আমারে এ আঁধারে

কবি অতুলপ্রসাদ সেনের জীবন-উপন্যাস

কল্যাণকুমার বসু

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ, ১৩৭৬
জুলাই, ১৯৬৯
প্রকাশ করেছেন
অমিয়কুমার চক্রবর্তী
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলকাতা ১২
ছেপেছেন
জগন্নাথ পান
শান্তিনাথ প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা ৬
প্রচ্ছদ এঁকেছেন
গণেশ বসু

ছেলেবেলায় প্রথম বাবার মুখে কবি অতুলপ্রসাদের নাম ও গান এবং তাঁর লখনউ প্রবাসের দিনগুলির কথা শুনি। অতুলপ্রসাদ বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ থেকে লখনউ-প্রবাসী হয়েছিলেন এবং প্রবাসেই দেহরক্ষা করেছিলেন। বংশপরম্পরায় আমরাও ছিলাম লখনউ প্রবাসী। অতুলপ্রসাদের সঙ্গে প্রথম পরিচয় আমার, মাকে উপহার দেওয়া বাবার লাল কাপড়ে তুলোর প্যাডে বাঁধাই সোনার জলে লেখা পুরোনো সংস্করণের গানের বইয়ের মাধ্যমে। সুরের একটা হাওয়া বহে গেল। তারপর এল গানের পর গান···বন্ধু প্রভু সেন, এখন লণ্ডন প্রবাসী কমার্শিয়াল আর্টিস্ট—তখন আমাদের গানের আসর বসত কখনো আর্ট কলেজের মাঠে। চিত্র সঙ্গীত সাহিত্যের মধ্যে কোথায় যেন একটা যোগসূত্র আছে, সেদিক থেকে আর্ট স্কুল বা কলেজের মাঠের একটা ঐতিহ্য আছে। সেখান থেকে গানের আসর বসত কখনো বন্ধু শ্যামল সেন এবং প্রভুর বালীগঞ্জ স্টেশনের কাছের একটা বাড়িতে। পিয়ানোর সামনে বসে প্রভু গান গাইত: 'আমারে ভেঙে ভেঙে', 'একা মোর গানের তরী ভাসিয়েছিলাম' বা 'আর কতকাল থাকব বসে দুয়ার খুলে', এবং আরও কত যে গান। বড় দরদী গলা ছিল তার। সে গানগুলির করুণ সুরের মায়া বড় নিষ্ঠুর হয়ে হৃদয়টাকে আঘাত করত। তখনই ভাবতাম, এত করুণ সুরে এত ব্যথার গান অতুলপ্রসাদ কেমন করে রচনা করলেন।···তখন কি জানতাম এমন সুর-পাগল মানুষটিকে! পরে একটু একটু করে জেনেছি এবং একটা সঙ্কল্পও করে বসেছি। আমার মনের ইচ্ছে অতুলপ্রসাদের জীবন কাহিনী জানা।—এ জীবন কাহিনী তাই তাঁর সাহিত্য-জীবন; তাঁর কাব্য-জীবন; তাঁর সুরের জীবন-কথা।

ইতিমধ্যে আমাকে প্রেরণা দিতে আমার বাবা (শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু) লখনউয়ের প্রবাস জীবন এবং অতুলপ্রসাদ প্রসঙ্গে একখানি পাণ্ডুলিপিও তৈরি করেছিলেন। তাতে আমার উৎসাহ আরও বৃদ্ধি পায়। কবিপুত্র শ্রীযুক্ত দিলীপ সেন এবং পুত্রবধূ শ্রীমতী বেলা সেন নানান তথ্য ও মূল্যবান চিত্র দিয়ে অনুগৃহীত করেছেন। শ্রীযুক্ত সেন অনেক শ্রম স্বীকার করে আমাকে সঙ্গে করে লখনউয়ে কবির স্মৃতি-চিহ্নিত স্থানগুলি ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন এবং কবির সম্বন্ধে নানান বিষয় আলোচনা করেছেন। কবির ভাইঝি শ্রীমতী জ্যোৎস্না সেন কবির নানান তথ্য, তাঁর পিতার ডায়েরি, কবির হস্তাক্ষর-চিত্র ও অমূল্য উপদেশ দিয়ে কৃতজ্ঞতা পাশে বেঁধেছেন। এছাড়া আমি অনেকের কাছেই কৃতজ্ঞ: যেমন, শ্রীমৎ স্বামী বিমলানন্দ গিরি মহারাজ, ৺ ডাঃ কালিদাস নাগ, সাহিত্য-প্রেমিক শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী, শ্রীসঞ্জীবকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীদেবকুমার বসু, শ্রীপ্রভাত

গঙ্গোপাধ্যায়, এবং আরও অনেকেই। একখানি গান বিশিষ্ট সাংবাদিক সাহিত্যিক শ্রীপ্রভাত গঙ্গোপাধ্যায় কবি অতুলপ্রসাদ রচিত বলে দাবি করেছেন। সে গানখানি এখনও অপ্রকাশিত। গানখানি তুলে দিলাম :

জননী বঙ্গ, তোমার সঙ্গ লভিয়া যদি গো,
অঙ্গ আমার হয় মা ক্ষয়,
তথাপি রঙ্গে ভ্রূকুটি-ভঙ্গে তুচ্ছ করিয়া
গাহিব জননী, তোমারি জয়।
লাঞ্ছিত আমরা যদিও জননী
শোণিত রঞ্জিত মোদের শির,
বক্ষ ভেদিয়া বহে যায় গুলি
তথাপি ফেলি না অশ্রুনীর,
মৃত্যু সতত করিছে নৃত্য শিয়রে মোদের
তবুও করি না কাহারে ভয়।
অভয়ার বরপুত্র আমরা
হাসিয়া করি মা গরল পান,
অনল দহন যদিও মা বুকে
কণ্ঠে গাহিবে তোমারি গান ;
সপ্ত কোটি সন্তান আমরা
তোমার লাগিয়া এনেছি অর্ঘ্য,
তুমি গো জননী দেবতা মোদের
ধরায় তুমি মা মোদের স্বর্গ।
যে পূজার মাগো এত আয়োজন
প্রাণ বিনিময়ে
সে যেন যজ্ঞ পূর্ণ হয়।

শ্রীবসন্তকুমার বসু
ও
শ্রীমতী শান্তি বসু

কবি অতুলপ্রসাদের হস্তাক্ষর

অতুলপ্রসাদ সেন

কবিপত্নী শ্রীমতী হেমকুসুম সেন

মনডে ক্লাবে অতুলপ্রসাদ
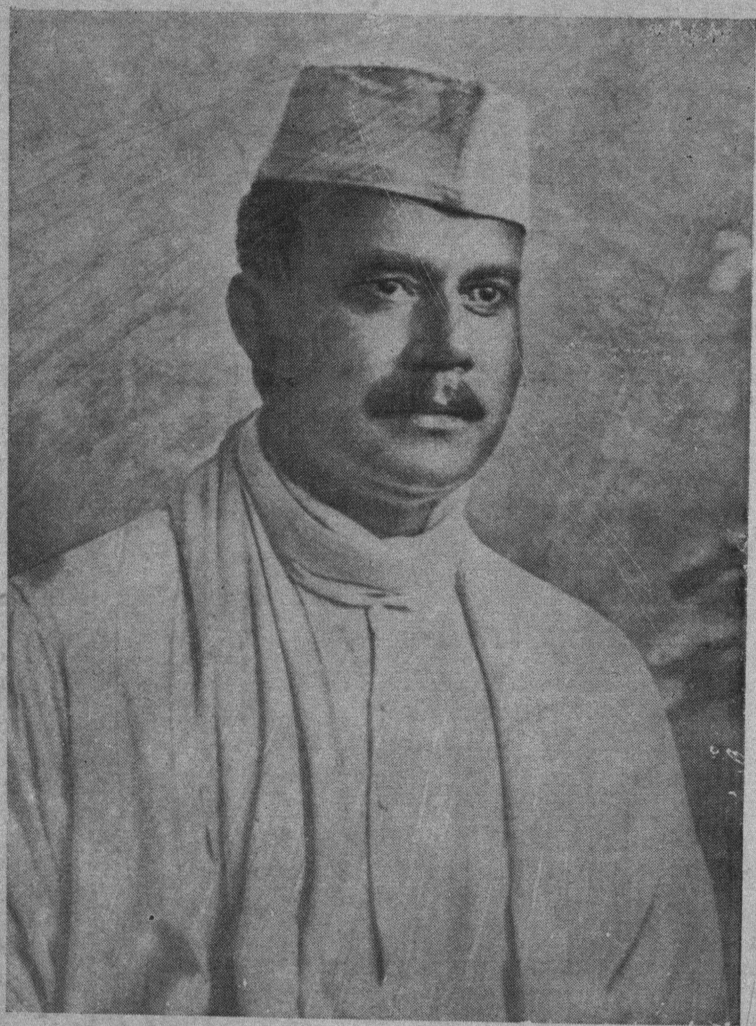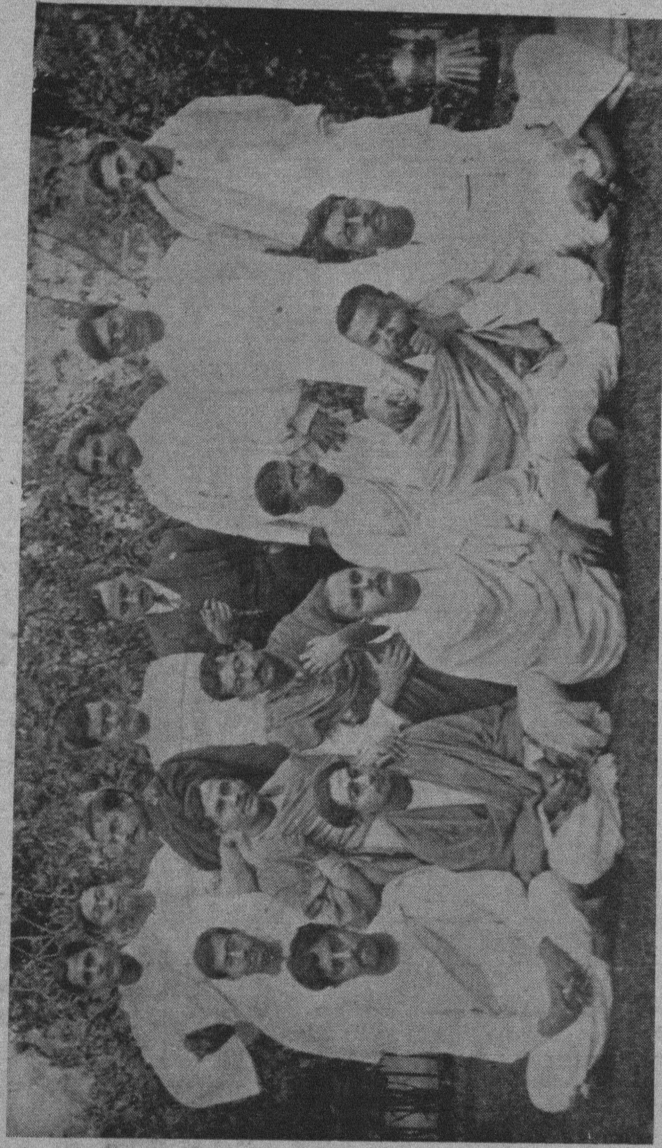
প্রথম সারিতে বসে : সুবিনয় রায়, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, অতুলপ্রসাদ সেন, শিশিরকুমার দত্ত, সুকুমার রায়।
মাঝের সারিতে বসে : যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অমল হোম, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, জীবনময় রায়।
দাঁড়িয়ে : হিরণ সান্ন্যাল, অজিতকুমার চক্রবর্তী, কালিদাস নাগ, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র সেন, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী।

১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডন-প্রত্যাগত নতুন ব্যারিস্টার অতুলপ্রসাদ সেন
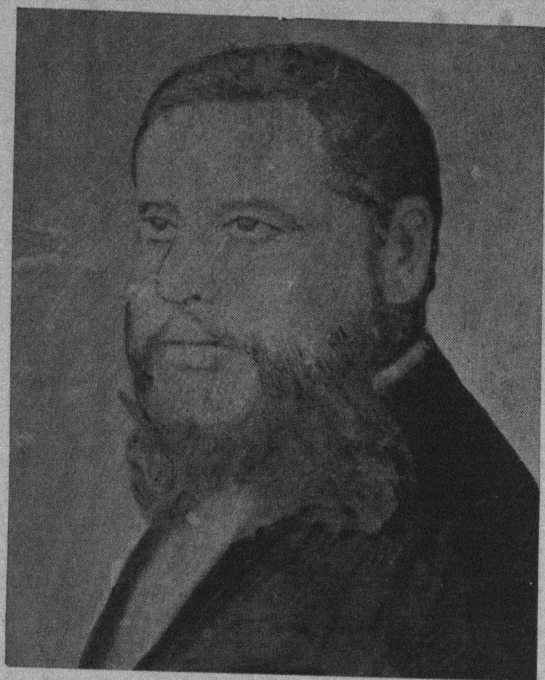
রামপ্রসাদ সেন (অতুলপ্রসাদ সেনের পিতা)

যমজ পুত্রের একজন—দিলীপ সেন

যমজ পুত্রের একজন— নিলিপ সেন

লক্ষ্ণৌয়ে অতুলপ্রসাদের মর্মর-মূর্তি

অতুলপ্রসাদ সেন

কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, তোমার বাবার নাম কী? কী বলবে অতুল বল তো বাবা? বলবে, ডাঃ রামপ্রসাদ সেন।…তোমার বাবা একজন ডাক্তার। বাবা আবার বলতেন—

মায়ের নাম কী জান? শ্রীমতী হেমন্তশশী সেন। ঠাকুর্দার নামও তোমার জানা উচিত, শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র সেন। আমাদের দেশ কোথায় জান অতুল? ফরিদপুর জেলার দক্ষিণ বিক্রমপুর পরগণার খালবিল-ঘেরা এক গণ্ডগ্রাম, নাম তার মগর। আজ থেকে বহুদিন আগে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝখানে বাঙলায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন গোড়া গেড়ে বসেছে, তাদের হাত পশ্চিম দিকে বিস্তার আরম্ভ করেছে, সেই সময়ে তোমার ঠাকুর্দা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কবিরাজি তাঁর পেশা ছিল। আশেপাশের যে-কটি গ্রামের মানুষ ছিল তাদের তিনিই ছিলেন কাণ্ডারী। হাতযশও হয়েছিল। রোগ সারানোর পাওনা হিসেবে শাকটা মুলোটা থেকে, কলুর তেল থেকে, গয়লাবাড়ির দুধ-ঘি, সংসারের যা কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসের তাঁর অভাব কোনদিনও হয়নি। মাঝে মাঝে জমিদারবাড়ি থেকে ডাক আসত, তখন পাওনা-থোওনা ভালই ছিল। অন্নবস্ত্রের অভাব ছিল না।…তোমার ঠাকুর্দার তিন ছেলে দুই মেয়ে—তোমার বড় জ্যাঠামশাইয়ের নাম দুর্গাপ্রসাদ সেন, তারপর তোমার বড় পিসিমা উমাতারা, তারপর মেজজ্যাঠামশাই গুরুপ্রসাদ, ছোট পিসি ভবসুন্দরী, আর সবথেকে ছোট্ট কে জান, তোমার বাবা রামপ্রসাদ। তোমার কোন কাকা নেই।

বাবা আবার বলতেন, তোমার জন্ম ঢাকা শহরে ১২৭৮ সনের কার্তিক মাসে এক রবিবার—ইংরাজী ২০-১০-১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে।…তুমি খুব ছোট্ট ছিলে বাবা, নীল নীল চোখ তোমার, একমাথা চুল, সোনার মত রং। আঁতুড়ঘরে তোমাকে তোমার মায়ের কোলের কাছে শুয়ে থাকতে দেখে কী যে ভাল লাগল…একবার তোমার মুখখানা দেখেই ভীষণ ভালবেসে ফেললুম। তোমাকে কোলে নিয়ে আদর করবার জন্যে ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু জান…

আমাকে তখন কোলে তুলেছিলে বাবা?

না। কোলে তুলে নিতে পারলুম কই!

কেন বাবা?

আঁতুড়ঘরে ছোটদের কোলে তোলা নিয়ম নেই। দিদিমা-ঠাকুমারা কোলে তুলতে দেয় না।

তুমি তাহলে আমাকে কোলেই নাওনি বাবা ?

তা কেন হবে। তুমি যখন একটু বড় হলে, আঁতুড়ঘর থেকে তোমার মা তোমাকে নিয়ে বাইরে এলেন, আমি তখন তোমাকে বুকে রেখে বসে থাকতুম দক্ষিণের বারান্দায়, শীতের রোদে, আমার ইজিচেয়ারটিতে। কখনো তোমার মাকে লুকিয়ে তোমাকে কোলে তুলে নিয়ে নেমে আসতুম চুপিচুপি সিঁড়ি ধরে একেবারে বাগানে। লতানে সাদা গোলাপ-ঝাড়টি আমার খুব প্রিয় ছিল, তার বাঁধানো চৌতরায় তোমাকে নিয়ে বসে থাকতুম ঘণ্টার পর ঘণ্টা। মিঠে রোদ উঠত, মৃদু হাওয়া বইত। তোমাকে আমি বাগানে নিয়ে আসি তোমার মা কিন্তু পছন্দ করতেন না। বলতেন ঠাণ্ডা লাগবে। কিন্তু তোমার ঠাণ্ডা লাগলেই হল, তোমাকে যে আমার গরম বুকের মাঝে বন্দী করে রাখতুম। তুমি যে আমার কত আনন্দের—তুমি যে আমার আত্মজ !

জান, তোমাকে কোলে নিয়ে যখন আমি বাগানে নেমে আসতুম তখন তোমার মা মুখভার করতেন। আমি হাসতুম, তোমার মা রাগ করতেন। তোমাকে নিয়ে আমাদের ঝগড়া হত।

তোমার মা বলতেন, খোকন আমার। আমি বলতুম, তুমি আমার। তোমার মা তোমাকে কোলে তুলে নেবার জন্যে হাত বাড়াতেন। তোমাকে ডাকতেন। তুমি খিলখিল করে হাসতে। নীল নীল চোখ আমার পানে তুলে তাকাতে। আমি বলতুম, 'ও' তোমার কাছে যাবে না।। 'ও' তোমার ছেলে নয়।

'ও' বললে, বাবা তোমার ওপর মা তাহলে খুব রাগ করতেন, তাই না বাবা !

বাবা বলতেন, হ্যাঁ, খ্‌উব। তারপর তুমি একটু বড় হলে। হামাগুড়ি দিতে শিখলে। প্রথমে বুকে হেঁটে হেঁটে, তারপর হাতে পায়ে শক্তি হল। তখন দেয়াল ধরে দুপায়ে দাঁড়ালে। টলটল করে হাঁটলে, হাঁটতে গিয়ে পড়ে গেলে মাটিতে বারবার—তখনই তো তুমি হাঁটতে চলতে শিখলে। প্রথম যেদিন আমার হাত ছেড়ে চললে সেদিন তোমার মা বিশ্বাসই করছিলেন না। আবার যখন আমাদের চোখের সামনে পায়ে পায়ে চললে তখন তোমার কৃতিত্ব থেকে আমাদের কাছে আমাদের কৃতিত্বটাই বড় বলে মনে হল। মনে হল আমাদের স্বপ্ন সফল হয়েছে।

এখন আমি অনেক বড় হয়ে গেছি, না বাবা—? 'ও বলে।

বাবা হাসতেন। বলতেন, তা হয়েছ, অনেক বড় হয়েছ, আমার মত বড় হয়েছ। মা'ও হাসতেন।

মা-বাবা ওর কথায় কেন হাসেন 'ও' মাঝে মাঝে ভাবে। বাবা বলতেন, তোমাকে মানুষ হতে হবে অতুল ; দেশ এবং দশের মাঝে একজন হতে হবে। মা বলতেন 'খোকন', বাবা বলতেন 'অতুল'।

মা বলতেন, জান, তোমার বাবা কত কষ্ট করেছেন তবে আজ দাঁড়িয়েছেন। এই ডাক্তার হিসেবে এত সুনাম, ডাক্তারখানার প্রতিষ্ঠা—এ কি সহজ কথা! কত দিনরাত পরিশ্রম করে তবে না……

মা বলতেন, তোমার বাবা দেশে তোমাদের গ্রামের পাঠশালায় লেখাপড়া শেষ করে তোমার ছোটপিসির কাছে পণ্ডিৎসায় গিয়ে বাংলা এবং ফারসী শেখেন। সেখান থেকে পণ্ডিত হয়ে জপসা ইস্কুলে পণ্ডিতের কাজ নিলেন। পণ্ডিতের কাজ কিছুদিনের মধ্যে তোমার বাবার আর ভাল লাগল না। একদিন পণ্ডিতের কাজ ছেড়ে দিয়ে অজানা উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। ভাসতে ভাসতে কলকাতায় এসে উপস্থিত। ওখানে এক মহর্ষির[1] সঙ্গে আলাপ হয়। তাঁর দয়ায় এবং সাহায্যে তোমার বাবা মেডিক্যাল কলেজের বাংলা ক্লাসে ভর্তি হলেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্ম ধর্ম নিলেন। তোমার বাবা পণ্ডিত ছিলেন, তারপর ডাক্তার হলেন। ডাক্তার হয়ে সরকারী কাজে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ালেন। ঢাকাতেও এলেন, পাগলা গারদের ডাক্তারের চাকরী নিয়ে…। তখন তুমি কোথায় খোকন!

মা, তুমি? ও নীল নীল চোখ তুলে মাকে জিজ্ঞেস করত।

মা বলতেন, তোমার বাবা তখনই তো আমাকে বিয়ে করে বাড়ি নিয়ে এলেন। তারপর জান খোকন…মা কিছুক্ষণ থামতেন, যেন দম নিতেন, তারপর বলতেন—

কিছুদিন পর তোমার বাবার এ চাকরীতেও মন বসল না। প্রায়ই হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে মুখ গম্ভীর করে থাকতেন। প্রায়ই বলতেন, পরের গোলামী আর করব না। চাকরী করে আর কী হবে। চাকরীতে উন্নতি নেই। গোনা টাকা… তখনই বুঝতাম অফিসে কারো না কারো সঙ্গে ঝগড়াঝাটি হয়েছে। তোমার বাবা আবার কোনরকম অন্যায়ই সহ্য করতে পারেন না। অন্যায় দেখলেই রুখে দাঁড়ান। তাই সকলের সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটে। আমি কত বলেছি, চোখ বুজে থাকলেই তো পার। তোমার বাবা বলেন, পারি না—কোন অন্যায়ই আমার সহ্য হয় না। পরের চাকরী আর করব না। আমি বলি, বেশ তো পরের চাকরী নাই বা করলে। কে তোমায় মাথার দিব্যি দিয়েছে। চাকরী করার দরকারই বা কী, ঢাকা শহরে প্রাইভেটে প্র্যাকটিস কর না। তোমার বাবা বলতেন, তুমি ঠিক বলেছ। প্রাইভেটে ডাক্তারীই করব।…তারপর তোমার বাবা এই মিরাতারে বাসা নিলেন আর প্রাইভেটে প্র্যাকটিস করে হাতে কিছু টাকা জমালেন—প্রতিষ্ঠা করলেন 'আর পি. সেন নিউ মেডিক্যাল হল'। ঢাকা শহরের মধ্যে এখন সবচেয়ে বড় ওষুধের দোকান। কত নামজাদা ডাক্তারেরা পালা করে বসেন।

---

১ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মা বলতেন, খোকন, আজ কী পড়াশোনা করলে ? কাল যে পড়াগুলি দিয়েছিলাম সব হয়েছে ?

'ও' বলত, হয়েছে মা। তারপর গড়গড় করে সব পড়া বলে যেত। সে সময়ে মা ছিলেন যেন একাধারে গুরুমা এবং প্রাণের বন্ধু। ওর সব কথা মাকে বলা চাই। খোকন বুঝতে পারুক আর না পারুক। আসলে মায়েরও যে কারো সঙ্গে কথা বলা চাই··· বাড়িতে আর কে আছে! ছোটবোনটা তো[২] এতটুকুন, সবসময়েই ঘুম আর ঘুম। আড়াইজনের (অতুল এবং তার ছোটবোনকে 'একজন'ও ধরা যায় না) সংসারের কাজ কতটুকুন! অল্পেই সব কাজ সারা হয়ে যায়। তারপর আর সময় পার হতে চায় না। কখনো সেলাই নিয়ে বসেন, খুকুর জন্যে ফ্রক তৈরি করেন। খোকনের জন্যে শার্টের মাপ নেন, খোকনকে সামনে দাঁড় করিয়ে···অথবা শীতকালে উলের সোয়েটার বোনেন ···কিন্তু সে কাজও সীমাবদ্ধ। কোন সকালে মিরাতারের বাসায় সূর্যনারায়ণবাবু, কাশীনাথবাবু, প্রিয়লালবাবু এবং ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষক দুর্গাদাসবাবুরা[৩] আসতেন। সাতসকালে চা জলখাবারের মধ্যে দিয়ে সময়টা মেল ট্রেনের মত এগিয়ে চলত। মিরাতারের বাসা ছিল যেন ডাক্তারদের ক্লাব কিংবা ডাক্তারদের ইস্কুল। কারণ করুণা ভাইয়ের বেটা কালীনাথ ঘটক এবং অটল ভাইরা ডাক্তারী শিক্ষা এখানেই করতেন। ঢাকার মেডিকেল স্কুলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ক্রমবি সাহেবও আসতেন। পাদরির মত অমায়িক এবং আলাপী ছিলেন। খালি পায়ে জলকাদা ভেঙে রুগী দেখতে যেতেন।

দুপুর হলেই মিরাতারের বাসা একেবারে নির্জন। খোকনের বাবা যেন মনে প্রাণে ডাক্তার। ডাক্তার, রুগী, রোগ এছাড়া পৃথিবীতে যেন আর কোন কথা নেই, পৃথিবীতে আর কেউ নেই। কোন্ সকালে ডাক্তার বন্ধুদের সঙ্গে নিউ মেডিক্যাল হলে তিনি বেরিয়ে যান। আর কত রাতে তিনি বাড়ি ফেরেন। সত্যি খোকন তার বাবাকে কখ্খনোই কাছে পায় না। বাবার সঙ্গে কোন কথা বলার সুযোগ পায় না। শুধু খোকনই কি!

মা বলেন, জান খোকন, তুমি যখন খুব ছোট তখন একবার আমরা দেশে গিয়েছিলাম···। তোমার বাবার প্রতি বছর দেশে যাওয়া চাই। ঢাকা থেকে কয়েকদিনের জন্যে ছুটি নিয়ে দেশ থেকে ঘুরে না এলে তোমার বাবার ঢাকা শহরে মন বসে না, কাজকর্ম ভাল লাগে না। দেশের বাড়িতে তোমার মেজজ্যাঠামশাই[৪] কবিরাজী

---

২ অতুলপ্রসাদ সেনের তিন বোনের মধ্যে বড় হিরণবালা।

৩ ঢাকা শহরের তৎকালীন নামজাদা ডাক্তারগণ—ডাক্তার সূর্যনারায়ণ সিংহ, ডাঃ প্রিয়লাল বসু, ডাঃ দুর্গাদাস রায়।

৪ অতুলপ্রসাদের জ্যাঠামশাই কবিরাজ গুরুপ্রসাদ সেন।

করেন। তোমার জাঠতুতো দাদারা কোন ইস্কুলে পড়ে জান—তোমার বাবাই দেশে-গ্রামে একখানা ইস্কুল করে দিয়েছিলেন—সেই ইস্কুলে।···সেবার জান, দেশের গ্রামের বাড়িতে আমরা একমাস থাকলুম। তারপর তুমি, তোমার বাবা এবং আমি ঢাকায় ফিরব বলে পদ্মানদীতে বজরায় চলেছি সেই সময়ে এক প্রচণ্ড তুফান উঠল—সেই ঝড় তুফানই পূর্ব-বাঙলার ১২৮০ সনের সেই কুখ্যাত ঝড়-তুফান আর বন্যা। সেই বন্যায় নোয়াখালি, বাখরগঞ্জ ভেসে গিয়েছিল। কী ক্ষতিটাই না হয়েছিল! কত মানুষ আর জীবজন্তু ভেসে গিয়েছিল তার ঠিকানা নেই।

খোকন বলে, পদ্মা নদীতে সেই ঝড়ের মাঝে আমাদের তখন কী হল মা?

মা বললেন, সেকথা ভাবলে আজও শিউরিয়ে উঠি বাবা! আমাদের বজরা বন্যার জলে ভেসে পদ্মার এক চড়ায় ঠেকল। মাঝি-মাল্লারা তোমার বাবাকে বললে যদি প্রাণ বাঁচাতে চান চড়ায় উঠে প্রাণ বাঁচান কর্তা। তোমার বাবা, তুমি এবং আমি তাড়াতাড়ি চড়ায় এসে প্রাণ বাঁচাব ভাবলাম। মাঝি-মাল্লাদের কথামত চড়ায় এসে উঠলাম। কিন্তু ক্রমশ বন্যার জল বাড়তে শুরু করল। পায়ের পাতা ভিজে গেল। পায়ের পাতা ছাড়িয়ে হাঁটু, হাঁটু থেকে কোমর, কোমর থেকে আমার গলা পর্যন্ত জল উঠল। অসহ্য স্রোতের টানে আমরা বুঝি ভেসেই যাব। তোমার বাবা তোমাকে কাঁধে তুলে নিলেন। আমরা সারাক্ষণ ভগবানকে ডাকলাম। ভগবান বোধহয় আমাদের কথা শুনলেন। ভোর হল। জল ধীরে ধীরে নেমে গেল। আমাদের মাঝি-মাল্লারা এসে আমাদের উদ্ধার করে নিয়ে গেল। ভগবানের অসীম করুণায় আমরা মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এলাম।

মা বললেন, আর একবার তুমি আর আমি এই ঢাকা শহরে কী বিপদে পড়েছিলাম!

'ও' বললে, আমার অল্প অল্প মনে আছে মা। আমরা সেদিন মামারবাড়ি যাচ্ছিলাম, ঘোড়ার গাড়িতে। ঘোড়ার গাড়ি চলছিল আর খুব দুলছিল, খুউব জোরে চালাচ্ছিল কোচওয়ানটা। ছুঠতে ছুটতে ঘোড়াগুলো যেন পাগল হয়ে গিয়েছিল। তুমি মুখ বাড়িয়ে কোচওয়ানকে বললে যেন মা, আস্তে চালাও। কিন্তু তোমার কথাটা শেষ হল না, আমাদের গাড়িটা হেলে পড়ল।

মা বললেন, কোচওয়ান ঘোড়াদুটো সামলাতে পারল না। ঘোড়াশুদ্ধু আমরা পড়লাম খালের জলে। আমি তোমাকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরে ছিটকে পড়েছিলাম খালের ধারের নরম মাটিতে, তাই সেবারও ভগবানের অসীম করুণায় বেঁচে গিয়েছিলাম। চোখ মেলে সেদিন যে দৃশ্য দেখেছিলাম আজো ভুলতে পারিনি খোকন। আমাদের ঘোড়ার গাড়িটা একেবারে ভেঙে চুরমার, ঘোড়াদুটো মরে পড়ে ছিল খালের ধারে। কোচওয়ানটার যে কী অবস্থা হয়েছিল আজও জানি না। সকলে সেদিন আমাকে তোমাকে তুলে নিয়ে মিরাতারের বাড়িতে পৌছে দিয়েছিল। তোমার বাবা তোমাকে

আমাকে পরীক্ষা করে বলেছিলেন, ভগবানের করুণায় এবারও তোমরা বেঁচে ফিরে এসেছ, আমার ভাগ্য এবং তোমার পুণ্য।

বাবা সবসময়ে ডাক্তারখানায়, মা ঘরকন্নার কাজে ব্যস্ত, ওর কাজ ছোটবোনটিকে পাহারা দেওয়া। কতভাবেই না ছোটবোনটিকে হাসাবার চেষ্টা করে ও। কখনো নেচেকুঁদে, কখনো মুখে নানা শব্দ করে। বোনটি খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। হাসলে বোনটিকে বড় মিষ্টি লাগে। তবু মনে মনে ভাবে বোনটি সত্যি বড় ছোট্ট। আর একটু বড় হলে বেশ হত। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখত মাঠের ধারের ছেলেদের। ওরা কপাটি খেলত, 'কপাটি কপাটি' বলতে বলতে। একদলের একজন সৈনিক আর-একদলের এলাকার মধ্যে পৌঁছে সকলকে 'মার' দিয়ে এল কিংবা সে বুঝি নিজেই ধরা পড়ল, ফিরে আসতে পারল না নিজের দলে। 'ওর' ইচ্ছে হত ওদের দলে নাম লেখায়। ওদের মত চিৎকার করে 'কপাটি কপাটি' বলে হাসি হাসে। ওদের মত খেলতে খেলতে ধুলোয় গড়াগড়ি দিলে মা বোধহয় খুবই বকবেন। মা যে বলেন ওদের সঙ্গে তোমার মেলামেশা করা উচিত নয় খোকন···ওরা বড় দুষ্টু। দেখছ না জামা কাপড় ছিঁড়ে ধুলোকাদা মেখে কি যাচ্ছেতাই কাণ্ডখানা করছে। ওদের সঙ্গে মেলামেশা করাটা মায়ের অপছন্দ।······তাই 'ও' মনমরা হয়ে যায়। বাড়িতে বসে বসে আর ভাল লাগে না। ভাবে বাবা-মাকে লুকিয়ে বাগানের গেট খুলে চুপিচুপি ওদের দলে চলে যাবে। কিন্তু সাহসে কুলায় না।

বাবা বোঝেন বুঝি। বলেন, অতুল তোমার এত মন খারাপ কেন ?

বাবা বলেন, আমি জানি। ওর সঙ্গীসাথী নেই—ওর একজন সঙ্গী চাই, ওর একজন বন্ধু চাই। ওর বুঝি বন্ধু-বান্ধব নেই ?

মা বলেন, নেই তো।

বাবা বলেন, আচ্ছা আমি ওর একজন সঙ্গী এনে দেব খেলাধুলো পড়াশোনার সবের—কালই।

বাবা দেশে জ্যাঠামশাইকে চিঠি লিখলেন : দাদা, তোমার সত্যকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। আমার অতুলের সঙ্গে ঢাকা শহরে মানুষ হবে। একসঙ্গে থাকবে। পড়াশোনা করবে। আমি তোমার সত্যর ভার নিতে চাই।

জ্যাঠামশাই আনন্দের সঙ্গে চিঠির উত্তর দিলেন। লিখলেন, বেশ তো ভাই তুমি সত্যর ভার নিতে চাও এ তো খুশির কথা। তোমার কাছে থাকলে আমি নির্ভাবনায় থাকি। সত্য তোমারই ছেলে। আমি পাঠিয়ে দেব তোমার কাছে নিশ্চয়ই।

দুই

চোখ মেলে চাও খোকন—আর কত ঘুমোবে! দেখ তোমার সামনে কে দাঁড়িয়ে আছে, কাকে সঙ্গে এনেছি। মা বললেন।

বিশ্বাস হয় না। রোজ সকালে ওর ঘুম ভাঙানোর জন্যে মায়ের কতই না অজুহাত। কখনো চোখের সামনে জানলা খুলে দিয়ে রোদ এনে দিয়ে ঘুম টুটিয়ে দেন। কখনো ঠাণ্ডা হাতখানা কপালে ছুঁইয়ে বলেন, কেমন ঠাণ্ডা বল তো! উঠে পড় শিগগির। এসব কথা ও জানে। তাই চোখ না খুলেই গায়ের চাদরখানা চোখ পর্যন্ত টেনে এনে পাশ ফিরে শোয় ও।

মা বললেন, উঠবি না তো—তবে উঠিস্‌নে।......চল্‌রে কালো, আমরা যাই।

আর কি সে বিছানায় শুয়ে থাকে! মুহূর্তে গায়ের চাদর সরিয়ে বিছানা থেকে লাফিয়ে নামে। কালোদা...তুমি! তুমি কখন এলে দাদা!

মা হাসেন।

পূজাপাঠ সেরে বাবা হাসেন।

ছেলেবেলার দিনগুলোয় 'ওর' জীবনের অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছিল ওর ছ-মাসের বড় জাঠতুতো কালাচাঁদদাদা বা সত্যদাদা।[৫] মিরাতারের বাসায় দাদার আসার সঙ্গে সঙ্গে দিনগুলো যেন অন্য রঙ ধারণ করল। বাবার ফুলবাগানের শখ ছিল, আবার সবজির খেতে সবজি ফলানোরও ইচ্ছে ছিল। সবজির খেতে নিজে দাঁড়িয়ে মালিকে কাজ করাতেন। সকলকে বলতেন, খেতের ফল তরিতরকারি বড় মিঠে জিনিস হে! এর আলাদাই স্বাদ গন্ধ। বাবার বাগান করার দেখাদেখি ওরও বাগান করার ইচ্ছে জাগত। দুই ভাইয়ের কোন্ সকালে ঘুম থেকে উঠে বিছানা ছেড়েই বাগানে চলে যাওয়া চাই। ফুল বাগানে, সবজির খেতের আল ধরে ধরে ঘুরে ফিরে বেড়াত। মালির সহকারী হয়ে খুরপি দিয়ে মাটি খুঁড়ত। কোদাল দিয়ে মাটি কোপাতে গিয়ে মালির কাছে বকুনি শুনত। খেলা ছিল ওদের রোজ সকালে বাগানে প্রজাপতি আর ফড়িংয়ের পিছু পিছু ছোটা। কোন ডালে ফুলে বা পাতায় বসলে পা টিপে টিপে উপস্থিত হয়ে তার ডানাদুটি ধরা। একবার প্রকাণ্ড একটা নানা রঙের প্রজাপতি ওকে লোভ দেখিয়ে এ ডালে ও ডালে ফুলে পাতায় বসে পালিয়ে যায় আর ও ছিটকে পড়ে কাঁটাঝোপের মাঝখানে। হাত-পা অনেকটা কেটে ছড়ে যায়। খুব খানিকটা বকুনি সেদিন জমা ছিল মায়ের কাছে।

---

৫ সত্যপ্রসাদ সেন। গুরুপ্রসাদ সেনের পুত্র।

সাত সকালে খালি পায়ে দুই ভাই বাগানে যায় মায়ের ইচ্ছে নয় তা। কিন্তু ওদের খালি পায়ে বাগানে-বাগানে ঝোপে-ঝাড়ে ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগত। হিরণ ছোট বোনটি, মাকে লুকিয়ে দাদাদের পিছু পিছু বাগানে আসত। মা তখন ব্যস্ত থাকতেন ছোট্ট কিরণকে ঘিরে। কিরণ সে বছর হয়েছে। ছেলেবেলায় মায়ের কাছে কত বকুনি চড়চাপড়টাই না খেয়েছে ওরা। তবে ভালোও বাসতেন খুউব। চড় চাপড় মেরে মার দুঃখ হত, গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতেন।

ওর বাবা ভোরবেলায় ওঠা পছন্দ করতেন।

বাবা বলতেন, তাড়াতাড়ি শুতে যাবে, তাড়াতাড়ি উঠবে। রোজ সকালে বিছানার ধারে এসে বলতেন, অতুল, সত্য, বিছানা থেকে উঠে পড়···আর ঘুম নয়। তিনি নিজে খুব ভোরে উঠতেন। অনেকদিন ঘুম ভেঙে শুনেছে ওরা বাবার গম্ভীর দরাজ গলার গান :

অয়ি সুখময়ী উষে কে তোমারে নিরমিল
বালার্ক-সিন্দুরফোঁটা কে তোমার ভালে দিল
হাসিতে মৃদু মৃদু আনন্দে ভাসিছে সবে
কে শেখালো এত হাসি, কেবা সে যে হাসাইল ?

গান শুনে ওরা বুঝতে পারে এখনো তাহলে বাবা বিছানা ত্যাগ করেন নি, আরো কিছুক্ষণ চোখ বুজে বিছানায় শুয়ে থাকা যায়। প্রত্যেকদিন স্তবগান গেয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে তবে বাবা বিছানা ত্যাগ করবেন। তারপর শুরু হবে তাঁর সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি। ঘুম ভাঙিয়ে ওদের প্রায় দিনই সংস্কৃত শ্লোক মুখস্ত করানো চাই। দাদার সংস্কৃত শ্লোক ভাল লাগত না। ফিকির খুঁজত বাগানে যাওয়ার জন্যে। 'খুড়োমশাইয়ের' অলক্ষ্যে ওকে চিমটি কাটত, চুপি-চুপি বলত, চল পালাই।

ওর কিন্তু সংস্কৃত শ্লোক ভাল লাগত। বাবার সঙ্গে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করতে আরো ভাল লাগত। স্মরণশক্তি প্রখর ছিল, যা শুনত ভুলত না।

রামপ্রসাদ পুত্রদের সংস্কৃত শ্লোক শিক্ষা দেবার পর হেসে বলতেন—যাও তোমাদের পাঠ শেষ হল, এবার মুখ হাত-পা ধুয়ে দুধ খেয়ে পড়তে বসে যাও।

ও বলত, বাবা, একবার আমি আর দাদা বাগান থেকে ঘুরে আসব ?

বাবা হেসে বলতেন, আচ্ছা যাও, বেশি দেরি কোরো না। আর, খালি পায়ে বাগানে যেও না।

কোন-কোন দিন বাবাও ওদের সঙ্গে নেমে এসে ওদের ফুলের ফলের গাছের সঙ্গে পরিচয় করাতেন। মালিকে বকে-ঝকে তরিতরকারি খেতের তদারকি করতেন। বাবার ডায়েবেটিস ছিল, সেইজন্য রোজ দুবেলা মাছ মাংস হত। বাবা নিজে ডাক্তার হয়েও আপন শরীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বাধা-নিষেধ মেনে চলতেন না। ডাক্তারেরা বোধ-

হয় অন্যদেরই উপদেশ দিয়ে থাকেন। নিজেরা মেনে চলেন না। ভোজনবিলাসী যাকে বলে রামপ্রসাদ তাই। বলতেন, ভাল খেতে হলে নিজে হাতে বাজার সারতে হয়। মাঝে মাঝে বলতেন, চল অতুল আমার সঙ্গে বাজারে। নিজে হাতে বাজার করবে চল।

মা রাজি হতেন না : কাজ নেই খোকন তোমার বাজারে গিয়ে, রোদ লাগাবে—শরীর খারাপ হবে।

বাবা একদিন বললেন, এবার তোমাদের ইস্কুলে ভর্তি হতে হবে অতুল-সত্য। কয়েকদিনের মধ্যেই ওদের দুর্গাবাবুর মডেল ইস্কুলে ভর্তি করে দিলেন। 'মিরাতারের গলি' থেকে দুর্গাবাবুর বিদ্যালয়ের দূরত্ব সামান্য। বাবা কাজে যাওয়ার পথে গাড়িতে ওদের দুজনকে ইস্কুলে পৌঁছে দিতেন। কখনো কখনো ওরা পায়ে হেঁটে ইস্কুলে যেত। বাবা সব সময়েই সাহেবী পোশাক পরতেন। এবং পছন্দ করতেন ওরাও যেন তাই পরে। বেশবাস দেখে ইস্কুলের বন্ধুরা প্রথম দিনেই ওদের নাম দিয়েছিল সাহেব। ওরা ছিল সাহেব-বাড়ির ছেলে। ইস্কুলের বন্ধুরা একটু আধটু ঠাট্টা করত, কিন্তু সম্মানও করত। সে সময়ে বন্ধুরা ছিল মনা, মতা, ভুতো—দুর্গাবাবুরই ছেলেরা, এবং বঙ্গবাবুর ছেলে যোগেশ এবং আরো কিছু ব্রাহ্ম ছেলেরা।

সেই সময়ে বাবা বলতেন, বল তো অতুল আমাদের কী ধর্ম ? আবার নিজে নিজেই বলতেন বাবা, আমরা ব্রাহ্ম। এই ব্রাহ্ম ধর্মের পরিকল্পনা করেন কে জান তো ? রাজা রামমোহন রায়। এই ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাতা কে জান তো ? মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। আমি যখন প্রথম কলকাতা যাই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হয়। তখন তিনি আমাকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা দেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজকে বলা হয় 'আদি ব্রাহ্মসমাজ'। তারপর ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে মহর্ষির আদর্শগত বিরোধ হল। কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে বসলেন নববিধান বা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ।

মডেল ইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা দুর্গাদাসবাবুও ব্রাহ্ম। ওঁর ইস্কুলের যে ক-জন শিক্ষক তাঁরাও ব্রাহ্মধর্মী। সৎকার্য হিসেবে ব্রাহ্মরা তখন প্রায়ই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করতেন। রামপ্রসাদও দেশে গ্রামের বাড়িতে একটা প্রাইমারী ইস্কুল করেছিলেন। সেইরকম দুর্গাদাসবাবুও ঢাকা শহরে ইস্কুল করলেন। উদ্দেশ্য মহৎ ছিল, কিন্তু পূর্ণতা ছিল না শিক্ষার ব্যাপারে। কারণ দুর্গাবাবুর বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা নববিধান সভার সভ্য এবং প্রচারক ছিলেন। এঁরা সকলে একটা বাড়ি ভাড়া করে থাকতেন। নববিধান সভার প্রচার কাজ সেরে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে সকালের প্রার্থনা সারতেই তাঁদের বেলা বারোটা সাড়ে বারোটা বেজে যেত। তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে তাঁরা যখন বিদ্যালয়ে

আসতেন তখন একটা দেড়টা বেজে যেত। তাই পড়াশোনার বদলে গোলমালই বেশি হত।

যোগেশ, মনা, মতা, ভুতো, সত্য, অতুলরা টেবিল পিটিয়ে বাদ্যকার্যে নিযুক্ত থাকত। কখনো গান জুড়ে দিত। গোলমালে দুর্গাদাসবাবু ক্লাস ছেড়ে ছুটে আসতেন। সৌম্য শান্ত মুখে বুঝি বিরক্তির রেখা ফুটত। পরমুহূর্তে শান্তভাবে পিঠে হাত বুলিয়ে বলতেন, এমন কাজ কোরো না বাবারা, একটু চুপ করে বোস তোমরা—এক্ষুনি তোমাদের শিক্ষকমহাশয় আসবেন। তোমাদের গোলমালের জন্যে অন্য শ্রেণীর পড়ার ক্ষতি হয়। ব্যাঘাত হয়। দুর্গাদাসবাবুর ক্লাসের মধ্যে প্রবেশ করলে ক্লাস একেবারে শান্ত, ক্লাসের বাইরে পা বাড়ালেই কল্লোল জেগে উঠত। আনন্দবাবুর[৬] পুত্র সুধীর এবং গোবিন্দবাবুর[৭] পুত্র সুবোধ গান গাইত। মিরাতারের বাসাবাড়ির দক্ষিণের ঘরটা ওদের গানবাজনা চর্চার আসর। গান এবং বাজনা দুই চলত। সুবোধের বাবা গোবিন্দবাবু গান লিখতেন। সুবোধ বাবার দেওয়া সুরেই বাবার গান গাইত, কত কাল পরে বল ভারত রে দুঃখ-সাগর সাঁতরি পার হবে। সুবোধের গানের সঙ্গে সঙ্গে মনা, মতা, ভুতো, সত্য কাঠের টেবিল পিটত বেসুরোভাবে। বাবার পাখোয়াজখানা বাবার ঘর থেকে নামিয়ে আনত ও বাবার অসাক্ষাতে। বাবার ঘরের এককোণে সব যন্ত্রই থাকত—বেহালা, তবলা, হারমোনিয়াম। রেওয়াজে যদিও ফুরসত মিলত না তবু যন্ত্রসঙ্গীত শেখার একটা আগ্রহ এবং ইচ্ছে ছিল বাবার। বাবা গান লিখতেন, কবিতা রচনা করতেন। হোলির সময়ে হোলির গান, প্রার্থনার সময়ে প্রার্থনা-সঙ্গীত লিখতেন।···মিরাতারের বাসার একধারে বড়দের গানবাজনার আসর, অন্যদিকে ছোটদের আসর। সুবোধ অতুল পাল্লা দিয়ে চিৎকার করে গান গাইত। বন্ধুরা আনন্দে হাততালি দিত। কিন্তু প্রায়ই সুবোধের সঙ্গে পেরে উঠত না অতুল। সুবোধ যখন হঠাৎ বাবার লেখা গান ছেড়ে দিয়ে হিন্দি গান চিৎকার করে শুরু করে দিত তখন রণে ভঙ্গ দিতে হত অতুলকে। কারণ ওর কোন হিন্দি গানে দখল নেই। ওদিকে আকর্ষণও নেই। সুবোধরা যে ছিল পশ্চিমে।

কুচবিহারের মহারাজার সঙ্গে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা সুনীতি দেবীর বিবাহ উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে আদর্শগত ও নীতিগত দিক থেকে মহা আন্দোলন উপস্থিত হল। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেও ভাঙন দেখা দিল। তার পরবর্তী অধ্যায়ে আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ প্রগতিশীল একদল ব্রাহ্ম সভ্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করলেন। ঢাকাতেও তার ঢেউ এসে পৌঁছল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে রইলেন পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, অতুলের মাতামহ রাজর্ষি কালীনারায়ণ গুপ্ত, ডাঃ পি. কে.

---

৬ আনন্দচন্দ্র রায়। ৭ গোবিন্দচন্দ্র রায়।

রায়, প্রসন্নকুমার মজুমদার, রজনীকান্ত ঘোষ, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় এঁরা সকলে। নববিধান সমাজ অর্থাৎ কেশবচন্দ্রের মতবাদ সমর্থন করে দাঁড়ালেন সর্বপ্রথমে ডাঃ রামপ্রসাদ সেন। তাঁর সঙ্গে এগিয়ে এলেন বঙ্গচন্দ্র রায়, ডাঃ দুর্গাদাস রায়, গোপীকৃষ্ণ সেন, কৈলাসচন্দ্র নন্দী, বৈকুণ্ঠ ঘোষ। মুস্কিল হল উপাসনা করার জায়গা নিয়ে; একটা অফিস তো চাই। নববিধান সমাজের একটা মন্দিরও চাই।

রামপ্রসাদ বললেন, যতদিন না আমরা মন্দির গড়তে পারি আমার বাড়িতেই হোক উপাসনা—নববিধানের অফিস হোক আমার বাড়ি।

তাই হল।

প্রতি রবিবার মিরাতারের বাসাবাড়ি হল নববিধান সভার সভ্যদের উপাসনার স্থান এবং অফিস। নববিধান সভার সভ্য-সভ্যারাও আসতেন উপাসনায় যোগ দিতে।

মিরাতারের বাসাবাড়ি প্রথমে ছিল ডাক্তারদের ক্লাব, এখন সেইসঙ্গে হল নববিধান সমাজের ব্রাহ্ম সভ্য-সভ্যাদের মিলন-ক্ষেত্র। ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা-সমালোচনা হত, আবার রবিবার নিয়ম করে উপাসনা-সভা বসত। অন্তরপুরিকারা যোগ দিতেন, আলাপ-আলোচনায় এবং উপাসনায়। ছোটরাও যোগ দিত। উপাসনা সভায় ছোট্ট অতুলের নিপুণ পাখোয়াজ বাদ্য উপস্থিত সকলে খুব উপভোগ করতেন। বাবা একদিন প্রার্থনা সভায় সকলের সামনে ওকে ওর উপযোগী ছোট্ট একটা পাখোয়াজ উপহার দিলেন। ওর সেদিন কী আনন্দ!

মিরাতারের বাসায় থাকতে থাকতেই বাবা একদিন দুর্গাবাবুর ইস্কুল ছাড়িয়ে ওকে আর সত্যকে ঢাকা কলেজিয়েট ইস্কুলে ভর্তি করে দিলেন। সত্যি, মডেল ইস্কুলে বিশেষ কিছু পড়াশোনা হচ্ছিল না, শুধু গোলমালেই সময় যায়।

মডেল ইস্কুল আর মানা, মত্তা, যোগেশ, ভুতো আর দুর্গাবাবুর মেয়ে বিনোদিদি সকলকে হারিয়ে আসতে ওদের বড় মন কেমন করছিল। কিন্তু উপায়ই বা কী! এর কিছুদিন পরে মিরাতারের গল্লির সেই কতদিনের পরিচিত বাড়িটাকেও তো ছেড়ে আসতে হল।

বাবা সেদিন মাকে বললেন, বড় অসুবিধেয় পড়া গেছে জান, আমাদের এই মিরাতারের বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। কালীপ্রসন্নবাবু নোটিশ দিয়েছেন। মিরাতারের বাড়িতে আমরা এগারো বছর রইলাম। বাড়িওয়ালার ভয়, বারো বছর থাকলে বাড়িটাতে আমাদের স্বত্ব জন্মে যাবে, তখন বাড়িটা তার হাতছাড়া হয়ে যাবে[৮]।

---

৮ 'মিরাতারের গল্লিতে যে বাসায় থাকিতাম তাহার মালিক ছিলেন কালীপ্রসন্ন বসু। এই বাসায় আমরা ১১ বৎসর ছিলাম। পাছে ১২ বৎসর থাকিলে আমাদের স্বত্ব জন্মে সেইজন্যে আমরা সে বাসা ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছিলাম।'

সত্যপ্রসাদের ডায়েরি থেকে।

মা হেসে বললেন, সেরকম আইন আছে শুনেছি যেন! আমরা অনেকদিন ভাড়া গুনে *দিলাম, বাড়ি আমরা ছাড়ব কেন! দাও না একটা কেস ঠুকে।*

বাবা হেসে বললেন, না সেরকম অধর্ম করতে পারব না। বাবা বাড়ি খুঁজলেন। পেলেন না সুবিধেমত। দাদু বললেন, যতদিন না তোমরা বাড়ি পাও আমার কাছে থাক না। দরকার কী এত বাড়ি খোঁজার, আমার এত বড় বাড়ি! অনেক ঘর আছে খালি। চলে এস। কোন অসুবিধে হবে না, রামপ্রসাদ।

বাবা বললেন, আচ্ছা।

অনেকদিনের স্মৃতিঘেরা মিরাতারের গল্লির বাড়ি ছেড়ে চলে আসতে হল। মালপত্তর গরুর গাড়িতে আগেই চলে গেল। ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে মায়ের সঙ্গে এল ১৪ নম্বর লক্ষ্মীবাজারে মামার বাড়িতে থাকতে এখন থেকে।

কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে বাস করা যায় না চিরকাল। তা ছাড়া লক্ষ্মীবাজার থেকে 'ঢাকা মেডিক্যাল স্টোর' অনেক দূর। তাই রামপ্রসাদ মিরাতারের গল্লির কাছাকাছি ডাক্তারখানার কাছেই একখানা ঘর ভাড়া নিলেন। ডাক্তারখানার কাজ শেষ করে সেখানেই বিশ্রাম নিতেন। সেখানেই অফিস, আড্ডার জায়গা। মাঝে মাঝে রাত্রিবাস করতেন সেখানেই। কোন কোনদিন লক্ষ্মীবাজারে এসে থাকতেন সারাদিন ছুটিছাটাতে। সেদিন অতুল-সত্যকে সারাদিন নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন।

দেখি কতদূর পড়াশোনা করলে—

কে আমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারে তাড়াতাড়ি,—অতুল না সত্য! নতুন কী গান শেখা হল অতুল? না কি আজকাল গান-বাজনা সব ভুলে গেছ?

রামপ্রসাদের মিরাতারের বাসাবাড়ি ছেড়ে দেওয়ায় ঢাকার নববিধান সমাজের অফিস ঘর এবং উপাসনা-সভার যথেষ্ট ক্ষতি হল। নববিধানের নব্য সভ্যবৃন্দ এসে ধরলেন রামপ্রসাদকে, এই নবসভার একখানা মন্দির চাই। রামপ্রসাদের মনেও আন্তরিক ইচ্ছে জেগেছিল নববিধান সভার একখানি মন্দির গড়ার। কিন্তু মন্দির গড়া কি সহজ কথা! তার জন্যে অনেক অর্থ অনেক পরিশ্রম প্রয়োজন। রামপ্রসাদ তাঁর সহযোগীদের বললেন, তাঁদের নববিধান সভার মন্দির যে করেই হোক তৈরি করতে হবে। যেমন করেই হোক অর্থ সংগ্রহ করতে হবে।

রামপ্রসাদের কথায় উৎসাহ পেলেন নববিধান সভার সভ্যরা। মনপ্রাণ সঁপে চাঁদার খাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন ঢাকা শহরের পাড়ায় পাড়ায়, বাড়িতে বাড়িতে, দোকানে অফিসে। তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন ডাক্তার রামপ্রসাদ সেন। যেখানে যে দোরে যতটুকুও সাহায্য পাওয়া যায় সেখানে পা বাড়ালেন অকুণ্ঠিত হৃদয়ে ডাক্তার রামপ্রসাদ।

ভাল কাজে অনেকে অনেক কথা বলে থাকে। অনেক ভাল, 'অনেক মন্দ কথা। অনেক বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনের কাছে রামপ্রসাদ ধিকৃত হলেন। অনেকে বললেন, ডাক্তারী ছেড়ে এ কী কাজে নেমেছেন ডাক্তার ·····আপনি ঢাকার একজন নাম-করা ডাক্তার···

রামপ্রসাদ হাসেন। আমি তো কোন কাজ ত্যাগ করে কোন কাজ করছি না।

রামপ্রসাদ হেসে বলেন আপন স্ত্রীকে, তুমি বল তো হেমন্তশশী, আমি যে কাজে নিজেকে নামিয়েছি সে কাজকে ভুল বলে তোমার মনে হয় ?

হেমন্তশশী বলতেন, তুমি ঠিক পথে আছ।

হেমন্তশশী তাঁর স্বামী ডাঃ রামপ্রসাদকে উৎসাহ জোগাতেন। তিনি স্বামী এবং পুত্রদের সঙ্গে সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। মাঘোৎসব অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অংশের ভার নিতেন। রান্না-খাওয়া, পরিবেশন, সব কিছু তিনি নিজে দেখতেন। প্রার্থনাসভায় পুরুষসিংহ শ্রীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায় আসতেন। কুলীনদের মধ্যে বহু-বিবাহ প্রথা লোপ করার জন্যে তিনি জীবনযুদ্ধে নেমেছিলেন। ডাঃ রামপ্রসাদ তাঁকে তাঁর কাজে উৎসাহ দিতেন।

ডাঃ রামপ্রসাদ সেন তাঁর স্ত্রী হেমন্তশশীকে প্রায়ই বলতেন, এক স্ত্রীর মৃত্যুর পর পুরুষেরা যেমন দ্বিতীয়বার বিবাহ করে, সে রকম স্বামীবিয়োগের পর স্ত্রীরও দ্বিতীয়বার পাণিগ্রহণে কোন বাধা নেই। তুমি কী বল ?

স্ত্রী চুপ করে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। স্বামী বলতেন, স্ত্রী-জাতির দ্বিতীয়বার বিবাহে সমাজের কোন বাধানিষেধ থাকা উচিত নয়। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী চীন, জাপান, বর্মীদের মধ্যে, এমনকি আমাদের ভারতবর্ষের কিছু কিছু হিন্দুর মধ্যেও পুনর্বিবাহ প্রথা চালু আছে। তবে কেন এই প্রথা আমাদের মধ্যে চালু করা হবে না ?

স্ত্রী বলতেন, সত্যি তুমি একথা অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস কর ?

স্বামী বলতেন, নিশ্চয়ই। ···হেসে একবার বলেছিলেন, জান, তোমাকে বিবাহের আগে আমার বিধবা বিবাহ করার খুব আন্তরিক ইচ্ছা জেগেছিল[৯]। স্বামী বলেন, আমি যে কথা চিন্তা করি আন্তরিক ভাবেই চিন্তা করি। স্ত্রী অবাক হয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। ভগবানও বোধহয় অলক্ষ্যে হেসেছিলেন। রামপ্রসাদ সেনের মতবাদের পরীক্ষা হেমন্তশশীর ওপর দিয়েই দেখতে চাইলেন। কিন্তু সেকথা আরো কয়েক বছর পরের ঘটনা।

স্বামীর তখন দিন নেই রাত নেই পরিশ্রম আর পরিশ্রম। মন্দির তাঁকে গড়ে

---

৯ 'খুড়োমহাশয় বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন। এক সময়ে নিজেই বিধবা বিবাহ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।' সত্যপ্রসাদ সেনের ডায়েরি থেকে।

তুলতেই হবে। কোন্ সকালে তিনি নবসভার সভ্যদের সঙ্গে নিয়ে ঢাকা শহরের পাড়ায় পাড়ায় অর্থসংগ্রহের চেষ্টায় বেরোন। স্নান আহারের ঠিক থাকে না। হেমন্তশশী অনুযোগ করেন, মাঝে মাঝে রাগ করে বসেন। বলেন—দরকার নেই এমন মন্দিরের যার জন্যে তোমার শরীরটা এমন যায়! তোমার কী অবস্থা হয়েছে বল তো! দেখেছ নিজের শরীরটা একবার আয়নায়? তোমার জন্যে আমার বড় ভয় হয় গো!

স্বামী হেসে বলেন, আর কিছুদিন। আর কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের টাকা তোলার কাজ শেষ হবে। আর অল্প প্রয়োজন।

একদিন স্বামী খুব আনন্দিতভাবে এসে বললেন, জান, আমাদের কোথায় মন্দির নির্মাণ হবে তার স্থান আমরা নির্বাচন করে এলাম। আরো কিছুদিন পরে বললেন, জান, আজ আমাদের জমি কেনা হল। এখন শুধু মন্দিরের নক্সা করা বাকি।

কিছুদিনের মধ্যে রামপ্রসাদকে ঘিরে নববিধান সভার সভ্যবৃন্দ অতি উৎসাহের সঙ্গে নক্সা নির্মাণ সংক্রান্ত আলোচনায় মেতে উঠলেন।

নক্সার কাজ শেষ। সেদিন নিউ মেডিক্যাল স্টোর থেকে বেরিয়ে মন্দিরের জায়গা জমির মাপঝোপের কাজ শেষ করে লক্ষ্মীবাজারের বাড়িতে ফিরে এলেন ডাঃ রামপ্রসাদ। এসে স্ত্রীকে বললেন, আমার শরীরটায় কেমন যেন জরজর মনে হচ্ছে। দেখ তো আমার পিঠে কোন ফোঁড়া হয়েছে কি? কেমন যেন ব্যথা ব্যথা লাগছে।

স্ত্রী বললেন, হ্যাঁ তোমার পিঠে একটা বিষফোঁড়া হয়েছে।

'সামান্য বিষফোঁড়া!' ডাঃ রামপ্রসাদ বিষফোঁড়াটার ওপর বিশেষ মনোযোগ দেবার দরকার মনে করলেন না। পরিণামে আরো কিছু কষ্টভোগ করতে হল। ফোঁড়াটা আকারে বড় হয়ে টসটসিয়ে উঠল। ডাঃ রামপ্রসাদ তখন স্থির করলেন, নিজেই নিজের ফোঁড়া অপারেশন করবেন। যা ভাবা তাই কাজ। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেই নিজের ফোঁড়াটিকে চিরে দিলেন। কিন্তু হিতে বিপরীত হল। আগে থেকেই ডায়েবেটিস ছিল, ঘা আর শুকোলো না। আরো মারাত্মক আকারে কার্বাঙ্কলে দাঁড়িয়ে গেল। রামপ্রসাদ একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন।

বাইরের কারো সঙ্গে দেখা করা চলে না। নববিধান সমাজের সভ্যরা প্রায় দিনই আসেন, বাইরে থেকে খবর নিয়ে চলে যান; দেখা করার অনুমতি মেলে না। কখনো কখনো একটু ভাল থাকলে বিছানার পাশে এসে দাঁড়ান বন্ধুরা, রামপ্রসাদ তাঁদের দেখে হাসতে চেষ্টা করেন। মন্দির নির্মাণের কাজ কতদূর এগুলো আগ্রহের সঙ্গে খবর নেন। মন্দির শেষ না হলে যে তাঁর কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। শেষে সেই দিন—অতুলের প্রথম দুঃখের দিনটি এসে গেল। রামপ্রসাদ অত্যন্ত অসুস্থ, তাঁকে মিরাতারের কাছে তাঁর একার নিবাস সেই বাসাবাড়ি থেকে লক্ষ্মীবাজারে অজ্ঞান অবস্থায় নিয়ে আসা

হল। দুর্বল শরীর, রক্ত-চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে। দুপুরবেলার দিকে তাঁর অবস্থা আরো খারাপ হয়ে এল। দাদামশাই-দিদিমা ব্যস্ত হয়ে অতুল সত্যকে ডাক্তার ডেকে আনতে বললেন। অতুলরা ছুটে গিয়ে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ডাঃ পি. কে. রায়কে খবর দিল। ডাঃ পি. কে. রায় এলেন। আরো কয়েকজন বড় বড় ডাক্তার এলেন ডাঃ রামপ্রসাদকে পরীক্ষা করতে। কিন্তু কোন মতেই কিছু করা গেল না। রাত্রে অতুলের পিতা রামপ্রসাদের আত্মা অমরলোকে যাত্রা করল। হিরণ কিরণ, অতুলের বোনেরা, কাঁদল মাটিতে লুটিয়ে লুটিয়ে, দিদিমা, মামা, মামী, মাসীরা কাঁদলেন। অতুল সত্য কাঁদল। বাবার মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে—মা পাথরের চোখ নিয়ে বিষণ্ণ-বিষাদ পাথরের মূর্তিতে বসে রইলেন—মা কাঁদলেন না। দিদিমা অশ্রুনয়নে মায়ের মাথায় হাত রাখলেন। ছোট বোন ছুটকিকে এনে মার কোলে বসিয়ে দিলেন। মা তখন কাঁদলেন। ভোরে শ্যামপুরঘাটে তাঁর নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এবং নববিধান সমাজের সকল সভ্যরা সেদিন শ্মশানঘাটে উপস্থিত ছিলেন।

তিন

স্বামী রামপ্রসাদের অকালে মৃত্যু হলে হেমন্তশশী নাবালক ছেলেমেয়ের ভবিষ্যতের ভাবনায় অশ্রু বিসর্জন করছিলেন, সেদিন অতুলের দাদু মহর্ষি কালীনারায়ণ গুপ্ত এসে নিঃশব্দে মেয়ের পাশে দাঁড়ালেন। মেয়ের মাথায় হাত রেখে বললেন, ভাবনা কোর না মা, আমি তো এখনও বেঁচে আছি। অতুলের বড়মামা কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত তিনিও ছোটবোনকে বললেন, তুই ভাবিস না হেমন্ত, আমরা সকলে আছি তোর পাশে, তোর ভাবনা কি!

শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকে গেল। দেখতে দেখতে কিছুদিন এগিয়ে গেল। এরই মাঝে একদিন সত্যকে খুঁজে পাচ্ছিল না অতুল ও সমবয়সী ছোটমামা বিনয়। কোথাও খুঁজে পেল না—বাগানে, তাদের প্রিয় গোলাপঝাড়টির চৌতরাটিতে, অথবা পুকুরপাড়ে অথবা রঙিন মাছের চৌবাচ্চার ধারে, কোথাও নেই।

মা বললেন, সত্যি, সত্য আমার কোথায় গেল রে!

শেষে অনেক খোঁজাখুঁজির পর অতুল-বিনয়-সুবালা সত্যকে খুঁজে পেল চিল-কোঠার কুঠরি ঘরে। নিজের ছোট টিনের বাক্সর সামনে বসে অঝোর-ঝরে কাঁদছে সে, আর তার বাক্সর চারধারে ছড়ানো তার পাতলুন-পাঞ্জাবি-সার্ট-ধুতি।

অতুল বললে, দাদা তুমি এখানে বসে কাঁদছ! আর আমরা তোমায় কোথায় না কোথায় খুঁজে বেড়াচ্ছি। মা তোমাকে দেখতে না পেয়ে ব্যস্ত হয়েছেন। ডাকছেন, চল নিচে।

সত্য কেঁদে বললে, আমি কোথাও যাব না। আমার কোথাও জায়গা নেই। কাকামশাই মারা গেছেন, তোমার মামার বাড়িতে আমার জায়গা হবে না অতুল। আমার কিসের সম্পর্ক! আমি দেশে বাবার কাছে চলে যাব। তোমাদের ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে।

অতুল বললে, তোমাকে যেতে দিলে তো। বিনয়মামা দাদার একখানা হাত ধর তো, আমি একখানা হাত ধরছি, চল মায়ের কাছে নিয়ে যাই। ··মায়ের কাছে অতুল অনুযোগ করল, দেখেছ মা, বাবা মারা যেতে দাদা ভেবেছে আমরা বুঝি পর হয়ে গেলুম।

হেমন্তশশী সেদিন জলভরা চোখে বলেছিলেন সত্যকে, অতুল আমার যেরকম, বাবা সত্য, তুমিও আমার সেরকম। অতুলের মামার বাড়ি তোমারও মামার বাড়ি। তোমরা দুটি আমারই ছেলে। কেন তুমি আমাদের ছেড়ে যাবে! এখানেই অতুলের সঙ্গে পড়াশোনা কর[১০]।

ছেলেবেলার অতুলের একমাত্র সাথী সত্য। একই বিছানায় শোয়া, অনেক সময় একই থালায় খাওয়া, একসঙ্গে বেড়াতে যাওয়া, একই ঘরে পড়াশোনা। এখন সাথী এসে জুটল ছোটমামা বিনয় আর সমবয়সী মাসি সুবালা।

সত্য বলত, বন্ধুত্বটা একা আমারই জন্যে অতুল এর ভাগ তুমি আর কাউকে দিতে পারবে না। তুমি একা আমার।

১০ সত্যপ্রসাদ লিখেছেন :

'বাংলা ১২৯১ সাল কার্তিক মাস খুড়োমহাশয় পরলোকগমন করিলে আমি চতুর্দিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। বাবা ও ছোট পিসিমা খুড়োমশাইয়ের পীড়ার কথা শুনিয়া বাড়ি হইতে দেখিতে আসিয়া তাঁহাকে দেখিতে পান নাই। আমি আপাতত তাঁহাদের সহিত বাড়ি চলিলাম। কিছুদিন পরে স্নেহময়ী খুড়িমা জানাইলেন অতুলের সঙ্গে আমারও স্থান অতুলের মামার বাড়িতে হইবে। এখানে রাজর্ষি কালীনারায়ণ অতুলের মাতামহ ও তাঁহার মহীয়সী ধার্মিকা সহধর্মিণী অন্নদা দেবী অতুলের মাতামহী। কালীনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র স্যর কে. জি. গুপ্ত, মধ্যম পুত্র ডাক্তার প্যারীমোহন, তৃতীয় গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্ত (পানীবাবু), চতুর্থ বিনয়চন্দ্র। কন্যাগণ, খুড়িমা হেমন্তশশী, সৌদামিনী, চপলা, সরলা, বিমলা ও সুবালা। এখানে আমি যে স্নেহ যত্ন পাইয়াছি, তাহা স্মরণ করিতেই আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠি। কোনমতে তাঁহারা বুঝিতে দিতেন না যে এ বাড়ি আমার আপন মাতুলালয় নহে। বিনয় ছিলেন আমাদের কিছু বড়। প্রতি মাঘোৎসবের সময় আমরা পাবনার ধুতি পাইতাম। বিনয়, অতুল কি আমার কাপড়ের কোন প্রভেদ থাকিত না।"

বিনয়মামা হাসত। হাসত সুবালা সত্যর কথা শুনে। হেসে উঠত-নগেন্দ্র, প্রাণকেষ্ট, নলিনী। সত্য তত রাগত। রাগবে না? অতুল যেন বড্ড বেশি মিশুক হয়ে পড়ছিল। সকলের সঙ্গে হেসে-হেসে অকারণ কথা বলত। খুব ঘনিষ্ঠ হয়েছিল বিনয়-মামা সুবালা মাসীর সঙ্গে এবং ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের নলিনী, নগেন্দ্র, প্রাণকেষ্টর (নলিনী নাগ, প্রাণকৃষ্ণ বসু, নগেন্দ্র সোম) সঙ্গে। ওরা সব সময়েই অতুলকে ঘিরে থাকত। অতুলও যেন ওদের সঙ্গকে বেশি মূল্যবান বলে মনে করত। ইস্কুল বসবার আগে বা শনিবার ছুটির পর কিংবা রবিবার ইস্কুলের ময়দানে বসে নগেন্দ্র কবিতা লিখে পড়ত। অতুল যেন কত সমঝদার, সেইভাবে তার মতামত জানতে চাইত। নগেন্দ্রর কবিতা লেখার রোগ ছিল। শুনে অতুল হাসত। বিনয়মামার মত অতুলও তখন ছবি আঁকত। কথা বলতে বলতে, কাগজে-পেন্সিলে-কলমে স্কুলবাড়ি, গাছপালা, মাঠের ধারে দারোয়ানদের নিচু টালির বাড়িগুলো আঁকত।

নগেন্দ্র কবিতার খাতাখানা বন্ধ করে বলত, কী ছাইপাঁশ ছবি আঁকছিস অতুল! আমার কবিতা শুনে ছবি আঁকতে পারিস তো বুঝি!

এবারেও অতুল হাসত।

নলিনী বলত, আমার মুখ আঁক তো দেখি···

তখন সূর্য নেমে আসত মাঠের ধারে, তারপর ইস্কুলবাড়িটার পিছনে, তারপর আরো নিচে আকাশ অন্ধকার করে দিয়ে···

সত্য বলত, চল অতুল খুড়িমা রাগ করবেন আর দেরি করলে। দাদা যেন অতুলের জীবনরক্ষক। এর পর সত্যি আর দেরি করা যায় না। অতুল, সত্য, নগেন্দ্র, নলিনী, প্রাণকেষ্ট, বিনয় ছজনের এই দলটি হাঁটতে হাঁটতে ঘরমুখো হত।

কলেজিয়েট স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন কৈলাস বসু। প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন পোপ-সাহেব—জনভনস-সমাবেশ পোপ। পোপসাহেব খেলাধুলোর ভক্ত ছিলেন। ভাল ক্রিকেট-ফুটবল খেলতেন। কলেজিয়েট স্কুলের টিমও ছিল সেইরকম। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল-কলেজ টিমের ভাল ভাল ছাত্রদের একত্রিত করে পোপসাহেব একবার দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ঢাকার ছাত্রদল হারিয়ে দিল কৃষ্ণনগর কলেজের, রংপুর কলেজের ছেলেদের। সেই সময়ে ঢাকা কলেজ ও স্কুলের রত্ন ছিলেন সারদারঞ্জন রায় ও তাঁর ভাই মুক্তিদা, কুলদা, যতীন রায়, বিপিন, সুধন্য বসু, বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়। ঢাকার ছেলেদের নাম ছিল খেলাধুলায়। পোপসাহেব ছিলেন সবকিছুর উদ্যোক্তা। পোপসাহেব যদিও প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন তবুও কলেজিয়েট স্কুলের নিচু শ্রেণীতে ইংরেজি পড়াতেন। পরীক্ষার সময়ে ছাত্ররা ভীত হয়ে পড়লে ধীরভাবে পিছনে দাঁড়িয়ে গায়ে-মাথায় হাত

বুলিয়ে আদর করে সাহস দিতেন। মাঝে মাঝে অতুলদের দুহাতে কোলে তুলে আদর করে বলতেন—স্পোর্টসম্যান হও, দৌড়ও, ঘোড়ায় চড়, রোয়িং কর। শুধু পড়াশোনায় কিছু হবে না—শরীর এবং মন ভাল রাখতে হলে পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে খেলাধুলো করা দরকার। সারদা, কুলদা, মুক্তিদা এঁরা ছিলেন অতুল বিনয় সত্যদের আদর্শ।

পোপসাহেব হঠাৎ চলে গেলেন কলেজিয়েট স্কুল ছেড়ে আপন দেশে। তাঁর জায়গায় এলেন বুথসাহেব। পোপসাহেবের বিপরীত। বুথসাহেব খুবই শিক্ষিত, অঙ্কে খুব মাথা। বুথসাহেব সম্বন্ধে গল্প আছে, বুথসাহেবের মৃত্যুর পর তাঁর মস্তিষ্কের গঠন দেখবার জন্যে তাঁর শরীর দশ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছিল।

বুথসাহেব ছিলেন গম্ভীর রাশভারি প্রকৃতির মানুষ। ছেলেদের সঙ্গে বিশেষ কোন কথাবার্তা বলতেন না। ক্লাসে পড়াবার সময়ে অঙ্গভঙ্গী করে পড়াতেন। সে সময়ে যে কজন শিক্ষক ছিলেন তাঁদের সকলের নামে এক কবিতা রচনা হয়। কবিতা রচনা হয় কলেজিয়েট স্কুলের মাঠে। রচনায় অতুল ও অতুলের সহপাঠী অনেকের নামই পাওয়া যায়। কবিতাটি :

> 'বুথে'র প্রধান কর্ম অঙ্গভঙ্গী করা।
> গোলমালে 'আগস্থি'র ঘণ্টা হয় সারা।
> 'বিদ্যানিধি', 'ডাঃ রায়' বলিতে অক্ষম।
> 'প্রসন্ন' তাহাকে ভাবে সদা অনুপম।
> সাহেবী ফ্যাসনে দক্ষ 'সারদারঞ্জন,'
> বুক ফুলিয়ে হাঁটেন বাবু 'সূর্যনারায়ণ'—[১১]

কৈশোরের দিনগুলিতে অতুলের ছোটমামা বিনয় ছিল যেন সকল বন্ধু-বান্ধবদের মামা—অথবা সকলের নেতা।

বয়েসে সামান্য বড় এবং মান্যেও বৈকি। তাই বোধহয় তার এই অধিকার-বোধটুকু জন্মেছিল। মাঝে মাঝে ছজনের এই দলটিকে নিয়ে চলত হোলির গান শুনতে, নয় তো জন্মাষ্টমীর কিংবা মহরমের মিছিল দেখতে। ঢাকা শহর গানবাজনার জন্য বিখ্যাত; এমন মহল্লা নেই যেখানে গানের আসর বসে না—গানের বৈঠকখানা নেই। হোলির সময়ে প্রত্যেক বছর পাল্লা দিয়ে হোলির গান চলত। বাবুর বাজারের পুলের পুবদিকে এবং পশ্চিমদিকে ঢাকা শহরের লোক ভেঙে পড়ত। এই দু-দলের লোকেরাই এক বছর

১১ বলা বাহুল্য সেই সময়ে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক ছিলেন প্রিন্সিপ্যাল মিঃ বুথ, শ্রীসূর্যকুমার আগস্থি, প্রসন্ন বিদ্যারত্ন, সারদারঞ্জন রায়, সূর্যনারায়ণ ঘোষ, ডাঃ পি. কে. রায় ও সারদা পণ্ডিত।

লক্ষ্মীবাজার রাজাবাবুর ময়দানে, অন্য বছর উর্দু লালাবাবুদের বাড়িতে পাল্লা দিয়ে গান জুড়ত। সুর তান মান লয় এসব নিয়ে বিচার হত। গানের মধ্যে এমন ভাষা থাকত যেগুলি গুনগান করছে না গাল দিচ্ছে বোঝা যেত না। ভানু নামে একজন ওস্তাদ গাইয়ে ছিল সে একবার গাইল : 'ভানুকা জ্যোতিসে…তেরা ভর দেঙ্গা চাঁদ বদন' অর্থাৎ সূর্যের আলোয় তোমার সুন্দর মুখ ঢেকে ফেলব।

অতুল একদিন চুপি চুপি বিনয়মামাকে বললে, ভানু ওস্তাদ 'ভানুকা জ্যোতিসে' বললে, 'না কি 'ভানুকা জুতিসে ' বললে মামা ! আমার তাই যেন মনে হল।

বিনয়মামা বললে, দুটো কথাই ভানু ওস্তাদ বলে থাকে অতুল।

বিনয়মামার কথা বলার ভঙ্গিতে নগেন্দ্র নলিনী প্রাণকেষ্টরা হেসে ওঠে।

যে কোন উৎসবে বিনয়মামা অস্থির, সঙ্গে সঙ্গে কর্মতৎপর হয়ে ওঠে। পড়ার ঘরে অতুল আর সত্যকে এসে চুপি চুপি ডাক দিয়ে যায়। আজ মহরম, কাল জন্মাষ্টমী, পরশু শিবচতুর্দশী। বলত চুপি চুপি পা টিপে-টিপে নেমে আসবি, বুঝলি, ধরা পড়িস নি যেন বাবা কাকা দিদিদের হাতে। পা টিপে-টিপে সন্তর্পণে সকলের চোখের আড়াল হয়ে নেমে আসত অতুল সত্য। তারপর তিনজনে লক্ষ্মীবাজারের সেই বিখ্যাত বাড়ি থেকে পায়ে-পায়ে চলে এদিক-ওদিক তাকিয়ে পথে নামত। রাস্তার মাঝে গাছের নিচে অপেক্ষা করত আরও তিন বন্ধু। সেখানে উপস্থিত হলে আর সন্ধান পায় কে ! বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে উর্দু লালাবাবুর বাড়ির পাশ কাটিয়ে ছুটতে ছুটতে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পড়ত 'নয়া সরকারের খালের ধারে' ওরা। নয়া সরকারের খালের ধারে দক্ষিণ দিকে তাঁতির বাজার, উত্তর দিকে নবাবপুর। ঢাকা শহরের শত-সহস্র নরনারী এখানে জমায়েত হত। এখান থেকে জন্মাষ্টমীর মিছিল বের হত। সমস্ত ঢাকা শহরময় এবং শহরতলীর মানুষদের মনে সাড়া পড়ে যেত। মেলা বসত যেন এখানে। পথঘাট আখ আর চিনেবাদামের খোসায় কলঙ্কিত হত। চালাক গাড়োয়ানেরা নবাগত সরল গ্রামবাসীদের সমস্ত ঢাকা শহর দেখাবার নাম করে কিছুদূর ঘুরিয়ে এই মেলার সামনে এনে নামিয়ে দিত। তাঁতির বাজারের এবং নবাবপুরের মানুষদের মধ্যে চিরকালের রেষারেষি ছিল। তাঁতির বাজারের পোদ্দারবাবুরা এই মিছিল এবং মেলার জন্যে বেশ কিছু টাকা রেখে দিতেন, তার সুদ থেকে ব্যয় হত নবাবপুরের মেলা, এবং মিছিলের ব্যয় চাঁদা করে হত। তাঁতির বাজারকে এইজন্যে বলা হত 'বাপেপুতে', নবাবপুরকে 'সাতেগোতে' অর্থাৎ সাত গোষ্ঠীতে।

জন্মাষ্টমী মিছিলের মত মিছিল সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে আর কোথাও হত না যেমনটি ঢাকায় হত। প্রথমে ৫০।৬০টি হাতি চলত, তারপর শতাধিক ঘোড়া, তারপর ছোট ছোট সজ্জিত চৌকি। ঘোড়া হাতিগুলি মূল্যবান পোশাকে সাজানো

হত। গলায় সোনার গয়না থাকত। তারপর যেত সুসজ্জিত বড় চৌকিগুলি। তারপর থাকত ছোট চৌকিগুলি। বড় চৌকিগুলিতে পৌরাণিক অথবা ঐতিহাসিক চিত্র রাখা থাকত। যেমন—সীতাহরণ, পদ্মিনীর চিতায় আরোহণ, ইন্দ্রের রাজসভা। বড় বড় পয়সাওয়ালা মানুষরা আপন আপন হাতিতে চড়ে মেলায় যোগ দিতেন। বড়লোক জমিদারদের এক একজনের অনেকগুলি হাতি থাকত। জন্মাষ্টমীর মিছিল দেখতে দেখতে অতুলের মাঝে মাঝে ইচ্ছে হত মিছিলের মধ্যে সেও যোগ দেয়। জন্মাষ্টমীর মিছিলে যোগ দেওয়া হয় না কোনবার। তবু মামাদের সঙ্গে বালিয়াটির জমিদার দিগুবাবুর (ব্রজেন্দ্রকুমার রায়) হাতিতে চড়ে মেলা দেখতে আসা অতুলের কাছে খুব লোভনীয় ছিল। তেমনি লোভনীয় ছিল দাদুর হাত ধরে 'বনবিহার উৎসব' দেখতে যাওয়া। বনবিহার উৎসবে শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠবিহার সংক্রান্ত নানা দৃশ্য মাটির পুতুলে তৈরি করে দেখানো হত।

ঠাকুর্দা[১২] বলতেন, বল তো দাদুভাই তোমাদের কোথায় নিয়ে যাব আজ? কী এক আশ্চর্য জিনিস দেখাব বল তো! একটু পরে বলতেন, চল তোমাদের আজ প্রতাপবাবুর বাড়িতে নিয়ে যাই।

প্রতাপবাবুর বাড়ির কথায়—বাঙলাবাজারে যেতে হবে শুনে আনন্দে নৃত্য করতে ইচ্ছে হত। ঠাকুর্দার ডানহাতের কনিষ্ঠা আঙুল আপন হাতের মুঠোয় ধরে রাখত অতুল। অন্য হাতের মধ্যমা ও কনিষ্ঠায় অধিকার ছিল বিনয় ও সত্যর। শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ-বিহারের সুন্দর পুতুলগুলি দেখতে দেখতে অভিভূত হয়ে পড়ত অতুলরা। ঠাকুর্দা তখন এর গুণাগুণ বিচার করতেন। কোন্‌টি দেখতে ভাল, কোন্‌টি বা দেখতে মন্দ, কোন্‌টির নাক খাঁদা, কোন্ কৃষ্ণর বাঁশি ঠিক হয়নি, কোন্‌টি বড়ই মনোমধুকর। সহজ সরলভাবে দাদু ব্যাখ্যা করতেন। ব্যাখ্যা শুনে অতুলরা হেসে ফেলত···সত্যি শ্রীকৃষ্ণ কী দুষ্টুটাই না ছিল, ওরা ভাবত।

ঠাকুর্দা ছিলেন সবকিছুর সমঝদার ব্যাখ্যাকার। ঠাকুর্দা ছিলেন মস্ত বড় শিল্পী। অতুল বিনয়রা কিশোর বলে ওদের জগৎটা যদি ছোট্ট হয়, অভিজ্ঞতা যদি অল্প হয়, ওদের ক্যানভাসটা যদি সেই পরিমাণ ছোট্ট হয় তবে ঠাকুর্দার অনেক বয়স, অনেক অভিজ্ঞতা, অনেক সঞ্চয়, ঠাকুর্দার ক্যানভাসটা অনেক বড়। ঠাকুর্দার প্যালেটে অনেক রঙ। মাঝে মাঝে ঠাকুর্দা বলতেন, কিভাবে চোখ আর মন খোলা রেখে এই পৃথিবীটাকে দেখতে হয়। পৃথিবীর অনেক রঙ; ঋতুতে ঋতুতে রঙ বদলায়। ঠাকুর্দা বলতেন শীতকালে কোন্ দেশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখির দল উড়ে আসে, পদ্মার

১২ অতুলপ্রসাদ দাদামহাশয়কে ঠাকুর্দা বলতেন। অতুলপ্রসাদের নামকরণ করেন তাঁর 'ঠাকুর্দা'।

চড়ায় বসে আবার ঝাঁক বেঁধে উড়ে যায়। পদ্মা মেঘনা ব্রহ্মপুত্র কোন্ সময়ে উত্তাল সমুদ্রে পরিণত হয়ে ভয়ঙ্করী মূর্তিতে পাড় ভেঙে চলে। কখন ঘন মেঘে ঢাকা বিষণ্ণ মূর্তিতে আঁকা স্রোতস্বিনী বহে চলে একাকী। দাদু এসব ছবি বোধহয় মনে মনে আঁকতেন এবং বিস্ফারিত-নয়ন নাতিদের বলে আনন্দ পেতেন। দাদু ছিলেন অতুলের কবিজীবনের কবিত্ব উন্মেষের যেন প্রথম সোপান।

কিন্তু তখনও অতুল কোনদিন স্বপ্নে ভাবে নি সে কবি হবে, কবিতা লিখবে। সে ছবি আঁকত, গান গাইত, বেহালা এস্রাজ তবলা বাজাত আর মাঝে মাঝে পানিমামাকে দেখে নাটক করার ইচ্ছে জাগত। পানিমামা নাটক লিখতেন, অভিনয় করতেন, চিত্রপট আঁকতেন, নৃত্যপরিকল্পনা থেকে পরিচালনা সব কিছুতেই তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। নাটকে প্রভাত দৃশ্যে নানান পাখির ডাক থেকে সিংহের গর্জন সবই তিনি শোনাতেন। এক কথায় তিনি ছিলেন নাটকপাগল। পানিমামা অতুলদের মাঝে মাঝে বলতেন, চল অতুল আজ তোমাদের সীতার বনবাস দেখতে নিয়ে যাই। কোনদিন বলতেন, চল অতুল নীলদর্পণ বিল্বমঙ্গল দেখে আসি। এসব নাটকে পানিমামাই ছিলেন প্রাণ। পানিমামাই অতুলদের প্রথম নবাবপুরে শকুন্তলা নাটক দেখতে নিয়ে গেলেন। সেদিনই প্রথম দিন, অতুলের প্রথম নাটকের সঙ্গে পরিচয়। শকুন্তলা নাটকে পানিমামা সেজেছিলেন রাজা দুষ্মন্ত—কী চমৎকার অভিনয় না তিনি করেছিলেন, চমৎকার গান গেয়েছিলেন। পানিমামা যে এত সুন্দর গান গাইতে পারেন অতুল কোনদিনও ভাবতে পারে নি। সেদিন এক অদ্ভুত সঙ্গীত-জগতে প্রবেশ করেছিল অতুল—অদ্ভুত তান লয়। কৈশোর জীবনে প্রথম দেখা সেই শকুন্তলা নাটক অতুল কোনদিনও ভুলতে পারে নি।[১৩]

পানিমামা রাজা দুষ্মন্তের বেশবাস রেখে মুখের রঙ ধুয়ে সেদিন যখন অতুলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললেন—বাড়ি চল অতুল, তখন পানিমামার মুখের দিকে বিস্ময়াবিষ্ট তাকিয়ে ছিল সে। যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না এই পানিমামাই রাজা দুষ্মন্ত কিংবা রাজা দুষ্মন্তই তার পানিমামা।

পানিমামা তার হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বলেছিলেন, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে এত কী ভাবছিস অতুল!

ভাবনার কি কোন শেষ আছে! পানিমামার মুখের দিকে তাকিয়ে কত কি চিন্তা এসেছিল তার—কোন কিংবদন্তীর দেশ থেকে রাজা দুষ্মন্ত এসে দাঁড়ালেন রাজবেশ ত্যাগ করে এ কোন সাধারণ বেশে···তবু রাজা ওর কাছে। মনে মনে হঠাৎ সেদিনই সে তার জীবনের লক্ষ্য ঠিক করে নিল···তার জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ হবে অভিনয় আর গান।

১৩ শকুন্তলা নাটকের গানের কোন কোন সুর অতুলপ্রসাদের গানে আছে, যেমন "সখী ধর ধর মালা"······

পানিমামা এক হাতে অতুলকে ধরে অন্য হাতে সত্যর হাত ধরে ধীরে ধীরে চলছিলেন। সামনে সামনে বিনয়মামা চলছিল। খাল পোল পেরিয়ে পানিমামা তাড়াতাড়ি চলছিলেন, বিনয় ছুটতে শুরু করে দিল। সত্য পানিমামার হাত ছাড়িয়ে বিনয়ের পাশাপাশি ছুটতে শুরু করল। পানিমামা কি জানি কেন আস্তে আস্তে চলতে শুরু করলেন—সম্ভবত অতুল পানিমামার মত দ্রুত চলতে পারছিল না। পানিমামা মাথা নিচু করে একবার অতুলকে দেখলেন। তারপর মিষ্টি হাসি হেসে বললেন, একটা কথা বল তো অতুল! তুমি যখন আমার মত বড় হবে অতুল, তখন তুমি কী হবে বল তো?

ততক্ষণে দশ নম্বর লক্ষ্মীবাজারের সেই বিখ্যাত বাড়িখানা এসে গিয়েছিল যেখানে অতুলের কৈশোর জীবন পার হয়েছিল······সেদিন কিন্তু সেজমামার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হল না, কারণ লক্ষ্মীবাজারের বাড়ি পৌছতে না পৌছতেই মা ডাকলেন, অতুল—অ···তু···ল! কোথায় ছিলি বাবা!

অতুল পানিমামার হাত ছাড়িয়ে দৌড় দিয়ে একেবারে মায়ের কাছে অন্দরমহলে। এবার যে উজাড় করে দেওয়া চাই সেদিনের যতকিছু অভিজ্ঞতা!

চার

আজ কী বল তো অতুল? দাদা এসে সেদিন বললে।

ও বললে, আমার মনে আছে, আজ তপসির[১৪] অন্নপ্রাশন।

দাদা বললে, আমাদের কিছু দিতে হবে আমাদের ছোট বোনটিকে। একেবারে নতুন কিছু! কী দেওয়া যায় বল তো! অতুল তুমি যদি একটা কবিতা লিখে দাও ওর নামে তাহলে খুব ভাল হয়।

দাদা বলল কবিতা লিখতে। নগেন্দ্র কতদিন বলেছে, আমার লেখা দেখে তোর কবিতা লিখতে ইচ্ছা হয় না রে অতুল? ইস্কুলের মাঠে তাদের ছোট্ট আসরে কতদিন নগেন্দ্র কবিতা পড়েছে উৎসাহভরে। পড়তে পড়তে থেমে পড়ে বলেছে, আমার কবিতা কেমন লাগছে রে তোদের? অতুল, তোকে কবিতা শুনিয়ে আমার বেশ ভাল লাগে। তুই কেন কবিতা লিখিস না অতুল?

বিনয়মামা মাঝে মাঝে বিরক্ত করতেন। কাগজে পেন্সিলে আঁকিবুকি কেটে অতুলের টেবিলে রেখে বলতেন, এই যে ছবি এঁকে দিলুম এই ছবি দেখে কবিতা লেখ তো দেখি কবি! সুন্দর একটা বাঁধানো খাতা উপহার দিয়েছিল বিনয়মামা।

১৪ তপসি (ইলা সেন) স্যার কে. জি. গুপ্তর ছোট মেয়ে।

অতুল রাগ করে বলত, বিনয়মামা তোমার ছবি তুমি নিয়ে যাও, তোমার খাতা তুমি ফেরত নাও, আমি কবিতা লিখতে পারব না, আমায় কবি বলবে না।

বিনয়মামা খাতা ফেরত নিত না, হাসত।

কিন্তু কবিতা লেখার প্রেরণা ওর ঠাকুর্দা। ঠাকুর্দা গান লিখতেন, কবিতা লিখতেন, ওদের সকলকে ডেকে পাশে বসিয়ে নিজেই গান গাইতেন। ঠাকুর্দা কত হোলির গান লিখেছেন। বাবাও হোলির গান লিখেছেন। ঠাকুরদা তাঁর 'ভাবসঙ্গীত' গীতি কবিতার বইখানি ওর হাতে দিয়ে বললেন, অতুল তোমাকে এমন গান লিখতে হবে। তবু লেখা হয় না। আজ সকালে মনটা যেন কেমন অন্যরকম হয়ে ছিল। বিনয়মামার দেওয়া খাতা পড়ার বইয়ের মাঝে লুকিয়ে রেখে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল সে। হঠাৎ ছেলেবেলার মিরাতারের বাড়ির বাগানে দাদার সঙ্গে প্রজাপতি ধরার কথা মনে পড়ে গেল। আরো মনে পড়ল বাবার সৌম্য-শান্ত মুখখানির কথা। রোজ সকালে ঘুম থেকে ওঠার আগে বাবার সেই স্তব-গান যেন শুনতে পেত সে। এখানে এসে, অনেকদিন ভোরের সূর্যকে প্রণাম করা হয় নি……

কার যেন পায়ের শব্দ শোনা গেল। অতুল তাড়াতাড়ি কবিতার খাতা রেখে এদিক-ওদিক মুখ তুলে চাইল। আর তখনই দেখল, জানলার বাইরে বকুলগাছের ডালে ছোট্ট হলুদ-লাল পাখিটা পুচ্ছ নাচাচ্ছে মনের আনন্দে। অতুলের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে ডেকে উঠল—যেন কথা বলল। দু-একবার ডাকল, তারপর বকুলগাছের ডাল থেকে উড়ে চলে গেল। কোথায় কে জানে। ছোট্ট পাখিটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে অতুল তার কবিতার খাতা টেনে নিল বুকের কাছে, কলম কালিতে ডুবিয়ে কি যেন লিখতে শুরু করল। যতক্ষণ না বিনয়মামা এসেছিল ততক্ষণ লিখল। বিনয়মামা ও দাদা এসে পড়ার ঘরে দাঁড়াতেই অতুল খাতা লুকিয়ে নিল, কিন্তু ততক্ষণে বিনয়মামার হাতে কবিতার খাতাখানা চলে গেছে। অতুল লজ্জায় লাল হল।

বিনয়মামা সুর করে পড়তে লাগল—

"তোমারি উদ্যানে তোমারি যতনে
উঠিল কুসুম ফুটিয়া।
এ নব কলিকা হউক সুরভি
তোমার সৌরভ লুটিয়া।
প্রাণের মাঝারে নাচিছে হরষ
সব বন্ধন টুটিয়া।
আজি মন চায়, অঞ্জলি লয়ে
ধাই তব প্রাণে ছুটিয়া।

যে প্রিয় নামটি দিলাম শিশুরে
স্নেহের সাগর মথিয়া।
সে নামের সাথে তব পূত নাম
থাকে যেন সদা গ্রথিয়া।
হাসি দিয়া এরে কর গো পালিত
তব স্নেহ-কোলে রাখিয়া ;
নয়নেতে দিও, মাগো স্নেহময়ী,
প্রেমের অঞ্জন আঁকিয়া।
যেন স্বার্থের কঠিন আঘাতে
যায় না কুসুম ঝরিয়া।
রক্ষিও নাথ, তোমার বক্ষে
সকল দুঃখ হরিয়া।
দেখ প্রভু দেখ, চালাইয়ো এরে
তুমি নিজ হাতে ধরিয়া ;
মঙ্গল-পানীয় দিয়ো তুমি দিয়ো
পরাণ-পাত্র ভরিয়া।
দীর্ঘায়ু হোক এ কোমল শিশু
সকলের প্রেমে বাড়িয়া ;
সে জীবনে, প্রভু, যেন কোথা কভু
না যায় তোমারে ছাড়িয়া।

পড়া শেষ করে বিনয়মামা বললে, বাঃ অতুল, চমৎকার কবিতা লিখেছিস! তারপর আবার পড়ল : তপসি ছোট্ট বোনটির অন্নপ্রাশন উপলক্ষে রচিত অতুলদাদা ও সত্যদাদার স্নেহের উপহার।

পড়া শেষ করে কবিতার খাতাখানি হাতে ঝুলিয়ে বিনয়মামা বললে, যাই কবিতাটা সকলকে দেখিয়ে আসি।

অতুল বাধা দিয়ে বললে, দাঁড়াও বিনয়মামা, খাতাটা দিয়ে যাও। তোমার পায়ে পড়ি বিনয়মামা কবিতাটা দেখিও না কাউকে! কিন্তু কে কার কথা শোনে। বিনয়মামার সঙ্গে ছুটে পারা কি সহজ কথা!

একদিন বিনয়মামা এসে খবর দিল, অতুল সত্য শুনেছিস!···তোরা যে ইস্কুলে পড়তিস, দুর্গাবাবুর ইস্কুল, সেই ইস্কুল উঠে গেছে।···

অমনি অতুলের মনে পড়ল দুর্গাবাবুর ইস্কুলের কথা, তাদের সেই মডেল হাই স্কুল।

মনে পড়ল ইস্কুলের বন্ধুদের মনা-মতা-ভুতো-যোগেশকে, আর সেইসব দিনগুলো। ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারক মাস্টারমশাইরা উপাসনা শেষে আসতে দেরি করতেন, ইস্কুলে কী সোরগোলই না হত তখন। মনা, মতা, ভুতো শেষ পর্যন্ত পড়েছিল সেই ইস্কুলেই। অতুল বললে, জান বিনয়মামা, দুর্গাদাসবাবু বড় ভাল লোক···আমরা তাঁর ক্লাসে বড় গোলমাল করতাম, এখন সত্যি দুঃখ হয়।

বিনয়মামা বললে, আরো একটা খবর আছে জানিস! বিনয়মামা যেন সাংবাদিক! যেখানে যে কোন খবর সব তার নখদর্পণে। কাল কোথায় কোন্ কুস্তির আখড়ায় কোন্ পালোয়ান লড়তে আসবে, কোন্ গানের জলসায় কোন্ গায়ক আসবে, অথবা সেদিন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে হঠাৎ মুহূর্তের জন্যে কেশব সেন এসেছিলেন···সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে কী ভীষণ ঝগড়া বিবাদ শুরু হল, এসব অনেক সত্য সংবাদ (!) পরিবেশন করত।—বিনয়মামা বললে, জানিস— পানিদার সঙ্গে দুর্গাদাসবাবুর মেয়ের বিয়ে হচ্ছে।

অতুল বললে, তাই বুঝি? বিনোদদিদি আমাদের সেজমামী হবেন?

এর কিছুদিন পরে পানিমামার সঙ্গে বিয়ে হল বিনোদমণির। তারপর কিছুদিনের মধ্যে পানিমামা কলকাতা শহরে চাকরি নিয়ে চলে গেলেন। কলকাতায় চলে গেলেন বড়মামা কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত স্ত্রী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে। লক্ষ্মীবাজারের বাড়িটা ধীরে ধীরে একেবারে শূন্য হয়ে গেল। অতুল সত্যরা সে বছর এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিল। কলকাতা যাওয়ার আগে প্রায়ই পানিমামা বলতেন, অতুলবাবু, বড় হয়ে তোমার কী হওয়ার ইচ্ছে?

অতুল মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে একবার হেসে মামার কথার উত্তর দিত, কিন্তু তার আগে মাকে প্রশ্ন করত, বল তো মা বড় হয়ে আমি কী হলে তুমি খুশি হও?

মা বলতেন, আমি চাই তুমি উকিল-ব্যারিস্টার হও। তোমাকে ব্যারিস্টার হতে হবে অতুল। আমি তোমাকে বিলেত পাঠাব। ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে এসে দেশের দশের মুখ উজ্জ্বল করবে। তোমাকে সেরা মানুষ হতে হবে।

পানিমামা বলতেন, তোমার অতুল গায়ক হবে, ছবি-আঁকিয়ে হবে—দেখছ না অতুলের চোখদুটো! এমন ভাসা-ভাসা চোখ আর দেখেছ? এ চোখ যার সে কবি না হয়ে যায় না।

মা আপন ভাইয়ের কথায় হেসে বলতেন, আমার মনের ইচ্ছে তুমি রাখবে না অতুল?

অতুল হেসে বলত, মা আমি ব্যারিস্টারও হব, কবিও হব। তোমার মনের ইচ্ছা আমি রাখব না এ কখনো হতে পারে!

বাবাকে হারাবার পর মা-ই একাধারে বাবা ও মা। মা যেন বহুরূপিণী। কখনো

করুণাময়ী কখনো রুদ্ররূপিণী কখনো শান্তিময়ী মাকে এক মুহূর্ত ভুলে থাকা দুঃসহ অতুলের পক্ষে। রাত্রে কিশোর অতুল মার পাশে শুয়ে অনেক দিন মায়ের গায়ে হাত রেখে বলেছে—মা সত্যি তুমি চাও আমি ব্যারিস্টার হই—অনেক বড় হই, তাই না মা ?
মা বলেন, নিশ্চয়ই আমি তাই চাই অতুল।
আমি তাহলে খুব ভালভাবে এন্ট্রান্স পাশ করব মা। খুউব মনোযোগ দিয়ে পড়ব। এন্ট্রান্স পাশ করে কলকাতায় কলেজে ভর্তি হব। কলেজ থেকে পাশ করে আমায় বিলেত যেতে হবে মা।
আমি তোমাকে বিলেত পাঠাব অতুল।
কিন্তু পরক্ষণেই বিষণ্ণ হন হেমন্তশশী স্বামী রামপ্রসাদের কথা ভেবে।…তুমি যদি এত সকালে চলে গেলে তবে তোমার অতুল, তোমার হিরণ-কিরণ-প্রভাকে আমার মনের মত করে কেমন করে মানুষ করব !…কেমনভাবে ওরা মানুষ হবে গো ?
অতুল ! অনেকক্ষণ পরে ডাকেন হেমন্তশশী। মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, শুতে যাবি না ?
তোমার পাশে আর একটু শুই মা, অতুল বলে।
অনেকক্ষণ মায়ের পাশে শুয়ে থাকে। মায়ের পাশে শুলে অনেক শান্তি। ইচ্ছে হয় না আর চলে আসে—তবু এক সময়ে ওকে হিরণ-কিরণ-প্রভার জন্যে জায়গা ছেড়ে দিতে হয়। ওরা যে ছোট, ও যে বড়—দাদা ! মার অমূল্য বিছানার কোণ ছেড়ে দিতে কষ্ট হয়। অন্য ঘরে আপন বিছানায় দাদার পাশে শুতে হয়। দুই ভাই দুই বন্ধুতে গলা জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। কিছুদিন থেকে মা-র শরীরটা বড় খারাপ হয়েছিল। বাবা মারা যাবার পর মার শরীরটা ভেঙে পড়েছে। মা শরীরটাকে মোটেই যত্ন করেন নি ; খাওয়া-দাওয়া না করে, দিন রাত সংসারের কাজ করেছেন। শরীরটার আর কিছু অবশিষ্ট রাখেন নি। দিদিমা কতদিন বলেছেন, হেম, তোমার সংসারে এত কাজ না করলেও চলবে—আমার বাড়িতে কাজ করার জন্যে লোকের অভাব কিছু নেই।
মা বলেছেন, তবু আমার তো কিছু সময় কাটে।
দিদিমা বলেছেন, তোমার কাজ তোমার অতুলকে এবং তোমার মেয়েদের মানুষ করা। এদের মানুষ করাই তোমার জীবনের ব্রত।
কিন্তু মায়ের শরীর আরো অসুস্থ হয়ে পড়ল। ডাক্তার বললেন, ঢাকা থেকে অন্য কোথাও যাওয়া উচিত। চেঞ্জে।
বড়মামা লিখলেন : হেমন্ত, আমার কাছে চলে আয় কলকাতায়। বড়মামা সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন কলকাতায়। অতুল আর তার বোনেরা ঢাকাতেই রইল—পড়াশোনা বন্ধ করে তো আর তাদের যাওয়া চলে না ! তাই ভাই-বোনেরা সকলেই ঢাকাতেই রইল।
আবার মা ফিরে এলেন। কেঁদে কেঁদে চোখ লাল করে পনের দিন পরেই। কী করে,

বল্ কী করে তোদের চোখের আড়ালে রেখে থাকি—মা বলেন, আমার ঢাকাই অনেক ভাল, স্বাস্থ্যকর। কিন্তু জীবনের শ্রেষ্ঠ বছর কটা এখানে পার করেও মায়ের শরীর এবং স্বাস্থ্য ঢাকায় ভাল থাকছিল না। আবার তাঁকে ফিরে যেতে হল দাদার কাছে চিকিৎসার জন্যে। আবার ফিরে এলেন। আবার তাঁকে চলে যেতে হল। এই বোধহয় শেষ যাওয়া।

পরীক্ষা তখন হয়ে গেছে। অতুলের অফুরন্ত অবসর। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে বিনয়মামা দাদার সঙ্গে রোজ যেত ও। মনে পড়ে মা ঢাকাতে থাকতে কতদিন একসঙ্গে উপাসনা সভায় গেছেন। যখন বাবা বেঁচে ছিলেন তখন সবাইকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। তাই বা কেন, নববিধান সভার বা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসভার উপাসনা-সভা মিরাতারের বাসাতেই হত। বাবা গান গাইতেন—ব্রাহ্মসঙ্গীত। অতুলকেও গান গাইতে হত। বাবা ছিলেন কেশবচন্দ্রের দলে—নববিধান সভার সভ্য। ঠাকুর্দা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের। দুজনের মতবাদ পৃথক ছিল। আজ বাবাও নেই ঠাকুর্দাও নেই, মা অনেক দূরে কলকাতায়। তবু ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হয়ে উপাসনা করা অতুলদের নিত্য-কর্মের মধ্যে। উপাসনা সভায় উপাসনা সঙ্গীত গাইতে হত তাকে। মাঝে মাঝে ও নিজে কয়েকটি প্রার্থনা সঙ্গীত রচনা করে সুর দিয়ে গান গাইত।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ থেকে উপাসনা শেষে ফিরে এল সেদিন বিনয়, সত্য এবং অতুল ১০ নম্বর লক্ষ্মীবাজারে মামার বাড়িতে। কিন্তু এ কোথায় এল অতুলরা—চারিদিকে সকলে শোকে মুহ্যমান। দিদিমা কাঁদছেন, মাসিরা-মামীমারা কাঁদছেন, তার বোনেরা কাঁদছে···তবে কি তার মা আর ইহজগতে নেই! অতুল তাড়াতাড়ি ছুটে গেল দিদিমার কাছে···দিদিমা আমার মা, আমার মা কেমন···আছেন! বল!

দিদিমা কোন কথা বললেন না। দিদিমার হাতে একটা চিঠি ধরা ছিল। বিনয়মামা দিদিমার হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে পড়ল।

অতুলের বড়মামা কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের চিঠি। তিনি লিখেছেন হেমন্তশশী দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছেন—দুর্গামোহন দাশকে।

সংবাদ এতই মর্মান্তিক, অতুল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল।···কে যেন বললে, তোমার মা··· তোমার মা নয়! কে যেন কানে কানে বললে, তোমার মা পর হয়ে গেছেন; তোমাদের তিনি আর ভালবাসেন না···আসলে তাঁর ভালবাসা মিথ্যে! চোখদুটো জলে ভরে এল। অতুল ছুটতে ছুটতে পড়ার ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দিল। ততক্ষণে ওর দুচোখের জল বাঁধ ভেঙে বন্যার স্রোতে দুকূল ছাপিয়ে গেল।

অতুল তোমার পরীক্ষা হয়ে গেছে। তুমি ভালভাবে পাশ করবে আমি জানি। তোমার

বোধহয় ছুটি হয়ে গেছে এখন। তুমি যত শীঘ্র পার হিরণ-কিরণ-ছুটকিকে সঙ্গে নিয়ে আমার কাছে কলকাতায় চলে এস। তোমাদের জন্যে পথ চেয়ে থাকব। ভালবাসা নিও।—মা।

সেদিন ছোট্ট একখানি চিঠি কলকাতা থেকে মা লিখেছেন। ছোট বোন ছুটকি এসে দিয়ে গেল। বললে, দাদা আমরা মার কাছে যাব। হিরণ কিরণ দুই বোন বললে, দাদা আমরাও মার কাছে যাব। মাকে কতদিন দেখিনি। বড় মন কেমন করছে। অতুল বললে, তোমরা যাও আমি যাব না। তোমাদের আমি মার কাছে পৌঁছে দিয়ে অন্য কোথাও চলে যাব।[১৫]

অশ্রুপূর্ণ চোখে বিদায় নিল ও খেলার সাথী সত্যদাদা বিনয়মামা সুবালামাসীদের কাছ থেকে। মামার বাড়ির সঙ্গে সকল সম্পর্ক শেষ হল। বোনেদের হাত ধরে কলকাতার পথে রওনা হয়ে গেল অতুল। স্টীমারে পদ্মা পার হয়ে গোয়ালন্দ এসে ট্রেন ধরে ওরা। যতদূর ট্রেন এগিয়ে চলে তত যেন মায়ায় টানে ঢাকা। মনে পড়ে যায় লক্ষ্মীবাজারের কৈশোরের সেই দিনগুলো···আরো দূরে শৈশবের মিরাতারের বাসা-বাড়ি। দাদার সঙ্গে বাগানে বাগানে ঘুরে প্রজাপতি-ফড়িং ধরা। মনা মতা ভুতো, ছেলেবেলার বন্ধুদের। আরো অস্পষ্ট মনে পড়ে বাবা-মার সঙ্গে বজরায় পদ্মা পার হয়ে দেশের বাড়িতে যাওয়া। কিরণ-প্রভা তখনও হয়নি, হিরণটা এই এতটুকুন। কত কী ঘটনা! চলন্ত রেলগাড়ির জানলায় যেন ভেসে ওঠে আর মুহূর্তে মিলিয়ে যায়। রেলগাড়ি এগিয়ে চলে, এগিয়ে চলে—কলকাতায়। কৈশোর শেষ হয়েছে ওর। এগিয়ে চলেছে। ···ওর লক্ষ সামনে, বহুদূর চলতে হবে।

---

১৫ "ইংরেজি ১৮৯০ জুন মাসের এক রবিবার আমি অতুল বিনয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে বাসায় ফিরিয়া দেখি সেখানে সকলেই শোকে মুহ্যমান। শোকাতুরা অতুলের মাতামহী ঠাকুরানী। অনুসন্ধানে জানিলাম যে খুড়িমাতা ঠাকুরানী দ্বিতীয়বার দুর্গামোহন দাশ মহাশয়ের সঙ্গে পরিণীতা হইয়াছেন। এ সংবাদ কে. জি. গুপ্ত লিখিয়াছেন কলিকাতা হইতে। এ সংবাদে সকলেই বিচলিত। হিরণ প্রভৃতি কাঁদিতেছে। আমরা খুব কাঁদিতে লাগিলাম। আমি তো নিজেকে সম্পূর্ণ আশ্রয়হীন বলিয়া মনে করিতে লাগিলাম। অতুলের মাতুলালয়ের সঙ্গে আমার সকল বন্ধন ছিঁড়িয়া গেল। আমি এখন দাঁড়াই কোথা? সেদিনকার আঘাত আমার খুবই প্রাণে লাগিয়াছিল। সে শোকাবহ দৃশ্য আজও আমার স্মরণ হয়। অতুল ভগ্নীদের লইয়া কিছুদিনের মধ্যেই কলিকাতায় চলিয়া গেল। ভগ্নীরা গেল মায়ের কাছে। অতুল রহিল মাতুল পানীবাবুর কাছে। তখন কে. জি. গুপ্ত রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বার আর পানীবাবু চীফ ইনকাম ট্যাক্স অ্যাসেসর কলিকাতার।"—সত্যপ্রসাদ সেনের ডায়েরি থেকে।

পাঁচ

সৌম্য শান্ত ভদ্রলোকটি আজও পানিমামার বাড়িতে বসার ঘরের আরাম কেদারায় কষ্টকর ভঙ্গিতে বসে আবৃত্তি করছিলেন সেই একই অসংলগ্ন শব্দগুলি, যে কথার সম্পূর্ণ অর্থ ওর মনে কোন রেখাপাত করে না। অর্থ বড় হাস্যকর, অবাস্তব, অবান্তর বলে মনে জাগে। ওর ইচ্ছে জেগেছিল সেই মুহূর্তে সেখান থেকে চলে আসে। পানিমামা বলেছিলেন, বস অতুল, এমন করে ওঁকে অপমান করে যেও না।

ভদ্রলোক আবার বলেছিলেন, তোমার মা তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। তোমার জন্যে তোমার আসার পথ চেয়ে আছেন। আজ তোমাকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব। তোমার কোন আপত্তি আমি শুনব না।

অতুল বলেছিল, না, আমার যাবার উপায় নেই। মাকে জানিয়ে দেবেন মার উপর আমার কোন ভালবাসা জমা নেই। আমাকে দেখবার কথা যেন মনে না আনেন। আমার বোনেদের নিয়ে তিনি সুখে থাকুন, আমার কথা তিনি ভুলে যান। ক্লান্ত হয়ে ও আবার বলেছিল, পানিমামা, ভদ্রলোককে তুমি আমার সামনে থেকে যেতে বল, কিম্বা অনুমতি দাও আমি এখান থেকে বিদায় নিই।

কয়েকটি শব্দহীন মুহূর্ত অতিক্রান্ত হয়েছিল। ভদ্রলোক এগিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিলেন অতুলের পাশে। পিঠে হাত রেখে বলেছিলেন, তোমাকে যে আমার চাই! চল আজ আমার সঙ্গে বাবা, আর কোন কথা শুনব না।

ভদ্রলোক যে পিতৃত্বের দাবি নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তা বুঝি অস্বীকার করা যায় না, অতুল পারে না। ধীরে ঘুরে ফিরে মাকে মনে পড়ে ওর। মিরাতারের বাসায় ওরা যখন ছিল—মা বাবা আর··· বাবা ডাক্তারখানায় সময় কাটাতেন অনেকখানি। তখন বাড়িতে কেবল ও আর মা। মায়ের কোলে মাথা রেখে, মায়ের মুখে তাকিয়ে থাকত ও।

মা ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বলতেন, আমার দিকে তাকিয়ে কী দেখিস খোকা!

ও বলত, মা তুমি খুউব সুন্দর, তোমাকে খুউব সুন্দর দেখায়। তারপর বাবা মারা গেলেন। তখন মায়ের চেহারা খারাপ হয়ে গেল। মা আপন শরীরের উপর আর কোন যত্ন করতেন না। আধবেলা খেতেন। ব্রাহ্মসমাজে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিরামহীন ক্লান্তিহীন প্রার্থনা করতেন। তারপর মায়ের শরীর ভেঙে গেল। মা কলকাতায় চলে এলেন। ···ওর হঠাৎ মনে হল, কতদিন মাকে দেখেনি! মা কেমন আছেন এ খবর কখনো জানতে চায়নি ও। কখনো জিজ্ঞাসা করা হয়নি মা কেমন আছেন। মা কেন

আসেন না এখানে! ও মনে মনে বড় অস্থির হল। অস্থিরতা প্রকাশ পেল ওর চলনে, আচরণে। দুর্গামোহনবাবু বোধহয় ওর মনের কথা বুঝতে পেরেছিলেন, ওর অস্থিরতা অনুভব করেছিলেন। তাই ধীরে ধীরে বললেন, তোমার মা এখন অনেকটা ভাল আছেন ; তোমাকে দেখার জন্যে ব্যাকুল। তুমি চল বাবা আমার সঙ্গে।

ও সম্মতি জানিয়ে বললে, আচ্ছা চলুন মাকে দেখে আসি। দুর্গামোহনবাবু ধীরে ধীরে বললেন, মাকে দেখে চলে আসলে চলবে না : তোমার মা। তুমি তাঁকে সেবা-যত্ন করবে, কাছে থাকবে, পাশে বসবে, তবেই না তোমার মা সুস্থ হয়ে উঠবেন! তোমাকে সকলের চেয়ে প্রয়োজন আমার। তুমি পার মায়ের মনের প্রফুল্লতা ফিরিয়ে আনতে।

অতুল বললে, বেশ আমি মায়ের পাশে থাকব। মাকে সেবা করে ভাল করে তুলব। হঠাৎ যেন মার জন্যে বড় মন কেমন করে উঠল, উতলা হল মন। ও বললে, চলুন, আমি যাওয়ার জন্যে তৈরি।

কলকাতা শহরের একধারে পানিমামা থাকতেন। পানিমামা তখন ছিলেন চীফ ইনকাম ট্যাক্স্ অ্যাসেসর। বড়মামা কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বার। তিনি থাকতেন সপরিবারে কলকাতা শহরের আর একধারে। আর ছিল দুর্গামোহনবাবুর বাড়ি। সেখানে মা থাকতেন, বোনেরা থাকত। অতুলও মাঝে মাঝে এসে থাকত। বোনেরা সে বাড়িকে আপন বাড়ি বলে মনে করলেও ওর কিন্তু সে কথা কখনো মনে হয়নি। দুর্গামোহনবাবুর এই যে আত্মীয়তা, এই যে অন্তরঙ্গতা, ওর কাছে ক্রমে ক্রমে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। অথচ দুর্গামোহনবাবু ওকে স্নেহ করতেন, ভালবাসতেন। নিজে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরোতেন, খেতে বসতেন। যখন যা প্রয়োজন হয় ওর চিন্তা করার সঙ্গে সঙ্গেই যেন আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে বুঝতে পারতেন এবং হাতের কাছে সাজিয়ে রাখতেন। তবুও ধরা-ছোঁয়ার বাইরে ও। দুর্গামোহনবাবুকে দেখে মনে মনে বিরক্ত হত—বিশেষত দুর্গামোহনবাবু যখন মায়ের সঙ্গে সাংসারিক অথবা যে-কোন বিষয়ে কথা বলতেন। ও ভ্রূকুটি করত, বিরক্ত বোধ করত। অনেক দিন রাগ করে ঘর ত্যাগ করে চলে যেত। দুর্গামোহনবাবু সে কথা মনে মনে বুঝতে পারতেন। মাও বুঝতেন। মুখে কিছু বলতেন না।

অবস্থা চরমে পৌঁছত যখন ও দুর্গামোহনবাবুর বাড়ি ফিরত না। চলে আসত পানিমামার বাড়ি। পানিমামা, তোমার বাড়িতেই আমি থাকব, তোমার এখানে থাকতে আমার ভাল লাগে। নয় তো এসে উঠত বড়মামার বাড়ি। সেইখানেই কয়েক দিন কাটিয়ে আসত। মামাতো ভাইবোনেরা ওকে কাছে পেয়ে হাতে স্বর্গ পেত। হাসি-গল্পে-গানে-খেলায়

মুহূর্তগুলি প্রাণময় হত। ওর তখন মনে পড়ত কৈশোরের দিনগুলো। ঢাকার লক্ষ্মী-বাজারের দিনগুলো। কলকাতায় এসে রঙ লাগত।

অতুল বলত, চল হেম একটু বেড়িয়ে আসি।

মামাতো বোন হেমকুসুম বড় জেদী। যখন যা চাইবে না পাওয়া পর্যন্ত স্বস্তি নেই। এই জেদের জন্যে মামাতো বোনটি কম মার খেয়েছে মামীমার হাতে! অতুলের স্নেহদৃষ্টি তাই মামাতো বোনটিকে ঘিরে। ভাল লাগে তাকে।

মামাতো বোন হেমকুসুম যৌবনের প্রথম সঙ্গিনীও। যদিও বালিকা, তবুও তার সঙ্গে মনের কথা বলা যায়। মনের যত কিছু দুঃখ প্রকাশ করা যায়। অতুল বলে, জান হেম, আমাদের মিরাতারের বাসার কথা আমার বড় মনে পড়ে। মিরাতারের বাসার কথা মনে এলেই বাবার কথা মনে পড়ে। জান, এখনও মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে আমি যেন বাবার গলায় স্তোত্রপাঠ শুনতে পাই। বাবা যেন বলছেন, 'অয়ি সুখময়ী উষে কে তোমারে নিরমিল। বালার্ক সিন্দুর-ফোঁটা কে তোমার ভালে দিল'। বাবা প্রার্থনা শেষ করেই আমাকে আর দাদাকে ঘুম থেকে ওঠাতেন। এখনো মাঝে মাঝে ভুলে চোখ বুজে শুয়ে থাকি। দুর্গামোহনবাবু, তিনিও ভোরে শয্যাত্যাগ করে স্তোত্র পাঠ করেন, সূর্যপ্রণাম করেন বাবার মতন। ঘুম ভেঙে ওঁর গলা শুনতে পাই। কিন্তু বাবার মত অমন দরাজ গলা নয়। উনিও মাঝে মাঝে স্তোত্রপাঠ শেষে আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, অতুলবাবু আর কত ঘুমোবে! ওঁর কথা শুনে আমার কান্না পায় হেম।

হেম বলে, অতুলদা, তোমার তখন বাবার কথা মনে পড়ে আমি জানি।

ও বলে, দুর্গামোহনবাবুর কোন কথা আমি সহ্য করতে পারি না। ওঁর কথা যাতে শুনতে না পাই তাই কান হাত দিয়ে ঢেকে রাখি।

হেম বলে, তোমার হাত দেখি অতুলদা। হাতের উপর হাত রাখে হেম। বলে, তুমি বড় দুর্বল! একটু শক্ত হও অতুলদা। তারপর বলে, জান অতুলদা, আমার মনে একটা ইচ্ছে হয়, ইচ্ছে হয় খুব ভাল বেহালা বাজাই। খুব নাম করি। তোমার নামকরা মানুষ হতে ইচ্ছে হয় না? আমি ঠিক বলছি, তোমার খুব নাম হবে। কবিতা আজকাল আর লেখ না?

অতুল বলে, আমার কিছু ভাল লাগে না, কিছুই আমার হবে না। আমি বাবাকে ভুলতে পারি না, মাকে ভালবাসতে পারি না; দুর্গামোহনবাবুকে শ্রদ্ধা দেখাতে পারি না: দুর্গামোহনবাবু ভাল লোক, তবুও…। বোনেদের কথা ভুলতে বসেছি…তোমার এখানে মাঝে মাঝে আসি, কিন্তু তোমার এখানে আসতেও আমার আজকাল ভাল লাগে না। ভাবি তোমরা আমাকে কেন এত ভালবাস, আমি তো আর কাউকে ভালবাসতে পারি না।

হেম বলে, তুমি সব পার। তোমাকে অনেক বড় হতে হবে অতুলদা—অনেক বড়।

অতুল বলে, হেম, তুমি আমার কথা জান না, বোঝ না।

আমি সব বুঝি, হেম হাসে।

তারপর অতুলের হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় হেম। কানে কানে কি যেন কি কথা বলে। তারপর শোনা যায় অস্পষ্ট কথা, হেরে যাবে?

ও বলে না।

প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল প্রকাশ হল। ১৮৮৯ সন। অতুল ভালভাবে পাশ করল। পানিমামা-বিনোদমণি পিঠ চাপড়ে বললেন, বাঃ! মামাতো ভাইবোনেরা চারদিক থেকে ঘিরে ধরে ওকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। মেজ বোন হেমকুসুম অতুলদাকে উদ্ধার করে বলল, অতুলদা পাশ করেছে যখন, মিষ্টি তখন আমাদেরই খাওয়াতে হবে। বড়মামা কে. জি. গুপ্ত একদিন সকলকে অতুলের পাশ করার দৌলতে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালেন। দুর্গামোহন দাশ আন্তরিক শুভেচ্ছা জানালেন। আনন্দ প্রকাশ করে বললেন, অতুল তোমাকে ভাল কলেজে এফ-এ পড়তে হবে। এফ-এ পাশ করে বি-এ পড়তে হবে, এম-এ পড়তে হবে। তারপর মনে মনে কী ঠিক করেছ বল তো অতুল?

দুর্গামোহনবাবুর কথার উত্তরে মা বললেন, আমি চাই ও ব্যারিস্টার হোক।

দুর্গামোহনবাবু বললেন, ব্যারিস্টার হতে গেলে লণ্ডনে যেতে হবে। বেশ তো, তোমার ছেলেকে আমি লণ্ডনে পাঠাব। কিন্তু সে কথা এখন দূরে, আগে এফ-এ ক্লাসে ভর্তি হতে হবে, ভালভাবে পাশ করতে হবে ওকে।

একদিন অতুলকে সঙ্গে নিয়ে দুর্গামোহনবাবু প্রেসিডেন্সি কলেজে পৌঁছে গেলেন। তুমি তাহলে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়ে গেলে অতুল। খুউব ভাল হল। আমার চেনা-শোনা কলেজ—ভাল কলেজ। ওহো বলতে ভুলে গেছি, আমার ভাইপো চিত্ত—চিত্তরঞ্জন দাশ এখানেই পড়ে বি-এ ক্লাসে। একসঙ্গে একই কলেজে যখন পড়বে তখন আলাপ পরিচয়ও হয়ে যাবে।

আমার সঙ্গে ওঁর পরিচয় আছে। উনি তো একবার ঢাকায় গিয়েছিলেন।

হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো আমি জানি, ডাঃ রামপ্রসাদ সেনের সঙ্গে কি আমার নতুন পরিচয়! ...এবার মন দিয়ে পড়াশোনা কর অতুলবাবু, কেমন!

অতুল দুর্গামোহনবাবুর বাড়িতে থেকে কলেজে যাতায়াত করতে লাগল। কখনো সেজমামা পানিমামার (গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্তর) বাড়িতে থেকে।

প্রেসিডেন্সি কলেজের মাঠে পড়াশোনার ফাঁকে আড্ডাখানা জমত মন্দ নয়। সকলেই কি সমবয়সী? হয়ত বয়সের দিক থেকে এবং শ্রেণীগতভাবে সকলে সমান নয়—কেউ এফ. এর ছাত্র, কেউ বি. এর ছাত্র—তাতে কী এসে যায়? আড্ডাখানায় বা

সাহিত্যালোচনা কেন্দ্রে সকলের সমান অধিকার। প্রেসিডেন্সি কলেজের মাঠ থেকে আবার কখনো-সখনো গোলদিঘির চৌকো পাড়ে ঘাসের উপর বসত। জোর আলোচনা হত।···রবিবাবু আলোচনায় অনেকখানি আলোচিত কবি ছিলেন। কবি হিসেবে অল্পসল্প নাম ছড়িয়েছে। এখানে ওখানে সাহিত্যসভা থেকে ডাক পড়েছে।···ওঁর (কড়ি ও কোমল) তার আগে প্রকাশ হয়েছে। কড়ি ও কোমলকে ব্যঙ্গ করে সমালোচনা করে একখানা বই প্রকাশিত হল 'বাহুরে রচিত মিঠেকড়া'। কিছুদিন সকলের মুখে মুখে ব্যঙ্গ কবিতাগুলি চলল—কলকাতার পাড়ায় পাড়ায়, গোলদিঘির ধারে ধারে, কলেজ ইউনিভারসিটির ছাত্রদের মুখে মুখে—কলকাতা পার হয়ে ঢাকা-ময়মনসিং সব জায়গায়। চিনেবাদাম আর ঝালমুড়ি খেতে খেতে প্রেসিডেন্সি কলেজের মাঠে অথবা গোলদিঘির ঘাসে বসে থাকতে থাকতে অতুল সুরেন ব্যানার্জিকে নকল করে হঠাৎ বক্তৃতা শুরু করত—বন্ধুগণ···

বন্ধুরা প্রথম প্রথম ঠাট্টাচ্ছলে ওর দিকে তাকিয়ে হাসত, তারপর অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বক্তব্য শুনত। দুচারজন লোক জড় হত, ভিড় জমবার আগেই ঝুপ করে বসে পড়ত ও আপন জায়গায়। বন্ধুরা বলত, চমৎকার! অনেকে আবার বলত, সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিষ্য হয়ে পড়।

অতুল মনে মনে হাসে। ওরা আর জানে কী!

ঢাকাতে থাকতে সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায় যখনই ওখানে উপস্থিত হয়েছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন, অতুল সেখানে উপস্থিত হয়েছে। বক্তৃতা শুনেছে। ঢাকাতে বক্তৃতা দিয়েছেন পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, মনোমোহন ঘোষ, টি. পালিত, আনন্দমোহন বসু, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার; শিবনাথ শাস্ত্রীর বক্তৃতাও ছেলেবেলায় ওর শোনার সৌভাগ্য হয়েছে। কিন্তু সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা! একবার সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখবার জন্যে সকলকে লুকিয়ে ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ গিয়েছিল। তাঁর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে একসঙ্গে ঢাকায় ফিরেছিল।···সুরেনবাবু ছিলেন ওর কৈশোর জীবনের আর এক আদর্শ। রূপবাবুদের বাগানে কিম্বা আনন্দ মাস্টারমহাশয়ের বাগানের নির্জন-নিভৃতে সাহিত্যালোচনা এবং বক্তৃতার অভ্যাস চলত···তখন সঙ্গী দাদা, সত্যেন্দ্র ও জ্ঞান। সে কথা আর এরা কী জানে? সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায় যেবার কংগ্রেসে না থাকার সিদ্ধান্ত করলেন, চরমপন্থী, নরমপন্থী কংগ্রেস লীডারদের মধ্যে দারুণ ঝগড়া বিবাদ···সারা শহর, সারা দেশ জুড়ে ভীষণ উত্তেজনা। গোলদিঘির ধারে, কলেজ ইউনিভারসিটির মাঠে, ছাত্রদের মাঝেও দারুণ উত্তেজনা। অতুলপ্রসাদ সেদিন দাঁড়িয়ে উঠে বললে, The National Congress without Surendranath is a mere farce.

১৮৯০ সনে চিত্তরঞ্জন প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি-এ পাশ করে বিলেতে চললেন। সে

বছর অতুলপ্রসাদ প্রেসিডেন্সিতে এফ-এ শ্রেণীর ছাত্র। যদিও জুনিয়র ছাত্র তবু হৃদ্যতা কম ছিল না ওদের মধ্যে। বি-এ পাশ করে চিত্তরঞ্জন বিলেত চলেছেন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বসতে, বন্ধুরা কয়েকজন ব্যস্ত হল বিলেত যাওয়ার বাজার সারতে। ঠাণ্ডার দেশ, তাই তার যথোপযুক্ত গরম জামাকাপড় সাজসরঞ্জাম চৌরঙ্গীর সাহেব-পাড়া থেকে কিনে আনা হল। চিত্তকে কলেজের ছাত্ররা একটা 'ফেয়ারওয়েল' দিল। রাজেন বললে, চিত্তদা তুমি চলে গেলে আমাদের স্টুডেণ্ট অ্যাসোসিয়েশন একেবারে কানা হয়ে যাবে।—

চিত্তরঞ্জন বললে, তোমরা তো রইলে। তুমি, অতুল চট্টোপাধ্যায়, অতুলপ্রসাদ। তাছাড়া ব্যোমকেশ চক্রবর্তী সম্পাদক, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী সহ-সম্পাদক—সেখানে আমি তো সাধারণ সভ্য, বলতে পার কর্মী। তোমাদের কোন অসুবিধায় পড়তে হবে না, সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি হিসেবে অভিভাবক হিসেবে তোমাদের মাথার উপর রইলেন।

অতুলপ্রসাদ বললে, চিত্তদা, তোমার অভাবে অ্যালবার্ট হলে এবং হিন্দু স্কুলে আমাদের সাপ্তাহিক অধিবেশনগুলোয় মন বসবে না। আমাদের সাহিত্য-সভায় উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ককে আপাতত আমরা বিদায় দিলাম।

চিত্তরঞ্জন চলে গেল ইংলণ্ডে। জাহাজ-ঘাটে 'সী অফ' করে এল ওরা। জিব্রাল্টার পার হয়ে অনেক দেশ ঘুরে চিত্ত পৌঁছবে ইংলণ্ড উপকূলে—দেখবে কত দেশ, কত নতুন মানুষের সঙ্গে আলাপ হবে···এক বিচিত্র অনুভূতি জাগছিল ওর। মনের কোণে প্রবল বাসনা জাগল—বিলেত যেতে হবে। চিত্তকে সী অফ করে বন্ধুরা ফিরে চলছিল। বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গড়ের মাঠ পার হয়ে ধর্মতলার মোড়ে এসে ঘোড়ার গাড়ি ধরে সোজা উপস্থিত হল পানিমামার বাড়ি।

পানিমামা-মামীমা বললেন, অনেকদিন তোমাদের কোন খবর নেই অতুল। মা ভাল আছেন? হিরণ, কিরণ, প্রভা ভাল আছে?

ভাল, মামা।

দুর্গামোহনবাবু?

ভাল।

অনেক দিনের পর আমাদের কথা মনে পড়ল বুঝি?

পানিমামা, জান, আজ আমাদের এক বন্ধুকে জাহাজে তুলে দিয়ে এলাম। জিব্রাল্টার পার হয়ে ইংলণ্ডে যাবে, আই-সি-এস পরীক্ষায় বসবে।

তাই বুঝি তোমার মন খারাপ! তোমারও বুঝি বাইরের দেশে যেতে ইচ্ছে করছে? বল আমি তোমাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি?

পানিমামা, তুমি পার না আমাকে কিছু টাকা দিতে? পানিমামা, তুমি পার না এদেশ থেকে আমায় অনেক দূর দেশে পাঠিয়ে দিতে? এদেশের আকাশ যাতে আমাকে দেখতে না হয়! এদেশের হাওয়া আর আমার ভাল লাগছে না। পানিমামা, পার না—পার না··· !

অতুল, শান্ত হও।

অশান্ত অতুল। একছুটে বেরিয়ে যায় বালিগঞ্জে স্টোর রোডে বড়মামা কে. জি. গুপ্তর বাড়ির উদ্দেশ্যে।

কী খবর অতুল ?

তুমি আমাদের সবরকম সাহায্য পাবে অতুল, শান্ত হও! স্থির হয়ে বস।

অস্থির অতুল।

বস্তুত অতুলপ্রসাদ তখন দ্বিতীয়বার মায়ের বিবাহের জন্যে এতদূর আঘাত পেয়েছে যে, নানানভাবে সে দুঃখ ভুলতে চেষ্টা করেও কিছুতেই ভুলতে পারে না। অনেক দূরদেশে উপস্থিত হয়ে অপরিচিত জগতে অপরিচিত মানুষের মাঝে থেকে সান্ত্বনা পেতে চায় ও। সে-দেশে পড়তে চায়। এখানে পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারে না। চিত্তদা চলে গেল। চিত্তদা যেন ডাক দিয়ে গেল। যদিও প্রেসিডেন্সি কলেজে ও ছিল ভাল ছাত্র। দুর্গামোহনবাবুর প্রথম পক্ষের জামাই প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক দার্শনিক পি. কে. রায় ওকে স্নেহ করতেন। স্নেহ করতেন প্রেসিডেন্সি কলেজের বিদেশী অধ্যাপকরা। পি. কে. রায় ছিলেন গম্ভীরপ্রকৃতির মানুষ; পি. কে. রায়ের ক্লাসে শ্যালক চিত্তরঞ্জন পর্যন্ত মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করত। এমনিতে চিত্তরঞ্জনের পড়াশোনায় বিশেষ মনোযোগ ছিল না।

পি. কে. রায় বলতেন, অতুলপ্রসাদ কলেজের একজন সেরা ছাত্র। মাঝে মাঝে বলতেন, মাই ডিয়ার বয়, বল তো তোমার জীবনের লক্ষ্য কী ?

সহপাঠী রাজেন্দ্র বলেছিল, স্যার, আমার ভারতের হাই-কমিশনার হওয়ার ইচ্ছে।

অতুল বলেছিল, স্যার, আমার ব্যারিস্টার হওয়ার ইচ্ছে। সেই ছেলেবেলা থেকে আমি স্বপ্ন দেখে এসেছি। বিলেত আমার যেতেই হবে।

অতুল চট্টোপাধ্যায় বলত, স্যার, অতুলপ্রসাদ খুব ভাল কবিতা লেখে! আপনি শোনেন নি ?

পি. কে. রায় বলতেন, অতুল, তোমার লেখা আমাকে দেখিও। পি. কে. রায়ের কাছে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর কথা প্রায়ই শুনত ওরা। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু দুর্গামোহনের জামাতা। লেডি অবলা বসু দুর্গামোহনের প্রথম পক্ষের কন্যা।

বন্ধুরা অনেকেই বিদেশে পাড়ি দিল। অতুলের মন খারাপ। পি. কে. রায় বললেন,

পাশটা করে নাও, তারপর তোমার যাওয়াই মঙ্গল। কিন্তু বি-এ পাশ করার আগেই বিলেত আকর্ষণ করল। বিদেশে যাওয়ার সময় হল। বিদেশে যাওয়ার আগে কলেজের অধ্যাপকদের সঙ্গে দেখা করে এল অতুল। একজন বিদেশী অধ্যাপক বললেন, বল তোমার কী উপকারে আসতে পারি···আমাকে যাবার আগে জানিও, আমার এক বন্ধুকে তোমার নামে একখানা চিঠি দিয়ে দেব, সেখানেই গিয়ে উঠতে পার। তোমাকে তিনি পোর্ট থেকে এসে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেও পারেন।

বাড়ি ফিরে এল অতুল। এসে মাকে বললে, মা, আমার পাসপোর্ট এবং প্যাসেজ জোগাড় হলেই লণ্ডনের পথে পা বাড়াতে পারি। লণ্ডনে থাকার একটা ব্যবস্থা আমার অধ্যাপক করে দেবেন বলেছেন। এখন প্যাসেজের টাকা জোগাড় হলেই হয়ে যায়।

দুর্গামোহনবাবু অতুলকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, খুব সুখবর বাবা, তোমার প্যাসেজের জন্যে ভাবতে হবে না, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব—কিছু ভেব না। কত লাগবে আমাকে বল।

অতুল চুপ করে রইল। দুর্গামোহনবাবুর হাত থেকে টাকা নিতে হবে, একথা মনে হতেই ওর মনে যেন কেমন বিরোধ বাধল। দুর্গামোহনবাবুর টাকা—এ টাকায় আমার কোন অধিকার নেই—এ টাকায় আমার কোন অধিকার থাকতে পারে না। তাঁর টাকা আমি নিতে পারি না, তার থেকেও বড় কথা, তাঁর টাকা নিয়ে আমি আমার আপন ক্যারিয়ার তৈরি করতে পারব না; নিজের কাছে নিজে ছোট হয়ে যাব। এ হতে পারে না, অসম্ভব।

না মা, ওঁর টাকা নিতে আমায় বোলো না।

মায়ের চোখে জল দেখা দিল।

অতুল বললে, মা, তুমি কাঁদছ! আমি বিলেত যাব না মা।

অতুল, আমার অনেক সাধ ছিল তুমি ব্যারিস্টার হবে। দেশের দশের এবং আমার মুখ উজ্জ্বল করে ফিরবে।

মা, আমারও কি ইচ্ছে নয় তা! আমি ছেলেবেলা থেকে স্বপ্ন দেখেছি বিলেত যাব। মনে নেই মা কতদিন তোমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে বলেছি—আমাকে কি কেউ তার চাকর করে নিয়ে যায় না! কিন্তু না মা, এভাবে আমাকে ওঁর টাকা নিতে বোলো না। আমি পারব না—আমার মন সায় দেয় না।

খোকন, মা ডাকেন।

কবেকার সেই ছেলেবেলার ডাক! কই মা তো আজকাল আর এ নামে ডাকেন না! বড় হতে মা ডাকেন, অতুল। খোকন নামটি যেন কোন বিস্মৃতির অন্তরালে ডুব দিয়েছে। মা বলেন, অতুল, তুমি তো আমার কথা শোন। কোনদিন আমার কোন

কথার অবাধ্য হও না। আমি চাই তুমি বড় হও—অনেক বড় হতে হবে। কে কি বলল না বলল তাতে তোমার কিছু এসে যাবে না। তোমার চলার পথে তোমার পায়ে পায়ে অনেক বাধা অনেক বিপত্তি জড়িয়ে চলবে, তাদের পিছনে রেখে চলতে হবে; তোমার অনেক মনঃকষ্ট হবে, তোমাকে হয়ত অনেকে বলবে স্বার্থপর, হয়ত অনেকে অনেক দুর্নাম দেবে, কিন্তু তাতেও তোমায় লক্ষ্যপথে স্থির থাকতে হবে, বিচ্যুত হলে চলবে না। তোমাকে মানুষ হতে হবে অতুল, আমাদের মুখ চেয়ে তোমাকে মানুষ হতে হবে। বোনেদের এবং তোমার মায়ের ভার নিতে হবে। অতুল, যে সুযোগ তুমি পাবে তাকে জীবনে কোনদিন নষ্ট হতে দিও না। জীবনে সুযোগ খুব কমই আসে।

হেমন্তশশীর চোখদুটি সজল হয় বুঝি।

মা, মা, তুমি কাঁদছ! তোমার মনে আমি কোন দুঃখ দিতে চাই না মা। তুমি যা চাইবে তাই হবে।

দুর্গামোহন স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, তুমি ঠাণ্ডার দেশে যাবে, তোমায় প্রয়োজনীয় গরম জামাকাপড় সঙ্গে নিতে হবে। চল, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে আসি।

অতুল বলে, চলুন।

অতুলের মনের ভাব ধীরে ধীরে এতদিনে পরিবর্তন হয় বুঝি। অতুল মাকে এবং দুর্গামোহনবাবুকে প্রণাম করে চলে গেল বাড়ির বাইরে—পানিমামার বাড়ি, পানিমামাকে খবরটা দিতে হবে। পানিমামাকে খবরটা দিয়েই বড়মামা কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তর বালিগঞ্জের বাড়িতে উপস্থিত হল। মামা-মামীমা বললেন, আমরা খুব খুশি তোমার কথা শুনে। ব্যারিস্টার হয়ে ঘরে ফের—এই আশীর্বাদ করি। বড়মামা বললেন, তোমার কোন কিছু প্রয়োজন হলে আমাকে জানাতে সঙ্কোচ কোরো না। মামাতো ভাইবোনরা ঘিরে ধরল। হেমকুসুম বললে, অতুলদা, তুমি আগে ইংল্যাণ্ড যাও না··· আমরাও পিছু পিছু যাব।

বিলাত যাত্রার জন্যে পানিমামা অনেক চেষ্টা করলেন, অনেকরকম সাহায্য—আর্থিক এবং কায়িক। পানিমামার চেষ্টায় এবং অতুলের ঘোরাঘুরিতে পাসপোর্ট পেতে দেরি হল না। দুর্গামোহনবাবু একদিন ওকে সঙ্গে করে নিয়ে চললেন দোকানে—কেনা হল শীতের দেশের উপযোগী গরম জামা-কাপড়, বাক্স-বিছানা। আবশ্যকীয় জিনিসপত্র যোগাড় করা হল, তারপর বিদেশ যাওয়ার দিন এগিয়ে এল। কলকাতার চাঁদপালঘাট থেকে অতুলের জাহাজ যাত্রা করবে ইংল্যাণ্ড উপকূলে। চাঁদপালঘাটে সেদিন ভিড়। দুর্গামোহনবাবু, মা-বোনেরা, মামা-মামী, মামাতো ভাই-বোনেরা, বন্ধুবান্ধব সকলে বিদায় জানাতে এসে দাঁড়ালেন গঙ্গার জাহাজঘাটে। মায়ের মন বিষণ্ণ, তাঁর অতুল আজ

কতদূর চলেছে এত অল্প বয়সে! এতদূরে একলা যেতে পারবে তো? যদি অসুখবিসুখ হয়—ভয়ে কেঁপে ওঠে মন। পরক্ষণেই মন আনন্দে ভরে ওঠে—তাঁর অতুল ব্যারিস্টার হয়ে ফিরবে; কত বড় হবে, নাম হবে, যশ হবে। ক্ষণে ক্ষণে আনন্দবেদনার ওঠা-পড়া চলে মায়ের মনপ্রাণে।

অতুল মাকে প্রণাম করে, একে একে গুরুজনদের প্রণাম করে আশীর্বাদ মাথায় রাখে। বন্ধুদের শুভেচ্ছা-শুভকামনা গ্রহণ করে। ছোটদের দিকে হাসিমুখে চেয়ে হাত আন্দোলিত করে জাহাজের সিঁড়ি বেয়ে জাহাজের ডেকে উঠে যায়। জাহাজের রেলিং ধরে দাঁড়ায় অতুল। সংযোগ-সূত্র ছিন্ন হয়ে জাহাজ বন্দর ত্যাগ করে। দূরত্ব ছড়িয়ে পড়ে।

দূর থেকে ও দেখল মা আঁচলে চোখ মুছছেন। ছোট বোনেরা জলভরা চোখে তাকিয়ে আছে। শেষবারের মত হাত আন্দোলিত করে মামা-মামীরা জেটি থেকে নেমে চলেছেন, সবশেষে হেমকুসুম। জাহাজঘাটে অগুন্তি মানুষের ভিড়।···হেমকুসুম কি একবার পিছু ফিরে তাকালো···পিছু ফিরে তাকিয়ে বুঝি একবার দাঁড়ালো—আদরের মামাতো বোনটি। তারপর সব ঝাপসা হয়ে গেল—ভাগীরথীর ওপারের সারি সারি কলকারখানার ধোঁয়া, চিমনি···পরিচিত শহরটা।···

জাহাজ এগিয়ে চলল ডায়মণ্ডহারবার কাকদ্বীপ ছাড়িয়ে সুন্দরবনের ধার দিয়ে সাগর-মুখে।

ভাগীরথী ক্রমে ক্রমে প্রসারিত হতে হতে অকস্মাৎ এক ব্যাপ্তির মধ্যে এনে দিল যখন, নিজেকে যেন মনে হল কত ক্ষুদ্র, বিন্দু মাত্র।[১৬]

---

১৬ অতুলপ্রসাদের পিতা ডঃ রামপ্রসাদ সেন ও ব্রাহ্মধর্মী সমাজকর্মী উকিল দুর্গামোহন দাশের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। ব্যবসায়িক নানা প্রয়োজনে ডাঃ রামপ্রসাদ সেন দুর্গামোহন দাশের কাছ থেকে প্রায়ই পরামর্শ গ্রহণ করতেন। পরে বৃদ্ধ বয়সে দুর্গামোহন দাশ অতুল-মাতা হেমন্তশশীকে বিবাহ করেন। দুর্গামোহন দাশ সুপরিচিত সমাজসেবী ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী, নিজের সর্বস্ব তিনি দান করে গেছেন—তাঁর মত উদার-মন, দৃঢ়চেতা, তাঁর মত দানশীল ব্যক্তি বিরল। বৃদ্ধবয়সে তাঁর এই সিদ্ধান্তে পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে মনোমালিন্য হয়েছে, তবু তিনি সঙ্কল্পে অটল।···সত্যপ্রসাদ সেন তাঁর ডায়েরির মধ্যে দুর্গামোহন দাশের উল্লেখ খুব কমই করেছেন। কবি অতুলপ্রসাদের জীবনী রচনার ইচ্ছে সত্যপ্রসাদের ছিল, কিন্তু তাঁর মনে ভয় ছিল, "তাহা হয়ত পক্ষপাতদোষে দুষ্ট হইতে পারে।" তবে সত্যপ্রসাদ সেন স্বীকার করেছেন, "অতুল ভগ্নিদের লইয়া কিছুদিনের

ছয়

অতুল বিলেতে পাড়ি দিল ১৮৯০ সনের নভেম্বর মাসে, তারিখটা সঠিক জানা যায় না। তখন ওর বয়স উনিশ বছর এক মাস। কলকাতা ও ঢাকা ছাড়া সে বাংলার বাইরে কোথাও যায়নি। এবার তাকে যেতে হবে সুদূর সমুদ্রপারে, একেবারে খাস বিলেতে। সেখানকার আচার-ব্যবহার, মানুষজন সবকিছুই তার কাছে অপরিচিত। এমনকি ভাল করে কাঁটা-চামচ ধরে খাওয়াতেও ও ততটা পোক্ত নয়। তার মাঝেই সান্ত্বনা সহপাঠী দুই বন্ধু—জ্যোতিষ দাশ ও নলিনী গুপ্ত। তারা দুজনে চলছিল বিদেশে উচ্চশিক্ষার্থে। জাহাজে কয়েকজন অন্য প্রদেশবাসী ভারতবর্ষের তরুণ ছাত্র একসঙ্গে চলেছিল। তাদের সঙ্গে ওর আলাপ হল। ক্রমশ তা বন্ধুত্বে পরিণত হল। তাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়ায়, গল্পে-গানে, খেলায় সময়টা এগিয়ে চলছিল—কম সময় তো নয়—প্রায় পঁচিশ দিন থেকে এক মাস এই জাহাজে সমুদ্রের বুকে থাকতে হবে। হঠাৎ ডেক-এ কৈশোর বয়সের সঙ্গী জ্ঞান রায়ের সঙ্গে দেখা।

মধ্যেই কলিকাতায় চলিয়া গেল। ভগ্নিরা গেল মায়ের কাছে।" ভগ্নিদের বিবাহ হল। বিবাহ দিলেন দুর্গামোহন দাশ খরচপত্তর করেও ; এ-কথা বলেছেন শ্রীমতী কুমুদিনী দত্ত (অতুলপ্রসাদের মাসতুতো ভাই শিশিরকুমার দত্তর স্ত্রী)। শ্রীমতী বেলা সেন (অতুলপ্রসাদের পুত্রবধূ) বলেছেন, "দুর্গামোহন দাশ আমাদের পরিবারের যে কতখানি বন্ধু ছিলেন, আমার শ্বশুরমশাইকে কতখানি সাহায্য করেছিলেন—বিলেত যাওয়া এবং অন্যান্য বিষয়ে তার একখানি হিসেব আমি দেখেছিলাম প্রথম আমার যখন বিবাহ হয় সেই সময়ে, তারপর তা আর খুঁজে পাইনি। হারিয়ে গেছে।" আবার সত্যপ্রসাদ বলেছেন,—"বিলাত গিয়া ব্যারিস্টার হওয়ার প্রবল বাসনা অতুলের প্রাণে কিশোর বয়স হইতেই ছিল। খুড়োমহাশয় অকালে চলিয়া যাওয়াতে যে সংস্থান রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে ইহা সম্ভব হওয়া সুকঠিন ছিল।···যৌবনেও সাংসারিক নানা ঘটনায় অতুলের প্রাণে নিদারুণ আঘাত লাগিয়াছিল, ফলে মাতুলদের কাহারো কাহারো প্রাণে এত সমবেদনা জাগিয়া উঠিয়াছিল যে, অতুলকে দূর দেশে পাঠাইয়া তাহার প্রাণের জ্বালা প্রশমিত করিতে চেষ্টা করা সমীচীন মনে করিলেন।"

···প্রেসিডেন্সি কলেজে এফ-এ পড়া হল না অতুলপ্রসাদের। এনট্রান্স পাশ করে ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে অতুল চললেন লণ্ডনে ব্যারিস্টারি পড়তে।

জ্ঞান জড়িয়ে ধরল অতুলকে। কতদিন পরে দেখা, কোথায় ছিলে এতদিন···কোথায় পড়ছিলে, কী পড়ছিলে, কোথায় পড়তে যাচ্ছ ?

একসঙ্গে অনেকগুলি প্রশ্ন বুঝি করে জ্ঞান—জ্ঞানেন্দ্র রায়—ঢাকার সেই জ্ঞান রায়··· রায়বাবুদের বাগানে কিংবা আনন্দ-মাস্টারমহাশয়ের বাগানঘেরা বাড়িতে বসে যে কাব্যালোচনা করত। লুকিয়ে লুকিয়ে কবিতা লিখে শোনাতো। রবীন্দ্রনাথের কথা জ্ঞানই প্রথম শোনায় তাকে। সেই অজ্ঞাত ইতিহাস কোন বিস্মৃতির অন্তরালে অনাবিষ্কৃত হয়ে আছে। মনেই পড়েনি। সেই জ্ঞান চলছে বিলেতে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে।

অতুল বললে, আমার ইচ্ছে আছে ভাই ব্যারিস্টারি পড়ব। কিন্তু আপাতত প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করতে হবে। তারপর ব্যারিস্টারির কথা ভাবা যাবে।

জ্ঞান রায়কে সহযাত্রীরূপে পেয়ে খুব খুশি হল অতুল। জাহাজের অন্যান্য ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। আলাপ করিয়ে দিল জ্যোতিষ দাশ, নলিনী গুপ্তর সঙ্গে। যে জাহাজে অতুলরা চলেছিল, সে-জাহাজে জন-দশ বার মিলিটারি সাহেব সপরিবারে ছুটিতে দেশে ফিরছিলেন। তাঁরা যেদিকে থাকতেন, সেদিকে ভারতীয় যাত্রীদের যাওয়া নিষিদ্ধ করেছিল জাহাজের স্টুয়ার্ট।—'অপমানকর ব্যবহার'। কিন্তু কী আর আশা করা যায় শাসকগোষ্ঠীর কাছে! মনে ক্ষোভই শুধু জমা থাকে। ভারতীয় ছাত্ররা, যাত্রীরা নিজেরাই একটা চক্র তৈরি করে নিলে কেমন হয়, বলল জ্ঞান রায়। অতুল বললে, সেখানে ওদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হবে।

সকলে সায় দিল।

তাই-ই হল। ভারতীয়দের চক্রে গান-বাজনার চমৎকার এক জলসা হয়ে গেল। কেউ গান গাইল, সেতার বাজালো, বেহালায় বাজালো ভারতীয় রাগ-রাগিণী। অভারতীয় ওদেশীয়রা দূর থেকে তাকিয়ে দেখল। এখানে ওদের প্রবেশ নিষেধ।

জাহাজ এগিয়ে চলল। ভারত মহাসাগর পার হয়ে কলম্বো বন্দরে থেমে, এডেন বন্দর হয়ে সুয়েজ পেরিয়ে আলেকজেণ্ড্রিয়া ছুঁয়ে একেবারে ভূমধ্যসাগরের মার্সিলিস বন্দরের মাটি কামড়ে ধরল। তারপর জিব্রাল্টার থেকে ব্রিস্টল অভিমুখে যাত্রা। জাহাজের দিনগুলো প্রথমদিকে সামুদ্রিক অসুস্থতায় বড় অস্বস্তিতে কাটছিল। তারপর নীল আকাশ আর নীল জলের সঙ্গে কেমন যেন মিতালি হল। সামুদ্রিক পাখি আর উড়ুক্কু মাছেদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কৌতূহল কখন বিরক্তিতে পরিণত হল, তবুও রাতের সমুদ্রে কালো জলের মাঝে হীরক-খচিত আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বুঝি আশ মেটে না। জান্তব দানবটার একটানা আর্তনাদে অবিরত যাত্রায় হঠাৎ মাটির জন্যে বড় কান্না পায়। মায়ের জন্যে বুঝি মন কেমন করে ওর।

ইংলণ্ডের উপকূল এগিয়ে আসে। ইংলণ্ডের বড় কাছাকাছি এগিয়ে আসে মনে ভয়

জাগে তত। ভাবে লণ্ডন শহর পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম শহর—তার অধিবাসীরা তাকে কিভাবে নেবে কে জানে···সহযাত্রী ইংরেজরা দেশের কাছাকাছি এসে অসহিষ্ণু হয়েছিল। যত শীঘ্র সম্ভব আপন জন্মভূমি আপন পিতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যগ্র এবং অধীর হয়ে উঠেছিল। দেশের মাটির দেখা পেতে বোধহয় শান্ত হয়েছিল ওরা। আপন আপন জিনিসপত্রের তদারকিতে ওরা যখন ব্যস্ত ছিল, করমর্দন করছিল বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে, একে অপরের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ে রত ছিল, ও তখন অবাক হয়ে সমুদ্রপারের ভিন্ন পৃথিবীর মুখ দেখল। অবাক হল, এবং উদ্‌বিগ্ন হল। শেষে ভাবল, বিলেত দেশটা মাটিরই।

লণ্ডনর কিংস ডকে জাহাজ এসে ভিড়ল। সাহেব যাত্রীরা সারি দিয়ে আগে আগে নামলেন, তাঁদের অবতরণ সমাপ্ত হলে ভারতীয়দের পালা। অতুল ও তার বন্ধুরা একে একে নেমে এল। নতুন দেশ, নতুন শহর, নতুন মানুষ, নতুন দৃশ্য। লণ্ডনের মাটিতে পা রেখে অবশেষে অতুল ভাবল, আমি এলাম আমার ছেলেবেলার স্বপ্নকে সফল করে তুলতে—সেই দেশে।···আজকে স্বপ্ন সফল হল, আজ এখানে আমার নতুন জীবন শুরু। যে-কটা বছর থাকব, সে-কটা বছরকে সফল করে তুলতে হবে। ভগবান, তুমি আমার সহায় হও।

ওরা চার বন্ধুতে প্রথম এসে উঠল কোন হোটেলে। তারপর যে-যার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যে-যার পথে।

অতুল তার কলেজের কাছাকাছি এক পল্লীতে পূর্বনির্ধারিত একজন ভদ্র সম্ভ্রান্ত ইংরেজ ভদ্রলোকের বাড়িতে এসে উঠল। বৃদ্ধ এবং তাঁর স্ত্রী ছাড়া আর সংসারে কেউ ছিল না। বৃদ্ধ পেনশনপ্রাপ্ত। পুত্র-কন্যা নেই। অতুলকে পেয়ে খুব আনন্দিত হলেন। বুড়ো-বুড়ির সংসারে দুদিনেই অতুল বড় আপনার হয়ে গেল। অতুলের রূপ-গুণ মুগ্ধ করেছিল ওদের।

কিছুদিন পরে লণ্ডন জীবনযাত্রার সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে কলেজে প্রবেশ করে অতুল মাকে চিঠি লিখল। মা, তুমি আমার জন্যে ভেবো না বেশি। আমি এখানে এক বুড়ি মাসি ও বুড়ো মেসো পেয়েছি তাঁরা আমাকে তাঁদের ছেলের মত মনে করেন। আমি ভারতবাসী তাঁরা ইংরেজ—এই বিভেদটুকু তাঁদের মনে নেই।

তারপর আরও চিঠি লিখল অতুল মাকে···এখানে যে এত শীত পড়ে এ-ধারণা আমার ছিল না। দারুণ শীতে হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে। তারপর সব সময়ে বৃষ্টি। সব সময়ে বৃষ্টি—আর মেঘলা মনমরা আকাশ। একটুকু রোদ নেই। বেজায় ঠাণ্ডা। দেশ থেকে যে-সব গরম জামা-কাপড় এনেছিলাম, তা এখানকার শীতে কাজে আসবে না। জুতো-গুলো ভিজে গেলে পরা মুস্কিল। এখানে ওয়াটারপ্রুফ জুতো, গরম ওয়াটারপ্রুফ,

ওভারকোট ছাড়া এক-পা চলা মুস্কিল। আমাকে ওই দুটোই করাতে হবে। উপস্থিত এখন আমি যাঁর এখানে আছি, তিনিই আমাকে একটা গরম স্যুটের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আমি যে-টাকা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম, সে-টাকা আমার কলেজে ভর্তি হতেই লেগে গেছে। আমি চেষ্টা করছি আমার কলেজের অবসর সময়ে একটা কাজের চেষ্টা করতে। তোমার ভাবনার কারণ নেই। এখানে সকলে এমনিই করে। আমি এখানে থাকার খরচ চালিয়ে নিতে পারব। আমাকে যদি গরম জামা ইত্যাদির জন্যে কিছু টাকা পাঠাও ভাল হয়।

হেমন্তশশী চিঠি পেয়ে দুর্গামোহনবাবুকে জানালেন। দুর্গামোহনবাবু টেলিগ্রাফ মনি অর্ডারে কিছু টাকা পাঠালেন। তখনকার দিনে বিলেতের চিঠি একবার করে মেল জাহাজে আসত। এদিকে মা, ওদিকে ছেলে চিঠির জন্যে আশা করে বসে থাকতেন। মা-র মন যতকিছু দুর্ভাবনার বন। কোনবার যদি কোন চিঠি পৌঁছল না বা হারিয়ে গেল, অমনি খাওয়া দাওয়া ত্যাগ। এদিকে দুর্গামোহনবাবুর স্বাস্থ্য দিন দিন ভেঙে এল।

অতুল লিখল···এই শীতে রোজ ভোরবেলা উঠে কলেজে ছুটতে হয়। তুমি তো জান মা, কেউ ভোরবেলা ডেকে তুলে না দিলে আমি কোনদিনই সকাল সকাল উঠতে পারি না···তোমার বোধহয় জানতে ইচ্ছে করছে এখানে আমাকে কে তুলে দিচ্ছে, না? আমার বুড়ি ল্যাণ্ডলেডি। তিনি ভোরবেলায় এসে দরজায় টোকা দিয়ে বলেন, আসতে পারি? তারপর ঘরে এসে গরম গরম কফির কাপ এগিয়ে দিয়ে, ফায়ার-প্লেসের আগুনের কাঠ সরিয়ে আগুন তাজা করে বলেন, আমার প্রিয় খোকন, উঠে পড় তাড়াতাড়ি, তোমাকে কলেজে যেতে হবে না?···আমি পালকের গরম লেপটায় মুখ অবধি ঢেকে নিয়ে পাশ ফিরে শুই। শীতের জন্যে উঠতেই ইচ্ছে করে না। তবু উঠতে হয়। এক চুমুকে কফি শেষ করে, গরম জামা-কাপড় পরে, ওভারকোট বর্ষাতি জড়িয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ল্যাণ্ডলেডিকে 'গুডমর্নিং' জানিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটি। লণ্ডনের আকাশ তখন অন্ধকার থাকে। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ে, একহাত দূরের মানুষও দেখা যায় না। তবু আমার মত অসংখ্য মানুষ ছুটে চলে তখন স্কুল-কলেজে-অফিসে। ওই ভোরে অন্ধকার থেকেই লণ্ডনের কর্মজীবন শুরু হয়ে যায়।···আমার বাড়ি থেকে বড় রাস্তা ধরে কলেজে যেতে একটু দূর পড়ে। কিন্তু সর্টকাট একটা রাস্তাও আছে, পার্কের মধ্যে দিয়ে পার হয়ে যায় লোকে। বসন্তে সমস্ত পার্কটা ফুলে ফুলে ছেয়ে থাকে। কেউ ফুলে হাত দেয় না বা তোলে না, এ-কথা ভাবতেই অবাক লাগে। আমাদের দেশ হলে পার্কের ফুলের কী অবস্থা হত ভাব। এখানে সারা ঋতুটা মা বেশ বোঝা যায়—শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত। এখানে 'সামার' লোকে

উপভোগ করে। উইক এণ্ড-এ দিন কাটিয়ে আসে সাগর-বেলায়···ছুটিছাটা পেলেই দলে দলে ইংরেজরা বেরিয়ে পড়ে এ শহর থেকে ও শহরে, গ্রাম থেকে শহরে শহর থেকে গ্রামে, পাহাড়ে, বনে, সমুদ্রে। উর্দ্ধশ্বাসে ঘোড়া ছোটাতে এরা ভালবাসে। আমি এদের প্রাণোচ্ছল জীবনের দিকে তাকিয়ে চোখ ফেরাতে পারি না। তবুও মাঝে মাঝে বড় মন খারাপ হয়ে যায়, এদের সাদা-কালোর দ্বন্দ্ব দেখে। লণ্ডনের পথে প্রান্তে কিছু-সংখ্যক ইংরেজ যুবক আমাদের ঘৃণা করে। তাদের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট আমরা। আমাদের সঙ্গে প্রায়ই ওদের কথা-কাটাকাটি হয়ে যায়। ওদের ব্যবহারের প্রতিবাদ করার জন্যে আমরা ভারতবাসীরা একটা সংগঠন করেছি—আমাদের ইচ্ছে যা-কিছু অন্যায়, অবিচার তার সবল প্রতিবাদ করা। প্রতিবাদ আমরা জানাই এখানকার কাগজপত্রে, সভা সমাবেশে। তুমি তো জান চিত্তরঞ্জনকে। চিত্তদা এখন এ-কাজের ভার নিয়েছে। তুমি আমার কথা বেশি ভেবো না মা······

হয়ত সেদিন অতুল চিঠির শেষ স্তবকটি লিখে কেটে দিয়েছিল। কারণ মা দূরে ভারতবর্ষে থেকে চিন্তিত হবেন। মা-কে ভাবনায় রেখে লাভ কি!

কিন্তু মায়ের কি চিন্তা ভাবনা যায়! মনটা যেন সকল সময়েই ওকে ঘিরে থাকে। শয়নে-স্বপনে, রাত্রে-জাগরণে অষ্টপ্রহর মায়ের চিন্তা। প্রবাসী পুত্রের জন্যে ভাবনা, ভাবনা দুর্গামোহনবাবুর জন্যে। দুর্গামোহনবাবুর স্বাস্থ্য দিন দিন ভেঙে পড়ছিল। অতুলের মাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করায় দুর্গামোহনবাবুর প্রথম পক্ষের পুত্রকন্যা, আত্মীয়স্বজন সকলে তাঁকে প্রায় ত্যাগ করেছেন। দুর্গামোহনবাবু অসুস্থ শরীরেও তাঁর কাজকর্ম কিছু ত্যাগ করেননি—কত কাজ তাঁর! প্রতি মাসে অতুলকেও টাকা পাঠাচ্ছিলেন। আর বুঝি শরীর সয় না। আর টাকা পাঠানো হয়ে ওঠে না। তাঁর মাথার উপর অনেক ঋণ জমে ওঠে। মা পড়লেন সমস্যায়। পুত্র বিদেশে অর্থকষ্টে রয়েছে। এদিকে স্বামী অসুস্থ, তাঁকে কী করেই বা বলা যায় আরো অর্থ জোগাও, আরো অর্থ পাঠাও। প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অতুল তখন ব্যারিস্টারি পড়ছে। ব্যারিস্টারি পড়তে হলে তখনকার দিনে রেওয়াজ ছিল প্রফেসরদের মাঝে মাঝে তোয়াজ করে ডিনার টেবিলে আমন্ত্রণ করা। প্রফেসর প্রসন্ন হলে ভাগ্য প্রসন্ন হবে। কিন্তু ডিনার টেবিলে প্রফেসরদের নিমন্ত্রণ করা কি সহজ কথা! অর্থ কোথায়? টাকার কত প্রয়োজন—বাসস্থানের ভাড়া, খাওয়ার খরচ, পাঠ্যপুস্তক কেনা, যাতায়াতের খরচাদি, কলেজের মাইনে।

মা একদিন মেজ ভাই প্যারীমোহনের বাড়ি উপস্থিত হয়ে সব কথা খুলে বললেন। বললেন, আমার অতুলকে তুমি কিছু সাহায্য কর দাদা। তুমি সাহায্য না করলে নয়, আমি আর পেরে উঠছি না।

প্যারীমোহন জানালেন, তোমার ভাবনার কিছু নেই, আমি এবার থেকে অতুলকে কিছু কিছু পাঠাবো। অতুল বিলেত থেকে ফিরে এসে ব্যারিস্টারিতে এনরোল হয়ে আমার টাকাটা শোধ করে দেবে যতদিনে হয়।

…অতুল কৃতজ্ঞতার সঙ্গে চিঠি দিল প্যারীমোহনকে।

লণ্ডনে মিডল টেম্পলে ব্যারিস্টারি পড়ছে অতুল। প্রায়ই পড়াশোনার জন্যে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের লাইব্রেরিতে তাকে যেতে হয়। লাইব্রেরিতে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিক্রম হয়। লণ্ডনে তখন চিত্তরঞ্জন, মনোমোহন ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষ। চিত্তদার সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়ে যায় ব্রিটিশ মিউজিয়ামে। চিত্তদা তখন খুব উত্তেজিত। আই-সি-এস পরীক্ষা দিতে দিতে হঠাৎ উঠে গিয়ে ব্যারিস্টারি পড়ছেন। সিনিয়র ছাত্র!

আমি ব্যারিস্টারি কেন পড়ছি জান? এদের বিদ্যা, এদের বুদ্ধির ধার দেখে নিয়ে আসরে নেমে এদের সঙ্গে যুদ্ধে মাতব।

উত্তেজনার কারণ অন্য।

'তুমি জান আমরা ভারতবাসী। আমরা এখানে প্রবাসী। বিদেশী—বিদেশীদের সঙ্গে কী ধরনের ব্যবহার করা উচিত তা এদের জানা নেই। আমাদের গায়ে যদি কাদা ছোঁড়ে, নোংরা জল ত্যাগ করে আমরা কি তার প্রতিবাদ করব না! সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের লাইব্রেরি ঘরে অন্যান্য ভারতীয় ছাত্রদের মাঝে কথাটি প্রচার হয়ে যেত। চিত্তরঞ্জন বলতেন, আমাদের পড়াশোনার মাঝে মাঝে অনেক কাজ করার আছে। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বসেই সকল ভারতীয় ছাত্রদের জড়ো করে সেদিন বললেন,— আপনারা পড়েছেন এদেশের পার্লামেন্টের সদস্য জেমস্ ম্যাকলীন সাহেবের বক্তৃতা। আমাদের ভারতবর্ষকে কিভাবে ছোট করেছেন! আমাদের ভারতবর্ষের মুসলমানদের বলেছেন 'দাস' (slaves) এবং হিন্দুদের বলেছেন 'চুক্তিবদ্ধ দাস' (Indentured slaves)! এর একটা বিহিত করতেই হবে।

একজন ভারতীয় ছাত্র বললেন, প্রতিবাদ করা উচিত; আর একজন বললেন, ম্যাকলীন সাহেবকে ক্ষমা চাইতে বলা হোক।

চিত্তরঞ্জন বললেন, আমি ভেবে রেখেছি। লণ্ডনের এক্সেটর হলে সকল ভারতীয় ছাত্রদের একত্রিত করে শীঘ্রই আমরা এক সভায় মিলিত হচ্ছি।

যে কথা সেই কাজ। পড়াশোনা বন্ধ হল প্রায়। চিত্তরঞ্জন ঝাঁপিয়ে পড়লেন দেশের কাজে—দেশের মানুষের অপমানের প্রতিকারকল্পে। ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে এক্সেটর হলে লণ্ডনের সমস্ত প্রবাসী ভারতীয় ছাত্ররা একত্রিত হলেন। চিত্তরঞ্জন

একটি জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলেন। রক্ত গরম হল ভারতীয় ছাত্রদের। সভায় স্থির হল :—

(১) জেম্‌স্ ম্যাকলীন সাহেব ভারতীয়দের সম্বন্ধে যে-সকল উক্তি করেছেন তার জন্যে তাঁকে ভারতীয়দের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

(২) এইসকল উক্তির জন্যে তাঁকে পার্লামেণ্টের সদস্যপদ থেকে অপসারিত করতে হবে।

(৩) ইংলণ্ডের রানীর কাছে এক আবেদন-পত্র পাঠাতে হবে।

ইংলণ্ডের বিদগ্ধ ইংরেজ সমাজে ম্যাকলীনের কার্যকলাপ এবং ভারতীয় ছাত্রদের চরম প্রতিবাদ বিষয় নিয়ে দারুণ আলোচনা-সমালোচনা হল। গোঁড়া ইংরেজরা ম্যাকলীনকে সমর্থন করে বক্তৃতা দিলেন। উদার ইংরেজদের কাছে ম্যাকলীন ধিক্কৃত হলেন। তাঁরা কাগজে পত্রে চিঠি লিখলেন, ম্যাকলীন সাহেবকে পার্লামেণ্টের সভা থেকে বহিষ্কৃত করা হোক। উত্তেজিত হল ইংলণ্ডের কাগজগুলি। তাঁরা চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতার সমর্থক হয়ে বক্তৃতার উদ্ধৃতি দিয়ে ভারতবাসীদের সমর্থন করে সম্পাদকীয় লিখলেন। চিত্তরঞ্জনের অবশেষে জিত হল। চিত্তরঞ্জনের পিছনে অতুলপ্রসাদ।

একদিন ভোরবেলা সংবাদপত্রে অতুল দেখল ম্যাকলীন সাহেবকে পার্লামেণ্ট সভা থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছে। সংবাদ পাঠ করে খুব খুশি হয়ে অতুল ছুটল চিত্তদার বাসায় দেখা করে আনন্দ প্রকাশ করতে।...চিত্তরঞ্জনের বোধহয় কোনদিনই কোন কাজের শেষ নেই। একখানি কাজের ইতিমুহূর্তেই আর একখানি গুরুত্বপূর্ণ কাজের আরম্ভ। ব্যারিস্টারি পড়ার মাঝে চিত্তদা এত সময় কোথায় পায়, ও ভাবে!...আবার শুরু হয়ে গেল নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা। পাড়ায় পাড়ায় বাড়িতে বাড়িতে ঘোরাঘুরি করে প্রচারকার্য, লয়েড পার্কে বক্তৃতা, এক্সেটর হলে ভারতীয়দের গোপন পরামর্শ, ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পাঠাগারে অবসর সময়ে অনুশীলন। চিত্তরঞ্জন যেখানে যে কাজে রয়েছেন, সে-কাজ ভালভাবে সমাধান না হয়ে যায় না। 'ফিনসবারী' থেকে প্রবাসী ছাত্রদের জন্যে সে বছর দাদাভাই নৌরজি পার্লামেণ্টের সদস্য নির্বাচিত হলেন।

কদিন পরে জ্ঞান এসে বলল, অতুল, চল আজ বিখ্যাত গায়িকা ম্যাদাম প্যাটের গান শুনে আসি। ম্যাদাম প্যাটের নাম শুনেছ?

অতুল হাসল।

জ্ঞান বলল, ম্যাদাম প্যাট এ-দেশের একজন বিখ্যাত গায়িকা। ওঁর গান শোনার জন্যে এ-দেশের লোক পাগল, জান।

ম্যাদাম প্যাটের সুমিষ্ট সুমধুর গলার 'হোম সুয়িট হোম' গানখানি গাওয়া ও বোধহয় কোনদিনও ভুলতে পারবে না। সত্যি অপূর্ব, অতুলনীয়।[১৭]

জ্ঞানের আবির্ভাব এমনি মাঝে মাঝে হয়। যেমন সেদিন এসে বললে, জান অতুলপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ এসে লণ্ডনে পৌছেছিলেন অগস্টে, নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই মাত্র দুমাস এগারো দিন থেকে ভারতবর্ষে ফিরে গেলেন। লণ্ডনে এসে কোথাও ঘুরে বেড়ালেন না, বাড়িতে অলসভাবে বই পড়ে পড়ে পার করলেন।

মাঝে মাঝে গ্রীষ্মাবকাশে ঝড়ের মত এসে বলে, চল সী কোস্ট থেকে লম্বা দৌড় দিয়ে আসি, না হয় দুটো ঘোড়া ভাড়া করে টেম্‌স্ নদীর পারে ঘোড়া ছোটাই।...তাও যাবে না! তবে চল না-হয় নিছক সময় কাটানোর জন্যে একটা থিয়েটার তো দেখে আসতে পারি। সব সময়ে এত কী ভাব, এত কী পড় বল তো! আমরা কি পড়াশোনা করি না!

অতুল বলে, বোস জ্ঞান।

জ্ঞান বলে, না তুমি উঠে পড়।...উঠবে না? পরমুহূর্তে জ্ঞান উঠে দাঁড়ায়।

অতুল বলে, একটু কফি পান করে যাও জ্ঞান, আমার ল্যাণ্ডলেডিকে এক্ষুনি বলছি।

জ্ঞান বলে, না থাক। তারপর যেমনি ঝড়ের মত তার আবির্ভাব, তেমনি ঝড়ের মত প্রস্থান।

ছুটির দিনগুলি অতুল এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করে না। বইপত্তর গুছিয়ে, ল্যাণ্ডলেডির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পার্কের সর্টকার্ট রাস্তা ধরে ফুলবাগিচার সামনে দাঁড়িয়ে শীতের দেশের মিষ্টি রোদ উপভোগ করে। কখনো রোদে ঘাসে পা ছড়িয়ে বসে ছোট ছেলেমেয়েদের খেলা, ছুটোছুটি করা দেখে। মাঝে মাঝে বুঝি নিজেকে একাকী, নিঃসঙ্গ মনে হয় 'তরুণ-তরুণীর কলকাকলিপূর্ণ প্রকাশ্য চুম্বনের উৎসব-মহোৎসবে'। পার্ক থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে লণ্ডনের পথ অতিক্রম করে মাটির তলার রেলপথ ধরে এসে উপস্থিত হয় ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পাঠাগারটিতে।

ও জানে ওর সময় অল্প, অথচ অনেক কাজ এখনও বাকি। এ দেশ থেকে তাকে আহরণ করে নিয়ে যেতে হবে অনেক জ্ঞান। অনেক পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তকের সঞ্চয় এই পাঠাগারের স্তরে স্তরে। এদেশে অনেক পণ্ডিত বাস করেন, এঁদের কাছে অনেক অনেক শেখার আছে—এদেশের ভালটুকু তাকে নিতে হবে—এ জীবনের যত কিছু ভাল মন্দকে বিসর্জন দিয়ে। পাঠাগারের মাঝে ওর বসার নির্দিষ্ট আসনটিতে অনেক সময় এগিয়ে চলে। সামনে সাজানো বইয়ের মেলা; ওর চারধারে বই, ওর টেবিলে

১৭ অতুলপ্রসাদ সেনের রচিত 'প্রবাসী চলরে দেশে চল' গানটিতে 'হোম সুইট হোম' গানটির সুরের ছায়া পড়ে।

বই—মনোযোগের সঙ্গে বই পড়ে ও, কখনো নোট লিখে রাখে। কখনো কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে নতুন বইয়ের নামের তালিকা পাঠায়।
সেদিন ব্রিটিশ মিউজিয়ামের বিখ্যাত পাঠাগার ওকে অকস্মাৎ বড় আনন্দ দিল। কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে বইয়ের তালিকা দেখতে দেখতে হঠাৎ ওর চোখে ধরা দিল 'বাংলা সাহিত্য-পুস্তকে'র তালিকা। কেবল 'বাংলা সাহিত্য-পুস্তকের' তালিকা নয়, বাংলা বই যে সকল ভাষায় অনুবাদ হয়েছে তারও সংক্ষিপ্ত পরিচয়। সেদিন বোধহয় অনেকক্ষণ বইয়ের তালিকা ধরা ওর হাত কেঁপেছিল। বাংলাদেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে কোন এক প্রখ্যাত পাঠাগারকক্ষে বাংলা বই, বাংলা ভাষার প্রতি এত সম্মান—একথা ভাবতেই কেমন যেন বাংলাভাষার উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা এবং ভালবাসায় মন ভরে গেল। গর্বে ভরে উঠছিল বুক। তালিকার প্রথমেই ছিল মাইকেল মধুসূদনের নাম। বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার ইংরেজি অনুবাদ করেছেন ফিলিপ সাহেব। ইংরেজি ভাষা থেকে অন্যান্য ভাষাতেও অনুবাদ হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস এবং মধুসূদনের কাব্য।
অতুল আগ্রহের সঙ্গে ব্রিটিশ লাইব্রেরি তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়ালো ভারতীয় ভাষার অমূল্য রত্নরাজি।

কলেজ থেকে বাড়িতে ফিরে চা বা কফি খেতে খেতে মনে পড়ে যায় রোজ দেশের কথা। বেশি করে মনে পড়ে জাঠতুত দাদার কথা। তাকে অতুল কলকাতায় থাকতে বলেছিল, দাদা, আমি তোমাকে মাসে মাসে পাঁচ টাকা করে পাঠাবো তোমার যদি কিছু সাহায্য হয়। মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হও। ডাক্তার তোমাকে হতেই হবে।
তোমার কথা আমার মনে থাকবে চিরদিন অতুল! দাদা বলেছিল।
অতুল কথা রেখেছিল। কলকাতা থেকে মাসে মাসে দাদাকে ঢাকার ঠিকানায় টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিল, ভুল হয় নি। তারপর ওকে লণ্ডন চলে আসতে হল। ওর নিজের হাতেই বা তখন কোথায় টাকা, ওর টাকার কত প্রয়োজন! দাদাকে তাই দুঃখিত মনে টাকা দিতে পারার অক্ষমতার কথা জানিয়ে চিঠি দিল ও।
আগুনের ধারে পা বাড়িয়ে দিয়ে ও দাদার কথা ভাবে। দাদা বোধহয় অনেক কষ্ট করেও মেডিকেল স্কুলের পড়া চালিয়ে যাচ্ছে। আমি যখন ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরব, দাদা তখন ডাক্তার হয়ে প্র্যাকটিসে বসবে।
দাদার অনেকদিন চিঠি পায়নি অতুল। দাদার তো নয়ই, মায়ের, বোনেদের কারোর নয়। বিদেশে দেশের সামান্য খবরটুকুও জানার জন্যে উৎকণ্ঠিত থাকে মন। সেদিন একই দিনে তিনখানা চিঠি আসে অতুলের। সত্যদাদার চিঠি,

মায়ের চিঠি, আর একখানা—গোটা গোটা অক্ষরে ওর নাম ও ঠিকানা লেখা—এ চিঠি বোধহয় হেমকুসুমের। দাদা লিখেছেন, ঢাকা থেকে। দাদা ঢাকায়। আর অতুল লণ্ডনে—কত দূরে! দাদা লিখেছেন, আমাদের দুই ভাইকে জীবনে দাঁড়াতে হবে। আমাদের দুজনের মাথার উপর অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে…আমাদের মাথার উপর অনেক দায়িত্ব, সব বাধাবিপত্তি পার হয়ে ঝড়ঝঞ্ঝা কাটিয়ে আমরা নিশ্চয়ই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব; অনেক দূরে থেকেও তোমার মুখ আমার সকল সময়ে মনে হয় ভাই।

মা লিখেছেন, বাবা, আমি আর কলকাতায় একা থাকতে পারছি না। তুমি যত তাড়াতাড়ি পার পড়াশোনা শেষ করে বাংলাদেশে ফিরে আমাদের ভার হাতে তুলে নাও।

মায়ের চিঠি বড় করুণ সুরে লেখা। মায়ের চিঠিতে অতুল জানল, দুর্গামোহনবাবুর শরীর খুব ভেঙে পড়েছে, বোধহয় এ-যাত্রায় আর কাটিয়ে উঠতে পারবেন না। মা ওকে বন্ধুর মত চিঠি লিখেছেন। মা এবং দুর্গামোহনবাবুর কোথায় যেন একটা ভুল হয়ে গেছে, সকলের কাছে হেয় হয়ে গেছেন ওঁরা। আজ দুর্গামোহনবাবুর অসুখের সময়ে, মরণ-বাঁচনের সময়ে কেউ তাঁকে দেখার নেই। দুর্গামোহনবাবুও কারো কাছ থেকে কোন রকম সাহায্য নিতে রাজি নন একথা জানে ও। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে অতুল।

হেমকুসুমের চিঠি তুলে নিল হাতে। হেমকুসুমের চিঠিতে কিছু খুশির হাওয়া ছিল বোধহয়। কারণ ওর মুখে তার ছায়া দোল খেল। ও একবার দেয়ালপঞ্জীর দিকে চোখ তুলে তাকালো। কে যেন ধীরে ধীরে বললে, হেমকুসুম আসবে…হেমকুসুম… এই লণ্ডনে…আসবে বলেছিল।

সাত

বিদেশে থাকতে থাকতে হঠাৎ যদি দেশের মানুষের দেখা পাওয়া যায় কথা ফুরোতে চায় না। দেশের জন্যে হঠাৎ যেন কেমন করে মন। মনের খোলা বাতায়নে দেশের দিনগুলির কথা ভিড় করে আসে। আত্মীয় বন্ধু প্রতিটি মানুষের খবরাখবর জানতে ইচ্ছে করে। যাদের সঙ্গে দুদিনের আলাপ, দুটি মাত্র কথা হয়েছে—যারা দেশে ছিল অলক্ষ্যে, অপাংক্তেয় হয়ে—তারাও যেন ব্যক্তিত্ব নিয়ে ধরা পড়ে। তাদের কথা জানতে ইচ্ছে করে।

আচ্ছা হেম, তোমাদের স্টোর রোডের বাড়ির মোড়ে নামাবলী গায়ে সেই বুড়ি ভিখিরিটা এখনও বসে থাকে রোজকার মত ঘুম-ঘুম চোখে হাত বাড়িয়ে? বাগানের শিউলি গাছে এখনও বোধহয় ফুল ফুটছে খুউব, নয়! হাস্নুহানার গন্ধ এখনও ঠিক তেমনি ছড়ায় পুবের বারান্দায়?······কলকাতায় এখন বোধহয় খুউব গরম······যাই বল কলকাতার গরম অনেক ভালো লণ্ডনের এই ঠাণ্ডার হাতে জমে যাওয়ার থেকে!

ওর কতই না কথা মনে হয়। জানতে ইচ্ছে করে মা কেমন, বোনেরা কেমন আছে। দুর্গামোহনবাবুর কথাও জানতে ইচ্ছে করে। জানতে ইচ্ছে করে পানিমামার কথা। পানিমামার কি এখনো থিয়েটার-যাত্রা করার নেশা আছে? কলকাতায় কি কোন থিয়েটার ক্লাব করেছেন? বিনোদমামী বোধহয় এই মুহূর্তে মাথার কাপড় খুলে রান্নাঘরে রান্নার কাজে ব্যস্ত। মনে পড়ে ছোটমামা বিনয়কে। বিনয়মামার মত খামখেয়ালী বোধহয় সারা ঢাকা শহরে খুঁজে মেলে না। কে জানে দাদা কেমন আছে ঢাকায়—অনেকদিন ওর কোন খবর পাওয়া যায় নি। মনে পড়ে আরো কত না মুখ!······

আচ্ছা হেম, তুমি এখনও ছবি আঁকছ তো? কলকাতায় থাকতে তোমার ছবি আঁকায় খুউব মনোযোগ দেখেছিলাম—সখ এখনও আছে তো?······বেহালা—না তো, এস্রাজ বাজনা কেমন হচ্ছে? তুমি তো এস্রাজ শিখছিলে, না? এখানে তোমাকে একটা যন্ত্রসঙ্গীত শিখতে হবে। কী শিখবে বল, বেহালা না এস্রাজ? কোন্‌টা ভালো লাগে বল?

লণ্ডনে থাকতে প্রায়ই ছুটি পেলে ও মামার বাড়ি এসে পৌঁছে যায়। মামা-মামীমা, মামাতো ভাইবোনেরা ওকে কাছে পেয়ে খুব খুশি হয়।

তুমি আজ সারাদিন এখানেই থাকবে এখানেই খাবে। আমরা সারাদিন আজ এখানে গল্প করব······রাতটা আজ আমাদের এখানেই থেকে যাও না অতুল, তুমি তো আজকাল আর এদিকে আস না!

মামা বলেন, পড়াশোনা কেমন হচ্ছে অতুল? তোমার কোন কিছু দরকার হলে আমাদের জানাতে দেরি কোরো না।

অতুল বলে, আচ্ছা মামা।

লণ্ডনে মামার বাড়ি এসে যেন মনেই হয় না ভারতবর্ষের বাইরে আছে। সেদ্ধ খাবার খেতে খেতে অরুচি জন্মে গেল মুখে। মামার বাড়িতে এলে তবু মামীমার হাতের রান্না খাওয়া যায়, বাংলাদেশের স্বাদ-গন্ধযুক্ত মুখরোচক খাবারের গন্ধে-গন্ধেই পেট ভরে যায়। আর বাংলা কথা বলা যায় মন খুলে। আপন ভাষায় কথা বলার যে কী সুখ তা বিদেশে উপস্থিত না হলে বোঝাই যায় না।

মামীমা মাঝে মাঝে বলেন, আমরা এখানে নতুন এসেছি পথঘাট কিছুই জানি না, অতুল তুমি তোমার ভাইবোনদের শহরটা একটু-আধটু ঘুরিয়ে দেখিয়ে দাও। ওঁর তো সময়ই হয় না। কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত থাকেন।

ও বলে, বেশ তো মামীমা, ছুটি পেলে আপনাদের সমস্ত লণ্ডন ঘুরিয়ে দেখাবো।

লণ্ডন শহরটা কি কম বড়! দিন দিন চারদিকে কেবল এগিয়েই চলেছে। কূল-কিনারা নেই কোন। ওরা ঘুরে বেড়ালো লণ্ডনের পাড়ায় পাড়ায় দ্রষ্টব্য স্থান দেখতে দেখতে। কোনদিন ওরা যায় থিয়েটারে। কোনদিন···মামীমা, আপনার ওয়েস্টার্ন ক্ল্যাসিকাল মিউজিক ভাল লাগে? মোজার্ট বিটোফেনের সুর? মাদাম প্যাটের গান শুনবেন? কিম্বা···চলুন মামীমা আমরা আজ শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটক দেখে আসি কোন।

কখনো মামা-মামীমাদের সঙ্গে ব্রাইটনের সমুদ্রবেলায় কিম্বা ব্রিস্টলের সী-কোস্টে সামারের কয়েকটা দিন আনন্দ-হুল্লোড়ে পার করে আসে। সেখানে সমুদ্রবেলায় রঙিন ছাতার নিচে রৌদ্রস্নানে স্বাস্থ্যকামী ওরা। কখনও বালুকাবেলায় হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূরে বালির পাহাড় আর ঝাউ-বীথিকার নির্জনে দাঁড়িয়ে পিকনিক স্পট নির্বাচিত করে। সমুদ্র-ঢেউ আছড়ে পড়ে বালিয়াড়িতে, গুনগুন করে সুর আসে মনে সমুদ্রের গর্জনে।

*　　*　　*　　*　　*

তুমি বেহালা শেখ হেম। তোমার বেহালার হাত বড় মিষ্টি। আজ তুমি বেহালা বাজাও শুনি।

হেমকুসুম বেহালা আনে, কখনও আনমনে ছড় টানে। সুর ওঠে তারের ঘর্ষণে। কখনও কোন বেসুরো সুর কানে বাজে। হেমের কানে সে-সুর ধরা পড়ে। বাজনা বন্ধ রেখে বেহালা নামিয়ে রাখে।

ও বলে,' থামলে কেন, বাজাও। বেহালার হাত তোমার মিঠে। আমি বলছি, তুমি খুব নাম-করা শিল্পী হবে। চারিদিকে তোমার নাম ছড়িয়ে যাবে দেখো।

বড়মামাকে বলে অতুল, একজন ভালো বেহালা-শিক্ষক রাখুন মামা হেমকুসুমের বেহালা শেখার জন্যে। বেহালায় খুব উৎসাহ হেমকুসুমের।

বেশ তো, হেমকুসুম বেহালা বাজনা শিখুক ভালো শিক্ষকের কাছে। এ তো ভাল কথা, আনন্দেরই কথা!

হেমকুসুমের ইচ্ছে শুধু বেহালা শেখায় নয়, চিত্রশিক্ষা এবং চর্চাও শুরু করে দিল একজন সাহেব চিত্র-শিক্ষকের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে বেহালা শিক্ষাও চলল আর একজন সঙ্গীত-শিক্ষকের কাছে থেকে। অল্পদিনের মধ্যেই হেম পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতে, বেহালা বাদনে পারদর্শী হয়ে ওঠে। লণ্ডনের অনেক সঙ্গীতসভায় সঙ্গীত-শিক্ষকের সঙ্গে

বাজিয়ে আসে। কখনও কোন আসরে একাকী বেহালা বাজিয়ে সকলকে মুগ্ধ করে। ক্রমে ক্রমে সঙ্গীতরসিক সমাজে হেমকুসুমের নাম ছড়ায়।

অতুল মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, এই তো চাই হেম ! তোমার প্রতিভা আছে !

বাবা অফিসের কাজে সব সময়ে ব্যস্ত, মা সাংসারিক কাজে ব্যস্ত, কুসুম বলে, দাদা, তুমি আমার সঙ্গে চল ক্লাবে, সভায়, নাচের আসরে। ক্লাবে আমার বেহালা বাজনা কেমন লাগল দাদা ?

হেমকুসুমের কেমন যেন আকর্ষণী শক্তি আছে। ফিটফাট করে সাজলে বড় সুন্দর দেখায়। হেমের সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগে, হেমের কথা শুনতে ভালো লাগে। হেমের অস্তিত্ব যেন কেমন আনন্দ দেয় ওকে। প্রায় দিনই তাই পড়াশোনার শেষে ও মামার বাড়ি চলে আসে, হেমের সঙ্গে গল্প করে। হেমের সঙ্গে এই অন্তরঙ্গতা যে অন্যদের চোখে অন্য রূপ ধারণ করতে পারে—সে-কথা ও ভাবে না। হেমের সাহচর্য লাভের জন্যে ও বোধহয় সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত। ক্রমে ও কেমন যেন দুঃসাহসী হয়ে ওঠে।

কয়েক মাস পরে হেমকুসুমরা লণ্ডন ছেড়ে চলে গেল। বড়মামা কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের লণ্ডনের কাজ আপাতত শেষ। আর এখন এখানে থাকার প্রয়োজন নেই। বিষণ্ণ মন অতুলপ্রসাদের। বিষণ্ণ মনে ঘুরে বেড়ায় লণ্ডন শহরের রাস্তায় রাস্তায়। হাইড পার্কে কারণহীন আবশ্যকহীন বক্তৃতা শোনে অনেকক্ষণ, টেম্‌স্‌ নদীর তীরে দাঁড়িয়ে তার জলে সুউচ্চ প্রাসাদপুঞ্জের ছায়ার দিকে তাকিয়ে থাকে। ঝির-ঝির বৃষ্টি আর বরফ-কুচি-ছাওয়া পথে হঠাৎ ও আপন মনে আবিষ্কার করল, ও নিজে ওর শরীরের ওপর অত্যাচার করছে। কারণ, ঘুম নেই চোখে। স্নান আহারের ইচ্ছে নেই, সময়-মত হচ্ছেও না। যে-কাজের জন্যে এসেছে এখানে, সেই কাজ অর্থাৎ পড়াশোনা যথেষ্ট পরিমাণে করতে পারছে না। আর এ-কথা মনে হতেই মনে হল এবার ওকে আরো পরিশ্রম করতে হবে। আর অন্য কোনদিকে মন নয়, কোন কিছু ভাবনা নয়, শুধু পড়াশোনা, শুধুই পড়াশোনার কথা ভাবতে হবে। তবু একদিন চিত্তদার কথা মনে হল। চিত্তদার অনেকদিন খবরাখবর নেওয়া হয়নি। চিত্তদার বাড়ি গেলে হয়। চলল চিত্তদার কুঠি। চিত্তরঞ্জনের লণ্ডনের বাসায় তখন দ্বিজেন্দ্রবাবু এবং আরও কয়েকজন প্রবাসী ভারতবাসীদের মাঝে জোর সাহিত্যালোচনা চলছে।

চিত্তরঞ্জন বললেন : এসো, এসো অতুল !

দ্বিজেন্দ্রলাল বললেন, অতুলবাবু, অনেকদিন আপনার পিয়ানো শুনিনি। গান কী রচনা করলেন ?

অতুল বললে, আপনি বরং একটা গান করুন, দ্বিজেনবাবু, আমি আর কী গান জানি ; তাছাড়া কদিন থেকে আমার মনটাও ভালো নেই। আপনারই গান শোনা যাক।

দ্বিজেন্দ্রলাল বললেন, কেন ? দ্বিজেন্দ্রলাল অকস্মাৎ উচ্চহাস্যে ফেটে পড়লেন। হেসে সকলকে চমকে দিয়ে পিয়ানো বাজিয়ে হঠাৎ শুরু করলেন তাঁর স্বরচিত গান।
সভাশেষে বললেন, আজ আমরা চিত্তরঞ্জনকে হাসিমুখে বিদায় অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনারা জানেন, চিত্তরঞ্জন ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। এখন খুব শীঘ্র দেশে ফিরে চলেছেন। আমরা খুব সুখী, সেইসঙ্গে দুঃখিতও, যে ওঁকে আমাদের পাশে পাব না ভেবে। আমরা ওঁর দেশে ফিরে যাওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করছি, সেইসঙ্গে শুভ কামনা জানাই, দেশে উনি একজন স্বনামধন্য ব্যারিস্টার বলে পরিচিত হবেন।

* * * * *

সভা ভঙ্গ হল। কয়েকদিন পরে চিত্তরঞ্জন ভারতবর্ষে ফিরলেন। চিত্তদার অভাব পূর্ণ হয় না। বিষণ্ণ মন। আবার পড়াশোনার মধ্যে ডুবে গেল অতুল। ভুলে গেল ক্লাব, ইণ্ডিয়া হাউসে ভারতীয় ছাত্রদের আড্ডা, টেম্‌স্‌ নদীর পাড়ে সূর্যডোবা। অহরহ বৃষ্টি, ঝির-ঝির বরফ পড়া। ফায়ার-প্লেসের গনগনে আগুনের সামনে শরীর সেঁকতে সেঁকতে পালকের লেপে গা ঢেকে রাতভোর প্রস্তুতি চলে পরীক্ষা-পর্বের। অবশেষে ফাইন্যাল পরীক্ষা এল। পরীক্ষা দেওয়া হল। পার্টি দেওয়া হলে ব্যারিস্টারিতে 'এনরোল্‌ড্‌' হল সে। এবার দেশে ফিরতে হবে। কিন্তু দেশে ফেরার আগে এ-দেশটা একবার ঘুরে দেখে যাবে না! আবার কবে সুযোগ হবে কে জানে! টাকার কিছু টানাটানি, প্যাসেজ বুঝি পুরোপুরি হয় না। মাকে চিঠি লিখতে লজ্জা করে। তবু চিঠি না লিখলে নয়।···কোনরকমে কিছু টাকা জোগাড় করে মা ওকে পাঠিয়ে দিলেন। ও দেশে ফেরার জন্যে তোড়জোড় শুরু করল,—সত্যি এ-দেশ আর ভালো লাগে না।
১৮৯৪ সন। অতুল দেশে যাত্রা করল।
যাত্রীবাহী 'পি অ্যাণ্ড ও'-র জাহাজ। নানান দেশ ঘুরে কলকাতায় আউটরাম ঘাটে এসে নঙর করল। জাহাজঘাটে আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব···কী যে আনন্দ দেশের মাটিতে পা রেখে—কী আনন্দ! তবু দুঃখ হয় মাকে দেখে—মাকে যেন চেনা যায় না—অনেক বয়েস হয়েছে। বোনেদেরও চেনা যায় না।······মা বোধহয় মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন······তোমার করুণায় আমার চোখের মণি এত বড় হয়ে ফিরে এসে আমাদের সকলের মুখ উজ্জ্বল করেছে······তোমাকে ধন্যবাদ, অসীম ধন্যবাদ!
মাটিতে মাথা স্পর্শ করল ও প্রথমে, তারপর মাকে প্রণাম করল। ঘোড়ার গাড়িতে সোয়ার হয়ে···কলকাতায় দুর্গামোহনবাবুর বাড়িতে এসে উঠল ওরা। সকলের জন্যে বিদেশ থেকে কিছু কিছু জিনিসপত্র এনেছিল। অতুল এগিয়ে দিতে সকলেই খুব খুশি। বোনেরা সব সময়েই তাকে ঘিরে বসে গল্প শোনে। মা কাজের অবসরে মাঝে

মাঝে হাসি মুখে এসে বসেন। ওকে পেয়ে যেন নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন, বাড়িতে একটা খুশির হাওয়া বইছে।

সেদিন সন্ধেবেলা বড়মামার বাড়িতে এল।

মামা-মামীদের সঙ্গে বিলেতের অনেক কথাবার্তা আলাপ-আলোচনা হল।

কিন্তু অতুলের চোখ যাকে খুঁজছিল সেই হেমকুসুমের দেখা নেই। অতুল মামীমাকে জিজ্ঞেস করেছিল—কুসুম কোথায় মামীমা!

মামীমা বলেন, ওর শরীরটা কদিন থেকে ভাল যাচ্ছে না। সে বোধহয় নিজের ঘরেই শুয়ে আছে।

অতুল হেমকুসুমের ঘরে এল। কপালে ছোঁয়ালো হাতখানি। তাতে হেমকুসুম চোখ মেলে তাকাল না।

অতুল বুঝল হেমকুসুমের অভিমান হয়েছে। অভিমান ভাঙাতে ওর ঘন কালো চুলে হাত বুলিয়ে বললে, হেম একটা কথা শোন।

কুসুম বললে, আমি তোমার কোন কথা শুনব না! তুমি ওদেশে থাকতে আমাকে কোন চিঠি লেখ নি কেন শুনি?

অতুল হাসল। বললে, অপরাধ হয়েছে, স্বীকার করছি।

অনেক সাধ্যসাধনায় বুঝি পাহাড়ও টলে। হেমকুসুমের রাগ পড়ল—বড় অভিমানিনী মেয়ে। হাসি হুল্লোড়ে, গল্পে-গল্পে অনেক রাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে বাড়ি ফিরল অতুল। পরের দিন সেজমামা পানিমামার সঙ্গে দেখা করল। দু-চার দিনের মধ্যেই দেখা-সাক্ষাতের পালা চুকে গেল। একদিন সকলে মিলে-মিশে স্থির করলেন অতুল একটা বাড়ি ভাড়া করবে, সেখানে সে তার অফিস-ঘর সাজিয়ে বসবে। প্র্যাকটিসের জন্যে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনাকাটা—তার ভার মামারা, মা এবং দুর্গামোহনবাবু নিলেন। ৮২ নম্বর সার্কুলার রোডে নতুন বাড়ি ভাড়া নেওয়া হল, সেখানেই অতুল থাকবে। অফিস হবে। অতুল ও ডাঃ নগেন্দ্র দাশ একসঙ্গে সেই ভাড়া-বাড়িতে এসে উঠলেন। অতুল কলকাতা হাইকোর্টে এনরোল্‌ড্‌ও হল। কর্মজীবনে প্রবেশ করার আগে একবার দেশ থেকে ঘুরে এল—দেশের মাটির আশীর্বাদ নিয়ে।

কোর্ট-কাছারি যাতায়াত শুরু হল। নতুন ব্যারিস্টার অতুলপ্রসাদের রূপ এবং গুণমুগ্ধ হলেন ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের মানুষরা।

আই. সি. এস. এবং ব্যারিস্টার পাত্র লোভনীয়। অতুল সুদর্শন এবং ব্যারিস্টার, পাত্র হিসাবে লোভনীয়। অতএব ও রোজই উত্যক্ত হয়। ব্যতিব্যস্ত অতুল। অনেকে সোজা এসে পৌঁছে যান ওর মা এবং মামাদের দরবারে লোভনীয় প্রস্তাব নিয়ে। মামারা বলেন পরে জানানো হবে। পুত্রগর্বে গর্বিতা মা বুঝি বলেন, সময় হলে

আপনাদের খবর দেওয়া হবে। এখনও আমার অতুলের বিয়ের কথা ভাবিনি—কত আর বয়স হল।

তেইশ-চব্বিশ বছরের পক্ষে ওকে যেন একটু বড় দেখায়; সুন্দর সুগঠিত দীর্ঘ দেহ। সারা দিনের পরিশ্রমেও শরীরে যেন কোন রকম ক্লান্তি নেই। কাজ, কাজ আর কাজ ' সময় কোথায় বিয়ের কথা ভাববার! সময় আছে কিন্তু অন্য কাজের। সেখানে যে প্রাণের টান! কোর্ট থেকে ফিরে এসেই পোশাক পরিবর্তন করে ছোটে ক্লাবে। অদ্ভুত এক ক্লাব—নাম তার খামখেয়ালী সঙ্ঘ—খামখেয়ালীপনা যাদের অঙ্গের ভূষণ। রবীন্দ্রনাথ সে সঙ্ঘের নেতা। জোড়াসাঁকোয় সে সঙ্ঘের জন্ম।

খামখেয়ালী সঙ্ঘের নামকরণ শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের।

সরলা দেবী একদিন ওকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন রবীন্দ্রনাথের দরবারে। আলাপ করিয়ে দিলেন তাঁর সঙ্গে। প্রথম দর্শনেই প্রেম। এর আগে হয়ত রবীন্দ্রনাথের ছবি ও দেখেছে। এখন তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর স্নিগ্ধ কান্তি দেখে মুগ্ধ হল। সেদিন অতুলও ছিল সেই চায়ের আসরের নিমন্ত্রিত ব্যক্তি। রবীন্দ্রনাথও নিমন্ত্রিত। সুললিত কণ্ঠে স্বরচিত গান কবি শোনাচ্ছিলেন। বড় ভাল লাগছিল সেই সুমধুর সঙ্গীত। সঙ্গীত সমাপ্ত হলে ওর কে এক দুষ্টু বন্ধু সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথকে বললে, দেখুন, অতুল গান করে এবং নিজেও কিছু কিছু গান রচনা করে।

কী মুস্কিল!

ছেলেবেলায় গোপনে কবিতা লিখে দু-একটা গান রচনা করে নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু বা আত্মীয় ছাড়া আর কাউকে শোনায় নি। তারপর গানের খাতা ধরা পড়াতে কী লজ্জা! আর এখন লজ্জায় সঙ্কোচে পৃথিবী দ্বিধা হও ভাব।

অতুল প্রতিবাদ করে। কবি শোনেন না। বলেন, সে তো ভাল কথা; আপনি নিজের রচিত একটা গান করুন।

কী মুস্কিল!

মনে মনে ভাবে ও, ভারতের শ্রেষ্ঠতম গীতিকবি এবং একজন সুগায়কের সামনে ওর নিজের রচিত গান গাইতে হবে! যদি সুরে ভুল থাকে, কম্পিত হয় কণ্ঠস্বর, সুর তান ছন্দ হারিয়ে ফেলে!

রবীন্দ্রনাথ বুঝলেন যে ও বিব্রত হয়েছে। তিনি আশ্বাস দিলেন। ওর মনে সাহস দিলেন, পিঠ চাপড়ে বললেন, গান করুন অতুলবাবু, নিশ্চয়ই পারবেন।

সকলের সামনে সেদিন কম্পান্বিত কলেবরে কম্পিত কণ্ঠে গান গাইল, ওর মুখের উষ্ণ-রক্তিম ভাব কাটতে বেশ সময় লাগল। শিষ্টতার প্রতিমূর্তি রবীন্দ্রনাথ শান্ত হয়ে বসে শুনলেন গান। গান শেষ হলে বললেন, চমৎকার অতুলবাবু, আপনি বেশ গান করেন!

তখন ও ছিল ,আপনি' এবং 'অতুলবাবু', পরে হল 'তুমি' এবং 'অতুল'। ও ছিল খামখেয়ালী সভার সর্বকনিষ্ঠ সদস্য। সভ্য-সংখ্যা কম ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, মহারাজা জগদীন্দ্রনারায়ণ রায়, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকেন্দ্রনাথ পালিত। এঁরা সাহিত্যিক, সুরসিক, শিল্পী ; খাম-খেয়ালীর সদস্য-পদে। সভার কাজকর্ম একটু খামখেয়ালী ধরনের—নিয়মের কোন বাঁধাধরা নেই। উদ্দেশ্য হাস্যরসের উদ্দীপন করা, নানান সঙ্গীতের মাধ্যমে সভ্যদের চিত্ত আকৃষ্ট করা এবং সভাশেষে জঠরের তুষ্টি-সাধন। হাসির বন্যায় ভাসিয়ে হাসির গান গেয়ে খামখেয়ালীর মজলিশকে মশগুল করে রাখতেন দ্বিজেন্দ্রলাল। দ্বিজেন্দ্রলাল গানের এক পদ গেয়ে গান থামিয়ে মুচকি হাসি হাসেন, সভ্যেরা সঙ্গে-সঙ্গে কোরাস ধরেন। রবীন্দ্রনাথ কোরাসের নেতা। দ্বিজেন্দ্রলাল গান ধরেন, 'হতে পাল্লেম আমি একজন মস্ত বড় বীর !' আর রবীন্দ্রনাথ মাথা আন্দোলিত করে কোরাস ধরেন, 'তা বটেই তো, তা বটেই তো !' দ্বিজেন্দ্রলাল আবার গানে ডুব দেন, 'নন্দলাল একদা করিল ভীষণ পণ'। রবীন্দ্রনাথ দলবল সমেত গান ধরেন, 'বাহারে নন্দ বাহারে নন্দলাল।'
দ্বিজেন্দ্রলাল খামখেয়ালী সভ্যদের হাসির উদ্বেল তরঙ্গে যেন নৃত্য করান। রবীন্দ্রনাথ সূক্ষ্ম হাসির রসের ভয়ঙ্করী প্লাবনে মাতিয়ে তোলেন। খামখেয়ালী আসরে মাঝে-মাঝে রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর আবির্ভাব হয়। মাঝে-মাঝে অবন ঠাকুর তুলি রেখে এস্রাজ হাতে এসে উপস্থিত হন সভার মাঝে। সেদিন তাঁর হাতের জাদুস্পর্শে মুক্তি পায় জগতের বন্দী যত রাগরাগিণী। আপন-আপন রচনা পাঠ করেন অনেক সাহিত্যিক। কিন্তু বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা অপূর্ব, অতুলনীয়। যেমন সুপুরুষ, তেমন উদার কণ্ঠস্বর।
বলেন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথকে দেখে মাঝে মাঝে মনে হয়, ওঁদের মত সারা জীবনটা যদি সাহিত্যের চর্চায় মেতে থাকা যায়! শুধুই সাহিত্যচর্চা—বাগ্‌দেবীর আরাধনা—সাহিত্য আলোচনা ; আর কোন কাজ নয়, কোন চিন্তা নয়, কোর্টে পৌঁছে অনর্গল 'অনেক মিথ্যা ও সত্য বলে ধরে নিয়ে' মক্কেলের হয়ে অপর পক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া নয়।······জোড়াসাঁকোর দক্ষিণের বারান্দার এক কোণে একটুকরো জায়গার জন্যে লালায়িত মন।
খামখেয়ালীর অধিবেশন এক একজন সদস্যের বাড়িতে হয়। যাঁর বাড়িতে অধিবেশন বসে তাঁকে আগেই সকল সদস্যকে নিমন্ত্রণ করতে হয়। ভোজনের সুব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে রাখা চাই। সেবার বলেন্দ্রনাথের পালা—সৌন্দর্যের পূজারী বলেন্দ্রনাথ। কবির কবিতাপাঠ, অন্যান্যের রচনাপাঠ, সঙ্গীত, হাসির গান, খামখেয়ালী উৎসব সম্ভোগের পর স্বল্পভাষী বিনয়ী বলেন্দ্রনাথ ভোজনের জন্যে অন্য একটি ঘরে সকলকে নিয়ে উপস্থিত

হলেন। সে ঘরটি এমনভাবে ফুলপাতায় সুন্দরভাবে সজ্জিত ছিল যে মনে হয় বুঝি নন্দনের পুষ্পকুঞ্জে এলুম। মাঝখানে দেখি জলাশয়। মাঝে মাঝে দু-একটি বনস্পতি, জলে রাজহংস, জলপদ্ম, সরসীর তটের চারপাশে নবদুর্বাদল। সবই প্রকৃতির অনুকারী……হংস তরুলতা দুর্বাদল সবই কৃত্রিম। সেই কাঁচ-নির্মিত জলাধারের চার-পাশে বসবার আসন। প্রত্যেকটি আসনের সামনে নানাধরনের খাদ্যসম্ভার, তাতে বিচিত্র বর্ণবিন্যাস। আমরা যেই খেতে বসলাম অমনি কোন লুক্কায়িত জায়গা থেকে মৃদুমন্দ সানাই বাজতে লাগল। উচ্চ হাসি এবং সভ্যদের আহার্যকালীন মুখব্যাদান দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়ে হাসির মাত্রা আরো বাড়তে লাগল। আর বাক্যকুশলী, আলাপকুশলী হাস্যরসিক রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, জগদীন্দ্র রায়, অর্ধেন্দু মুস্তাফী সকলে এমন হাসতে শুরু করলেন, যে সেই আলোড়নে সুখাদ্য কোথায় তলিয়ে যায় বুঝতে পারা গেল না। রবীন্দ্রনাথ বললেন, এবারের খামখেয়ালীর আসর অতুল তোমার বাড়িতে বসবে স্থির হয়েছে। জ্ঞানী গুণীর পদধূলিতে ধন্য হবে এ-ঘর—তাই বাড়ি-ঘরদোর সাজানো হল। কোর্টকাছারি থেকে তাড়াতাড়ি ছুটি করে বাড়ি ফিরল অতুল! মান রাখতে হবে বৈকি, তার জন্যে দাম দিতেও হবে।—একাকী জীবনে মাঝে মাঝে বড় অসুবিধেয় পড়তে হয়। কতদিকে কত দৃষ্টি রাখা যায়! একাকী—নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ মনে হয়…একজন যদি সঙ্গী থাকত……

…মনে আছে যেদিন খামখেয়ালীর অধিবেশন হয় সেদিন কবি বাড়ি গেলেন রাত বারোটার পর। মহারাজা নাটোর গেলেন বাড়ি একটা-দুটোর সময়ে। আর দ্বিজেন্দ্রলাল আর আমরা কয়েকজন সারারাত কীর্তন শুনে আর তাঁর হাসির গান শুনে সময় কাটালাম। তার পরদিন প্রাতে হাস্যরাজকে অতুল বাড়ি পৌঁছে দেয়। মনে আছে তাঁর স্ত্রী বড়ই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর শিশুপুত্র মণ্টু (দিলীপকুমার রায়) বাবার কোলে উঠে ভাঙা-ভাঙা সুরে 'অ আ' করতে লাগল। দ্বিজেন্দ্রলাল বললেন, আমার পুত্রটি বোধহয় গাইতে পারবে, না? কী মনে হয়?*

* * *

বড়মামা কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত একদিন এলেন অতুলের বাড়িতে, সঙ্গে বড়মামীমা এবং কন্যা হেমকুসুম।

বড়মামা মামীমাকে দেখে অতুল তাড়াতাড়ি অফিস-ঘর থেকে বাইরে এসে অভ্যর্থনা জানাল।

বড়মামা বললেন, আমরা আর বসব না অতুল। এদিকে এসেছিলাম, তোমাকে আমরা একবার দেখতে এলাম।

---

* অতুলপ্রসাদ সেনের রচনা 'আমার কয়েকটি রবীন্দ্রস্মৃতি' থেকে।

মামীমা বললেন, তুমিও আর আমাদের বাড়ি যাও না অতুল।

বড়মামা বললেন, তুমি নাকি এখন সাহিত্যচর্চা করছ ? করছ কর, কিন্তু আপন কাজকে ভুলো না যেন। সময় নষ্ট কোরো না। মনে রেখ প্র্যাকটিস জমাতে হলে দিনরাত প্র্যাকটিসের কথা ভাবতে হবে—মন-প্রাণ দিয়ে ভাবতে হবে ; তবেই জীবনে দাঁড়াতে পারবে।

যাবার আগে হেমকুসুম বলে গেল, দু-একদিনের মধ্যে আমাদের বাড়ি এসো। আর ওর কথা শুনে মনটা যেন কেমন হল। ওর কথা হঠাৎ যখন মনে হয় কোন কাজের অবসরে তখন সব কাজে যেন কেমন ভুল হয়ে যায়। মক্কেলদের দলিল-দস্তাবেজে বৃথাই ঘুরে ফিরে মরে। সওয়াল ভুল হয়, প্রতিপক্ষের ব্যারিস্টার অ্যাডভোকেটরা উচ্চস্বরে হেসে ওঠেন। সিনিয়র এস. পি. সিংহ বলেন, মাই বয়, তোমার কী হয়েছে ? কাজে এত ভুল কেন ! তুমি তো এমন নও ?

বার লাইব্রেরিতে বসে আইনের মোটা-মোটা বই খুলে নোট নিতে নিতে হঠাৎ যেন আপনাকে কাজের ছোট গণ্ডিতে বাঁধা বলে মনে হয়। এই জটিলতা-কুটিলতাভরা জগতে নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। মুহূর্তে এ জীবন এ জীবিকা ত্যাগ করে ভেসে যেতে ইচ্ছে হয়।......তখনই মনে পড়ে সাহিত্যচক্রের কথা। রবীন্দ্রনাথের অনিন্দ্যসুন্দর স্নিগ্ধ কান্তি, বলেন্দ্রনাথের সুমিষ্ট সুমধুর কাব্যকণ্ঠ, দ্বিজেন্দ্রলালের সর্বদা হাস্যপূর্ণ মুখমণ্ডল। ..... হাইকোর্টের এই লাল দুর্ভেদ্য দুর্গ তখন অতুলের কাছে অসহ্য...তখন যদি.....

কর্মক্লান্ত অতুল সেদিন ফিরে চলে কোর্ট থেকে ঘরমুখো। অকস্মাৎ নববর্ষার প্রথম বৃষ্টি-ফোঁটা স্পর্শ দেয় শরীরে মনে। কেন জানি না ওর রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়ে যায়। সিক্ত শরীরে সটান পৌঁছে গেল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি।......বর্ষার প্রথম সায়াহ্নে কবি তাঁর একান্ত ঘনিষ্ঠ সহচর লোকেন পালিতের সঙ্গে একান্তে একখানি ছোট ঘরে বসে নববর্ষার রূপ দেখছিলেন এবং মাঝে মাঝে তন্ময় কবি তাঁর বর্ষার কবিতা আবৃত্তি করছিলেন আর গান গাইছিলেন। সখা লোকেন পালিত ইংরাজি, ফরাসী, ইউরোপীয় ভাষা থেকে সেই কবিতাগুলির সমভাবাপন্ন কবিতা আবৃত্তি করছিলেন।

কবি বললেন, 'এস অতুল, বোস এখানে—আমার পাশে। তুমি আসবে আমি ভেবেছিলাম। তোমার কথা ভাবছিলাম অনেকদিন।'

বর্ষাকাল জুড়ে চলল সেই বর্ষামঙ্গল আসর। কবি বলতেন, তুমি এসো দ্বিপ্রহরের পরে। লোকেন্দ্র পালিত বলতেন, জগতের কোন ভাষায় রবীন্দ্রনাথের বর্ষার কবিতা ও বর্ষা-সঙ্গীতের তুলনা নেই।

আট

আমি যখন তোমার বাড়ি আসব, তুমি তখন কাজ করতে পারবে না, বুঝলে······রেখে দাও তোমার দলিল-দস্তাবেজ ফাইল-কাগজপত্রগুলো। আমার দিকে চোখ তুলে তাকাও······আমার সঙ্গে গল্প কর।

কিন্তু হেম, তুমি জান না তুমি কী ক্ষতি করছ আমার! তোমার জন্যে আমার······ কথাটা বুঝি শেষ করতে পারে না অতুল।

সময়-অসময় নেই, হেমকুসুম ওর সারকুলার রোডের বাড়িতে এসে ওর সমস্ত কাজকে গোলমাল করে দেয়। বাইরের লোকজন মানে না। ওর জন্যে ভদ্রতা রাখা বুঝি দায় হয়ে পড়ে। অফিসে এসে ওর টেবিলের অপর দিকের চেয়ারে বসে। পরক্ষণেই চেয়ার ঠেলে দাঁড়িয়ে ওঠে। চারিদিকে ঘুরে তাকিয়ে বলে—তোমার অফিস-ঘর কী অপরিষ্কার······ওইজন্যেই তো কোন ক্লায়েণ্ট আসে না তোমার কাছে! পরিষ্কার করতে পার না ঘরদোর? পয়সা নেই? না কি, পয়সার দিকে মন নেই? তবে কোন্ দিকে মন? বলে হেসে ওঠে।

কোন-কোনদিন অফিস-ঘরে এসে তাক পরিষ্কার করে, বইপত্তর গুছিয়ে, টেবিলের অনেক কাগজ বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে, ফুলদানিতে ফুল রেখে বলে—দেখ এবার······তারপর হেসে বলে, বল কী! ফুল ভালবাসো না তুমি!

কোনদিন বা অফিস-ঘরে এসে কোন কথা না বলে যায় রান্নাঘরে। স্টোভ জ্বালিয়ে গরম জলের কেটলি চড়িয়ে হাঁক দেয়—চিনি কোথায়? উঃ কী তেষ্টা পেয়েছে!

তারপর গরম চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ওর টেবিলে ঠকাস করে নামিয়ে রেখে বলে, চা খাও। পরমুহূর্তেই বলে, চা খাচ্ছ, কিন্তু বেশি খেও না, শরীর খারাপ হবে—তোমার জন্যে আমার বড় ভাবনা!

যদিও প্রায়-দিন হেমকুসুম এসে পৌঁছতে পারে না সারকুলার রোডের বাড়িতে, তবু মুহূর্তগুলি ওর প্রত্যাশাতে পূর্ণ থাকে নানা কাজের মাঝে। হেমকুসুমের কথা মনে হয়।······মনে হয় এই মুহূর্তে হেম হয়ত ওর কথা ভাবছে, তা না হলে হেমের কথা এত মনে পড়ে কেন! মন বলে এক্ষুনি ছুটে চলে যাই একবার দেখে আসি তাকে, অসুখ-বিসুখ করেনি তো! দুশ্চিন্তা কেন যে মনের সামনে এসে দাঁড়ায় ও বুঝতে পারে না।

মা আসেন রোজ সকালে। আপন বাড়ির কাজ সেরে ছেলের বাড়ি দেখাশোনা করতে। ছেলের নিঃসঙ্গ জীবন মাকে সকল সময়ে বড় ব্যথিত করে। মা বলেন, বাবা, তুই এবার একটা বিয়ে-থা করে সংসারী হ।

ও বলে, না মা, এখন আমি বিয়েতে মত দিতে পারব না। আমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে দাও।

হেসে মামীমারা বলেন, বল তোমার কী রকম মেয়ে পছন্দ। না কি তুমি নিজে পছন্দ করে বিয়ে করবে?

ও কিছু বলে না, হাসে।······ও জানে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সকলের সঙ্গে হয়ত একদিন ওর বিচ্ছেদ নেমে আসতে পারে। ও বুঝতে পারে ওকে প্রচণ্ড বাধার বিরুদ্ধে একা দাঁড়াতে হবে; কারণ বিয়ে যে ও করবে না একথা ঠিক নয়—ও আপন মনোনীত মেয়েকে বিয়ে করবে এবং ও স্থির নিশ্চিত যে, ওদের এই বিবাহে ওর কোন আত্মীয়-স্বজন সম্মতি দেবে না। কিন্তু ও সঙ্কল্পে দৃঢ়। অতুলের মানসী প্রতিমা যে ওর মামাতো বোন হেমকুসুম!

কলকাতায় ব্যারিস্টারিতে প্র্যাকটিস জমে না। এখানে প্র্যাকটিস করেন রথী-মহারথীরা। দেওয়ানীতে রাসবিহারী ঘোষ, তারক পালিত, বিনোদ মিত্র, সত্যপ্রসন্ন সিংহ; ফৌজদারিতে অনেক ইংরেজ ব্যারিস্টার—যেমন নর্টন সাহেব, বাঙালী ব্যোমকেশ চক্রবর্তী। এর মাঝে নতুন ব্যারিস্টার অতুলপ্রসাদের জায়গা কোথায়! চিত্তরঞ্জন তখন কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টার রূপে নাম লিখিয়েছেন।···এস. পি. সিংহ এবং আরও কে কে যেন পরামর্শ দিলেন, রংপুরে গিয়ে প্র্যাকটিস করুন। প্র্যাকটিস জমবে।

মনটাও হঠাৎ ভীষণ খারাপ হয়ে গেল যিনি ওদের এত সাহায্য করতেন অর্থ দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে সাহস দিয়ে, তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে। দুর্গামোহনবাবুর মৃত্যুতে ওর প্রাণে শেল বাজল।* এখন থেকে সমস্ত সংসারটাই ওর কাঁধে এসে পড়ল।

সংসার আর চলে না। রংপুরে প্র্যাকটিসের কথাটা মনে পড়ল······রংপুর বড় শহর, তবে, কলকাতার মত বড় নয়। এবং প্রতিযোগিতাও সেখানে কম নিশ্চয়ই। রংপুরে প্র্যাকটিস করলে ফলাফল নিশ্চয়ই ভাল হবে। কথাটা মনঃপূত হল। সঙ্গে-সঙ্গেই মন খারাপ হয়ে গেল। কলকাতা ছেড়ে গেলেই কলকাতার বা বাংলার সাহিত্য জগৎ থেকে দূরে সরে যেতে হবে। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথের অমূল্য সঙ্গ থেকে সে বঞ্চিত হবে। খামখেয়ালী সঙ্ঘের সকল সভ্যদের মন থেকে সে মুছে যাবে।··· যদিও মন ক্ষণিকের জন্য বিষণ্ণ এবং বিচলিত হয়, কিন্তু জীবিকার তাগিদে রংপুর

* দুর্গামোহনবাবুর মৃত্যু হয় ১৯শে ডিসেম্বর ১৮৯৭

যাওয়ার সঙ্কল্প ছেড়ে দেয় না। শুভদিন দেখে রংপুর যাত্রা করে। এবং উৎসাহের সঙ্গে রংপুরে কিছুদিন প্র্যাকটিস শুরু করে। কিন্তু সেখানেও ব্যর্থতা। প্র্যাকটিস জমে না। কিছু মাস পরে অতুল রংপুরে প্র্যাকটিস করা ছেড়ে দিয়ে আবার ফিরে চলে এল কলকাতায়। কলকাতায় এসে শান্তি—কলকাতায় সঙ্গীত···সাহিত্য···সাহিত্যিক বন্ধু···রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, খামখেয়ালী সঙ্ঘ···এবং প্রস্ফুটিত প্রেমের কলি······।

এদিকে হেমকুসুম ও অতুলের প্রেমের সম্পর্ক আর আত্মীয়দের কাছে অজানা রইল না। আত্মীয়দের অনেকে উপদেশ দিলেন, অনেকে তিরস্কার করলেন। অতুল, হেমকুসুম, তোমাদের জন্যে আমাদের সমস্ত পরিবারের মুখ দেখানো দায়!

মা নীরবে চোখের জল ফেললেন।

তুমি জান অতুল, তোমার এ বিবাহে আত্মীয়দের মধ্যে বিচ্ছেদ আসবে, সম্পর্ক তিক্ত হবে। মামাতো বোনকে বিয়ের ইচ্ছে ত্যাগ কর বাবা। এ অসিদ্ধ,—আমাদের সমাজ রীতিনীতির বাইরে:

কিন্তু হেমকুসুমের সঙ্গে বিবাহ না হলে কোনদিনই আমি বিবাহ করব না। একথা জেনো। আর রীতিনীতি, সমাজ—সমাজ আমরা অনেকেই মানি না। আমরাই হাতে গড়ি, আমরাই ভাঙি।

অতুল!

ক্ষমা কর মা!

ওদিকে হেমকুসুম তার মাকে বললে, অতুলকে ছাড়া আর কাউকে বিবাহ করতে সে রাজি নয়। বিরক্ত হলেন মামা মামীমা, মেয়ে এবং ভাগনের ব্যবহারে। কিন্তু মেয়ে বড় হয়েছে, রাগের মাথায় কিছু একটা ঘটে যাওয়া—যেমন আত্মঘাতী হওয়া—হেমকুসুমের পক্ষে বিচিত্র নয়। এমনিতেই হেমকুসুম বড় অভিমানিনী, একগুঁয়ে, জেদী প্রকৃতির মেয়ে। তাকে ভয় হয়। অনেক ভেবে চিন্তে বড়মামা জানালেন, বেশ, তোমরা সাবালক হয়েছ, বিয়ে করতে চাও কর। তবে কিন্তু জেনে রেখ, এদেশে তোমাদের বিবাহ হবে না। এ দেশের আইনে তোমাদের বিবাহ হতে পারে না।

অতুল হেমকে জানালো, আমাদের বিয়ে যদি এদেশের আইনে না মানে তবে বিদেশের আইনে মানবে। ওখানে আমাদের বিয়ের কোন বাধা নেই। আমরা বিয়ের জন্যে বিদেশে পাড়ি দেব।

কয়েক মাস পরে স্যর কে. জি. গুপ্ত অফিসের কাজে লণ্ডন চলে গেলেন।······যা কিছু জমানো টাকা আর কিছু ধার-দেনা করে কিছুমাত্র দেরি না করে কলকাতা থেকে এক রাত্রে অতুল হেমকে নিয়ে বোম্বাই রওয়ানা হয়ে গেল।

বোম্বাই থেকে জাহাজ-যোগে স্কটল্যাণ্ড। সেখানে অনাড়ম্বরে দুজনের বিবাহ হল। সুইটজারল্যাণ্ডে হল হনিমুন। সুইটজারল্যাণ্ড থেকে লণ্ডনের পথে পা বাড়ালো অতুল হেম।

সে বছরটা উনিশশো এক।

লণ্ডনে পৌছে অতুল হেমকুসুমকে বলল, আজ আমাদের নিজেদের সত্যি একাকী মনে হচ্ছে……আমরা আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব পরিত্যক্ত, সমাজ আমাদের দূরে ঠেলে দিয়েছে। বিবাহের জন্যে দূর প্রবাসে আমাদের ছুটে আসতে হল হেম। দেশে বিবাহ হলে তোমার বিবাহে উৎসবের ঘটা হত……আলোর রোশনি, বাজির ঝলকানিতে আকাশ হাসত। এখানে আমরা এখন একেবারে নিঃস্ব।

কে বলে আমরা নিঃস্ব ?

জান হেম, আমি স্থির করেছি আমরা আর দেশে ফিরব না……হেম, দেশ আমাদের কোলে স্থান দেয়নি ; দেশের মানুষ আমাদের অবজ্ঞা করেছে। দেশের জন্যে এই দূর বিদেশে বসে মন কেঁদে উঠলেও ভাবতে হবে, এই দেশই আমাদের আশ্রয়দাতা। আমাদের কর্মভূমি হবে এই দেশ, এবং আমাদের অন্নভূমিও। আমি আমার কর্মভূমি হিসেবে ইংল্যাণ্ডকেই মনোনীত করলাম। আমি এখানেই ব্যারিস্টারি করব হেমকুসুম—এই ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে।

হেম বলে, সেই ভাল।

ব্রেকফাস্ট সেরে অনেক উৎসাহের সঙ্গে রোজ সকালে নতুন কর্মক্ষেত্রে ছোটে অতুল। কিন্তু বারে-বারে ব্যর্থ হয়। কলকাতা হাইকোর্টে, রংপুরে আর এখন লণ্ডনের ওল্ড বেলীতে সেই একই ইতিহাস। সারাদিন-শেষে কর্মহীন ক্লান্তি মেখে যখন ও বাড়ি ফেরে তখন দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে হেমকুসুম। হেমকুসুমের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারে না ও। কেমন যেন লজ্জা করে। মাঝে মাঝে জগৎটার ওপর প্রচণ্ড আক্রোশ এসে জমা হয়। মাঝে মাঝে বুঝি নিজের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। হেমকুসুম উৎসাহ দেয় তখন। বলে, তুমি একদিন আপন আসন নিজেই করে নিতে পারবে দেখো। আমাদের এর মধ্যেই নিজেদের চালিয়ে নিতে হবে……আমি চালিয়ে নেব দেখো। সুদিন আমাদের আসবে।

লণ্ডনে শীত পড়তে শুরু হয়। গাছের পাতা ধীরে ধীরে ঝরে কঙ্কালসার রূপ নেয়। কুয়াসায় পথঘাট ছেয়ে যায়। ঝিরঝিরে বরফ পড়ে পড়ে রাস্তাঘাট ঘরবাড়ি ঢেকে দেয়। বর্শার ফলার মত ঠাণ্ডা হাওয়া এসে গায়ে বিঁধে জ্বালা ধরায়। রোদের মুখ দেখা যায় না। মেঘলা মনমরা ঠাণ্ডা দিনরাত। জ্বালানির অভাব। যথেষ্ট গরম জামাকাপড়ের অভাব। আর বুঝি দিন চলে না।

একদিন বাড়িওয়ালা এসে অতুলকে শুনিয়ে দিয়ে গেল বাড়ি ভাড়া বাকি পড়েছে, শীঘ্র মিটিয়ে দাও না হলে অন্য কোথাও বাড়ি দেখে-শুনে নাও। দিন চলাই মুস্কিল হয়ে ওঠে। কোন-কোনদিন সকালে মোড়ের মাথার দোকান থেকে সসেজ-সব্জি মাংস কিনে এনে হেমকুসুমের কাছে নামিয়ে দিয়ে বলে, কয়েকদিন কষ্ট করে চালিয়ে নাও হেম।······কোন-কোনদিন হাতে কিছু পাউণ্ড-শিলিং এলে মনমেজাজ শরীফ হয়ে ওঠে। অতুল বলে, আজ বাড়িতে রান্নার প্রয়োজন নেই হেম, চল রেস্তোরাঁয় ডিনার খাওয়া যাক। দিলদরিয়া মেজাজ বলে এত অভাব-অভাব ভালো লাগে না। ···চল হেম আজ আমরা নাটক দেখে আসি···ক্ল্যাসিকাল গান শুনে আসি···চমৎকার লাগে আমার ওয়েস্টার্ন মিউজিক। আমার গানের সুরে কিছু কিছু এদেশের সুরের ছোঁয়া আছে, জান!

হেমকুসুম বলে, তুমি তো অনেকদিন কোন গান রচনা করো নি গো।

হবে, হবে, সব হবে। উল্লসিত অতুল। উচ্চহাস্য করে। উচ্চহাস্যে দুঃখ বেদনা সব ঝরে পড়ুক।

মাঝে মাঝে বড় বিষণ্ণ মনে হয় অতুলের। বলে, হেম, দেশ থেকে কেউ কোন চিঠি লিখে আমাদের খবর নিলে না। আমার আত্মীয়-স্বজনেরা না হয় আমাকে ভুলেছেন কিন্তু আমার বন্ধু-বান্ধবরাও কেন চিঠি লিখল না? সকলে কি আমাদের মন থেকে মুছে ফেলল?···আমি একা থাকতে কোনদিনই ভালোবাসতাম না—আমি চিরকালই ভেবেছি আমি থাকব আমার বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সকলের সঙ্গে।

হেম বলে, যাঁরা আমাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে ইচ্ছা করেন না তাঁদের সঙ্গে আমরাও কোন সম্পর্ক রাখব না।* আমরা বেশ আছি। প্রয়োজন হলে আমরা চিরকাল একলা বাস করব।

ছিঃ হেম, অমন কথা মনে রেখো না, মনে এনো না কখ্‌খনো। সামান্য কথার রেশ ধরে অতুল ও হেম দুজনের মনে অশান্তির বীজ দেখা দেয়। দুজনের কারো শান্তি থাকে না মনে, কারণে-অকারণে মনোমালিন্য ঘটে যায়।

হেম বলে, কাকে চিঠি লিখছ শুনি!

অতুল বলে, মাকে। মায়ের জন্যে বড় চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে। মা এবং বোনদের কথা

* অতুলপ্রসাদ সকল সময়ে আত্মীয়-পরিজন সহ থাকিতে ভালোবাসিতেন। যে সকল আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব তাঁহাদের প্রতিবন্ধক স্বরূপ দাঁড়াইয়াছিলেন হেমকুসুম (অতুলপ্রসাদ সেনের স্ত্রী) তাঁহাদের কারো সাথে সম্পর্ক রাখিতে চাহিতেন না। পরবর্তীকালে স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ এই কারণেই ঘটে।' (শ্রীসত্যপ্রসাদ সেনের ডায়েরি থেকে)

মনে পড়ছে বড় আজ। কতদিন……কতদিন ওঁদের দেখিনি জান! বড় দেখতে ইচ্ছে করে। কিভাবে যে ওঁদের দিন চলছে কে জানে! আমি তো চলে এলাম……

বিরক্তিভরা গলায় হেম বলে, তোমার মাকে বুঝি তুমি খুব ভালবাস? তোমার মা এবং বোনেরা তোমায় বিয়ের পর কেমন ভালোবাসেন আমি দেখে নিয়েছি। তুমি চিঠি লিখছ! কিন্তু ওঁরা তো তোমাকে কোনদিন চিঠি লিখেছেন বলে মনে পড়ে না!

অতুল চুপ করে থাকে। কখনও উত্তেজিত হয়ে পায়চারি করে ঘরময়। মুখে বিরক্তির রেখা ফোটে। কখনও ক্লান্ত হয়ে অবসন্ন বোধ করে। বিরক্তির রেখাগুলি সময়ের স্রোতে অন্তর্ধান করে। অতুল বলে, সত্যি হেম, তোমাকে সুখে রাখতে পারলাম না। তোমাকে বিয়ে করে কেবল কষ্ট দিলাম। একটুকুর জন্যেও সুখে রাখতে পারলাম না—অভাব, অর্থকষ্ট, অনটন আমাদের চিরসঙ্গী হয়ে রইল। ব্যারিস্টারিতে এখানেও ভালোভাবে বসতে পারলাম না। হেরে গেলাম হেম।

হেমকুসুম আশ্বাস দেয়।

কোর্ট থেকে কোন-কোন দিন ফিরে জামা কাপড় না বদলে ইজিচেয়ারে ক্লান্তভাবে শুয়ে থাকে অতুল। হেমকুসুমের প্রশ্নের উত্তরে বলে, শরীর ও মন কোনটাই ভাল লাগে না……

হেম বলে, কিছু হল না বুঝি!

কিছু না, কিছু না গো।

এক সময় উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে ওঠে ও। মুষ্টিবদ্ধ দুহাত পিছনে রেখে ঘরময় ঘুরে বেড়ায়। কখনও ফায়ার-প্লেসের সামনে এসে দাঁড়ায়। উত্তপ্ত আগুনের লাল আভায় ওর মুখখানা রক্তাভ মনে হয়। নিস্ফল দুখানি হাত ছোঁড়ে, চুল ছেঁড়ে। হেমকুসুমের পাশে এসে দাঁড়ায়। বলে, হেম, তুমি শীতে কষ্ট পাও। ঘুম ভেঙে আমি দেখেছি তুমি অনেক দিন বিছানায় উঠে বসে আছ।……তোমার কষ্ট আমি বুঝতে পারি……আজ কোর্ট থেকে ফিরে সোজা উপস্থিত হয়েছিলাম একটা পোশাকের দোকানে, ইচ্ছে ছিল তোমার জন্যে একখানা গরম ওভারকোট আর একটা পালকের লেপ কিনে আনব। ……কিন্তু আমি কিনে আনতে পারলাম না, ওভারকোট কেনার মত টাকা আমার নেই।

হেম ওকে ধীরে ধীরে ডাকে,—শোন…একটা কথা আছে…কাছে এস লক্ষ্মীটি… আমার এখানে বস—এখানে এস…তোমাকে যে কথা বলব ভাবছিলাম…যে কথাটা বলা হয়নি; কিন্তু বলতে লজ্জা করে। আমি কেন বিছানায় উঠে বসি, জান? আমার…

কী হয়েছে হেম…তুমি কি অসুস্থ, বল, তুমি কি অসুস্থ?

হেম মিষ্টি হাসি হাসে।

হেম, কী হয়েছে? আমায় বল, আমায় বল।

হেমকুসুম অকস্মাৎ ওর চোখে যেন অন্য রূপে ধরা দিল। হেমকুসুমের আঁখিদুটি যেন বড় ক্লান্ত মনে হয়। ক্লান্তি যেন সারা শরীরে ছড়িয়ে। রুক্ষতার বান অঙ্গে; তবু যেন কেমন খুশির আভা ওর মুখখানিতে।

হেমকুসুমের মিষ্টি-হাসি মুখখানিতে চেয়ে ও বলে, তাহলে তো তোমার শরীরের খুব যত্ন করা উচিত। তোমাকে নিয়ম করে চলতে হবে।

আবার উৎসাহ ফিরে আসে কাজে। দ্বিগুণ উৎসাহ উদ্যম মনে এনে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজের মধ্যে। হেমকুসুমকে নিয়ে লণ্ডনের হাসপাতালে যাতায়াত চলে। হাসপাতালে হেমকুসুমের যমজ সন্তান প্রসব হয়। বিদেশী বন্ধুরা এসে 'উইশ' করে গেলেন। প্রবাসী দেশী বন্ধুরা বললেন, মিষ্টি খাওয়ান। একসঙ্গে দুই পুত্রের গর্বিত পিতা অতুল-প্রসাদ সেন।

স্বামী-স্ত্রী দুজনে দুজনের চোখে তাকিয়ে হাসে। অতুল বলে, এদের নাম দেওয়া দরকার। কী নাম দিই বল তো! একজনের গলায় হার পরিয়ে দাও, একজনের গলা শূন্য রাখ। দুজনকে চিনতে পারবে তো! দুজনেই যে এক দেখতে!

হেম বলে, তুমি এদের একটা নাম বল।

স্বামী বললে, একজনের নাম দাও দিলীপ—পুরো নাম দিলীপকুমার সেন……অন্যজনের কি নাম দেব বলতো?

হেম মিল রেখে বললে, নিলীপ—পুরো নাম নিলীপকুমার সেন। মিল রেখে নাম দিয়ে দিলুম। কেমন নাম বল।

স্বামী বললে, নিলীপ মানে কী?

স্ত্রী বললে, তুমি কবিতা লেখ, এত মানে জিজ্ঞেস করছ কেন? মানে নেই?

স্বামী বললে, চমৎকার! চল একদিন এদের একটা ছবি তুলে নিয়ে আসি।

অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয়। পুত্রদ্বয়ের সৌভাগ্যে সৌভাগ্য সূচিত করে বুঝি। কিন্তু আবার অবনতি—আর্থিক অবনতি, মানসিক বিচ্যুতি, ছোটখাট ঘটনা থেকে অশান্তি স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে।

এদেশ আমার আর ভাল লাগে না—দেশ ছেড়ে এই বিদেশে। বাঙলা দেশ আমাকে ডাক পাঠাচ্ছে। বাঙলা দেশের সাহিত্যিক বন্ধুদের জন্যে আমার মন কেমন করে থেকে থেকে। আমি ওদের ডাক শুনেছি, আমায় যেতে হবে। আমায় যেতে হবে সেখানে আমার শস্যশ্যামলা মাতৃভূমিতে আমার সেই যে সেই সোনার বাংলায়; আমার কেউ বেঁধে রাখতে পারবে না আর।

যমজ পুত্রের একজন নিলীপ মারা গেল দুদিনের জ্বরে ভুগে। মাত্র ছটি মাস আয়ু সঙ্গে নিয়ে সে এসেছিল এই পৃথিবীতে। মন ভেঙে গেল স্বামী স্ত্রীর। আর এখানে থাকা যায় না। হেমকুসুম বলে, চল আমরা ফিরে যাই দেশে।
ওল্ড বেলী থেকে সেদিন ফিরে এলেন অতুলপ্রসাদ। বললেন, শোন হেমকুসুম, মনস্থির করেছি আমরা এবার দেশে ফিরে যাব। তবে, কলকাতায় ফিরব না। রংপুরেও নয়—বাংলাদেশে কোথাও নয়। ভারতবর্ষে ফিরে যুক্তপ্রদেশের রাজধানী লখনউ শহরে আমরা বাসা বাঁধব। নবাব-শহর লখনউ শহরে আমি ব্যারিস্টারি শুরু করব নতুন করে। আমার বন্ধু লখনউয়ের বিশিষ্ট এক তালুকদার আমাকে আহ্বান দিয়েছেন। মনে হয় ওখানে আমার পসার জমবে। আমায় ঠিকানা দিয়েছেন এক খ্যাতনামা বিশিষ্ট বাঙালী অ্যাডভোকেট মহাশয় যাঁর নাম বিপিনবিহারী বসু। তিনি আমাকে কথা দিয়েছেন সাহায্য করবেন।······চিঠি-লেখালেখি হয়েছে তাঁদের সঙ্গে। আমাকে আশ্বাস দিয়ে ডাক পাঠিয়েছেন। এখন প্যাসেজ পেয়ে গেলে, টাকা জোগাড় হয়ে গেলে যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে যাব আমরা ভারতবর্ষে।

নয়

চিঠি-লেখালেখির পাট শেষ হয়েছিল। ডিসেম্বর ১৯০২ সন কি ১৯০৩-এর জানুয়ারি। অতুলপ্রসাদের লখনউ প্রবাসের দিন এগিয়ে এল। বিপিনবিহারী নিজের বড় ছেলে সনৎকুমারকে অফিসগাড়ি নিয়ে ইস্টিশানে আনতে পাঠালেন। গাড়ি এসে ঝাউলাল পুলের বাড়িতে পৌছল। বিপিনবিহারী নিজের দপ্তরখানা থেকে বেরিয়ে এসে অতুলপ্রসাদকে সাদর আহ্বান জানালেন। নিজের বড় মেয়ে প্রভাকে বললেন, বৌমাকে তুমি বাড়ির ভিতরে নিয়ে যাও। তোমার মায়ের কাছে।
প্রভারই বয়সী হেমকুসুম—অতুলপ্রসাদের স্ত্রী,—সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী, সুন্দরী। বিপিনবিহারীর স্ত্রী শরৎবালার প্রথম দৃষ্টিতেই ভাল লাগল। বিপিনবিহারী অতুলপ্রসাদকে আপন গেস্ট-রুমে থাকার বন্দোবস্ত করে দিলেন। শরৎবালার মনঃপূত হল না। বললেন, এরা তো আমার ছেলে বৌয়ের মত; আমার বাড়িতেই থাকুক। তুমি বরং তোমার ঘর ছেড়ে দাও।
বিপিনবিহারী হাসলেন।
ঘরের অভাব ছিল না। বাগানের ধারেই ইউক্যালিপ্‌টাস বীথি, সামনে সুসজ্জিত ঘরখানি। সেইখানেই তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন। এদিকে কেশরবাগের

বাড়িখানি ভাড়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। রংচংয়ের কাজ শেষ হয়েছিল। অতুলপ্রসাদের জন্যে ওয়াজিদ হোসেনকে বলে সমস্ত আসবাবপত্র তার দোকান থেকে আনিয়ে দিলেন। ড্রইংরুম সেট, বেডরুমের জন্তে খাট-পালঙ, অফিসঘরের টেবিল-চেয়ার আলমারি প্রভৃতি কোন কিছুরই ত্রুটি রাখলেন না। অতুলপ্রসাদকে কাছারিতে নিয়ে গিয়ে জুডিশিয়াল কমিশনার সাহেবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। পরিচয় করিয়ে দিলেন জজ-সাহেবদের সঙ্গেও।

বিপিনবিহারী লখনউ বার অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান। কিছুদিনের মধ্যেই অতুল-প্রসাদকে তিনি এখানকার সভ্য করে দিলেন। বিপিনবিহারী অতুলপ্রসাদকে সকল বিষয়ে পরামর্শ দিলেন। একদিন বললেন, যদিও আপনি এখানে হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করতে আরম্ভ করেছেন, আপনাকে নিচের আদালতের দলিলপত্র বিষয়ে জানতে হবে। এখানে নিচের আদালতের বেশির ভাগ কাজ-কর্মই উর্দু ভাষাতে হয়। আপনার উর্দু শেখার খুবই প্রয়োজন। উর্দু না জানলে এখানকার কাজ-কর্মে আপনার খুব অসুবিধে হবে। আপনাকে আমি একজন মৌলভী ঠিক করে দেব। তিনি আপনাকে উর্দু শেখাবেন। আমার মুন্সিজীকে (মুহুরি) বলব আপনার জন্যে একজন হুঁসিয়ার মুন্সি দেখে দেবে।

বিপিনবিহারী আবার বললেন, আপনার কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে কিছু জানা প্রয়োজন। আপনি বাস করছেন এখন সংযুক্ত প্রদেশের রাজধানী লখনউ শহরে। সংযুক্ত প্রদেশ হয়েছে অযোধ্যা এবং আগ্রা এই দুটি প্রদেশকে যুক্ত করে। আউধ বা অযোধ্যা রাজ্য যা নবাব ওয়াজিদ আলি শাকে রাজ্যচ্যুত করে ইংরেজ দখল করেছিল তার নামই নন-রেগুলেটেড প্রদেশ বলে ধরা হল। এর অধীনে নটি জেলা। রাজধানী লখনউ। অন্য ভাগে আগ্রা প্রদেশ, এর অধীনে কুড়ি-বাইশটি জেলা, রাজধানী এলাহাবাদ। এই প্রদেশে একজন করে লেফটেন্যান্ট গভর্নর শাসনকার্য করেন। আগ্রা প্রদেশের জেলা-শাসকদের বলা হয় ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাণ্ড কালেকটর। আউধের জেলা-শাসকদের বলা হয় কমিশনার। আগ্রা প্রদেশের সর্বোচ্চ বিচারালয় এলাহাবাদ হাই কোর্ট। আর আউধের সর্বোচ্চ বিচারালয়ের নাম জুডিশিয়াল কমিশনার্স কোর্ট। কোর্টের বিচারের শেষ আপিল হয় লণ্ডনের প্রিভি কাউন্সিলে। জুডিশিয়াল কমিশনার্স কোর্টকে চীফ কোর্ট করা হয়, সেইজন্যে জজের সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। যুক্তপ্রদেশের গভর্নররা এলাহাবাদ ও লখনউতে ভাগাভাগি করে থাকেন; গরম কালে নৈনিতাল যান। আউধ যদিও ছোট প্রদেশ তবু এখানকার জমিদারদের প্রবল প্রতাপ। এঁদের বলা হয় তালুকদার বা Barons of Oudh। এঁরা ইংরেজের সৃষ্টি। এখানকার যেসব জমিদারেরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে সেপাই-বিদ্রোহের সময় লড়াই করেছিলেন তাঁদের জমিদারি কেড়ে নিয়ে যারা

ইংরেজকে সাহায্য করেছিল ইংরেজরা তাদের মধ্যে বিতরণ করেছিল। এদের মধ্যে একটা বিলিতি আইনও প্রচলন করা হয় যাতে বংশের একমাত্র বড় ছেলেই জমিদারির উত্তরাধিকারী হবে। অন্য ছেলেরা বাবুয়ানা বা খোরপোশের জন্যে কিছু জমি ও কিছু টাকাকড়ি পাবে। এইসব জমিদার, তালুকদার ও নানান শরিকদের মধ্যে প্রায়ই হাঙ্গামা লেগে যায়। লখনউতে মামলা মোকর্দমার বিরতি নেই। লখনউ কাছারি সবসময়েই সরগরম।

বিপিনবিহারী বললেন অতুলপ্রসাদকে এখানে আপনার ব্যারিস্টারি জমবে না তো কোথায় জমবে! আপনি জানেন, আমি লখনউ আসি ১৮৮৫তে, ঠিক আপনারই মত অবস্থাতে। আর আজ ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাস। আমাকে তো আপনি দেখছেন। আপনিও এখানে সার্থক হবেন অতুলবাবু।

বিপিনবাবু তাঁর বন্ধু ও সহকর্মী বড়-বড় উকিল ব্যারিস্টার,—স্যর ওয়াজির হোসেন, লালা শ্রীরাম, মহম্মদ নাসিম তাঁদের সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন,—ব্যারিস্টার মিঃ এ. পি. সেন আমার স্নেহভাজন, পুত্রের মতন। এখন আমার সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করবেন। আপনারা মিঃ সেনের জন্যে একটু ভাববেন।

ওঁরা বললেন, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!

মহম্মদ নাসিম বললেন, আপনার শরীর খুউব অসুস্থ বলে মনে হচ্ছে যেন বিপিনবাবু।

শরীরটা ভালো নেই নাসিম কিছুদিন থেকে।

আপনি খুউব বেশি পরিশ্রম করেন বিপিনবাবু।

বিপিনবিহারী ক্লান্ত হাসি হাসেন।

আপনি এই লখনউ শহরে কবে এসেছেন বিপিনবাবু? অতুলপ্রসাদ বললেন।

অনেক দিন। জীবনটাই কাটিয়ে দিলাম এই সংযুক্ত প্রদেশে। আমার পৈত্রিক ভূমি বাংলা দেশের কোন্নগরে। বাবা মারা যাওয়ার পর জ্ঞাতিদের অসৎ ব্যবহারে মা আমাকে সঙ্গে নিয়ে বারাসতের বাদুর গ্রামে যান। বারাসত থেকে এনট্র্যান্স পাশ করি। তারপর বাংলাদেশ ছেড়ে মাকে সঙ্গে নিয়ে চলে আসি কানপুরে মাসির বাড়ি। মাসির বাড়িতে থেকে টিউশানি করে বি-এ পাশ করলাম, তারপর মীরাট কলেজে চাকরি নিলাম। মীরাট কলেজে থাকাকালীন বাংলাদেশে গিয়ে কুমারটুলির মহেন্দ্রনাথ ঘোষের মেয়েকে বিয়ে করলাম। তারপর এম.এ. পরীক্ষা দেব; তার জন্যে সুবিধে হবে ভেবে মীরাট কলেজ ছেড়ে দিয়ে এলাহাবাদের সরকারি বিদ্যালয়ে যোগ দিলাম। এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি তখনও স্থাপিত হয় নি। কলকাতা ইউনিভার্সিটির অধীন ছিল এলাহাবাদের মেয়র কলেজ। এম. এ-তে সেবার আমি ভাগ্যক্রমে ফার্স্ট হয়ে গেলাম অতুলবাবু, আর সঙ্গে-সঙ্গে ল-টা পড়ে নিলাম। এলাহাবাদে আমার ঘনিষ্ঠ

বন্ধু ছিল ডাঃ রামলাল চক্রবর্তী। হাসপাতালে কি একটা ভুলের জন্যে রামলাল চক্রবর্তীকে লখনউ শহরের সরকারি সার্জেন রূপে বদলি করে দেওয়া হল। আমি তখন এদিকে ওদিকে ইংরিজি কাগজপত্রে প্রবন্ধ লিখতাম, এমন সময়ে, জানেন, কলকাতা থেকে এক পাদরি এলেন এলাহাবাদে। এসে বক্তৃতায় এবং পুস্তিকা ছাপিয়ে হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করে প্রচার করতে লাগলেন খ্রীস্টধর্ম অনেক ভালো, অনেক বড়। ভালো লাগে কি পাদরির এসব কাজকর্ম ? আপনিই বলুন! আমিও তাঁর বক্তৃতার ও পুস্তিকার সমুচিত জবাব কবিতায় লিখে ছাপিয়ে সকলের মাঝে ঘুরে ঘুরে বিলি করলাম। এতে সাহেব মহল খুবই বিরক্ত হলেন। আমার চালচলন কাজকর্ম সবই ডি. পি. আই-এর কানে গেল। সাহেব এক্সপ্লানেশন চাইলেন। আমি জানালাম আমি কোন অন্যায় করি নি—অন্যায় করেছ তোমরা আমার কাছে এক্সপ্লানেশন চেয়ে। কারণ আমি তো কেবল তোমাদের ব্যবহারের উত্তর দিয়েছি। আমি কোন এক্সপ্লানেশন দিতে পারব না। ছেড়ে দিলাম চাকরি। অর্থকষ্ট দারুণ। ঠিক সেই সময়ে বন্ধু রামলাল ডাক্তারের চিঠি পেলাম। রামলাল লিখেছেন, তুমি তো 'ল' পাশ করেছ। লখনউ চলে এস। তোমার আদর্শ জায়গা। ওকালতি কর। নবাব-শহরে তোমার প্র্যাকটিস জমবে নিশ্চয়ই। আমরা তোমার পথ চেয়ে বসে রইলাম। —আমরা কে ? আমি মনে মনে ভাবলাম। রামলাল জানালেন আমাদের প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে একজনও উকিল নেই, তুমি সে অভাব পূর্ণ করবে। তুমি যত শীঘ্র সম্ভব চলে এস। ঝাউলাল পুলের উপর রায়বাহাদুর দুর্গাপ্রসাদের বাড়ি তোমার জন্যে ভাড়া নিয়ে রেখেছি, সেখানেই উঠবে।—ডাঃ রামলাল চক্রবর্তীর মত বন্ধু আর হয় না।

······আর দেরি করলাম না। আবার নতুন জীবন····· নতুন পেশার শুরু। ডেরা ডাণ্ডা তুলে লখনউ এসে উপস্থিত হলাম। আর শুরু করে দিলাম ওকালতি। লখনউতে আসবার পর আমার ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্ন হলেন। ওকালতিতে পসার জমে উঠল। মুঠোভরা ধুলো তুলি, দেখি সোনা হয়ে যায়। যে বাড়িতে ভাড়াটে হয়ে ঢুকেছিলাম তা কিছু বছর পরে কিনে নিলাম। সংস্কার করালাম। বড় রাস্তার উপর অফিস-বাড়ি তুললাম। অতিথিদের থাকবার জন্যে গেস্ট-হাউস হল। ঘোড়ার গাড়ি রাখার আস্তাবল, বাইরের মক্কেলদের জন্যে আস্তানা, সবই হল। আঠারো বছরের প্র্যাকটিসে অনেক কিছুই করলাম অতুলবাবু। নাজিবাবাদ মহল্লায় আর একখানা প্রাসাদ কিনলাম···বাঙলা দেশ ছেড়ে এসেছি এতদূরে, তবু জানেন, বাঙলা দেশের কথা ভুলতে পারি না। কলকাতার গ্রে স্ট্রীটেও একখানা বাড়ি করলাম······আর একটা সাধ ছিল আমার স্ত্রীর জমিদার-গিন্নি হবার। তাই বা কেন বাকি থাকে! কিনে ফেললাম একটা জমিদারি—এই যুক্তপ্রদেশেই—লখনউ থেকে কিছু দূরে 'ওনাও'তে। বলে হেসে ফেললেন উচ্চস্বরে বিপিনবিহারী।

প্রাতঃকালে জোব্বা পরে মাথা টুপিতে ঢেকে মোটা লাঠি হাতে ছোটখাটো শরীরখানা এগিয়ে চলত গোলাগঞ্জের নিচু রাস্তা ভেঙে—রাস্তাটা যেখানে সমান হয়ে গেছে রেসিডেন্সির কাছে সেখানে থেমে পড়ে ডাক দিতেন লখনউয়ের তৎকালীন প্রখ্যাত উকিল বিপিনবিহারী বসু লখনউর প্রখ্যাত বাঙালী, রায়বাহাদুর ·ডাঃ রামলাল চক্রবর্তীকে : রামলাল আছো নাকি হে ?

ডাঃ রামলাল চক্রবর্তী আপন বাড়ির বাগানে চা খাওয়ার অবসরে ডাক্তারি বইয়ের পাতা ওল্টাতেন। দরাজ গলার ডাক শুনে গলার আওয়াজ উঁচুতে তুলে বলতেন, বস হে ব্রাহ্ম বিপিনবিহারী বসু ! চা-পান কর।

বিপিনবিহারী হাসতে হাসতে লোহার ফটক সরিয়ে অন্দরে এসে বলতেন, ব্রাহ্ম তো হলে না, ব্রাহ্মণই রইলে। ব্রাহ্মদের ধর্ম তুমি কী বুঝবে ? না ডাক্তার, বামুনের বাড়িতে আমি চা খাই না।

ডাঃ রামলাল চক্রবর্তী হেসে বলতেন, তুমি কি আমাকে ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত করতে ইচ্ছে কর নাকি ?

বিপিনবিহারী হাসিমুখে বলতেন, চেষ্টা করলে তোমাকে অনেক আগেই ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত করে আমাদের দল পুষ্ট করতে পারতাম। কিন্তু এলাহাবাদে যখন কেশব-চন্দ্রের কাছে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হই তখন আমার মায়ের কান্নাকাটিতে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আমার বংশের কিংবা কোন মানুষকে জোর করে ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত করতে চেষ্টা করব না। সে যদি আপন ইচ্ছায় ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করে তো দীক্ষা দেব।

রামলাল ডাক্তার হেসে বলতেন, জানি।

বিপিনবিহারী হেসে বলতেন, তোমার বলরামপুরের হাতির কী সংবাদ ? হাতির খোরাক সংগ্রহ করতে পারছ তো ? আজকাল প্রাতঃকালে তোমাকে হস্তীপৃষ্ঠে ভ্রাম্যমাণ হতে দেখি না তো! বলরামপুরের মহারাজাকেই হাতি ফেরত দিয়ে এলে বুঝি ?

ডাঃ রামলাল চক্রবর্তী সে সময়ে সত্যি বড় অসুবিধেয় পড়েছিলেন। বলরামপুরের মহারাজা শিকারে বেরিয়ে একবার বাঘের থাবায় আহত হল। 'আঠারো ঘা'র কবলে পড়ে জীবন মরণ সমস্যা। লখনউয়ের সিভিল সার্জন সাহেব হার মানলেন। এলাহাবাদ থেকেও সাহেব সিভিল সার্জেন এলেন, তিনিও ঘায়ের পচ রোধ করতে পারলেন না। তখন মহারাজের কানে কে বললে যেন, 'মহারাজা আপকা লখনউকা হাসপাতালমে এক বঙ্গালী ডকটর হ্যায়। হুঁসিয়ার আদমি, উস্‌কো অগর আপ দেখায় তো উমেদ হ্যায় কি আপ জলদি অচ্ছা হো যাইয়েগা।' খবর গেল ডাঃ রামলাল চক্রবর্তীর কাছে। বামুন মানুষ তায় কালীভক্ত ; কালীর নাম জপ করে, ওষুধের ব্যাগ হাতে নিয়ে

বলরামপুরের রাজার চিকিৎসায় চললেন রামলাল ডাক্তার। রাজাকে অনেক চেষ্টায় সুস্থ করে তুললেন। রাজা খুশি হয়ে বললেন, রামলালবাবু তুমি যা চাও তাই দেব। রামলাল বললেন, মহারাজ, আমি কিছু চাই না।

তা কী হয়! মহারাজা বলরামপুর আউধের সবথেকে বড় তালুকদার। তাঁর বিস্তৃত জমিদারিতে লক্ষ-লক্ষ টাকা আয়। রামলাল ডাক্তারের উপর খুশি হয়ে মহারাজা এক লক্ষ টাকা নগদ, একশো টাকা মাসোহারা, আর একখানা হাতি উপহার দিয়ে বসলেন। হাতি পেয়ে রামলাল ডাক্তারের মহা মুস্কিল—হাতির খোরাক রোজ জোগানো কি সহজ কথা! কিছুদিন পরে রামলাল ডাক্তার হাতিতে চড়ে বলরামপুর রাজার দরবারে উপস্থিত হয়ে কুর্নিশ করে বললেন, মহারাজ, আপনার হাতি আপনি দয়া করে গ্রহণ করুন। আপনার এই মহামূল্য হাতির খোরপোষের ব্যয় আমার ডাক্তারি পেশা থেকে নির্বাহ করতে পারছি না মহারাজ। বলরামপুরের মহারাজা বললেন, ডক্টর. যদি তোমাকে একটা ছোট জমিদারি উপহার দিই তাহলে বোধহয় হাতির খোরাক চালানো তোমার পক্ষে সুবিধে হবে। তোমাকে একটা জমিদারি উপহার দেব।

বলরামপুরের মহারাজার কৃপায় ছোটখাটো জমিদার হলেন ডাঃ রামলাল চক্রবর্তী। মহারাজার অনুরোধে, এবং কর্মদক্ষতার জন্যে যুক্তপ্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নর তাঁকে রায়বাহাদুর উপাধিতে সম্মানিত করলেন।

সেই সময়ে লখনউ শহরে যে ক-জন বিশিষ্ট বাঙালী ছিলেন তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আর কুলভূষণ ভাদুড়ী, লখনউয়ের দু-জন বাঙালী জজ—কালিদাস সিংহ ও গিরিশচন্দ্র বসু, গভর্মেণ্ট পাবলিক লাইব্রেরির কিউরেটর গঙ্গাধর গাঙ্গুলী এবং ডাঃ নবীনচন্দ্র মিত্র সুপরিচিত ছিলেন। সকলে অতুলপ্রসাদের বয়োজ্যেষ্ঠ, বিপিনবিহারী বসুর বন্ধু-বান্ধব। লখনউ প্রবাসী এই আটজন বাঙালী আপন আপন বিষয়ে এক-একটি স্তম্ভবিশেষ। একদিন কোন এক মুহূর্তে এই আটজন এক ফোটোগ্রাফারের ক্যামেরার চোখে ধরা পড়ে গিয়েছিলেন। বিপিনবিহারী ছবির দিকে তাকিয়ে বলতেন, আমরা অষ্টমুনি। ঝাউলাল পুলের অফিস-ঘরের দেওয়ালে ছবিখানি টাঙানো থাকত যেখানে বিপিনবিহারী বসতেন ঠিক তার পিছনের দেওয়ালেই।

একদিন বিপিনবিহারী অতুলপ্রসাদকে বয়োজ্যেষ্ঠ এই বিশিষ্ট আটজন বাঙালীর ছবি দেখিয়ে বললেন····· আপনার সঙ্গে এঁদের সকলের আলাপ করিয়ে দেব, এঁরা আপনাকে অনেকে অনেক বিষয়ে সাহায্য করবেন।

একদিন সঙ্গে করে প্রবীণদের দরবারে অতুলপ্রসাদকে উপস্থিত করলেন। বিপিন-বিহারী বললেন, আসুন পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি ডাঃ নবীন মিত্র, ইনি অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়। ইনি জজ-সাহেব মিঃ ভাদুড়ী। ইনি······। অতুলপ্রসাদ সাদরে

গৃহীত হলেন সকলের প্রাণের মাঝে। জজসাহেব কালীপ্রসন্ন এবং গিরিশচন্দ্র বললেন, কোন অসুবিধে হলে আমাদের জানাবেন। বিপিনবাবুও আছেন, উনি আপনাকে অনেক উপদেশ দেবেন। কিভাবে লখনউয়ে প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায় সে রহস্য ওঁর জানা। রামলাল ডাক্তার বললেন, কৈশরবাগ থেকে গোলাগঞ্জ খুব একটা দূর নয়। মাঝে-মাঝে আড্ডা দিতে চলে আসবেন আমার বাড়ি।

* * * *

অতুলপ্রসাদ যখন প্রথম লখনউতে এলেন বিপিনবিহারী বললেন, চলুন আপনাকে লখনউ শহর ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিই—আমাদের বাঙালীদের সবকটি প্রতিষ্ঠান দেখাই।

অতুলপ্রসাদের সঙ্গ পেয়ে বিপিনবিহারীর আর নাওয়া-খাওয়ার ফুরসত মেলে না··স্ত্রী শরৎকুমারী অনুযোগ করেন : তোমার এখন বয়স হয়েছে, অত ঘোরাঘুরি না করলেই কি নয়? সনৎ রাজু না-হয় অতুল কুসুমকে লখনউয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে। তুমি বসো।

বিপিনবিহারী স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। অতুলপ্রসাদকে বললেন, জানেন অতুলবাবু, চোদ্দ বছর বয়সের সময়ে কলকাতা থেকে শরৎবালাকে বিবাহ করে এনেছিলাম ওর বুদ্ধিদীপ্ত মুখ দেখে। ছয় বছরের বুদ্ধিদীপ্ত মুখ দেখে স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেছিলেন, এমন যার উজ্জ্বল মুখ তাকে বাড়িতে বসিয়ে রেখেছ কেন সেনগিন্নী? বিদ্যাসাগর মহাশয় শরৎবালাকে নিয়ে গিয়ে বেথুন ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। শরৎবালাকে বিয়ে করার পর কত বছর পার হয়েছে, প্রভা সনৎ হয়েছে—এলাহাবাদে একটি ছেলে দুটি মেয়ে হল। লখনউ এসে দুটি ছেলে চারটি মেয়ে হল। আমার স্ত্রীটি প্রগতিবাদী; আমার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজে উপাসনায় যান, আবার শাশুড়ির সঙ্গে দুর্গাবাড়ি, কালীবাড়িতে পুজোপাঠও করে থাকেন। লখনউ এসে শরৎবালা আমাকে বলেছিল, তুমি তো এত কাজ কর, একটা মেয়েদের ইস্কুল কর না কেন? তোমার মেয়েদের শিক্ষার জন্যে তুমি যখন চিন্তা কর, দেশের সকল মেয়েদের জন্যে কেন ভাব না? শরৎবালার সঙ্গে কথায় পারবার উপায় নেই। আমি তখন বলতাম, আমারও অনেক দিনের ইচ্ছে, শরৎ, একটা ইস্কুল করি। সত্যি···আমি লক্ষ্য করেছি প্রবাসে আমাদের ছেলেমেয়েরা ভালো করে বাংলা পড়তে পারে না, বাংলা বলতে পারে না। বাংলা দেশ ছেড়ে এসে আমরা বাংলা ভুলেছি; আমারও ইচ্ছে হয় বাঙালী ছেলেমেয়েদের জন্যে একখানা স্কুল গড়ে তুলি।······তারপর আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম ইস্কুল তৈরির কাজে ······সেদিন লখনউয়ের কয়েকটি ইয়ং ম্যান বাঙালীর ছেলে এসে আমায় ধরেছিল, আমরা একটা ক্লাব তৈরি করতে চাই—আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন, আমাদের পৃষ্ঠপোষক হোন। আমারও অনেক দিনের ইচ্ছে একটা বাঙালী প্রতিষ্ঠান হোক—রাস্তায় রাস্তায়

ঘুরে না বেড়িয়ে নষ্টামি না করে ছেলেগুলো যদি বাংলার সংস্কৃতি-সম্পদ-কৃষ্টি ইত্যাদি নিয়ে একটু চিন্তা করে তাহলে অনেক মঙ্গল। আমি সেদিন আমারও মতামত অনেকটা বললাম ওদের। আমি বললাম, আমাদের ক্লাবের নাম হবে ইয়ংম্যান অ্যাসোসিয়েশন। ক্লাবে খেলাধুলো হবে ঘরে এবং মাঠে-ময়দানে; একটা লাইব্রেরি করতে হবে—পড়াশোনার পাঠ রাখতে হবে। আমরা বাংলা দেশ থেকে সদ্যপ্রকাশিত গ্রন্থ সব আনাব—আরো ইচ্ছে আছে, আমরা ক্লাব প্রাঙ্গণে মাঝে মাঝে যাত্রা-থিয়েটার করব।

ইয়ংম্যানরা বলেছিল খুব ভাল, খুব ভাল হয়।

বিপিনবিহারী বললেন, এইভাবেই ইয়ংম্যান অ্যাসোসিয়েশনের জন্ম হয়। আমি তখন বলেছিলাম ওদের, তোমরা শিগগির একটা কমিটি ফর্ম কর। ডাক্তার রামলাল চক্রবর্তী, শরৎবাবু, গিরীশবাবু, ভাদুড়ী সাহেব এঁদের কাছ থেকে মোটা কিছু চাঁদা নিয়ে এস, ওঁদের কাছে আরো অনেক সাহায্য পাবে। আর আমি তো আছি, যখন দরকার লাগবে আমাকে তোমাদের মধ্যে ধরে নিয়ো—আমি খুব অ্যাকটিভ।

*　　　*　　　*　　　*

বিপিনবিহারী বসুর চেষ্টাতেই প্রতিষ্ঠিত হল কুইন্স অ্যাংলো স্যাংস্কৃট হাই স্কুল, হিন্দু গার্লস স্কুল। শিক্ষিত মানুষদের জন্যে রাফায়েল ক্লাবের জন্ম হল। বিপিনবিহারীর চেষ্টায়, অনুপ্রেরণায় এবং কর্মে অনেক কিছুই হল, কিন্তু মাত্র উনপঞ্চাশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হল। তিনি প্রচারবিমুখ ছিলেন বলে এবং অন্তরালে থাকতে ভালোবাসতেন বলে তাঁর নামটুকু লখনউয়ের বুক থেকে ধুয়ে মুছে গেল। আমিনাবাদ মহল্লার ঝাউলাল পুলের উপরে ভাঙা পোড়ো বাড়িটিকে দেখে আজ আর কেউ ধারণা করতে পারবেন না এখানে প্রবল পরাক্রমশালী এবং বিত্তবান অ্যাডভোকেট বিপিনবিহারী বসু বাস করতেন।……অতুলপ্রসাদ আসর জমিয়ে এলেন তার পরে।

বিপিনবিহারী বলতেন, আমার মনে হয় আপনি লখনউ বারের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যারিস্টার হবেন।

অতুলপ্রসাদ বাগ্মী, ক্ষণজন্মা পুরুষটির দিকে চোখ তুলে তাকাতেন।

বিপিনবিহারী বলতেন, জানেন, আমার মন বলছে আমি আর বেশিদিন বাঁচব না। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলতেন, সনতের উপর আমার অনেক আশা ছিল…… সনৎকে আমার পেশায় আমার মনের মতন করে মানুষ করব। পারলাম না। ওকে প্লীডারশিপ পড়াতে গেলাম। পড়ল না। আমার কোন ছেলে উকিল হবে না।

ওকথা কেন বলছেন? আপনার কোন না কোন পুত্র নিশ্চয়ই আপনার পথে এসে সে অভাব পূর্ণ করবে।

বিপিনবিহারী আবার বলতেন, আমার সব সময়ে আর এক ভাবনা আমার বড় মেয়ে প্রভাকে ঘিরে। আমার বড় জামাই ধনেন বিলেত গেল আজ কত বছর। ফিরল না এখনও। ডাক্তারি পরীক্ষা দিল, পাশ করল, এখন চাকরি করছে ওখানেই। কবে যে ফিরবে তার কোন ঠিক নেই। ওদের জন্যে ভাবতে ভাবতেই আমার শরীরটা গেল অতুলবাবু।

লখনউতে বড় মেয়ে এবং তাঁর নাতি সত্যেনকে এনে রেখেছিলেন বিপিনবিহারী। অতুলপ্রসাদের স্ত্রী হেমকুসুম এসে প্রভাকে নানান ভাবে সান্ত্বনা দিতেন।

বিপিনবিহারীর শরীর ভেঙে এসেছিল। বন্ধু রামলাল ডাক্তার বললেন, গ্যাসট্রিক আলসার। অন্য বন্ধু নবীন ডাক্তার বললেন, পেটে টিউমার হয়েছে। খাওয়া দাওয়া প্রায় বন্ধ। দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ে শরীর, তবু মক্কেল কোর্ট কাছারি থেকে মুক্তি নেই। আরো আছে হাতে গড়া নানান প্রতিষ্ঠান যার সঙ্গে তিনি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ; সেগুলিও না দেখলে নয়। আর বুঝি শরীর সয় না। রামলাল ডাক্তার পরামর্শ দিলেন, বিপিনবিহারী, কলকাতায় গিয়ে ভালো ডাক্তার দেখাও! এখানকার থেকে ওখানে সুবিধে।

অতুলপ্রসাদ তখন রোজ সকালে মামলা মকর্দমার কাজে ঝাউলাল পুলে বিপিনবিহারীর বাড়িতে আসতেন।

বিপিনবিহারী নির্জনে ক্লান্ত হয়ে অফিস-ঘরে তাঁর আরাম-কেদারায় শুয়ে ছিলেন।

অতুলপ্রসাদ বললেন, কেমন আছেন ?

ভালো নেই। আমার বোধহয় ডাক এসে গেছে অতুলবাবু। বিপিনবিহারী ক্লান্তভাবে বললেন : আর বোধহয় আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে না। ডাঃ রামলাল চক্রবর্তী দেখতে এসেছিলেন আজকে ; এইমাত্র আমায় বলে গেলেন কলকাতায় না গেলে আমি বাঁচব না। কলকাতায় গিয়ে চিকিৎসা করাবো। কিন্তু আমার মন বলছে, এই বোধহয় আমার শেষ যাওয়া।

অতুলপ্রসাদ বললেন, না না, এ কথা আপনি মনে আনবেন না। এসব কী কথা ভাবছেন!

বিপিনবিহারী হাসলেন।

বললেন, মিঃ সেন, বাঙালী সংগঠনগুলির জন্যে আমার বড় ভাবনা। এদের নিজেদের মধ্যে বড় রেশারেশি, ঝগড়া বিবাদ। আমার বড় প্রাণের ওই ইয়ংম্যান অ্যাসোসিয়েশন। বেঙ্গলী ক্লাব ও ইয়ংম্যান অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে মিটমাট কি হয় না ? ওদের ভার আপনার হাতে দিয়ে গেলাম—আমার আরো কত কাজ করার ইচ্ছে ছিল অতুলবাবু, কিন্তু আমি বোধহয় আর বাঁচব না।

আপনি এত ভেঙে পড়ছেন কেন?
আমি যে নিজেকে বুঝতে পারছি অতুলবাবু!
এ আপনার ভুল ধারণা। আপনি কলকাতা থেকে সুস্থ হয়ে আসবেন বিপিনবাবু।
অতুলবাবু, আপনি যোগ্যতম। আপনি পারবেন। আপনি দেখবেন হিন্দু গার্লস স্কুল অ্যাংলো স্যাংস্কৃট হাই স্কুল তাদের উন্নতির জন্যে। আপনি আমাকে কথা দিন। এরা আমার বড় প্রাণের……
কথা দিলাম। কিন্তু আপনি কেন এত…অতুলপ্রসাদ বললেন, একটা শুভ সংবাদ আজ নিয়ে এসেছি আপনার কাছে। জানেন, আজ আমাকে জানানো হয়েছে আমি রাফায়েল ক্লাবের সেক্রেটারি মনোনীত হয়েছি।
বিপিনবিহারী আনন্দ প্রকাশ করলেন। তারপর ক্লান্তভাবে শুয়ে বললেন, আপনি অনেক বড় হবেন অতুলবাবু। আপনার অনেক নাম হবে…আমি তখন এ জগতে থাকব না। আমি যখন থাকব না আমার কথা মনে রাখবেন!…সনতের মা আর আমার নাবালক ছেলেমেয়েদের জন্যে বড ভাবনা। আমার বড় ছেলে সনতের বুদ্ধি পাকা হয়নি। বিষয় আশয় ঠিকমত বাঁচাতে পারবে কি না জানিনা……আপনি ওদের দেখবেন, আমি যদি না ফিরি?
অতুলপ্রসাদ বললেন, আপনাকে চিন্তা করতে হবে না বিপিনবাবু। কিন্তু আপনার ভাবনা অমূলক।
বিপিনবিহারী বললেন, আমার মুহুরিকে বলেছি, মামলা-মকর্দমার কাগজ-পত্র যা কিছু আছে আপনাকে দেবে, আর আপনার কথা সে যেন শোনে। আমার গাড়ি-ঘোড়া রেখে গেলুম, আপনি ব্যবহার করবেন। আমি কাল সকালের মেলে কলকাতায় চলে যাচ্ছি।
বিপিনবিহারী সপরিবারে লখনউ ছেড়ে চলে গেলেন। কলকাতার মেডিকেল কলেজের কয়েকজন বড় বড় ডাক্তার দেখলেন। কিছুতে কিছু হল না যখন, তখনকার দিনের প্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনকে ডাকা হল। গঙ্গাপ্রসাদ বিপিনবিহারীকে পরীক্ষা করে নাড়ী দেখে বললেন, এঁর আয়ু পনের দিন। এ কথা শুনে বিপিনবিহারীর শ্বশুরমশাই বাড়ি গিয়ে বিছানায় শুলেন। তিনদিনের দিন তিনি মারা গেলেন। বিপিনবিহারী মারা গেলেন ষোল দিনের দিন। দূর বিদেশে কাজের সূত্রে বাস করলেও বিপিনবিহারী বাংলা দেশকে বড় ভালোবাসতেন। দেহ রাখলেন জন্মভূমিতেই।
পারলৌকিক কাজকর্ম শেষ হলে শরৎবালার ভাই বললেন, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে লখনউ ফিরে আর দরকার কী? সেখানকার জমিদারি, বাড়ি ঘর দোর বিক্রি করে দিয়ে কলকাতায় থাক। শরৎবালা বললেন, না। আমি লখনউ ফিরে যাব, আমার স্বামীর ভিটেতেই।

শরৎবালা নাবালক ছেলেমেয়েদের অভিভাবক হয়ে লখনউ ফিরে এলেন। বাড়ির গাড়ি নিয়ে মুন্সি কানাইয়ালাল অঘোরবাবুর সঙ্গে গেল স্টেশন থেকে আনতে।

মনে পড়ে সেদিনের কথা…হেমকুসুমকে দেখে শরৎবালার শোক নতুন করে উথলে উঠল। ছেলেমেয়েদের চোখ জলে ভরে এল। হেমকুসুম শরৎবালাকে সান্ত্বনা দিয়ে ছেলে-মেয়েদের আদর করে আপন বাড়িতে এনে রাখলেন। অতুলপ্রসাদ এলেন কোর্ট থেকে ফিরে সোজা বিপিনবিহারীর বাড়ি। শরৎবালার বৈধব্য বেশ তাঁকে দুঃখ দিচ্ছিল। নিঃশব্দে কিছু সময় পার হল। শরৎবালা অতুলপ্রসাদের সঙ্গে আপন ভবিষ্যৎ বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন। বড় ছেলে সনতের একটা চাকরির খুব প্রয়োজন জানালেন।

আমি ওর কথা ভেবেছি, অতুলপ্রসাদ বললেন। গ্রিফিথ সাহেবকে বলব। সনতের চাকরি হবে নিশ্চয়ই।

একদিন দুপুরবেলা সনৎকে সঙ্গে নিয়ে গ্রিফিথ সাহেবের সঙ্গে দেখা করলেন অতুলপ্রসাদ। সনতের চাকরি হল কপিইং ডিপার্টমেণ্টে হেড-কপিইস্টের পদে।…অন্য যে যে ছেলে এবং মেয়ে যারা যেখানে যে শিক্ষায়তনে পড়ছিল তারা সেখানেই রইল, যাতায়াত করল।

ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা-শেষে অতুলপ্রসাদ ও হেমকুসুম আসেন মাঝে মাঝে ঝাউলাল পুলে শরৎবালার বাড়ি।

কেমন আছেন মা? ছেলেমেয়েরা সব কেমন আছে? সনতের কাজকর্ম কেমন হচ্ছে?

শরৎবালা মিষ্টি হাসি হাসেন। বলেন, আমরা ভালোই। তোমরা ভালো তো? দিলীপ কেমন আছে? তোমার ছেলে বড় ভোগে বাবা, ওর দিকে একটু দৃষ্টি রেখো।

একদিন বললেন, আমাদের জমিদারিটা নিয়ে বড় মুস্কিল হয়েছে বাবা। সনৎকে পাঠিয়েছিলাম জমিদারি দেখাশোনার জন্যে। দেখাশোনার অভাবে প্রজারা অসন্তুষ্ট হয়ে আছে। কিছু মুসলমান প্রজা সেদিন সনৎকে হত্যা করার চেষ্টা করে। অনেক কষ্টে সনৎ পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়। তাই ভাবছি, কে আর জমিদারিটা দেখবে। আর রাখবই না। ও জমিদারি কাউকে তুমি বিক্রি করে দিতে পার?

অতুলপ্রসাদ রাজি হলেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই অতুলপ্রসাদের চেষ্টায় লখনউয়ের প্রখ্যাত অ্যাডভোকেট মহম্মদ নসিম 'ওনাউ'র জমিদারি কিনে নিলেন।

অতুলপ্রসাদ ঝাউলাল পুলের বাড়িতে এসে আপন মনের খেয়ালে অরগ্যান বাজিয়ে সুরেলা গলায় স্বরচিত গান গাইতেন। তাঁর চার পাশ ঘিরে বসত ছোট্ট ভক্তরা, বিপিন-বিহারীর ছেলেমেয়েরা—সনৎ, বসন্ত, বিনোদিনী, কুমুদিনীরা…হেমকুসুম তখন সান্ত্বনা

দিতেন তাঁর প্রিয় সখী বিপিনবিহারীর মেয়ে প্রভাবতীকে—প্রভাবতীর স্বামী সুদূর বিদেশে।

সেদিন শরৎবালা বললেন অতুলপ্রসাদকে, তুমি তো অনেক দিন বিলেতে ছিলে বাবা, বিলেতের কথা অনেক জান। আমার জামাইকে ওদেশ থেকে ফিরিয়ে আনতে পার না! বারো বছর হল—আমার জামাই বিলেতে গেছে ডাক্তারি পড়তে। ডাক্তারি পড়া শেষ হল। এখন চাকরি করছে বোধহয় লিভারপুলের কোন হাসপাতালে।

অতুলপ্রসাদ বললেন, আচ্ছা আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব মা ওঁকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্যে।

চিঠি-লেখালেখি করে মত করিয়ে, টমাস কুক কোম্পানির দৌলতে পাসেজ বুক করিয়ে, অবশেষে বিপিনবিহারী বসুর বড়জামাই এলেন ভারতবর্ষে ফিরে।

এরপর অনেক দিন অনেক বছর ছিল বিপিনবিহারীর পরিবারের সঙ্গে অতুলপ্রসাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার মত সম্পর্ক। দীর্ঘ বারো বছর পরে বিপিনবিহারীর স্ত্রী শরৎবালার মৃত্যু হল। শবানুগমনও করেছিলেন অতুলপ্রসাদ নতমস্তকে।

…তারপর কালের স্রোতে কত পরিচয়. কত ঘনিষ্ঠতা অন্তরঙ্গতা, কত স্মৃতির শেষ হয়, —কে আর তার খবর রাখে।*

---

*লেখক লখনউ প্রবাসী বসু পরিবারের একজন। তাঁর পিতার মুখ থেকে অতুলপ্রসাদের অনেক কথা ও কাহিনী শুনেছেন। শ্রীবসন্তকুমার বসুর (লেখকের পিতা) পাণ্ডুলিপি থেকেও কিছু অংশ গৃহীত।

এই প্রসঙ্গে কিছু নতুন তথ্যযুক্ত একখানি পত্র লেখকের হাতে এসেছিল যা ভবিষ্যৎ জীবনীকার বা ঐতিহাসিকগণের প্রয়োজন মনে করে তুলে দেওয়া হল।

"আপনার লেখার প্রথম দিকের সংখ্যায় ('অমৃত' পত্রিকায় ধারা-প্রকাশনার সময়ে) একটি নামের উল্লেখে সুদূর অতীতের একটি বিস্মৃতপ্রায় ঘটনার কথা মনে করে এই চিঠিখানি না লিখে পারলাম না। আপনার রচনায় বিপিনবিহারী বসুর নামটিই এই চিঠি লেখার মূল উদ্দেশ্য। এই নামটি ছোটবেলা থেকে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে এসেছি, যদিও এই সুদীর্ঘ জীবনে ইঁহার সাথে সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসার সুযোগ জীবনে আসে নি।…সে আজ প্রায় ১৮৭৬।৭৭ সালের কথা। একটি কুলীন ব্রাহ্মণের পরিবারের শিশুকন্যা পিতামাতার গৌরীদানের পুণ্যে ৬।৭ বৎসরে বিধবা হন। সেদিনের সমাজ-ব্যবস্থার কথা আপনার অজানা। সেই বয়সেই ব্রাহ্মণের বিধবার কঠোর আচার অনুষ্ঠানে ক্লিষ্টা বালিকার দুঃখে ব্যাকুল হয়ে বালিকার দাদার দুটি যুবক বন্ধু তাকে একদিন গোপনে বাড়ি থেকে চুরি করে এনে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছে দেন। ১২।১৩ বৎসরের এই মেয়েটিকে

দশ

অতুলপ্রসাদ লখনউ এসেছিলেন ১৯০২ কি ১৯০৩ সালে। লখনউয়ে তখন তিনি নতুন ব্যারিস্টার। তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, কর্মে আন্তরিকতা ও কর্মতৎপরতা তাঁকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যারিস্টার বলে লখনউ শহরের মধ্যে তুলে ধরল। শুধু ব্যারিস্টার কেন, একাধারে তিনি রাজনীতিবিদ, সমাজ সেবক ও সমাজ সংস্কারক, সাহিত্যিক, কবি, গীতিকার। এক সময়ে সঙ্গীতজ্ঞ নবাব ওয়াজিদ আলি শাহের নির্বাসন হয়েছিল হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের পীঠস্থান লখনউ নগরী থেকে সুদূর বাঙলা দেশে। সেদিন কলকাতার মেটেবুরুজ অঞ্চল সঙ্গীতজগতের তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল।······ইতিহাস প্রতিশোধ নিল। অতুলপ্রসাদকে যেতে হল সুদূর লখনউ নগরীতে বাঙলাদেশের দূত হয়ে। এদিক দিয়ে বাঙলা সঙ্গীত লাভবানই হয়েছে। অতুলপ্রসাদ বাঙলা গানে ঠুংরির আমেজ এনেছেন। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সঙ্গে তিনি বাঙলার নিজস্ব সুর—কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালি মিশিয়েছেন।
অতুলপ্রসাদ যখন প্রথম এসেছিলেন লখনউয়ে তখন লখনউয়ের অবস্থা ভাল ছিল না। পুরোনো শহর 'চকের' দিকটা ছিল খুবই ঘিঞ্জি। নবাবি আমল যদিও তখন শেষ হয়েছে তবু নবাবি আমলের কৌলীন্য কাটিয়ে উঠতে পারে নি লখনউয়ের মানুষেরা। সিপাহী বিদ্রোহের পর লখনউ শহরের পুরোনো বাড়ি ঘর দোর মাঠ করে সাফ করে সাহেবপাড়া হজরতগঞ্জ উঠল। নতুন চওড়া রাস্তা হল—মল রোড। মল রোডে বিরাট বিরাট অট্টালিকা দোকান অফিস বাজার হল। একদিকে সাহেবপাড়া হজরতগঞ্জ, অন্যদিকে পুরোনো চকের নবাবি ঐতিহ্য। মাঝে আমিনাবাদ অবহেলিত। একটিমাত্র সদর রাস্তা ইস্টিশান থেকে কৈশরবাগ পর্যন্ত এসেছিল, আর ছিল কিছু উলটো-পালটা আঁকাবাঁকা অন্ধকার গলি-পথ। সেখানে বস্তিবাড়ি, খোলা নর্দমা দুধারে। সেই পরিবেশে দোকান বাজার মণ্ডি আর বাইজীদের মহল্লা। ভদ্রপাড়াগুলো হল গণেশগঞ্জ,

---

শাস্ত্রীমহাশয় কন্যাস্নেহে পালন করেন। পরে যথাসময়ে তাঁর মনোনীত পাত্র বাংলার নবযুগের অন্যতম চিন্তানায়ক বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে বিবাহ দেন। বিপিনচন্দ্র ছিলেন আমার পিতৃদেব, আর এই মেয়েটি আমারই গর্ভধারিণী জননী। এই দুটি যুবকের একজন মার দূরসম্পর্কের আত্মীয় বিদ্যাসাগর জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আর অন্যজন সেদিনের লখনউয়ের উকিল বিপিনবিহারী বসু। বর্তমানে আমার বয়স ৮৩ বৎসর। ছোটবেলা থেকে এই দুজনার কথা বাবার কাছ থেকে শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনে এসেছি। নমস্কারান্তে—শোভনা নন্দী।

মকবুলগঞ্জ, ঘোষিয়ারীমণ্ডি, নয়াগাও। আর একটা রাস্তা আমিনাবাদ থেকে বেরিয়ে ঝাউলাল পুল, গোলাগঞ্জ, আগমীর দেওড়ি হয়ে পুরোনো চক অবধি গিয়েছিল।... অতুলপ্রসাদ এসে যে বাড়িখানি প্রথমে ভাড়া নিলেন তা হল নবাব ওয়াজিদ আলি শাহর কৈশরবাগের দক্ষিণ ফটকের সামনে দুটো রাস্তা আউটরাম রোড ও ক্যান্টনমেণ্ট রোডের মোড়ে। ওয়াজিদ আলি শাহর বেগম মহল ছিল কৈশরবাগে,—বিরাট একটা চৌকোনা জমির মধ্যে চারদিকে সারিবদ্ধ প্রাসাদ বেগমদের থাকবার জন্যে। বাগিচার মাঝখানে আর একখানা প্রাসাদ, তার নাম বারদুয়ারী। এখানে নবাব বেগমদের নিয়ে গান-বাজনার আসরে মাততেন। উত্তর দিকে বেগমদের স্নান এবং সন্তরণের জন্যে বাঁধানো প্রকাণ্ড পুষ্করিণী, কৈশরবাগের ভেতরের বাগানে অল্প দূরে মার্বেল পাথরের আসন। ফুল পাতায় ছাওয়া কুঞ্জ, যেখানে বেগমরা একান্তে বসে আলাপচারী হতেন। কৈশরবাগে চারটে দরওয়াজা ছিল—উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমে। ইংরেজরা লখনউ অধিকার করার পর উত্তর দক্ষিণ দরওয়াজা ভেঙে ফেলে। সেই শূন্য জায়গায় ক্যানিং কলেজ স্থাপিত হয়। দক্ষিণ দরওয়াজা ভেঙে একটা রাস্তা চলে গেল আমিনাবাদ থেকে কৈশরবাগের মধ্য দিয়ে। মল রোডে এসে মিশে গোমতীর তীর ধরে এগুল। গোমতী নদীর তীরে নবাবের বিখ্যাত ছত্তরমঞ্জিল প্রাসাদ রূপ নিল ইংরেজদের আমোদ-প্রমোদ-বিলাস ব্যসনের ইউনাইটেড সার্ভিস ক্লাবে। সেখানে ভারতীয়দের প্রবেশ নিষিদ্ধ। অল্প কিছু দূরে সিপাহী বিদ্রোহের ইংরেজদের স্মৃতিস্বরূপ বেলিগার্ড বা রেসিডেন্সি। বাকি নবাব আমলের ঘর বাড়ি ভেঙে টুটে...নবাবের মন্ত্রী রোশনুদ্দৌলার বাড়ি দখল করে তাতে ডেপুটি কমিশনারের কোর্ট হল। কোর্ট কাছারি নতুন করে করা হল।—এই হল মিউ-টিনির পরের লখনউ। তখন ছিল বাঙালী তালুকদার দক্ষিণারঞ্জনের লখনউ। লখনউয়ের উন্নতির মূলে দক্ষিণারঞ্জন।

এখনকার লখনউ শহরকে নতুন করে গড়ে তোলেন বাবু গঙ্গাপ্রসাদ ভার্মা এবং লেফটেন্যাণ্ট গভর্নর স্যর হারকুট বাটলার। তারপর এলেন অতুলপ্রসাদ।

গঙ্গাপ্রসাদ মিউনিসিপ্যালিটির সভ্য হয়ে পরে বেসরকারী চেয়ারম্যান হয়ে লখনউ আমিনাবাদ মহল্লার উন্নতির কাজে পণ করলেন। ছোটলাট স্যার হারকুট বাটলারকে রাজি করিয়ে বিলেত থেকে নগরপরিকল্পক প্রফেসর গেডিসকে আনিয়ে শহরকে উন্নততর করে তুললেন। তৈরি হল আমিনাবাদ পার্ক, আমিনুদ্দৌলা পার্ক, লেডীজ পার্ক, আরো অনেক পুষ্পপত্রশোভিত উদ্যান। নবাবের আমল থেকেই লখনউকে বলা হত উদ্যান-নগরী। ইংরেজরা তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করল না। নতুন নতুন চওড়া রাস্তা হল —যার নাম ল্যাটুশ রোড, হিউয়েট রোড, শ্রীরাম রোড, গঙ্গাপ্রসাদ রোড। আমিনুদ্দৌলা পার্কে গঙ্গাপ্রসাদ নিজের টাকায় তাঁর আপন ভাইদের নামে প্রকাণ্ড এক

ধর্মশালা তৈরি করলেন। লখনউয়ের কৈশরবাগের বারদুয়ারীতে 'জনসাধারণের সমাবেশে'র একটিমাত্র জায়গা ছিল। এছাড়া আমিনুদ্দৌলা পার্কে 'জনসমাবেশের' মত একখানা হলঘর ও পাঠাগার তৈরি হল। গঙ্গাপ্রসাদের মৃত্যুর পর এই হলঘরের নাম রাখা হল গঙ্গাপ্রসাদ মেমোরিয়াল হল।

তারপর রঙ্গমঞ্চে এলেন অতুলপ্রসাদ।

সেদিন বিপিনবিহারী বসু গঙ্গাপ্রসাদের সঙ্গে অতুলপ্রসাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন: ...এই যে আমাদের তরুণ ব্যারিস্টার বন্ধু মিঃ এ. পি. সেন।...লণ্ডন থেকে এলেন বাবু গঙ্গাপ্রসাদ ভার্মা......

গঙ্গাপ্রসাদের সম্পাদনায় 'অ্যাডভোকেট' কাগজ তখন পক্ষপাতহীন নির্ভীক দৃষ্টি নিয়ে এবং স্বাধীন চিন্তায় লখনউ থেকে প্রকাশিত হয়ে লখনউবাসীদের প্রিয় পাত্র হয়েছে। লখনউবাসীদের আরো মনের কাছে হয়েছেন গঙ্গাপ্রসাদ। কিন্তু এবার বোধহয় বিদায় নেবার পালা।

গঙ্গাপ্রসাদ দেখেছিলেন অতুলপ্রসাদকে। জহুরি জহরত চেনে। বিপিনবিহারীকে ধীরে ধীরে বললেন গঙ্গাপ্রসাদ, এই যে যুবক—একে কোথা থেকে আনলেন বিপিনবাবু! এমন নির্ভীক প্রতিভাময় অপরূপ চোখদুটি! আমাদের যুগ শেষ হয়েছে বিপিনবাবু।

অবশেষে অতুলপ্রসাদ।

অতুলপ্রসাদের লখনউ বা লখনউয়ের অতুলপ্রসাদ।

সেদিন অতুলপ্রসাদকে বাদ দিয়ে লখনউয়ের অস্তিত্ব ছিল না—কোন মূল্য ছিল না। লখনউয়ের মুকুটহীন নবাব অতুলপ্রসাদ।—যে-কোন প্রতিষ্ঠানে যে-কোন সংগঠনে উন্নয়নমূলক কাজে সঙ্গীতের আসরে রাজনীতিতে অতুলপ্রসাদ সকলের সামনে। হরিমতী বালিকা বিদ্যালয়, ক্যানিং কলেজ, রামকৃষ্ণাশ্রম, আউধ সেবা সমিতি—অতুলপ্রসাদ কর্মকর্তা হিসেবে সামনে না দাঁড়ালে চলে না। ক্যানিং কলেজ যখন লখনউ বিশ্ববিদ্যালয় রূপে মর্যাদা পেল তখন তিনিই তো মন্ত্রণাদাতা। বিশ্ববিদ্যালয়ের নানান সভার Executive council, Board of Appointment সভার মনোনীত মন্ত্রণাদাতা হয়ে স্বভাবসিদ্ধ নিরপেক্ষ বিচারে চরিত্রমাধুর্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অধ্যাপক সব শ্রেণীর মানুষের আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ পেয়েছেন।

অতুলপ্রসাদ লখনউয়ের সুপ্রসিদ্ধ প্রথম ক্লাব বেঙ্গলী ইয়ংম্যান অ্যাসোসিয়েশনের একজন কর্মকর্তা। প্রবাসে বাঙালীদের যেখানে বাস সেখানেই তাদের একখানা ক্লাব আর একখানা কালীবাড়ি। লখনউতে কালীবাড়ির প্রতিষ্ঠা ১৮৬৪ সালে। কলকাতা থেকে মিলিটারি হেডকোয়ার্টার্স উঠে এল লখনউতে; তখন চাকরি সূত্রে চার-পাঁচশো বাঙালী কর্মচারী লখনউতে বসবাস করছে। আরো ছিলেন আউধ রোহিলখণ্ড রেলওয়ের

চাকুরিয়া বাঙালীরা; তাদের অবসর সময় কাটানোর জন্যে প্রতিষ্ঠা হল বেঙ্গলী ক্লাবের। রেলওয়ে ইঞ্জিনীয়ার অতুল সিংহ হিউয়েট রোডের ওপর একখানি জমি দিলেন। তাঁর চেষ্টাতেই বেঙ্গলী ক্লাবের পাকা স্টেজ, হলঘর হল। অতুলপ্রসাদ যখন লখনউতে এলেন তখন দুই ক্লাবের রেশারেশি শুরু হয়েছে। প্রবাসে বাঙালীদের মধ্যে একতা থাকা দরকার। অথচ যেখানেই দু-দশ ঘর বাঙালী সেখানেই দুটো ক্লাব, দুটো দল, দু-রকম মত, দু-রকম কাজকর্ম। এরা মিলে মিশে থাকতে জানে না, পারে না, ভালোবাসে না। তাই অতুলপ্রসাদ বেঙ্গলী ইয়ংম্যান অ্যাসোসিয়েশন এবং বেঙ্গলী ক্লাবের মধ্যে সমঝোতা আনতে চেষ্টা করলেন: বেঙ্গলী ক্লাব প্রবীণদের, বেঙ্গলী ইয়ংম্যান অ্যাসোসিয়েশন নবীনদের।

প্রবীণ এবং নবীনদের দ্বন্দ্ব চিরকালের, চিরযুগের।

আচ্ছা আমরা দুজনে দুজনের অভিমান, আত্মম্ভরিতা, অবজ্ঞাটুকু বিসর্জন দিয়ে কি এক হতে পারি না? আমরা একসঙ্গে এসে দাঁড়াতে পারি না কি পরস্পরের কাছে? প্রবীণের অভিজ্ঞতাটুকু এবং নবীনের প্রাণময়তার নির্যাসটুকু নিয়ে সবেগে ধাবিত হতে পারি না নানান কাজের মাঝে? অতুলপ্রসাদ বললেন। আমরা একসঙ্গে দুটি ক্লাব মিলে মিশে হতে পারি না বেঙ্গলী ইয়ংম্যান অ্যাসোসিয়েশন?

বেশ, তাই হোক।

অনেক দিনের চেষ্টায় দুটি ক্লাবের মিলন হল। অবশ্য অনেক বছর পরে। বেঙ্গলী ক্লাবের কর্ণধার অতুল সিংহের তখন মৃত্যু হয়েছে।

কিন্তু তারও আগে, অতুলপ্রসাদ তখন যুবক, ১৯০৮ সাল। ভারতবর্ষে তখন স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়েছে, আগুন জ্বলে উঠেছে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। বাঙলা দেশের বিপ্লবী তরুণরা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর শাসনতন্ত্রের ভিত কেঁপে গেছে। মজঃফরপুর বোমার মামলায় ক্ষুদিরামের ফাঁসি হল। প্রফুল্ল চাকী কানাই আত্মত্যাগ করলেন। আলিপুর বোমার মামলায় বারীন ঘোষ উল্লাসকরের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হল। ব্যারিস্টার সি. আর. দাশের সওয়ালে অরবিন্দ ঘোষ মুক্তি পেলেন। আগুন জ্বলল ভারতবাসীর রক্তে রক্তে: 'ইংরেজ, ভারত ছাড়!' স্বদেশের কবি অতুলপ্রসাদ। তরুণ কবি অতুলপ্রসাদ। রক্তে তাঁর বান ডাকল। তখন শুধু গান। রক্ত-পাগল-করা গান। 'উঠগো ভারত-লক্ষ্মী'র কবি অতুলপ্রসাদ। সারা বাঙলার মানুষ—বাঙলা দেশ কেন, সারা দেশের মানুষ এককণ্ঠে গাইল সেদিন:

> উঠ গো ভারতলক্ষ্মী
> উঠ আদি-জগতজন পূজ্যা

দুঃখ দৈন্য সব নাশি, কর দূরিত ভারত লজ্জা।
ছাড়ো গো ছাড়ো শোকশয্যা, করো সজ্জা
পুনঃ কমল-কনক-ধন-ধান্যে।
জননী গো লহ তুলে বক্ষে,
সান্ত্বন-বাস দেহ তুলে কক্ষে,
কাঁদিছে তব চরণতলে
ত্রিংশতি কোটি নরনারী গো।

বিপ্লবীরা গেল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে, ফাঁসির মঞ্চে। কণ্ঠে তাদের গান···

খাঁচার গান গাইব না আর খাঁচায় বসে।
কণ্ঠ আমার রবে না আর পরের বশে।
সোনার শিকল দে রে খুলি
দুয়ারখানি দে রে তুলি।
বুকের জ্বালা যাব ভুলি
মেঘ পরশে—শীতল মেঘের পরশে।
থাকবে নিচে ধরার ধূলি,
ভুলব পরের বচনগুলি
বলব আমার আপন বুলি
মন-হরষে—আপন মনের হরষে।

আমাদের দেশ কখনই স্বাধীন হবে না উন্নত হবে না যদি ধর্মে গোঁড়ামি থাকে—মানুষ মানুষকে ঘৃণা করে, ভাই ভাইয়ের বুকে ছুরি হানে। আমাদের দেশে অনেক জাতি অনেক ধর্ম অনেক বর্ণ। আমরা একে অন্যকে ঘৃণা করি, একে অন্যকে দাবিয়ে রাখি। একজন আর একজনের ছায়া স্পর্শ করি না। ছায়া ছুঁয়ে গেলে অপবিত্র মনে হয়, গঙ্গাস্নানে পবিত্র হই। কিন্তু কল্পনা করি কি, গঙ্গার সে স্রোতধারায় পবিত্র স্নানেই কি আমাদের মনের অপবিত্রতা দূর হয়? অতুলপ্রসাদ সেদিন লিখলেন—

পরের শিকল ভাঙিস পরে,
নিজের নিগড় ভাঙরে ভাই।
আপন কারায় বদ্ধ তোরা
পরের কারায় বন্দী তাই।
হা রে মূর্খ, হা রে অন্ধ,
ভাইয়ে ভাইয়ে করিস দ্বন্দ্ব!

দেশের শক্তি করিস মন্দ—
তোদের তুচ্ছ করে তাই সবাই।
সার ত্যজিয়া খোসার বড়াই।
তাই মন্দিরে মসজিদে লড়াই।
প্রবেশ করে দেখ রে দু-ভাই—
অন্দরে যে একজনাই।
দেশমাতার আর বিশ্বমাতার
ম্লেচ্ছ কাফের এক পরিবার।
নয় তুরস্ক—নয়কো তাতার
জন্ম মৃত্যু এই যে ঠাঁই।
ভিন্ন জাত আর ভিন্ন বংশ—
এক জাতি তাই একশো অংশ।
হিন্দু রে, তুই হবি ধ্বংস
না ঘুচালে এই বালাই।
ভাইকে ছুঁলে পদতলে
শুদ্ধ হোস তুই গঙ্গাজলে
ওরে সেই অদ্ভুত ছেলেই তুলে কোলে
তুষ্ট হন যে গঙ্গা মাঈ।
খাবি নে জল ভাইয়ের দেওয়া?
খাস নে অন্ন তাদের ছোঁওয়া?
ওরে, শবরীর আধ-খাওয়া মেওয়া
রঘুনাথ তো খেলেন তাই।
তোরাই আবার সভার স্থলে
হাঁকিস সাম্য উচ্চরোলে;
সম-তন্ত্র চাস সকলে—
বিশ্বপ্রেমের দিস দোহাই!
জাতির গলায় জাতের ফাঁস,
ধর্ম করছে ধর্মনাশ,
দাসত্ব ঘোচে না তাই।
ছাড় দেখি রে রেষারেষি,
কর্ প্রাণে প্রাণে মেশামেশি।

তখন তোদের সব বিদেশী
দাস না বলে বলবে ভাই।

অতুলপ্রসাদ তখন মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট, তখন একটা অঘটন ঘটে গেল।

লখনউকে বলা হয় নবাব-শহর। দূরদেশ থেকে যাত্রীরা যখন নগরপ্রান্তে এসে দাঁড়ায় তখন মনে হয় এ কোন নবাবী দুনিয়ায় এলাম। গম্বুজ, থাম্বা, সিংদরওয়াজা আর নবাবী মেজাজ এ শহরের বৈশিষ্ট্য। লখনউয়ের আমিরী শেষ হওয়া সত্ত্বেও লখনউ এখনও আমির। ছত্তর মঞ্জিলের ছাদে বসে নবাবের সর্ব অঙ্গে সুগন্ধি আতর-যুক্ত তেলমর্দন চলত সেই সময়টিতে গোমতীর ওপারের কবুত্তরখানা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পায়রা উড়িয়ে দেওয়া হত নবাবের মাথায় ছায়া দেবার জন্যে। দিলদরিয়া নবাব আসফদ্দৌলার শাসনকালে একবার অযোধ্যা প্রদেশে দুর্ভিক্ষ হয়। সব প্রজাদের অন্নাভাব ও অর্থকষ্ট দেখা দেয়। দিলদরিয়া নবাব প্রজাদের সাহায্যের জন্যে শোনা যায় প্রকাণ্ড এক ইমারত তৈরি করার কথা চিন্তা করলেন। পরিকল্পনা হল দিনরাত কাজের। দিনে যে কাজ হয় রাতে তার কিছু অংশ ভেঙে ফেলা হয়—আসল উদ্দেশ্য প্রজাদের আর্থিক সাহায্য করা। এমনি করে সে ইমারত তৈরি হল। আগ্রা-অযোধ্যার নবাবদের শাসনকালে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সম্পর্ক মোটামুটি ভাল ছিল। মহরমের সময়ে ইমারতগুলি আলো দিয়ে সাজানো হত এবং সে আলোর রোশনাই দেখতে হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মানুষই ভিড় করত।—তেমনি দশহরার সময়ে দুই-সম্প্রদায়ের মানুষ রামলীলায় রাবণ বধের দৃশ্য উপভোগ করত। তবু মহরমের সময়ে ইসলামধর্মীয়দের মধ্যে সিয়া-সুন্নি এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা বিরোধ লেগে থাকত প্রত্যেক বছর। সিয়ারা তাজিয়া রাখত দশদিন, তাজিয়ার সামনে 'মাসিয়া' গাইত। দশ দিনের দিন দল বেঁধে বুক চাপড়িয়ে শোকের মিছিল বার করত। ওদিকে সুন্নিদের মিছিল আসত হর্ষভরে লাঠি ছুরি খেলা খেলতে খেলতে। দুই মিছিল সামনাসামনি হওয়া-মাত্রই খুনোখুনি লড়াই বেধে যেত।

সিয়া সুন্নির ঝগড়া চলে আসছিল নবাবী আমল থেকে। তারপর এল ইংরেজ। সিয়া সুন্নির চিরকালীন বিরোধ যদিও অবসান হল তবু সূত্রপাত হল আর এক ভ্রাতৃবিরোধের, বিদেশী শাসকের হস্তক্ষেপের ফলে। অতুলপ্রসাদ তখন মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট।

লখনউতে আমিনাবাদ পার্কের কোণে ছোট একটা মহাবীরের মন্দির আছে, সে মন্দিরে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ থাকত। সে গরমের দিনে কাছাকাছি ইঁদারা থেকে জল তুলে এনে লোকেদের জলপান করাত ও মন্দিরের পূজাপাঠ আরতি ও রক্ষণাবেক্ষণ করত।

এ ব্যবস্থাটি জনসাধারণের অলক্ষ্যেই ছিল। আমিনাবাদের চারদিকে হিন্দু-মুসলমান ব্যবসায়ীদের নানান দোকান ঘর, কিছু-কিছু অফিস, পোস্ট অফিস, ব্যাঙ্ক। আশেপাশে কোন মসজিদ ছিল না। তাই কিছু মুসলমান পার্কের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মাদুর বিছিয়ে নমাজ পড়ত। এই নমাজ পড়া এবং মন্দিরের পূজা পাঠ আরতি বেশ মিলে মিশে শান্তভাবে চলে আসছিল কয়েক বছর। তারপর হঠাৎ পট পরিবর্তন হল, সকলের ধারণা শাসক বিদেশী দলের চক্রান্তে পার্কে মুসলমানদের নমাজে বসার সংখ্যা বেড়ে গেল এবং মহাবীরের মন্দিরের ক্ষীণ ঘণ্টাধ্বনি তাদের আপত্তির কারণ হয়ে দাঁড়াল। প্রথম-প্রথম সেই ব্রাহ্মণ আরতির সময়ে মন্দিরে ঘণ্টা বাজানো বন্ধ করে দিত। কিন্তু হিন্দুদের সংখ্যাও আমিনাবাদে কম ছিল না; তারাও সকলে আরতির সময়ে মন্দিরে এসে জড়ো হল। শাঁক ঘণ্টাধ্বনি জোর হল। একদিন অবস্থা চরমে উঠল যখন দুই সম্প্রদায়ের দুই ধর্মের মানুষের মধ্যে পাথর ছোড়াছুড়ি, লাঠালাঠি, ছোরা-মারামারির ঘটনা ঘটে গেল। রাস্তাঘাট অন্ধকার। মোড়ে মোড়ে জটলা। শান্তিরক্ষক বাহিনীর দেখা নেই। ভারতবর্ষের এই প্রথম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কয়েকদিন ধরে চলল। দাঙ্গা যখন চলছে তখন হাট বাজার দোকানপাট বন্ধ; অভুক্ত মানুষ। দুধ মেলে না শিশুর।

অতুলপ্রসাদ ছুটলেন ডেপুটি কমিশনারের কাছে। তাঁকে বললেন, তিন চারদিন হয়ে গেল জনসাধারণের এমন অবস্থা, আর আপনারা চুপ করে বসে আছেন! দাঙ্গা বন্ধ করুন! পুলিশ মিলিটারি ডাকুন!

কমিশনারটি পাকা সাম্রাজ্যবাদী। বললেন, মিঃ সেন, আপনারা সকলে স্বরাজ্য কামনা করছেন। আমরা এখানে না থাকলে আপনাদের স্বরাজ্য কেমন হবে একটু ভোগ করে দেখুন!

অতুলপ্রসাদ সংযত মানুষ। তিনি জানালেন, আমাদের মধ্যে কোনদিনই কোন ঝগড়া বিবাদ হয়নি, ছিল না, যতদিন কোন না কোন বিদেশী তৃতীয় ব্যক্তির আগমন ঘটেছে।

এরপর দু-একদিনের মধ্যেই লখনউ শহরে মিলিটারি পুলিশ আসতে দেখা গেল। লখনউ শান্ত হল কয়েক দিনের মধ্যেই। কিন্তু লখনউ শহরের আন্দোলনের জের ধরে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। লখনউয়ের 'মিউজিক বিফোর মস্ক' সূত্র ধরেই হিন্দু মুসলমানের বিভেদ সৃষ্টি, বোধহয় পরবর্তীকালে মুসলিম লীগের পত্তন এবং ভারতবর্ষের ভাগাভাগিও।

রাজনৈতিক জীবনে এবং মতবাদে অতুলপ্রসাদ গোখ্‌লের মত ও পথের অনুরাগী—তিনি ছিলেন নির্ভীক, স্বাধীনচেতা ও অগ্রণী নেতা। গোখ্‌লেকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করতেন। সেদিনের স্বদেশপ্রীতির ঢেউ উত্তর ভারতেও পৌঁছেছিল। সে বছর

কংগ্রেসের অধিবেশন মহামতি গোখ্‌লের নেতৃত্বে বারাণসী ও লখনউতে বসে। অতুলপ্রসাদ ডেলিগেট হয়ে অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য হন এবং গোখ্‌লের সঙ্গে বিশেষ-ভাবে পরিচিত হবার সৌভাগ্য হয়। পরবর্তীকালে গোখ্‌লের স্থাপিত 'সারভেন্ট অব্‌' ইণ্ডিয়া' সমিতির তিনি একজন সভ্য হন। সারভেন্ট অব্‌ ইণ্ডিয়ার বিশিষ্ট নেতারা অনেকবার লখনউতে এসে অতুলপ্রসাদের আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। গোখ্‌লে যখন লখনউ এসেছেন অনেক সময়ে অতুলপ্রসাদের বাড়িতেই উঠেছেন। অতুলপ্রসাদের অতিথি হয়ে তাঁর বাড়িতে থেকেছেন সরলা দেবী, চিত্তরঞ্জন দাশ, স্যর আশুতোষ-মুখোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল। সেবার এলেন লখনউতে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। রফিয়ম এসোসিয়েশন হলে সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য সভাপতির আসনে উপবিষ্ট। বাঙালী ক্লাবের তরফ থেকে অতুলপ্রসাদ সুরেন্দ্রনাথকে মাল্যদান করে অভ্যার্থনা করার পর সুরেন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে সিংহনিনাদে বক্তৃতা করছেন, এমন সময়ে একটি অবাঙালী কলেজের ছেলে 'ট্রেটর, ট্রেটর টু দি কানট্রি' চিৎকার করে উঠে ভয়ে পালিয়ে গেল। সুরেন্দ্রনাথের নিনাদ নরম হয়ে গেল এবং তিনি চ্যালেঞ্জ করলেন, যে 'ট্রেটর' বলে তাঁকে সম্বোধন করলেন তাঁকে তিনি সম্মুখে প্রশ্ন করতে চান ; কিন্তু সে তখন পলাতক। মালব্যজী আসন থেকে উঠে নত হয়ে সভার সামনে 'অ্যাপোলজি' চাইলেন।*...সেবারই তো বিপিনচন্দ্র পাল এক মাস প্রায় লখনউতে থেকে বৈষ্ণব ধর্মের উপর বারদুয়ারী হলে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিলেন।

বাঙালী যুবক সমিতির তখন দুর্দান্ত জয়যাত্রা। কারণ অতুলপ্রসাদ তখন কর্ণধার। প্রবাসে লখনউ নগরীতে প্রায়ই দিক্‌পালের আগমন ঘটে, আর সকলের সম্মান-সম্বর্ধনা-সভার জন্যে আছে একটি মাত্র ক্লাব যার কর্ণধার অতুলপ্রসাদ।

'আমাদের মধ্যে উচ্চ-নীচ জ্ঞান, জাত্যভিমান বড় বেশি।' বললেন অতুলপ্রসাদ।

লখনউতে সে সময়ে বাঙালীদের সামাজিক অনুষ্ঠানে, দুর্গাপূজায়, কালীপূজায়, বিবাহে, অন্নপ্রাশনে বা শ্রাদ্ধবাসরে ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও অন্যান্য জাতিদের পৃথক পৃথক স্থানে খাদ্যগ্রহণের জন্যে আসন ব্যবস্থার রীতি ছিল। ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যকে খাদ্যদ্রব্য ছুঁতে দেওয়া হত না।

নিশ্চয়ই অন্যায়! কেন?

অতুলপ্রসাদ ডাক দিলেন ক্লাবের সভ্যদের। তিনি বললেন, আমাকে যখন তোমাদের ক্লাবের প্রধান বলে মেনে নিয়েছ আশা করি আমার কথা তোমরা শুনবে।

কোন-কোন উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে চাঁদা তুলে সকলে মিলে একসঙ্গে বসে খাওয়া-

* সত্যকুমার মুখোপাধ্যায়ের ডায়েরি থেকে

দাওয়ার বন্দোবস্ত হত। প্রথমে ক্লাবের অনেক সভ্য হয়ত ইতস্তত······দ্বিধাগ্রস্ত হতেন এক পংক্তিতে বসে খাদ্য গ্রহণে—অনেকদিনের সংস্কার!···একত্র ভোজনে একতা বাড়ে, মুসলমানদের মধ্যে এই যে একতা তার কারণ উচ্চ নীচ সকলেই তারা একত্র ভোজন করে। মুসলমানদের মধ্যে একটা প্রথা আছে আহারের সময়ে মনিবও তার ভৃত্যকে বলে 'আও ভাই বিসমিল্লা' করো। এই লোকাচার শিষ্টাচার তারা এখনও বজায় রেখেছে।—বলেছেন অতুলপ্রসাদ।* ব্যারিস্টার অতুলপ্রসাদ। সমাজসংস্কারক অতুলপ্রসাদ। কর্মী অতুলপ্রসাদ। দিনরাত সেই কাজ—জীবন-ভোর কাজ···

রাজনীতিবিদ অতুলপ্রসাদ। বহু টাকা গোখ্‌লের 'সার্ভেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়াতে' দান করেছেন। প্রতি বছর কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিতেন এবং কখনো কখনো অভ্যর্থনা-সমিতির সেক্রেটারি হিসেবেও কাজ করেছেন। সুরাট কংগ্রেসের সময়ে যে দলাদলি হয় এবং দুটি বিভিন্ন দলের সূত্রপাত হয় সে সময় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং এ ব্যাপারে তাঁর মনে খুব আঘাত লেগেছিল। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে নরমপন্থীরা কংগ্রেস থেকে আলাদা হয়ে 'লিবার‍্যাল' দল গড়লেন। অতুলপ্রসাদও কংগ্রেস ত্যাগ করে লিবার‍্যাল লীগে যোগ দিলেন।—তখন তিনি যুক্তপ্রদেশের লিবার‍্যাল নেতা।

স্বদেশী কবি অতুলপ্রসাদ—স্বদেশের মুক্তি-কামনা যাঁর ছিল স্বপ্ন। গীতিকার, গায়কও অতুলপ্রসাদ।—যেখানে সেখানে, যে-কোন খাতায়, ছেঁড়া কাগজের টুকরোয়, ডায়েরিতে জন্ম নিয়েছে তাঁর বিখ্যাত কবিতা, গানগুলি। গীতিকবিতা। কত কবিতা হারিয়ে গেছে, কত গান বিস্মৃতির আড়ালে। কবিতায় তাঁর বড় সঙ্কোচ। লুকিয়ে রাখতেন নিজেকে নিজের কবি পরিচয় থেকে। গান ও কবিতা ছিল তাঁর হৃদয়ের বড় কাছের। লেখার আগে মনের মধ্যে সুরের আনাগোনা চলত। সুর প্রথমে মুক্তি চাইত। পিছু পিছু আসত কথা।

মোকর্দমার কাজে একবার অতুলপ্রসাদ কানপুর গেলেন। দেখা হল সমাজকর্মী ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে। সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে বাঙলা ভাষা সংক্রান্ত কথা বলে অতুল-প্রসাদ তাঁকে বললেন, প্রবাসী বাঙালীদের একটা মিলন-ক্ষেত্র দরকার যেখানে বছরে একবার আমরা সকলে মিলে আমাদের সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ভাবের আদান প্রদান করতে পারি। প্রবাসেও আমাদের বাঙলা সাহিত্যের ধারা যাতে সমান্তরাল চলে, ব্যাহত না হয় তার দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

সুরেন্দ্রনাথ বললেন, নিশ্চয়ই! আমাদের তাহলে এ বিষয়ে এলাহাবাদের জজসাহেব

*বসন্তকুমার বসুর পাণ্ডুলিপি থেকে

লালগোপাল মুখোপাধ্যায়, কাশীর কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিতপ্রবর গোপীনাথ কবিরাজ এবং আর যাঁরা প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি আছেন তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়। কানপুরে এ বিষয়ে প্রথম আলোচনাচক্র হল। নাম স্থির হল 'উত্তর-ভারতীয় বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন।' প্রথম অধিবেশন বসল কাশীতে ১৯২৩ সালে। অতুলপ্রসাদ এই সভাতেই প্রথম গাইলেন :—

মোদের গরব, মোদের আশা,
আ মরি বাংলা ভাষা !
তোমার কোলে তোমার বোলে
কতই শান্তি ভলোবাসা।
কি জাদু বাংলা গানে—
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে
(এমন কোথা আর আছে গো !)
গেয়ে গান নাচে বাউল
গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।
ইত্যাদি—

এগার

ওগো নিঠুর দরদী, একি খেলছ অনুক্ষণ !

তোমার কাঁটায় ভরা বন, তোমার প্রেমে ভরা মন।

মা এসে পৌঁছলেন লখনউতে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে, দুর্গামোহনবাবুর মৃত্যু হয়েছে—এখন সম্পূর্ণ একা। তাই প্রবাসেই এসে ছেলের কাছে জীবনটা পার করবেন না তো কার কাছে। ছেলেও মাকেই কাছে রাখতে চায়। মা তুমি আমার কাছে থাকো। তুমি আমার কাছে এসে থাকলে আমার বড় শান্তি। তোমার জন্যে আমার কত যে ভাবনা তোমাকে কী বলব······ ! তুমি না বোলো না মা। অতুলপ্রসাদ মাকে আপনার কাছে এনে রাখলেন। হেমকুসুমের এতে আপত্তি। আপত্তির কারণ—যে যে আত্মীয়স্বজন ওঁদের বিয়ের বিরুদ্ধে মত পোষণ করছিলেন তাঁদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখা চলবে না। তাই অতুলপ্রসাদ যখন তাঁর মাকে লখনউয়ে এসে বসবাস করার জন্য বারবার অনুরোধ জানাচ্ছিলেন, হেমকুসুম তখন তার প্রবল প্রতিবাদ জানিয়ে চলছিলেন।

আমি চাই না তুমি তোমার কোন আত্মীয়-স্বজনকে আমাদের এই লখনউয়ের বাড়িতে নিয়ে আসো।

অবুঝ হয়ো না হেম। ওকথা তোমার মুখে মানায় না।

হেমকুসুমের ইচ্ছে হেমন্তশশী কলকাতাতেই বাস করুন। অতুলপ্রসাদ মাকে মাসে মাসে যেমন টাকা পাঠাচ্ছেন তেমনিই টাকা পাঠাবেন। লখনউতে মায়ের আগমনের কোন প্রয়োজন নেই। এই পর্যন্তই থাকুক মা এবং ছেলের সম্পর্ক। হেমন্তশশী লখনউ এলে কেবল জটিলতার সৃষ্টি হবে।

অতুলপ্রসাদের ইচ্ছে সকলকে একসঙ্গে নিয়ে থাকা।

মা আসবেন বৈকি আমার বাড়িতে। আমার বাড়ি তো তাঁরও বাড়ি ! তাঁরও অধিকার আছে এই বাড়িতে থাকবার। বোনেরাও আসবে। বোনেদের ছেলেরাও আসবে আমার এখানে। আমার প্রতিটি আত্মীয়স্বজন আসবেন যাঁর ইচ্ছা হবে। আমি কাউকে বাধা দেব না। তুমি পুরোনো দিনের কথা ভোল। এখন সুখের দিন তোমার, মিলে মিশে থাকতে হবে তোমায়।

আমি পারব না।

ওকথা বললে তোমার চলবে না হেম।

তোমার এখানে যথেষ্ট নাম হয়েছে, প্রতিপত্তি হয়েছে ; তোমার সুনামটুকু গ্রহণ করে তোমার অনুগ্রহ ভিক্ষা করে অনেক আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব জীবনে দাঁড়াতে চায়। দুঃখের সময়ে কিংবা তোমার অসময়ে তাঁরা কোন্ সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন? আমি কাউকে অনুগ্রহ করব না। আমার এই লখনউর বাড়িতে কোনদিনই কাউকে আসতে বলব না। আমার এই লখনউর বাড়ির দরজা সব সময়ে তোমার আত্মীয়-স্বজনদের কাছে বন্ধই থাকবে।

তা বলে তুমি চাও আমার মা আমার বাড়িতে কোনদিন আসবেন না?

সেদিন হেমকুসুমের উত্তর বড় তীক্ষ্ণ, বড় পরিষ্কার। তাঁরা যদি এ বাড়িতে এসে বসবাস আরম্ভ করেন, আমি তবে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব!

অতুলপ্রসাদ মুখের উপর কিছু বলতেন না। পরে বলতেন, জেনে রেখো, মা ছাড়া আমার এ দুনিয়ায় আর কেউ নেই। মা যখন 'অতুল' বলে ডাকেন তখন আমার সেই ছেলেবেলার দিনগুলি মনে পড়ে—মনেই থাকে না আমার এত বয়স হয়েছে —এত প্রতিষ্ঠা হয়েছে। মায়ের জন্য আজ আমি এত বড় হয়েছি। মায়ের ইচ্ছায় মায়ের চেষ্টায় মায়ের প্রেরণায় আজ আমার এই প্রতিষ্ঠা, আর তোমার কথায় মাকে ভুলে যাব! মাকে দূরে রেখে দেব!

মা লিখলেন, অতুল তুই যখন আমায় ডাক দিয়েছিস আমি নিশ্চয়ই তোদের কাছে গিয়ে থাকব।

মাকে কলকাতা থেকে এক সময়ে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন অতুলপ্রসাদ কৈশরবাগ ও আউট্রাম রোডের বাসাবাড়িতে। মা ঘুরে ঘুরে দেখলেন কৈশরবাগের বাড়ি। ঘরগুলি, বাইরের ফুল-বাগিচা, টেনিস লন, আউট-হাউস ইত্যাদি। অল্প দূরে ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা-স্থলটি। মা বললেন, তুমি একটা ওয়েলার ঘোড়া আর গাড়ি কিনেছ। বাড়ি ঘরদোর সুন্দর করে সাজিয়েছ। এবার টাকা কিছু সঞ্চয় কর। তোমার মত হেমকুসুমও একটু বেশি খরচ-টরচ করে দেখছি। এটা বন্ধ করতে হবে। টাকার মর্ম আমি বুঝি। তোমাকে একটা বাড়ি করতে হবে মনে রেখো। গাড়ির থেকে বাড়ির প্রয়োজন আগে। মাথা গোঁজবার একটা আস্তানা চাই তো, ভাড়া বাড়িতে কতদিন কাটাবে!…যাক আমি এসে পড়েছি, তোমার এত ভাবনা চিন্তা না করলেও চলবে। খরচ অনেক কমিয়ে দিতে হবে। আমার কথামত কাজ কর, দেখবে তোমার ভালো হবে।

মা প্রথম দিন থেকে এসেই সংসারের জোয়াল কাঁধে তুলে নিলেন। সর্বময়ী কর্ত্রী হলেন। চিরকাল যে পদে অভ্যস্ত সে পদ কি সহজে ত্যাগ করা যায়! তাই বললেন— হেমকুসুম, তোমার ভাঁড়ারের চাবিটা আমাকে দিও। দেখি তোমার ভাঁড়ার ঘর

কেমন সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছ! সংসারের বিষয়ে আর তোমাকে চিন্তা করতে হবে না, তুমি নিজের শরীর এবং অতুলের শরীরের দিকে দৃষ্টি রেখ। অতুলের শরীর এমন কেন হল বল তো? চিনতেই পারিনি প্রথম যখন ওকে দেখলাম। তুমি ওকে ভালভাবে দেখ না বুঝি?

দিন এগিয়ে চলে। কিংবা দিন অচল হয়। থেমে দাঁড়ায় দিন। মনে মনে অসন্তোষ জমা হয় হেমকুসুমের এবং হেমন্তশশীর মধ্যে। কথা হয় না দু-জনের মধ্যে।

হেমকুসুম হেমন্তশশীর সঙ্গে বিশেষ কোন কথাবার্তা বলেন না জরুরি প্রয়োজন ছাড়া। আপন মনে চিন্তা করেন। সংসারে হেমন্তশশীর সর্বময়ী কর্তৃত্ব দেখে হেমকুসুম বিরক্ত হন। ভেতরে ভেতরে জ্বলে যান। ক্রমে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে আপন মনে আপন ঘরে অন্তরীণ হলেন। অতুলপ্রসাদ বুঝলেন না, কোনদিকে দৃষ্টি রাখলেন না। আপন কাজে মেতে থাকলেন। হেমকুসুম মাঝে মাঝে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে অতুলপ্রসাদকে আপন মনের দুঃখ জানাবার প্রয়াস পান। কিন্তু সব কথা বলতে পারেন না। বলা হয় না। অথবা অতুলপ্রসাদ হেসে হেসে বলেন, বেশ তো আছ, কোন কাজকর্মের ভাবনা নেই, খাও-দাও আর···আনন্দ কর। তোমার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দেখে আমার লোভ হয়, এমন মা পেয়েছ!

মা বলেন, হেম, তুমি ঘরে বসে কী এত ভাব বল তো! এস, আমার সঙ্গে সংসারের কাজে হাত লাগাও।

হেমকুসুম হেমন্তশশীর ডাকে কখনো সাড়া দেন; কখনো মুখ ভার। শুনেও শোনেন না। সম্পর্ক ক্রমে তিক্ত হয়ে ওঠে। অপ্রসন্ন হেমন্তশশী অতুলপ্রসাদকে মাঝে মাঝে হেমকুসুমের অবাধ্যতার কথা বলেন। অতুলপ্রসাদ হেমকুসুমের ওপর বিরক্ত হন। হেমকুসুমেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। রুষ্ট কণ্ঠে মাঝে মাঝে বলেন, আমি চললাম! আমাকে তোমার আর প্রয়োজন নেই দেখছি। থাক তোমরা মা ছেলে। আমার যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাব। হেমকুসুম ভুলতে পারেন না কোন পূর্বস্মৃতি। পূর্বের যত কিছু অবহেলা প্রতিশোধের রূপ ধরে বাসা বেঁধে থাকে অণুক্ষণ। অতুলপ্রসাদ সেদিক দিয়ে অনেকটা ক্ষমাপরায়ণ, আপনভোলা প্রকৃতির। অতুলপ্রসাদ প্রায়ই বলেন, তুমি সব কাজেতে এমন রাগ করে ওঠ কেন?

অতুলপ্রসাদের দুটি সমস্যা স্ত্রী এবং মাকে ঘিরে। ক্রমে অসহ্য হয়ে যায় দিনগুলো। প্রায় সব দিনই যখন পুত্রকে কাছে মেলে, মায়ের অভিযোগের অন্ত নেই। স্ত্রীরও মায়ের প্রতি অভিযোগ রোজকার কাজের মধ্যে। অশান্তি। সবদিন অশান্তি, ছোটখাটো কথা থেকে অশান্তি দানা বাঁধে। নিরুৎসাহ দিন-রাতি। বাড়ির মধ্যে থাকতে ইচ্ছে হয় না। তাই বাইরের কাজ নিয়ে সারাক্ষণ মেতে থাকেন অতুলপ্রসাদ। বাড়ি

এসেও স্ত্রী এবং মাকে এড়িয়ে সকল সময়ে অফিস ঘরে। অবসর সময়ে কোর্টের কাজ নিয়ে বসেন। মাঝে মাঝে মনে হয় হেমকুসুমের কথা মত মাকে লখনউতে না আনলেই যেন ভাল হত। অন্তত এই রোজকার অশান্তির হাত থেকে বাঁচতেন। কিন্তু হেমকুসুমেরই বা এত জেদ কেন! হেমকুসুম কি মায়ের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে চলতে পারে না? একসঙ্গে বাস করে কি সকলে সুখী হওয়া যায় না? মায়ের কথা ভেবে দুঃখ হয়—মা কোথায় আর যাবেন? বোনেরা থাকলে তো তাঁরই দেখাশোনার কথা। তিনিই তো তাঁর একমাত্র পুত্র। কর্তব্য নয় কি মাকে এই বৃদ্ধ-বয়সে দেখা? চিরজীবন মা শুধু দুঃখই পেলেন। আর দুঃখ নয়।

প্রথম প্রথম অতুলপ্রসাদ স্ত্রী এবং মায়ের পরস্পরের দোষারোপ শুনতেন। বোঝাতে চেষ্টা করতেন দুজনকেই। এতে বিপরীত ফল হত। দু-জনই তাঁকে অপরের পক্ষপাতী মনে করে অভিমানে এবং রাগে তাঁর সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিতেন। এই অবস্থা কদিন চলছিল যখন হেমকুসুম অতুলপ্রসাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন না। বড় একটা মোকদ্দমায় অতুলপ্রসাদও কয়েকদিন খুব ব্যস্ত। কাছারিতে হাড়ভাঙা খাটুনি। অনেক রাত অবধি মক্কেলদের সঙ্গে পরামর্শ করা। ঘুমে চোখ ঢুলে আসে। বৈঠক-খানা ঘর থেকে উঠে এসে কিছু খেয়ে শুয়ে পড়লেই আর ভাবতে ইচ্ছে করে না কোন সাংসারিক কথা, বা সংসারটা কেমন চলছে। মাঝে মাঝে মনে হয় এই ঝগড়া হয়ত দু-দিনের, মিটে যাবে কাল সকালেই। কাল সকালে ঘুম ভেঙে দেখবেন এই সংসারের নতুন রূপ। নতুন দৃশ্য। কিন্তু কোন পরিবর্তন নেই। প্রতিদিনের একই ঘটনা।

তোমার এত রাগ কেন আমি বুঝি না। ক্ষুব্ধ অতুলপ্রসাদ।

তোমার যদি রাগের কোন কারণ থাকত তবে বুঝতাম! আমি বুঝি না কেন তুমি মায়ের প্রতি রাগ কর। মা তোমার কী করেছেন এমন? প্রতিটি কাজে মায়ের কেন এত খুঁত ধর?

ভালোমন্দ মেশানো মানুষ। মায়ের সব কাজই কি তোমার মন্দ মনে হয়? তাঁর ভালোটা কি তোমার চোখে পড়ে না? তাঁর আন্তরিকতায় তোমার সন্দেহ জাগে এখনো? তিনি তো তোমার ভালোই চান। চাননা কি, তুমিই বল? তোমায় ভালবাসেন না, না?

এ ধরনের কোন কথা আমাকে বোলো না। আমার শরীর খারাপ লাগে, আমার মাথা ঘোরে, শরীর কেমন করে, মাথায় রক্ত চড়ে যায়। তুমি জান আমার শরীর খারাপ! কিন্তু তুমি কি জান না মা তোমাকে কতটা ভালবাসেন?

আমি জানি বৈকি!

না তুমি জান না! তাহলে মায়ের সঙ্গে, আমার অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে এমন

ব্যবহার কখনো করতে না। তুমি জান না তোমার কথায় মা কতটা অপমানিত বোধ করেন। হাজার হোক তিনি বুড়ো মানুষ; তাঁর সম্মানটুকু দেওয়া তোমার উচিত।

সম্মান দিতে আমি জানি যদি আমি নিজে সম্মান পাই। আমায় তুমি কতটুকু সম্মান দিয়েছ! আমাকে তুমি শুধু বকো আর শুধু ত্রুটি বিচ্যুতিই দেখ। অন্ত কারো নয়। আমিই কেবল তোমার কাছে দোষ করি। আমার যেন কোন গুণই নেই, সবই দোষ!

তোমার কি কোন দোষ নেই তুমি বলতে চাও? আমার মা এমনি-এমনি তোমার উপর ক্ষুব্ধ হন আমি মনে করব?

এমনি মনে করার তোমার প্রয়োজন নেই। আমিই সকলের সঙ্গে ঝগড়া করে বেড়াই এ তোমার জানা উচিত! আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করি, তোমার মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করি। আমি ঝগড়াটে। আমি রাগী। আমি······কিন্তু আমি যা বলি আমি তাই করি। আমি অতি খারাপ আর তুমি খুউব ভাল, তাই নয়?

প্রায় দিনই এই ঘটনা ঘটে। সত্যপ্রসাদ সেন লিখেছেন, 'অতুলের মা অতুলের সঙ্গে আসিয়া থাকিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে অতুলের জীবনে মস্ত পরীক্ষা আরম্ভ হইল। আত্মীয়দের সঙ্গে অতুলের কোন যোগ থাকে উহা তাহার পত্নীর ইচ্ছা নাই। অথচ অতুলের স্বাভাবিক স্নেহপ্রবণতা ইহার বিপরীত। ফলতঃ প্রতিপদেই পতি পত্নীর মধ্যে মনোমালিন্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ···'হেমকুসুমের ব্যবহার অতুলের মনে খুব আঘাত দিতে লাগিল। অতুল ইচ্ছা করে আত্মীয়স্বজনদের লইয়া থাকে ; হেমকুসুম বাধা দিতে লাগিল। ক্রমে বাধা অত্যাচারে পরিণত হইল। বিবাহের পর অতুল রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের মত হইয়া পড়িয়াছিল। আমাদের সহিত সকল রকম সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। ···অতুল আমাকে পরে ইহার কারণ বলিয়াছিল যে সে একেবারে উপায়হীন হইয়া পড়িয়াছিল। একদিকে হেমকুসুমের জেদ যেমন বাড়িতে লাগিল অন্যদিকে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের জন্য অতুলের স্নেহ মমতা কূল ছাপাইয়া উঠিতে লাগিল।······অতুলের প্রেমে ভরা মন পত্নীর অন্যায় জেদ সহ্য করিতে অপারগ হইয়া উঠিল।'

শাশুড়ি বধূর সম্পর্ক ক্রমে তিক্ততার পর্যায়ে পৌঁছে গেল। অতি রাগে অসুস্থ হেমকুসুম। প্রায়দিনই হন মূর্ছিত। ডাঃ ট্যাণ্ডনের চিকিৎসায় চিকিৎসিত হন হেমকুসুম। শুশ্রূষাকারী হলেন অতুলপ্রসাদ ও মহেশ চট্টোপাধ্যায়। মহেশ চট্টোপাধ্যায় পুত্র দিলীপের শিক্ষক, অতুলপ্রসাদের স্নেহভাজন। মহেশ পরোপকারী। পড়াশোনা করেন, দিলীপকেও পড়ান। অতুলপ্রসাদের নিকট আর্থিক দিক দিয়ে অনেক বিষয়ে কৃতজ্ঞ। মহেশ বলেন অতুলপ্রসাদকে, আপনি ব্যস্ত হবেন না।

দিদি এমন কিছু অসুস্থ নন, আমার পরীক্ষা হয়ে গেছে, এখন আমার অবসর। দিদিকে দেখাশোনা, ওষুধপত্র খাওয়ানো, পথ্য ইত্যাদি বিষয়ে দেখতে পারি। তা-ছাড়া আয়া তো আছে। আপনি ভাববেন না কিছু।

অতুলপ্রসাদ বললেন, ঠিক আছে ; তোমার দিদি তোমাকে স্নেহ করেন। একজন অজানা-অচেনা মানুষের চেয়ে একজন পরিচিত মানুষের সেবা-সাহচর্যে শরীর ও মন সুস্থ ও সতেজ থাকবে। তুমি থাকলে আমিও অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকব।

অতুলপ্রসাদের মা নানা ঘটনায় হত-চকিত। ছেলের কাছে মুখ দেখাতে পারেন না। আপন চিন্তায় একা একা ঘরে বসে ভারাক্রান্ত। কেনই বা এখানে আসতে সম্মত হলেন! ছেলের সুখের সংসারে এ কী বিপর্যয় আনলেন তিনি! আমার এখন কলকাতায় ফিরে যাওয়া উচিত ; একবার মনে করলেন। আর একবার মনে হল হেমকুসুমকে দেখে আসি। ভাবলেন, হেমকুসুম কি তাতে আরো উত্তেজিত হবে? হেমকুসুমকে দেখতে গিয়ে যদি আবার অন্য কোন পরিস্থিতিতে পড়তে হয়! যদি সে কিছু মনে করে! নানা কথা শহরের লোকের মুখে মুখে ফিরবে, কী করে আমি মুখ দেখাব সকলের সামনে? আমি তো অশান্তি চাই নি! অতুলের ভালোর জন্যেই আমি সংসারের ভার নিতে চেয়েছিলাম, যাতে সে দু-পয়সা জমিয়ে একটা মাথা গোঁজবার বাড়ি-ঘর তৈরি করতে পারে। তা আমার কপাল মন্দ, আমার জন্যেই তাদের এই বিড়ম্বনা। আমি আর এখানে থাকব না। অতুলকে বলব, আমাকে পাঠিয়ে দে বাবা যেখান থেকে আমি এসেছি ; যা পারিস দিস তাতেই আমার চলে যাবে। অনেক দুঃখ নিয়ে আমি এ পৃথিবীতে এসেছি···অনেক দুঃখ আমার কপালে এখনো লেখা আছে।

হেমন্তশশী আপন মনকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলেন, তারপর মনে মনে ভাবলেন, হেমকুসুম সুস্থ হোক, আমি তাকে সুস্থ দেখে এখান থেকে চলে যাব।

কিছুদিন পরে হেমকুসুম তখন কিছু সুস্থ হয়েছেন। কয়েকটি মাস গেছে এগিয়ে। হেমন্তশশী একদিন অতুলপ্রসাদকে বললেন, অতুল, আমার আর এখানে বাস করতে ইচ্ছে করছে না বাবা, শরীরটা মোটেই ভালো থাকছে না। আমি চলে গেলে তোমরা সুখী হবে অতুল।

অতুলপ্রসাদ দুঃখিত মনে বললেন, এ কথা কেন বলছ মা! কিন্তু মা, তুমি যদি চলে যাও আমার মনে কী রকম দুঃখ হবে সেকথা তুমি জান?

জানি বাবা। তবু···

না মা তুমি যেও না।

না বাবা!

মা তুমি আমার কাছে থাকবে না? তুমি যেও না।

আমায় বাধা দিও না বাবা। আমায় যেতে দাও।

কেন ফিরে যেতে চাও···অতুলপ্রসাদ অনেক দুঃখে বললেন, বেশ তবে তুমি যাও মা! আর একবার বলছি তুমি থাক মা, তোমার আর কোন কষ্ট হবে না, কেউ তোমাকে অপমান করবে না কোনদিন।

না বাবা, তুমি আর আমাকে বাধা দিও না। আমি আসব তোমার কাছে, আবার আসব।

কৈশরবাগের মোড়ের বাড়ির দিকে পিছু ফিরে তাকালেন হেমন্তশশী। ভাঙা দিন জোড়া লাগে না। চোখদুটি অশ্রুসজল হল। ধীরে ধীরে বললেন, অতুল আমায় তুই বিদায় দে বাবা!

অতুলপ্রসাদ প্রণাম করলেন মাকে ব্যথিত মনে। হেমকুসুম দরজার কোণে শক্ত পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলেন অসুস্থ শরীরে। গাড়ি চলে গেল কৈশরবাগের মোড় অতিক্রম করে চার বাগিচার রুক্ষ প্রান্তরের মধ্য দিয়ে দূরে···অনেক দূরে।

বারো

মা অপমানিত মনে কিছুদিনের মধ্যে লখনউ ত্যাগ করে চলে গেলেন। কোন রকমেই আর বেঁধে রাখা গেল না। মা লখনউ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর থেকে অতুলপ্রসাদের সারা মন নৈরাশ্যে ভরে গেল। যন্ত্রচালিত মানুষের মত প্রতিদিনের কাজকর্ম করে চললেন। হেমকুসুমের মানসিক সুস্থতা তখনও সম্পূর্ণ ফিরে আসে নি। উপযুক্ত চিকিৎসায় এবং মহেশের সেবা-যত্নের ফলে হেমকুসুম অনেকটা সুস্থ হলেন। চিকিৎসক বলেছিলেন হেমকুসুম যেন সকালে বিকেলে একটু আধটু ভ্রমণ করেন, তাতে তাঁর মন প্রফুল্ল থাকবে। মন প্রফুল্ল থাকলে শরীর ভাল থাকবে।

অতুলপ্রসাদ হেমকুসুমকে সঙ্গে নিয়ে প্রাতঃভ্রমণে বাহির হতেন। সঙ্গী হিসেবে মহেশ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গ দু-জনের কাছেই আনন্দজনক। মহেশের সঙ্গে কথা কয়ে হেমকুসুমের মন অনেকটা ভাল থাকে ; তাই অতুলপ্রসাদ মহেশকে বলেন, তুমি এসে কথা কয়ে তোমার দিদির মনকে চাঙা করে রেখ, কেমন ?

চিকিৎসক বলেছিলেন এমন কোন কাজ করবেন না মিঃ সেন যাতে মিসেস সেন উত্তেজিত হন। উত্তেজনা ওঁর শরীরে আনবে অনিষ্ট।

অতুলপ্রসাদ সে কথা জানেন বোঝেন, তবু উত্তেজনাপূর্ণ শব্দগুলি দু-চার কথার মাঝে অজ্ঞাতসারে এসে পড়ে। নিজেকে সংবরণে সামর্থ্য নেই, ভুলতে পারেন না হেমকুসুমের জন্যেই মা তাঁদের ত্যাগ করে চলে গেছেন, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। বড় রুক্ষ হন অতুলপ্রসাদ। মুখ-দেখাদেখি কম হয় ইদানীং হেমকুসুম এবং অতুলপ্রসাদের মাঝখানে অদৃশ্য এক দেয়াল বিধাতা ধীরে ধীরে গড়ে তুলতে থাকেন। তাই বোধহয় অতুলপ্রসাদের কাজের বিরতি নেই, সময় নেই এক মুহূর্ত, অবসর নেই হেমকুসুমের সঙ্গে গল্প করার। কোর্টের কাজকর্ম সেরে মামলা-মোকর্দমার কাজকর্মের পর সন্ধেটুকু তখন যায় সাহিত্য সাধনায়, গান রচনায়, সুর সংযোজনায়। প্রায় প্রতিদিনই অগুন্তি মানুষের আনাগোনা, সাহিত্য-সভা, সঙ্গীত-সভা। প্রায় দিনই সুরপিয়াসীর দল হেমকুসুমের সময়টুকু নিঃশেষে উজাড় করে নিয়ে উপস্থিত থাকে। রবাহূত অভ্যাগতদের ভিড়ে নিজেকে খুব অসহায় বোধ হয় হেমকুসুমের। অতুলপ্রসাদকে অনেক দূরের মানুষ বলে মনে হয়, সেই কারণেই তাঁকে অসহনীয় মনে হয়। ক্ষমাহীন দাবি জানায়। প্রতিশোধের স্পৃহা জাগায়।

মহেশকে সঙ্গে নিয়ে শিষ্য-শিষ্যা-পরিবৃত অতুলপ্রসাদের সামনে দিয়ে হেমকুসুম

ভ্রমণে বাহির হন প্রায়ই দিন।···গোমতী নদীর তীর ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেন, কৈসরবাগের বাগিচায় এসে লতানিকুঞ্জ-ঘেরা পাথরের আসনে বসে কখনও আলাপচারী হন। কখনও আপন মনে ভাবেন—ভাবনার কূল-কিনারা ছিল না কোন। বাগিচার সবুজ মাঠে অন্য সব ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দিলীপ খেলাধুলোয় মাতে। তারপর রোদ উঠলে বেড়ানো সাঙ্গ হয়। বিকেলে রোদ পড়লে ছেলে ইস্কুল থেকে ফিরলে তাকে জলখাবার খাইয়ে খেলতে পাঠান। খেলাধুলো করে এসে তুমি পড়তে বসবে, তারপর আমি বেড়িয়ে ফিরে এলে মহেশকাকা তোমাকে পড়াতে বসবেন।

একদিন সন্ধ্যাবেলা হেমকুসুম বেড়াতে বেরিয়েছেন, বেড়াতে বেড়াতে গোমতী নদীর তীর ধরে মতিমহল অবধি এসে তার চত্বরে বসেছেন।···অনেক রাত হল। বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে হল না হেমকুসুমের।···কী হবে বাড়ি ফিরে —সেই নির্জন নির্বান্ধব পুরীতে—যেখানে এক মুহূর্ত আর বাস করতে ইচ্ছে হয় না—যেখানে কথা বলার—ভালবাসার মানুষ নেই। হঠাৎ হেমকুসুমের যেন মনে হয় তিনি অনেক দিন অতুলপ্রসাদের সঙ্গে কথা বলেন নি, তাঁর পরিচর্যা করেন নি—ব্যবধানের প্রাচীর কেন যে হঠাৎ মাঝে রূপ নিল কে বলতে পারে!

অকস্মাৎ হেমকুসুমের মন অতুলপ্রসাদের জন্যে কেমন যেন চঞ্চল হল। বাড়ি ফিরে এলেন। বাড়ির গেট পার হয়ে ভেতরে এসে দেখেন, বসার ঘরের সব-কটা আলো জ্বলছে 'দিন' হয়ে। স্বরলহরী ভেসে আসছে নারী পুরুষ কণ্ঠের। ধীরে ধীরে বসার ঘরের দরজার পাশে এসে দাঁড়ালেন হেমকুসুম। দেখলেন, আপন মনে বিভোর হয়ে অর্গ্যান বাজিয়ে গান গাইছেন অতুলপ্রসাদ। তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে তাঁর গলার সুরে স্বর মিলিয়ে গান গাইছেন দুটি তরুণ তরুণী। তারা বোধহয় অতুলপ্রসাদের নতুন কোন গানের সুর তুলতে চেষ্টা করছে। নতুন দৃশ্য কিছু নয়, তবু হেমকুসুমের মন সেদিন বোধহয় ও দৃশ্য দেখার জন্যে প্রস্তুত ছিল না। এল দুরন্ত রাগ, প্রচণ্ড আক্রোশে হল তার প্রকাশ।

বিরক্ত বিব্রত অতুলপ্রসাদ বললেন—শান্ত হও।

অশান্ত হেমকুসুম।

সংযত মানুষ অতুলপ্রসাদ।

বললেন, দেখ, আমরা আজ দু-জনে দু-পথে চলেছি। আমরা বোধহয় আর দু-জন দু-জনকে ভালবাসতে পারছি না। অথবা আমাদের ভালবাসা আজ শুকনো মালা আমাদের মাঝে বিরাজ করছে। আমাদের একত্রে থাকা বোধহয় আর ঘটবে না। তোমার যা খরচপত্র তোমাকে আমি দেব। তুমি আমায় মুক্তি দাও, আর অশান্তি নয়।

উত্তেজিত হেমকুসুম বললেন, আমি কোথাও যাব না তোমাকে ছেড়ে! আমি এখানেই থাকব—আমার বাড়ি, আমার ঘর।

অতুলপ্রসাদ ঘরময় ঘুরে বেড়ালেন অশান্তভাবে।

সে রাতে অতুলপ্রসাদ এবং হেমকুসুম দু-জনেই অভুক্ত রইলেন। নিদ্রাহীন রাত যাপন করলেন ভিন্ন ঘরে। ঘরময় পায়চারি করেছেন অতুলপ্রসাদ এবং অনবরত ধূমপান করেছেন, যদিচ ধূমপান তিনি করতেন ক্বচিৎ কখনো। ঘরময় পোড়া সিগারেটের টুকরো, চোখে মুখে অনিদ্রার ক্লান্তি, মুখ দেখে মনে হচ্ছিল সমাধানের পথ এখনও সুদূর পরাহত। কোন সমাধানে পৌছতে পারেন নি অতুলপ্রসাদ। ভাবছিলেন, হেমকুসুমকে যখন বিবাহ করেছিলাম তখন আত্মীয়স্বজনরা আমাকে বাধা দিয়েছিলেন। মারও ইচ্ছে ছিল না আমি ওকে বিয়ে করি। ওর জন্যে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলের কাছে আমি হেয় হয়েছি। আমার সঙ্গে কেউ সম্পর্ক রাখে নি। তাদের সকলের কথা শুনিনি, এখন আমাকে তাই ফলভোগ করতে হচ্ছে। হেমকুসুমের সঙ্গে একসঙ্গে দিনযাপন করা ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠছে। আরো কিছুদিন একসঙ্গে থাকলে আমাকে হয়ত পাগল হতে হবে। হয় আমি পাগল হব, নয় তো হেমকুসুম। এ অশান্তির হাত থেকে আমি মুক্তি পেতে চাই। বিচ্ছেদ ছাড়া আমাদের উপায় নেই—বিচ্ছেদ—সেই ভাল। কিন্তু···ওকে বললাম তুমি যেখানে ইচ্ছে থাকো, যদি বিচ্ছেদ মেনে নাও অর্থ চাও, নাও; কিন্তু দোহাই আর অশান্তি নয়। আমার মান ইজ্জত নষ্ট করে আমার ওপর প্রতিশোধ নিও না। আমি শান্তি চাই, আমি স্বস্তি চাই; কী দোষ করেছি তোমার কাছে?···ওর সুখ সুবিধের সবই তো ব্যবস্থা করেছি, কোনদিক দিয়ে কোন অভাব রাখি নি। আমার আত্মীয়দের সঙ্গে ও কোন যোগাযোগ রাখতে চায় না; আমিও দূরে চলে এসে ওর কথা রেখেছি—এতদিন পরে এখন যদি কেউ আমার কাছে আসে, আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে আমি কেন তাদের না বলব!···আমি যে এখানে এসে এত টাকা উপার্জন করছি সে শুধু কি হেম আর দিলীপের জন্যেই!···আমার মনের ইচ্ছে···আমার দেশের মানুষ···আমার প্রাণ···ও আপন স্বার্থকে বড় করে দেখে; অস্বীকার করি না সে কথা খুব অযৌক্তিক নয়। তবুও!···ও চায় না আমি কোন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করি···কিন্তু কী করে এ সম্ভব! আমার গান আমার কবিতা যদি কারো ভালো লাগে আর তাতে আকৃষ্ট হয়ে ওরা যদি আসে আমার কাছে গান শিখতে, আমি কি বলব তোমরা চলে যাও? এত অভদ্র আমি হতে পারব না। ওর মনের এই দুর্বলতার জন্যেই ওর নিজের মনে অশান্তি ডেকে এনেছে!

অবশেষে অতুলপ্রসাদ সমাধানের পথ খুঁজে পেলেন। হাতে যে কটা মামলা আছে

শেষ করে নি। মুনশিকে টাকাপয়সা দিয়ে যাব, হেমকুসুমকে খরচপত্র দেবে। দিলীপ যেমন লেখাপড়া করছে করুক। মহেশকে বলে যাব যেন ওকে দেখাশোনা করে। সত্যকুমার* আমাকে খুউব ভালোবাসে। সে যেন রোজ এসে খোঁজখবর নিয়ে যায়, আমাকে যেন চিঠিপত্র লিখে খোঁজখবর জানায়। হেমকুসুম এখানে থাকুক। ওর জন্যে চাকর-বাকর খানসামা বেয়ারা ফিটন আইভিলতার কুঞ্জ সব রইল। ও সুখে থাকুক এখানে।...লখনউ ছেড়ে যেতে একটু দুঃখ হবে—অনেকদিনের কর্মভূমি, অনেকখানি প্রতিষ্ঠা, নাম-যশ, তবু আমাকে কলকাতায় ফিরে গিয়ে নতুন করে কর্মজীবন শুরু করতে হবে। তা হোক, আবার নতুন করেই না হয় যাত্রা শুরু হবে। মনে মনেই একটা সমাধানের পথ খুঁজে পেয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন অতুলপ্রসাদ।

* * *

পরদিন সকালবেলায় গোমতী নদীর তীরে বেড়াতে গিয়েছেন সত্যকুমার, ফেরার পথে ভাবলেন একবাব অতুলদাদার বাড়ি ঘুরে গেলে কেমন হয়। যে কথা ভাবা সেই কাজ।* সত্যকুমার অতুলদাদার বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন। কানাইলাল বসে ছিলেন। তিনি জানালেন সাহেব ঘুমুচ্ছেন এখনও।

সত্যকুমার শুনে আশ্চর্য হলেন। মনে ভাবলেন, সাহেব তো এত বেলা অবধি ঘুমোন না, শরীর ভাল আছে তো? ইতিমধ্যে পুরোনো ভৃত্য বেরিয়ে এসে বললে, বাবু আপনি যাবেন না বসুন, আমি বৈঠকখানা খুলে দিচ্ছি। সত্যকুমার বৈঠকখানায় বসলে পর ভৃত্যটি বলল, কাল সাহেব মেমসাহেব রাত্রে দু-জনেই কেউ খাওয়া-দাওয়া করেন নি। আপনি এসেছেন, আপনাকে দেখলে সাহেব খুশি হবেন। আপনাকে চা দিয়ে যাচ্ছি, কাগজ দেখুন।

ভৃত্য প্রভুর ঘরে ধীরে ধীরে আওয়াজ দিয়ে প্রভুকে জাগিয়ে জানালো, সত্যকুমারবাবু এসেছেন, বৈঠকখানায় আপনার জন্যে অপেক্ষায় আছেন।

অতুলপ্রসাদ হাতমুখ ধুয়ে সত্যকুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন, তুমি এসেছ ভালোই হয়েছে, তোমার কথাই কাল রাতে ভাবছিলাম।

সত্যকুমার বললেন, আপনি ও বৌঠান কাল রাতে কিছু খাননি, কী ব্যাপার বলুন তো!

অতুলপ্রসাদ তখন গতকালের ঘটনার কথা সত্যকুমারকে বললেন। এবং তিনি মনে

---

* সত্যকুমারের পরিচয়—সত্যকুমার মুখোপাধ্যায়, পিতা অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় যিনি নববিধান সমাজের একজন প্রচারক ছিলেন। সত্যকুমার অতুলপ্রসাদের একজন ঘনিষ্ঠ সহচর।

মনে মনে যা স্থির করেছেন, অর্থাৎ তিনি এসময়ে কিছু দূরে থাকলে হেমকুসুমের মনের পরিবর্তন হতে পারে, সেকথা সত্যকুমারকে জানালেন।

সত্যকুমার বললেন, যদি তাই ভেবে থাকেন তাহলে সে কাজই করে দেখুন।

অতুলপ্রসাদ বললেন, তোমাকে যে ভার দিচ্ছি সেটা তোমাকে পালন করতে হবে।

সত্যকুমার বললেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি সে কাজ যথাসাধ্য করে যাব।

অতুলপ্রসাদ বললেন, তুমি একবার বৌঠানের কাছে যাও। উনি আমার ওপর রেগে আছেন। রাতেও কিছু খাননি। তোমার কথা বৌঠান শুনবেন। আমি সামনে যাব না। আমায় আবার এক্ষুনি স্নান করে বেরোতে হবে কোর্টে। একটা বড় মকর্দমা চলছে। দেখছ না, মক্কেলরা দোরে ধরনা দিয়ে বসে আছে।

সত্যকুমার হেসে হেমকুসুমের ঘরে এলেন। হেমকুসুম তখন আরাম-কেদারায় শুয়ে আছেন। আয়া চুল আঁচড়ে দিচ্ছে। সত্যকুমারকে দেখে আন্তরিকভাবে ডাকলেন হেমকুসুম। স্বাভাবিকভাবে বললেন, তুমি অনেকদিন আসনি যে সত্যকুমার? তাঁর চেহারার মধ্যে গতকালের ঝড়ের কোন চিহ্ন নেই।

সত্যকুমার বললেন, আজ সকালে আপনি বেড়াতে গেলেন না যে!

আজ শরীরটা তেমন ভাল বোধ হচ্ছিল না, হেমকুসুম বললেন, মহেশকে বললাম তুমি দিলীপকে নিয়ে বেড়াতে যাও।

সত্যকুমার বললেন, আপনার চা-জলখাবার খাওয়া হয়েছে? শুনলাম কাল থেকে আপনি অন্নগ্রহণ করেন নি। বড় অন্যায়। আয়াকে বলি আপনার খাবার দিয়ে যেতে। আমার জন্যেও এককাপ চা বানাতে বলবেন। যদিও অতুলদার ঘরে আমার এক কাপ চা হয়েছে তবু আমি তো চায়ের পোকা জানেন,......সাহেবের সঙ্গে অফিসের কাজে দেরাদুন মুসৌরি ঘুরে এলাম। মুসৌরি বড় চমৎকার জায়গা, চারদিকে পাহাড় ঝরনা, দূরে একটা লেক আছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—বড় ভাল লাগল। এক কাজ করতে তো পারেন, দাদা এবং আপনি দিলীপকে নিয়ে কয়েকদিনের জন্যে সেখান থেকে ঘুরে আসতে পারেন। শরীরও সারবে, মনও ভাল থাকবে। আমি বলছি দেখবেন, সেখানে কয়েকটি দিন কাটিয়ে এলে একেবারে নতুন জীবন মনে হবে। আর দেরি করবেন না, আপনারা ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ুন।

হেমকুসুম কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আমারও আর ভাল লাগে না। এখানে বড় একঘেয়ে মনে হয়। তবে, উনি এখানকার কাজকর্ম বন্ধ রেখে মুসৌরি যেতে পারবেন কি? বলবেন তোমরা যাও। ওঁকে আমি এই সাতশো রাক্ষসীর দেশে রেখে যেতে পারব না!

সত্যকুমার বললেন, দেরাদুন মুসৌরি বেড়াতে যাওয়ায় আপনার মত আছে

জানলাম। এখন দেখি দাদাকে বলে। আশা করি দাদাও মত দেবেন। আচ্ছা আজ চলি, আর একদিন আসব,—অফিস আছে তো! এই বলে সত্যকুমার উঠে পড়লেন। যাবার আগে অতুলপ্রসাদের সঙ্গে কাছারিতে দেখা করে বলে এলেন, বৌঠানের মেজাজ ভালোই দেখলুম। চা-টা খাচ্ছেন। পরে তাঁর সঙ্গে দেখা করে পরবর্তী কার্যক্রম আপনাকে জানাবো। ইতিমধ্যে আপনি বৌঠানের ওপর মেজাজ-টেজাজ দেখাবেন না যেন।

অতুলপ্রসাদের বাড়িকে ঘিরে পৃথিবীর আহ্নিক গতি যেমন চলছিল তেমনই চলল। সকালে উঠে হাতমুখ ধুয়ে, ভৃত্যের দেওয়া চা ডিম টোস্ট খেয়ে অতুলপ্রসাদ নিজের কাছারি-ঘরে মক্কেল নিয়ে বসেন। তারপর কোর্টে যাওয়ার সময় হলে তাড়াতাড়ি উঠে স্নান সেরে জামাকাপড় পরে খেতে বসেন। কোনরকমে তাড়াহুড়ো করে খাওয়া সেরে খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় আসেন। দেখেন মুন্সি কানাইয়ালাল নথিপত্র নিয়ে গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁরা উঠলে গাড়ি ছেড়ে দেয়। তারপর চলে সারাদিন পরিশ্রম। জজদের সামনে দাঁড়িয়ে মক্কেলদের হয়ে আরগুমেণ্ট। দুপুর একটার সময় লাঞ্চের ছুটি—সেই সময়টা যা একটু বিশ্রাম। জলযোগের পর বার লাইব্রেরিতে পৌছে বন্ধুবান্ধব সহকর্মীদের সঙ্গে গল্পসল্প আলাপ আলোচনায় কোন দিক দিয়ে সময়টা কেটে যায়। তারপর আবার ডাক পড়ে। জজসাহেবের সামনে পৌছে গিয়ে চলতে থাকে আবার বাক্‌যুদ্ধ প্রতিপক্ষের উকিল ব্যরিস্টারদের সঙ্গে বেলা চারটে অবধি। চারটে বাজলে জজেরা উঠে পড়েন। কোর্ট বন্ধ হয়। তখন বাড়ি ফেরার পালা। অতুলপ্রসাদ বাড়িতে ফিরে ক্লান্তভাবে শুয়ে পড়েন আরামকেদারায় যতক্ষণ না ভৃত্য এসে তাঁর কোট খুলতে সাহায্য করে। ভৃত্য তার মনিবের কাজকর্মের রীতিনীতি সব বোঝে। আস্তে আস্তে জুতো-মোজা পা থেকে খুলে নিয়ে স্লিপার এগিয়ে দেয় পায়ে। পাজামা পাঞ্জাবি গেঞ্জি এনে কাছে রাখে। ঘরের পরদা টেনে দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ায়। বাইরের পোশাক ছাড়া হলে সেগুলি নিয়ে গিয়ে যথাস্থানে পাট করে রেখে দেয়। তারপর মগে মুখ হাত ধোবার জল ও গামলা নিয়ে আসে। তিনি হাত মুখ ধুয়ে নিলে তোয়ালে এগিয়ে দেয় মুখ হাত মোছার জন্যে। মোছা হলে পায়ে জল ঢেলে, পা তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে মগ সরিয়ে নিয়ে যায় ভৃত্য। গরমের দিনে আনে তাঁর প্রিয় বরফ-দেওয়া ফলসার সরবত।

দিন-দুই কাটলে একদিন সত্যকুমার অফিস-ফেরতা এলেন অতুলপ্রসাদের বাড়ি। তখনো তিনি কোর্ট থেকে ফেরেন নি। ভৃত্যদের কাছে শুনলেন মেমসাহেব বাড়িতে আছেন, কোথাও বেড়াতে যান নি। সত্যকুমার মনে ভাবলেন ভালই হল, তিনি

বৌঠানের সঙ্গে দেখা করার কথাই ভাবছিলেন প্রথমে। তাই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বাড়ির অন্দরমহলে এলেন।

হেমকুসুম তাঁর গলার স্বর শুনতে পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, সত্যকুমার, তুমি সেদিন বলে গেলে আসবে ক-দিন, আর দেখাই নেই!

আসিনি তার কারণ, আমাদের অফিসে অডিট হচ্ছিল, তাই রোজই ফিরতে রাত হত।

হেমকুসুম বললেন, তুমি সেদিন দেরাদুনের কথা বলছিলে। আমারও খুব ইচ্ছে হচ্ছে সেখানেই যাই। অনেকদিন লখনউয়ের বাইরে পা বাড়াই নি। কিন্তু তোমার দাদার ইচ্ছে না হলে কেমন করে যাই বল তো!

সত্যকুমার বললেন, এখনো বুঝি আপনাদের মধ্যে অভিমান চলেছে, কথা বন্ধ? আপনার মনের কথা দূত হয়ে আমায় অতুলদাদার কানে পৌঁছে দিতে হবে তো!

সত্যকুমার চা খেতে খেতে বললেন, বৌঠান আর নয়, এবার দাদার সঙ্গে মিটমাট করে ফেলুন। আপনিও কিছু ত্যাগ করুন, দাদাও কিছু করুন। যা হবার তা তো হয়েই গেছে।

হেমকুসুম বললেন, না ভাই, আমি কেন মিটমাট করতে যাব প্রথমে? উনি যখন এখনও আমার সঙ্গে কথা বলেন না, কাছে ডাকেন না, কোন সংশ্রব রাখতে চান না তখন আমারই বা নিচু হয়ে লাভ কী? আমি বা সব কিছু ত্যাগ করে প্রথমে ওঁর কাছে এগিয়ে যাব কেন?

সত্যকুমার হাসতে হাসতে বললেন, আপনিও নিচু হবেন না, দাদাও নিচু হবেন না। দু-জনেরই এক কথা, সমান জিদ। হবে না কেন, যখন দুজনেরই মাঝে একই রক্ত বইছে! দাদা কোর্ট থেকে আসুন, আজই আমি দাদাকে মুসৌরি যাওয়ার কথা বলছি এবং রাজি করাচ্ছি। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে মুসৌরি যাওয়ার জন্যে তোড়জোড় করুন।

তা তোমার যা ইচ্ছে কর, হেমকুসুম বললেন। দাদা তোমার কথা শোনেন শুনবেন, কিন্তু আমি তোমার দাদার কাছে প্রথমে যাব না।

সত্যকুমার বললেন, দাদা আমার কথা শুনবেন। আমাকে তিনি ছোট ভাইয়ের মত ভালবাসেন। দাদার মত মানুষ হয় না! জানেন, আমার অফিস থেকে চাকরির জন্যে একজন সিকিউরিটি চাইলেন, দাদা আমার জন্যে দাঁড়ালেন।

এমন সময় ভৃত্য এসে জানিয়ে গেল সাহেব অনেকক্ষণ এসেছেন এবং সত্যকুমারবাবুকে সেলাম দিয়েছেন। সত্যকুমার বললেন, চল যাচ্ছি।

সত্যকুমার অতুলপ্রসাদের ঘরে আসতেই তাকে দেখে তিনি বললেন, তুমি দু-দিন আস নি এদিকে? সত্যকুমার অতুলপ্রসাদকে অফিসের কথা পুনর্বার জানালেন। তারপর

বললেন, অতুলদাদা, আপনি যে লক্ষ্ণৌ ছেড়ে বনবাসে যাচ্ছিলেন তা এখন কিছুদিনের জন্যে স্থগিত রাখুন।

কেন?

যদি অভয় দেন তো বলি।

বল।

আমি বলি কি, আপনি এবং বৌঠান এখন কিছুদিনের জন্যে দেরাদুন মুসৌরি কিম্বা সিমলা-নৈনিতাল থেকে বেড়িয়ে আসুন। তাহলে সব মেঘ কেটে যাবে।

তারপর সত্যকুমার হেমকুসুমের সঙ্গে তাঁদের আলাপ-আলোচনার আদ্যন্ত সব কথা জানালেন। বললেন বৌদি আমার প্রস্তাবনা শুনে পাহাড়ে যেতে উৎসুক।

অতুলপ্রসাদ বললেন, বেশ হেমকুসুম যদি রাজি থাকে আনন্দের সঙ্গেই যাওয়া যাবে। ...হাতের কাজগুলোর তাড়াতাড়ি একটা নিষ্পত্তি করে নি। যাক, তোমার কথা শুনে ভাল লাগল। তুমি যে আমাদের হিতকামনা কর এতে আমি সুখী হয়েছি।

সত্যকুমার বললেন, এ কথা কেন বলছেন, আমি আপনার ছোট ভাইয়ের মতন। আপনি তো আমার হিতকামনা সব সময়ে করে থাকেন।

কিছু পরে সত্যকুমার বললেন, বৌঠানের যখন পাহাড়ে যাবার ইচ্ছে হয়েছে আপনি তখন আর দেরি করবেন না। যত তাড়াতাড়ি হয় বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুন। আগামী সপ্তাহের শুক্রবার যাত্রা করতে পারেন, দিনটা ভাল।

অতুলপ্রসাদ বললেন, দেখি যদি পারি তো সেই চেষ্টা করব। বরং তুমি কাল একবার এসো।

পরের দিন সত্যকুমার আসতে অতুলপ্রসাদ বললেন, দেখ আমার হাতে দুটো মোকর্দমা আছে, তার একটার কাল নিষ্পত্তি হয়ে যাবে; অন্যটার দিন পড়েছে শুক্রবার। সেইদিনই গাড়ি রিজার্ভের ব্যবস্থা করে দিলে শনিবার রাত্রের গাড়িতে দেরাদুন রওনা হয়ে যাব।

সত্যকুমার বললেন, ঠিক আছে। বৌঠানকে বলেছেন কি?

অতুলপ্রসাদ বললেন, না, তুমি বল গিয়ে।

হেমকুসুম শুনে বললেন, দেখ, না আঁচালে বিশ্বাস নেই। যতক্ষণ না গাড়িতে চড়ছি বিশ্বাস হচ্ছে না।

শুক্রবার সকালে অতুলপ্রসাদের সঙ্গে সত্যকুমার দেখা করলেন। তিনি বললেন, তুমি এসেছ ভালোই হল। তোমাকে টাকা দিচ্ছি। তুমি কালকের জন্যে রিজারভেশানটা করিয়ে দাও। সত্যকুমার টাকা নিয়ে চলে যেতে যেতে বললেন, আজ বিকেলে টিকিট নিয়ে আসছি। এখন অফিসের তাড়া।

সত্যকুমার বিকেলবেলা অফিস-ফেরতা অতুলপ্রসাদের বাড়ি এলেন। শুনলেন সাহেব এখনও বাড়িতে ফেরেন নি। তাই বৌঠানের কাছেই সোজা চলে গেলেন। কুসুম বৌঠানকে দেখেই বললেন, গোছগাছ করে ফেলুন। টিকিট কাটা বার্থ রিজার্ভ হয়ে গেছে।

বৌঠান হেসে বললেন, সমুদ্দুরের ওপর পোল বেঁধে ফেলেছ দেখছি। সীতা উদ্ধারের আর দেরি নেই!

আপনি যেন আমার সঙ্গে কার তুলনা করলেন? তাই যদি হতে পারতাম তাহলে বুক চিরে আপনাদের দুজনকে পাশাপাশি দেখালে খুশি হতেন বৌঠান।

রসিকতায় দুজনেই হাসলেন। টমটমের শব্দে হেমকুসুম বললেন, ওই তোমার দাদার প্রিয় ওয়েলার ঘোড়া দাদাকে নিয়ে বোধহয় কোর্টইয়ার্ডে প্রবেশ করল। অনেক দেরি হল। তোমার দাদা জামা কাপড় ছাড়ুন, মুখ-হাত-পা ধুয়ে নিন। তোমার খবর আমার ভৃত্যই দেবে। তুমি ততক্ষণ এখানে আমার কাছেই বোস।

সত্যকুমার বললেন, বৌঠান আপনি আজকে আমার একটা অনুরোধ রাখবেন। আজ চলুন একবার ও-ঘরে আমার সঙ্গে। আপনাকে যেতেই হবে। ওজর আপত্তি শুনব না।

হেমকুসুম কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আচ্ছা যাব, তুমি যখন বলছ।

একটু পরে সত্যকুমার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চলুন বৌঠান।…হেমকুসুম লজ্জিত ভঙ্গিতে বললেন, তুমি এগোও আমি আসছি।

সত্যকুমার অতুলপ্রসাদের ঘরে প্রবেশ করে বললেন, দাদা, টিকিট হয়ে গেছে। কালকের ট্রেনে বার্থ রিজার্ভ করাও হয়ে গেছে।

অতুলপ্রসাদ ক্লান্তভাবে আরাম কেদারায় বসে ছিলেন। সত্যকুমারের দিকে চোখ তুলে তাকালেন। বললেন, আজ ভেবেছিলাম মোকর্দমাটা শেষ হয়ে যাবে, তা হল না। সোমবারও চলবে। কী করি বল তো?

অতুলপ্রসাদ যখন এই কথা বলছিলেন হেমকুসুম তখন ঘরে প্রবেশ করছেন। কথাটা তাঁর কানেও গেল। তাঁর নত মস্তক দেখে অতুলপ্রসাদ তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন। একই বাড়িতে আছেন অথচ কতদিন তাঁদের দেখা-সাক্ষাত হয়নি, কথাও বন্ধ।

সত্যকুমার বললেন, বৌঠান এসেছেন? দাদার পাশের চেয়ারটায় বসুন। তারপর অতুলপ্রসাদের দিকে ফিরে বললেন, কী বলছিলেন দাদা? বৌঠানেরও পরামর্শ দরকার।

হেমকুসুম এগিয়ে এসে অতুলপ্রসাদের পাশের সোফায় বসতে বসতে বললেন, দেখলে তো সত্যকুমার? বলেছিলাম না যতক্ষণ গাড়িতে না উঠি বিশ্বাস নেই!

অতুলপ্রসাদ খানিক চিন্তা করে বললেন, সত্যকুমার তুমি ভাই একটা কাজ কর। তুমি কিছুদিন ছুটি নিয়ে চল আমাদের সঙ্গে। বেশ আনন্দেই সেখানে আমাদের দিনগুলি

কাটবে। আমি ভাবছিলাম তোমার সঙ্গে কালকেই তোমার বৌঠানকে পাঠিয়ে দিই, তারপর এখানকার কাজটা শেষ করেই আমি সেখানে রওনা হয়ে যাব।

সত্যকুমার বললেন, আমার তো আপনাদের সঙ্গে যেতে খুবই ইচ্ছে করে। কিন্তু বুড়ো বাবা-মাকে ছেড়ে যাই কেমন করে? তার ওপর বাবার শরীরটাও ভাল নেই, কখন কী হয় বলা যায় না। আমি চলে গেলে ডাক্তার ডাকার দ্বিতীয় কোন মানুষ নেই।

হেমকুসুম আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। অতুলপ্রসাদকে বলে ফেললেন, তোমার এই কাজ-কাজের জন্যে আমি পাগল হয়ে যাব!

সে কী বলছ! অতুলপ্রসাদ বললেন, কাজই তো আমাদের লক্ষ্মী, কাজই তো আমাদের অন্ন-বস্ত্র সুখ ঐশ্বর্য জোগাচ্ছে। যাক এসব কথা নিয়ে তর্কাতর্কি করে লাভ নেই, কালকের যাওয়ার কী করা যায় তার একটা ঠিক করতে হবে।

হেমকুসুম মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে মুখভার করে বললেন, তাহলে আমি আর যাব না। বলে রাগ করে ওঠে চলে আসছিলেন, সত্যকুমার বললেন, বৌঠান আপনাদের আমি নিরাশ করতাম না, কিন্তু বাবা-মায়ের কথা ভেবে বড় অসুবিধায় পড়েছি। তবে আমি একটা কথা ভেবেছি। মহেশের পরীক্ষা তো হয়ে গেছে, সে-ই না-হয় কাল আপনাকে আর দিলীপকে নিয়ে যাক। তারপর দাদা তো দু-চারদিনের মধ্যে যাচ্ছেন। তারপর মহেশ না-হয় ফিরে আসবে।

এই কথা শুনে অতুলপ্রসাদ হেমকুসুমকে বললেন, তুমি আর অমত কোরো না। সত্য-কুমার খুব ভাল সাজেসান দিয়েছে। তারপর চাকরকে ডেকে বললেন, দেখ তো মাস্টারবাবু দিলীপের ঘরে পাড়াচ্ছেন কি না! তাহলে আমাদের এখানে পাঠিয়ে দাও।

মহেশ দিলীপকে পড়াচ্ছিলেন, খবর পেয়ে ঘরে এলেন। অতুলপ্রসাদ বললেন, মহেশ, তোমাকে ডেকেছিলাম একটা কাজের জন্যে। তোমার তো পরীক্ষা হয়ে গেছে, এখন ছুটি। তোমাকে ভাই একটা কাজ করতে হবে। আমাদের মুসৌরি যাবার সব ব্যবস্থা কালকের রাতের গাড়িতে হয়েছিল, কিন্তু আমার একটা দরকারি কাজের জন্যে কাল যাওয়া হয়ে উঠছে না, দু-একদিন পরে যাব। কাল তোমাকে দিলীপ আর দিলীপের মাকে সেখানে নিয়ে যেতে হবে।

সে একটু ভাবল। তারপর বললে, আচ্ছা আমি রাজি, আপনি যখন বলছেন।

অতুলপ্রসাদ বললেন, আমি সেখানে তোমাদের জন্যে সেখানকার সিভিল মিলিটারি হোটেলে থাকবার সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। তাদের গাড়িও তোমাদের নিতে আসবে। কোন ভাবনা নেই, হোটেলের মালিকও আমার মক্কেল। সে-ই এখান থেকে টেলিগ্রাম করে বন্দোবস্ত করে দেবে। তারপর বললেন, তুমি কাল সন্ধ্যার আগেই সব ব্যবস্থা করে নাও। জিনিসপত্র নিয়ে চলে আসবে আমার বাড়িতে।

মহেশ উঠে গেল দিলীপের ঘরে। সত্যকুমার বললেন, বৌঠান আপনার তাহলে সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। এখন গোছগাছ করে নিন, আমি আপনাদের কাল ইষ্টিশানে গিয়ে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসব। হেমকুসুম বললেন, যাচ্ছি, কিন্তু তোমার ওপর ভার রইল তোমার দাদাকে যত তাড়াতাড়ি হয় পাঠিয়ে দেবে।

সত্যকুমার হেসে বললেন, নিশ্চয়ই! সত্যকুমার ট্রেনের টিকিট রিজারভেশন স্লিপ ইত্যাদি অতুলপ্রসাদের হাতে এগিয়ে দিলেন, তারপর আবার দেখা হবে বলে বিদায় নিলেন।

হেমকুসুম চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে ঘর থেকে চলে যাচ্ছিলেন, অতুলপ্রসাদ হাত ধরে বললেন বোস।

হেমকুসুম বললেন, কী বলছ বল।

অতুলপ্রসাদ বললেন, এতদিন তুমি আমার সঙ্গে কথা না কয়ে কিরকম করে ছিলে বল তো?

হেমকুসুম বললেন, কেন, তুমিও তো আমার সঙ্গে কথা না বলে আছ। তারপর হেসে বললেন, সত্যকুমার সেদিন যা বলেছিল ঠিকই বলেছিল।

অতুলপ্রসাদ বললেন, কী বলেছিল?

হেমকুসুম বললেন, সে বললে, আপনাদের দু-জনের যা গোঁ! কেউ কম যান না! হবে না কেন, একই রক্ত রয়েছে!

অতুলপ্রসাদ হেসে বললেন, ও মুখফোঁড় লোক। পেটে একটা কথা রাখে না, সবই বলে ফেলে। তারপর বললেন, কুসুম, তোমার জন্যে কাল বড় মন কেমন করছিল যখন ঝম-ঝম বৃষ্টি পড়ছিল। তাই আর বিছানায় শুয়ে থাকতে পারলাম না, একটা গান লিখে ফেললাম। শুনবে?

হেমকুসুম বললেন, আন।

অতুলপ্রসাদ উঠে গিয়ে নিজের শোবার ঘর থেকে প্যাড নিয়ে এলেন। বললেন, পড়ছি শোন। শুধু পড়া নয়, গুন-গুন সুরে সুরেলা কণ্ঠে তিনি গাইলেন:

বঁধুয়া, নিদ নাহি আঁখিপাতে।
আমিও একাকী, তুমিও একাকী
আজি এ বাদল রাতে।
ডাকিছে দাদুরী মিলন তিয়াসে,
ঝিল্লী ডাকিছে উল্লাসে।
পল্লীর বধূ বিরহী বঁধুরে
মধুর মিলনে সম্ভাষে।

আমারো যে সাধ বরষার রাত
কাটাই নাথের সাথে—
নিদ নাহি আঁখিপাতে।
গগনে বাদল, নয়নে বাদল,
জীবনে বাদল ছাইয়া;
এস হে আমার বাদলের বঁধু,
চাতকিনী আছে চাহিয়া।
কাঁদিছে রজনী তোমার লাগিয়া,
সজনী তোমার জাগিয়া।
কোন্ অভিমানে হে নিঠুর নাথ,
এখনো আমারে ত্যাগিয়া?
এ জীবন-ভার হয়েছে অবহ
সঁপিব তোমার হাতে।—
নিদ নাহি আঁখিপাতে।

গান শুনে হেমকুসুম হেসে বললেন, তুমি এতও পারো! যাক রাত হয়েছে, দিলীপের মাস্টার চলে গেল, তোমাদের খাবার দিতে বলি। তুমি খাবার ঘরে এস।

অনেকদিন পরে আবার আনন্দে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করলেন। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ফর্সা হয়ে চাঁদ উঠল, দু-জনের মনের মেঘও কেটে গেল।

॥ তের ॥

পরেরদিন ভোর হতেই পাখির ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। বিছানা ত্যাগ করে নিঃশব্দে শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন হেমকুসুম। তারপর বাগানের সামনের বারান্দায় একটা বেতের চেয়ার টেনে বসে পাখির কাকলি, ফুরফুরে বাতাস আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করতে করতে ভাবলেন, ভগবান, কেন আমার এই সুখে বাধা পড়ে! কেন আমায় রাগেতে পাগল করে তোলে···যার জন্যে দিগ্‌বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ি! আমার তো কোন কিছুরই অভাব রাখ নি! তবে কেন এমন হল? সকলের অমতে বিনা আশীর্বাদে আমাদের এই মিলন, তাই কি এত বাধা পড়ে!

চা-পর্ব আজ একসঙ্গে বসে সমাপ্ত হল। অতুলপ্রসাদ বললেন, তুমি এবার তৈরি হয়ে নাও। কেনাকাটা যদি কিছু সারতে হয় সারো, একসঙ্গে গাড়িতে বেরোবো। আমি এখন কাছারিতে গিয়ে বসছি। তোমার সময় হলে আমায় ডাক পাঠিও।

দিলীপকে পড়িয়ে মহেশ বাড়ি ফিরছিল, হেমকুসুম বললেন, তোমার জিনিসপত্র সঙ্গে করে নিয়ে আমার এখানেই রাখ, একসঙ্গে খেয়ে দেয়ে ইষ্টিশানে যাব।

বিকেল থেকে অতুলপ্রসাদ মক্কেলদের নিয়ে বসেছিলেন। ওদের সঙ্গে কথাবার্তায় সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। মক্কেলদের বিদায় করে ধীর পায়ে উঠে অধৈর্য হেমকুসুমের ঘরে এসে হেসে বললেন, তোমার কথা ভুলিনি। ট্রেনের এখনও দেরি আছে। কোচওয়ানকে গাড়ি আনতেও বলেছি।

হেমকুসুম বললেন, মুখ-হাত-পা ধুয়ে এসে তুমিও আমার সঙ্গে বসে খেয়ে নাও।

অতুলপ্রসাদ বললেন, বেশ, ভাল।

হেমকুসুম কিছু পরে খাওয়ার অবসরে বললেন, দেখ তুমি এখানে যেন বেশি দেরি কোরো না, যত তাড়াতাড়ি পার দেরাদুন চলে এসো। তুমি না এলে আমার ভাল লাগবে না। তোমার জন্যে আমার বড় মন-কেমন করছে। কবে আসবে? আরো কিছু পরে বললেন, আয়া এসে কদিন ছুটি চাচ্ছিল। ওকে কিছুদিনের ছুটি দিয়ে দিয়েছি।

···জিনিসপত্র তোলা হলে সকলে ফিটনে উঠে বসলেন—স্বামী-স্ত্রী এবং একমাত্র সন্তান দিলীপ : পথ থেকে সত্যকুমারকে তুলে নেওয়া হল। সকলে ইষ্টিশানে পৌঁছলেন। মহেশও এসেছিলেন।

অতুলপ্রসাদ হেমকুসুম ও দিলীপকে বললেন, যাও তোমরা কামরায় উঠে বোস।
যথাসময়ে ট্রেন দুলে উঠল। প্ল্যাটফরমের ধার ধরে এগিয়ে চলল। সত্যকুমার বললেন, বৌঠান, এবার বিশ্বাস হচ্ছে তো আপনি সত্যি-সত্যি দেরাদুন মুসৌরি চলেছেন ?
হেমকুসুম জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললেন, তোমার দাদাকে যে-দিন পাঠাতে পারবে সেদিনই বুঝব, আজ নয়।
ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে গেল। অতুলপ্রসাদ কিছুক্ষণ অনিমেষে তাকিয়ে রইলেন। সত্যকুমারের কণ্ঠস্বরে ফিরে বললেন, হ্যাঁ, চল যাওয়া যাক।
পাশাপাশি ফিটনে বসে সত্যকুমারকে বললেন, তোমার বাহাদুরি আছে! যাক তুমি আমাদের একটা বড় কাজ করলে—যা মনান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছিল আমার ভয় হচ্ছিল এর পরিণতি কোথায় গিয়ে না দাঁড়ায়। তোমার তো কাল ছুটি আছে, দশটার পর এসো না আমার সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করবে। সারা দুপুর তোমার সঙ্গে গল্পগুজব করা যাবে।
সত্যকুমার বললেন, বেশ, আপনি যখন বলেছেন যাব। ফিটন সত্যকুমারের বাড়ির কাছাকাছি আসতে সত্যকুমার বললেন, গাড়িটা এখানেই থাক, গলির মধ্যে গিয়ে কাজ নেই ; আমি চলে যাব। ফিটন থামতে সত্যকুমার বাড়ির পথ ধরলেন। কোচওয়ানকে অতুলপ্রসাদ বললেন, বাড়ি চল। কিছুদূর চলার পর কোচওয়ানকে বললেন, গাড়ি ঘোরাও, চল গোমতী নদীর ধারে ধারে।......
জো হুকুম।
কোচওয়ান সেলাম দিল।
রিভার-ব্যাঙ্ক রোড ধরে অতুলপ্রসাদের ভিক্টোরিয়া ফিটন এগিয়ে চলল। শীর্ণকায়া গোমতীর জলধারা বয়ে চলে। এমনিতে গোমতী বড় শান্ত, কিন্তু যখন বন্যা নামে, দু-কূল ভাসিয়ে চলে। তবে তা কদাচিৎ, পদ্মা-মেঘনার মত অহরহ নয়। 'পদ্মা' এই কথাটির মধ্য দিয়ে পূর্ব বাঙলার স্মৃতি মনে ভাসে। অদূরে অস্তমিত সূর্য লোহাপুলের ধার ঘেঁসে। লক্ষ্মণটিলার ওপর নবনির্মিত মেডিকেল কলেজ। এপাশে ভুলভুলাইয়া, ছত্তর মঞ্জিল, নবাবের প্রসাদ—এখন ইংরেজদের ক্লাব, কোলাহল অট্টহাস্য আনন্দ-হুল্লোড়ে মত্ত। গোমতীর ওপরে নতুন লখনউ ধীরে-ধীরে এগিয়ে চলেছে—বাটলারগঞ্জ…হেমকুসুম এখন অনেক দূরে এগিয়েছে। …গোমতীর ধারে-ধারে চলে অতুলপ্রসাদের ভিক্টোরিয়া ফিটন। বনেদী সাদা রঙের ওয়েলার ঘোড়া ক্ষুরে শব্দ তোলে ঠক্ ঠকাস্ ঠক্ ঠক্। খাঁটি লখনউর পোশাক অতুলপ্রসাদের অঙ্গে—সাদা মসলিনের শেরওয়ানি, চুড়িদার পায়জামা, চিকন কাজের বাঁকা টুপি। মনে সুর আসে গুন-গুন। ভিক্টোরিয়া ফিটন থেকে নেমে শেরওয়ানির পিছনে হাতদুটি মুষ্টিবদ্ধ করে পায়চারি করেন

আপন মনে। মনে সুরের খেলা যখন চলে তখন নতুন গানের আনাগোনা হয়। মুক্তি চায় কথা সুরে সুরে:

কে গো তুমি আসিলে অতিথি মম কুটিরে ?
কবে যেন দেখেছি তোমারে আমি
কুঞ্জ-কুসুম হাতে ফিরিতে যমুনা-তীরে।
ও দুটি নয়নমণি চিনি যে গো আমি চিনি,
কাজল মধুপ-ছায়া দেখেছি ফুল-শিশিরে।
জানি ও উজল হাসি, বিষাদ-তমস-নাশী,
দেখেছি বঙ্কিম ধনু নীল নীরদ-নীরে।

কোচওয়ান গাড়ি নিয়ে এল। দরজা খুলে সেলাম দিল। বললে, এবার কোন্ দিকে যাবেন সাহাব ?

ওয়েলার ঘোড়ার গায়ে হাত বুলিয়ে ফিটনে চড়লেন অতুলপ্রসাদ। বললেন, বাড়ি চল। বাড়িতে এসে খানসামাকে ডাকলেন, কালকের জন্য মোগলাই খানা বানাতে হুকুম দিলেন। খাদ্যরসিক অতুলপ্রসাদ।

কাল রবিবার। ছুটির দিন। ছুটির দিনে বন্ধু বান্ধব ভক্ত শিষ্য শিষ্যা সকলের অবারিত দ্বার। আর তারা এলে তাদের জন্যে সামান্য কিছুর বন্দোবস্ত করতে হয় বৈকি।

সকালে মক্কেলদের জন্যে কিছু সময় ব্যয় করলেন। এগারোটার সময়ে সত্যকুমার এলেন। বললেন, এস এস সত্যকুমার।

চর্ব্য-চোষ্য খেয়ে দুজনে ডিভানে শুয়ে নানান গল্পগুজব করলেন। চারটে বাজতেই সত্যকুমার লাফিয়ে উঠলেন—হকি ম্যাচ আছে। একটা ভালো টিমের সঙ্গে আমাদের ক্লাবের। যাব মনে করছি।

অতুলপ্রসাদ বললেন, চা-টা খেয়ে যাও।

চা-পান করে সত্যকুমার ছুট দিলেন। বিকেলবেলা ছুটির দিনে বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে হল না। স্নান সেরে জামা কাপড় বদলিয়ে অতুলপ্রসাদ ছড়ি হাতে বেরিয়ে পড়লেন। গোমতী নদীর ধারে নির্জন রিভার-ব্যাঙ্ক রোডে বেশ খানিকটা বেড়িয়ে যখন ফিরলেন তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। বসার ঘরে দু-চারজন লোক বসে আছেন। অফিস-ঘরে আলো জ্বলছে। সহকর্মী ব্যারিস্টার মমতাজ হোসেন বসে আছেন তাঁর জন্যে। তাঁকে অভিনন্দন জানাতে হাত মিলিয়ে অতুলপ্রসাদ বললেন, কী ব্যাপার ?

মমতাজ হোসেন বললেন, দেখ, বার-কাউন্সিলের সভাপতি নির্বাচন করা হবে ক-দিন পরে।

অতুলপ্রসাদ বললেন, সে তো আমি জানি।

মমতাজ হোসেন বললেন, শুধু জানলেই হবে না। এবার তোমাকে সভাপতি করতে চাই—আমাদের পার্টি এবং লালার পার্টির সকলে তোমাকে ভোট দেব। তুমি রাজি কি না বল?

অতুলপ্রসাদ বললেন, সে কী করে হয়! পণ্ডিত গোকরন মিশ্র পুরনো এবং বিজ্ঞ লোক, আমি তো তাঁর কাছে নগণ্য।

মমতাজ জানালেন, আমরা তোমার নাম নির্বাচন করেছি। তোমায় দাঁড়াতেই হবে। আমি তোমার কথা বিশ্বেশ্বর নাথের কাছে বলেছি। তিনি বলেছেন, তুমি সভাপতি-পদে দাঁড়ালে তাঁদের পার্টির সকলেই তোমাকে ভোট দেবেন।

অতুলপ্রসাদ ভাবলেন, ঈশ্বরের অসীম করুণা। বললেন, আপনারা যা স্থির করছেন আমি রাজি আছি। কিন্তু কথাটা আর একবার ভেবে দেখবেন। তারপর বললেন, হোসেন সাহেব, কী খাবেন বলুন, চা না কফি?

আজ কিছু না, কিছু না। মমতাজ হোসেন বললেন, আগে তুমি বার-কাউন্সিলের সভাপতি হও তারপর আমরা একটা ভোজ খাব তোমার কাছে। আজ উঠি। এই বলে তিনি উঠে পড়লেন। অতুলপ্রসাদ তাঁকে ফটক পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলেন।

একজন লোক লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জ্ঞান চক্রবর্তী মহাশয়ের কাছ থেকে একখানি চিঠি নিয়ে এসেছিলেন, অতুলপ্রসাদ চিঠিখানি হাতে নিয়ে পড়লেন। জ্ঞান চক্রবর্তী জানিয়েছেন, আপনাকে আমার খুব প্রয়োজন। আপনাকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকরী সভার সভ্যরূপে মনোনীত করতে মনস্থ করেছি। একদিন সাক্ষাৎ হলে বাধিত হব। আগামী সোমবার আপনি কি কাছারির পর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে আমাদের সঙ্গে মিলিত হতে পারেন?

অতুলপ্রসাদ দেখা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিলেন। সকলে চলে যেতে অতুলপ্রসাদ ঘরে বসে নিশ্চিন্ত হয়ে সিগার ধরালেন। তারপর মনে মনে ভাবলেন, কোথায় কাছারির কাজ সেরে দেরাদুন মুসৌরি যাব তা নয়, দুটো কাজের বাধা এসে গেল। এখন শ্যাম রাখি না কুল রাখি! ভগবানের দেওয়া সম্মান, অথবা স্ত্রীর মনোরঞ্জন। কুসুম নিশ্চয়ই খুউবই রাগ করবে আমার দেরি হলে। যাক কালকেই তাকে সব কথা জানিয়ে চিঠি দিয়ে দেব।

সাতটা আটটা বাজতেই একের পর এক বন্ধু-বান্ধব আসতে শুরু করল। সকলের জন্যেই অবারিত দ্বার। গান গল্প আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে সময়টা কোন্ দিক দিয়ে এগিয়ে যায়—বোঝাই দায় হয়। বস্তুত সপ্তাহের ছটা দিন কাজে কাজে থাকে ঠাসা। কোর্ট কাছারি উকিল মক্কেল,—এদের নিয়ে জীবন কাটে। নিশ্বাস ফেলার অবসর থাকে না ব্রীফের চাপে। রবিবার একটু খুশির হাওয়া, মুক্তির আনন্দ,

অন্য জগতের খবর আনে। সেদিন শুধু গান আর গান আর গান। রবিবারে হেমকুসুমও যেন কেমন দূরের মানুষ। হেমকুসুমের কথাও মনে থাকে না। কত হাসি, কত যে গান……

অতুলদা, আপনি সেদিন যে গান শেখাচ্ছিলেন তুলতে পারি নি। আজ কিন্তু আপনার কাছ থেকে তুলে নেব।

কী গান শেখাচ্ছিলাম বল তো! আমার মনে পড়ছে না।

ওই যে, মেয়েটি বলে: কত গান তো হল গাওয়া আর মিছে কেন গাওয়াও……

'অতুলদা' গাইলেন:

যদি যতই মরি ঘুরে
তুমি ততই রবে দূরে,
তবে কেন বাঁশির সুরে
তব তরে শুধু ধাওয়াও?

অতুলদা, অপূর্ব আপনার গাওয়া! এমন প্রাণ-মন দিয়ে আর কে গাইতে পারে? আপনার লেখা গান আপনার গলায় না শুনলে জীবন অসার্থক!

বিদেশ থেকে আনা ছোট্ট একখানি হারমোনিয়াম। কোলের কাছে কত আদরে তুলে সুরেলা কণ্ঠে গাইলেন:

যদি সন্ধ্যা হলে বেলা
নাহি মিলে তব বেলা,
পথ ভোলা মোর ভেলা
এ অকূলে কেন বাওয়াও?

অতুলদা……অতুলদা—

'যদি আমার দিবারাতি
কাটি' যাবে বিনা সাথী
তবে কেন বঁধুর লাগি
পথ পানে শুধু চাওয়াও?

অতুলদা……

বড় ব্যথা তোমায় চাওয়া;
আরো ব্যথা ভুলে যাওয়া;
যদি ব্যথী না আসিবে,
এত ব্যথা কেন পাওয়াও?

অতুলদা আপনার গান আপনার মুখ থেকে শোনার মত সার্থকতা আর নেই।

* * * *

পরের দিন যে মোকদ্দমাটার জন্যে যাওয়া হল না দেরাদুন, তা আরো দু-দিন চলল। তারপর বার অ্যাসোশিয়েশনের সভাপতিত্বের জন্যে তাঁর বন্ধুরা যে প্রস্তাব এনেছিল তার নির্বাচনও দু-এক দিনের মধ্যে হবে। লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জ্ঞানেন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকরী সভার সভ্য করে নিয়ে তাঁর উপর একটা গুরু দায়িত্ব দিয়েছেন। এসবের জন্যে নিশ্বাস ফেলবার উপায় নেই।

হঠাৎ খবর পেলেন সরলা দেবী আসছেন লখনউয়ে।···সেদিন কী আনন্দের দিন! সরলা দেবী এলেন অতুলদাদার গৃহপ্রাঙ্গণে। বন্দেমাতরম গান গাইলেন। সহস্রাধিক শ্রোতা মুগ্ধ, স্তব্ধ, নির্বাক হয়ে যেন গানের লহরে লহরে আনন্দে সাঁতার কাটতে লাগল। সমস্ত পাড়াটা যেন সঙ্গীত-ঝঙ্কারে আমোদিত হল। তারপর অতুলপ্রসাদ মিষ্ট কণ্ঠে সুললিত কবিসুলভ ভাষায় সরলা দেবীকে প্রশংসাসূচক যে ভাষায় মালা পরিয়ে দিলেন তাতে সরলা দেবী পরিতোষ লাভ করে স্বীকার করলেন যে মালার গুরু ভারে তাঁর মস্তক নত হয়েছে এবং সে ভার বহন করা তাঁর সাধ্যের অতীত। সরলা দেবী লখনউ থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন।

এমনি করে কয়েকটা বছর পার হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথের চিঠি পেলেন অতুলপ্রসাদ। চিঠি তো শুধু নয়, আমন্ত্রণ।···রবীন্দ্রনাথ গরমের সময়টা রামগড়ে পাহাড়ি জায়গায় কয়েকটা দিন কাটাবেন স্থির করেছেন। রামগড় কাঠগুদাম থেকে অল্প দূরে; যাত্রাপথে লখনউ ছুঁয়ে যাবেন রবীন্দ্রনাথ। অতুল তুমিও আমার সঙ্গে চল, কয়েকটা দিন রামগড়ে একসঙ্গে আনন্দে কাটানো যাবে।

কিগো অতুল, যাবে নাকি আমার সঙ্গে? রামগড়ে আমার বাড়িটি বেশ ভাল। নাম দিয়েছি 'হৈমন্তী'। প্রায় তিনশো বিঘে জমির ওপর বাগান-বাড়ি—আছে আপেল পেয়ারা পীচ খোবানি আখরোট ফলের গাছ। চল, চল।

রবীন্দ্রনাথ ডাক দিয়েছেন। তাঁর অমূল্য সঙ্গ ত্যাগ করা যায়? নিশ্চয়ই নয়। ···হেমকুসুম রাগ করবে। বড় অভিমানিনী······কিন্তু···

১৯১৪, মে-জুন মাস। কবি রবীন্দ্রনাথ কন্যা পুত্রবধূ পরিবারের লোকজন-সমেত হিমগিরির পায়ের তলায় রামগড়ের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন।

রবীন্দ্রনাথ বদরিকাশ্রম তীর্থদর্শন করে হিমালয় ঘুরে ফেরার পথে মুকুল দে ও দিনেন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে রামগড় পৌঁছে গেলেন। এলেন অতুলপ্রসাদ। পরে এলেন সি. এফ. অ্যানড্রুজ। বাড়ি জমজমাট, দিনেন্দ্রের আগমনে আরো জমে উঠল। গল্পগুজব হাসি গানের বিরাম রইল না। আহারের প্রচুর ব্যবস্থা হল—নিজেদের বাগান থেকেই

আমদানি হল শাক-সজি, টাটকা ফলমূল। সবচেয়ে জমিয়ে দিল গান। গায়কের ত্র্যহস্পর্শ—একই জায়গায় রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, দিনেন্দ্রনাথ। 'হৈমন্তীতে' গানের ফোয়ারা ছুটল। রবীন্দ্রনাথ সব কাজ ছেড়ে প্রতিদিন নতুন গান রচনা করে তাতে সুর দিতে লাগলেন। দীনেন্দ্র কাছে রয়েছে, রবীন্দ্রনাথ নির্ভয়। সুর হারিয়ে যাবে না, তাকে একবার নতুন সুর শোনালেই সে মনে রাখবে। তাই মনের আনন্দে রবীন্দ্রনাথ গান বাঁধতে লাগলেন। নতুন কী গান বাঁধা হয়েছে শোনায় সকলের আগ্রহ। কিন্তু সবচেয়ে বেশি আগ্রহ বোধহয় অতুলপ্রসাদের।

আজ—আজ কী গান লিখলেন, কী সুর দিলেন? অতুলপ্রসাদ বলেন।

তোকে যে গান কাল শেখালাম, রবীন্দ্রনাথ দিনেন্দ্রকে বলেন, তুই-ই গেয়ে দে না। আমার কি ছাই মনে আছে?

দিনেন্দ্র গান ধরেন। একটা শেষ হলে আর-একটা। অতুলপ্রসাদের তবু তৃষ্ণা মেটে না। নতুন গান শেষ হলে পুরনো গান থেকে গাইতে বললেন, তাঁর যেগুলি বিশেষ ভাল লাগে। রবীন্দ্রনাথ তখন অতুলপ্রসাদকে বললেন, তোমার আশ তো মিটল, এখন আমাদের আশ মেটাও। আমরা এবার তোমার গান শুনি। অতুলপ্রসাদ তখন তাঁর মিষ্টি গলায় গানের পর গান গেয়ে যান। বনমালী যতক্ষণ না 'খেতে যে হবে' বলে সভা ভেঙে দেয় ততক্ষণ গান আর বন্ধ হয় না।

রামগড়ের দিনগুলো রবীন্দ্র-সঙ্গমে কী আনন্দেই না পার হয়েছিল।

অতুলপ্রসাদের নিজের কথাতে সে সব দিনের কথা শোনা যাক।···"একদিন বৈকালে প্রবল বেগে বর্ষা নামিল এবং অনেক রাত্রি পর্যন্ত অবিরাম বৃষ্টি হইল। সেদিন আমাদের বর্ষার আসর বসিল বৈকাল হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি প্রায় দশটা পর্যন্ত। কবি একাধারে বর্ষার কবিতা পাঠ করিলেন এবং গান গাইলেন। সে দিনটা আমি কখনও ভুলিব না। রাত্রি আটটার সময়ে খাবার প্রস্তুত। কবিকন্যা এবং পুত্রবধূ দ্বারে দাঁড়াইয়া আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন। কবির কিম্বা আমাদের কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই। বর্ষাগীতির মাদকতায় আমাদের বাহ্যজ্ঞান রহিত করিয়াছে। ক্ষুৎপিপাসা তিরোহিত হইয়াছে। ···এই প্রসঙ্গে একটি হাসির কথা মনে পড়িতেছে। সে আসরে রবীন্দ্রনাথ একবার আমাকে আদেশ করিলেন, অতুল তোমাদের দেশের একটা হিন্দী গান গাও তো হে!' আমি গাহিলাম, 'মহারাজ কেওরিয়া খোল বসকি বুঁদ পড়ে।' সময়োপযোগী বলিয়া সকলের সে গানটি ভাল লাগিল। কবি সে গানটি আমার সহিত গাহিতে লাগিলেন।—আমাদের সকলকেই বর্ষার মোহ আচ্ছন্ন করিয়াছে, এমনকি সঙ্গীত-অজ্ঞ রেঃ অ্যানড্রুজ সাহেবকেও এই গানের ছোঁয়া ধরিল। তিনি অদ্ভুত উচ্চারণ করিয়া এবং ততোধিক বেসুরো কণ্ঠস্বরে আমাদের সহিত গাহিতে লাগিলেন

'মহারাজা কেওরিয়া…খেলো।' তাঁর সঙ্গীতের আকস্মিক উচ্ছ্বাস রোধ করা দুষ্কর দেখিয়া আমরা তাঁকে বাধা দিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিলাম না। …সেবার রামগড়ে কবির গান রচনার একটি স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিলাম। তিনি যে ঘরে শুইতেন আমার শয্যা সেই ঘরেই ছিল। আমি দেখিতাম তিনি প্রত্যহ ভোর না হইতেই জাগিতেন এবং সূর্যোদয়ের পূর্বেই বাটির বাহির হইয়া যাইতেন। একদিন আমার কৌতূহল হইল। আমিও তাঁহার অলক্ষিতে তাঁহার পিছু পিছু গেলাম। আমি একটি বৃহৎ প্রস্তরের অন্তরালে নিজেকে লুকাইয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম তিনি একটি সমতল শিলার উপর উপবেশন করিলেন। যেখানে বসিলেন তার দুইদিকে প্রস্ফুটিত সুন্দর শৈলকুসুম। তাঁর সম্মুখে অনন্ত আকাশ এবং হিমালয়ের তুঙ্গ গিরিশ্রেণী। তুষারমালা বালরবি-কিরণে লোহিতাভ। কবি আকাশ এবং হিমগিরি পানে অনিমেষ তাকাইয়া আছেন। তাঁর প্রশান্ত ও সুন্দর মুখমণ্ডল ঊষার আলোয় শান্তোজ্জ্বল। তিনি গুন-গুন করিয়া তন্ময় চিত্তে গান রচনা করিতেছেন…'এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর।' আমি সে স্বর্গীয় দৃশ্য মুগ্ধ নয়নে দেখিতে লাগিলাম এবং তাঁর সেই অনুপম গানটির সদ্য রচনা ও সুরবিন্যাস শুনিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ তাহা দেখিলাম এবং শুনিলাম, এবং তিনি নামিয়া আসিবার পূর্বেই পলাইয়া আসিলাম। আর একদিন প্রাতে শুনিলাম তিনি তেমনি করিয়া গান রচনা করিতেছেন—'ফুল ফুটেছে মোর আসনের ডাইনে বাঁয়ে পূজার ছায়ে।' এইরকম করিয়া প্রায় প্রাতে লুকাইয়া তাঁর গান রচনা শুনিতাম আর বাণীর বরপুত্রের সেই দেবময় মূর্তি হিমালয়ের কোলে উপবিষ্ট দেখিতাম। একদিন ধরা পড়িয়া গেলাম। পলাইয়া আসিবার সময়ে দেখিয়া ফেলিলেন। সুচতুর কবি বুঝিলেন যে গোপনে আমি তাঁর গান শুনিতেছিলাম। তিনি ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'অতুল এখানে এত ভোরে যে, কোথায় ছুটে যাচ্ছ?' আমি দেখিলাম ধরা পড়িয়াছি, আর উপায় নাই। বলিলাম, 'লুকাইয়া আপনার গান শুনিতেছিলাম।'

তার দুইদিন পরে তিনি যখন আমাদের শুনাইলেন—'এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর', আমি বলিলাম—ওই গানটি আমি শুনিয়াছি। তিনি বলিলেন—পূবে কী করে শুনলে? আমি তো মাত্র দু-দিন হল গানটি রচনা করেছি। আমি বলিলাম—রচনা করবার সময়েই শুনেছিলাম।

কবি বললেন, তুমি তো বড় দুষ্টু! এই রকম করে রোজ শুনতে বুঝি? আমরা সকলে খুউব হাসিলাম।

…… একদিন বৈকালে বাহিরে বসিয়া আমরা চা ও গৃহজাত নানাপ্রকার সুখাদ্যর সম্ভোগে ব্যস্ত ছিলাম, কবি হঠাৎ পিছন হইতে আসিয়া, অতুল, এস বলে হাত ধরে

টানিয়া লইয়া চলিলেন। তাহার কন্যা ও পুত্রবধূ বলিয়া উঠলেন—বাবা ওকি, অতুলবাবুর যে খাওয়া এখনো শেষ হয়নি।—তা হবে এখন, বলিয়া সঙ্গে লইয়া চলিলেন। তাঁহার বালকের মত উৎসাহ আমার বড় মধুর লাগিল। আমি আগ্রহের সঙ্গে চলিলাম। তিনি অনতিদূরে লইয়া গিয়া পরম রমণীয় পত্রপুষ্পশোভিত একটি সুন্দর নির্জন স্থান আমাকে দেখাইলেন। তিনি বলিলেন, আমি রোজ এখানে আসি। এখানে বসি, গান গাই এবং গান রচনা করি। আমি অনুরোধ করিবামাত্রই কয়েকটি গান সেখানে বসিয়া আমাকে শোনাইলেন। কী যে ভাল লাগিয়াছিল বলিতে পারিতেছি না। ফিরিয়া আসিলে কবিকন্যা বলিলেন, বাবা, তোমার যে কাণ্ড, অতুলবাবুকে না খাইয়ে কোথায় এতক্ষণ ধরে রেখেছিলে? তিনি বলিলেন, অতুলকে জিজ্ঞেস কর। আমি বললাম, আমি সেখানে খুউব ভাল জিনিস খেয়ে এসেছি।

·····রামগড়ের সে দশ দিনের সে অবিরাম আনন্দ ও গীতোৎসব কখনো ভুলিব না।"*

রামগড় থেকে ফিরে এলেন অতুলপ্রসাদ। আবার শুরু হল তাঁর কর্মময় জীবনধারা। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সমাজের সকল স্তরের মানুষের আন্তরিক ডাক উপেক্ষা করা যায় না। অধিকার করল অনেকখানি সময় কোর্ট কাছারি এবং কবির চিন্তামগ্ন মন। গায়ক গোষ্ঠী ··সুর-পাগল মানুষেরা এসে ঘিরে ধরল। ইতিমধ্যে হেমকুসুম নানান দেশ বিদেশ ঘুরে ফিরে এসেছেন। তা সত্ত্বেও সম্পর্ক হল তিক্ত। হেমকুসুমের শরীর সুস্থ, মন অসুস্থ। নানারকম সন্দেহ তাঁকে ঘিরে ধরল, কুরে কুরে খেল। নানারকম যুক্তি তাঁর: যেহেতু তিনি সুস্থ তাই অতুলপ্রসাদ তাঁকে আর দেখছেন না—তাঁর জন্যে একটুকু সময় ব্যয় করেন না। আবার মুখ দেখা-দেখি বন্ধ হয় বুঝি। ঝড়ের সূচনা দেখা দিল—ক্রমে ঝড় এসে পড়ল। অতুলপ্রসাদের একজন বন্ধু ও বন্ধুপত্নী এলেন কোন পারিবারিক উৎসবে তাঁদের নিমন্ত্রণ জানাতে। নিমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁরা বিদায় নিলেন।

অতুলপ্রসাদ তাঁর অফিস-ঘরে পরিবৃত মক্কেলদের মাঝ থেকেও অভ্যর্থনা করে তাঁদের হাসিমুখে ফটক পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এলেন। বললেন, নিশ্চয়ই যাব নিমন্ত্রণে। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! আপনারা কী খাওয়াচ্ছেন বলুন। কী কী মেনু?

মার্কেট থেকে পছন্দমত উপহার কিনে বাড়ি ফিরলেন। জামা-কাপড় বদলে খাবার ঘরে চা-জলখাবার খেতে বসেছেন। হেমকুসুমকে ঘরে দেখতে না পেয়ে ভৃত্যকে বললেন, মেমসাহেব কোথায়?

---

* অতুলপ্রসাদ রচিত 'আমার কয়েকটি রবীন্দ্র-স্মৃতি' থেকে (উত্তরা-প্রকাশিত ষষ্ঠ বর্ষ, মাঘ ১৩৩৮ সাল; পৃষ্ঠা ৪৫৫-৪৬০)

ভৃত্য জানালো, তিনি তাঁর ঘরেই আছেন।

অতুলপ্রসাদ কি মনে করে চায়ের পেয়ালা হাত থেকে টেবিলে নামিয়ে তাঁকে ডাকতে গেলেন।

হেম শোন—হেম, উৎফুল্ল অতুলপ্রসাদ বললেন, এতদিন একটা কেস নিয়ে বড় ব্যস্ত ছিলাম, হাঁফ ছাড়বার ফুরসত পাইনি। আজ মিটে গেছে। খুউব খাটুনি গেছে, জান! যাক, চল আজ বন্ধুর উৎসবে গিয়ে একটু আমোদ করে আসি চল।

হেমকুসুম চোখ তুলে তাকালেন।

হ্যাঁ শোন, আর একটা কথা। জন্মদিনের উপহার স্বরূপ একটা উপহার কোর্ট থেকে ফেরার পথে কিনে এনেছি। এই বলে ঘরে উঠে গিয়ে কাপড়ের প্যাকেটটা নিয়ে এসে হেমকুসুমের সামনে মেলে ধরলেন খুব খুশি মনে।

উপহারের কাপড়টা দেখেই অকস্মাৎ হেমকুসুমের পুরোনো বীভৎস ভয়ঙ্কর রাগ জেগে উঠল। রক্তবর্ণ চক্ষুগোলক কাঁপতে কাঁপতে স্থির হল। ঝড়ের পূর্বাভাস। বললেন, তা তো আনবেই! আনবে না কেন, আনবে বৈকি! হঠাৎ হেমকুসুম উঠে দাঁড়িয়ে কাপড়ের বাণ্ডিলটা হাতে ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন ঘরের কোণে। বললেন, যাও তুমি একা যেখানে খুশি, আমি যাব না!

অতুলপ্রসাদ কথা না বাড়িয়ে ঘর ছেড়ে টমটম হাঁকিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে অনির্দিষ্ট পথে যাত্রা করলেন।

অনেক রাতে বাড়ি ফিরে এলেন। ঘর-বাড়ি তখন পোড়া গন্ধে ছাওয়া। হাওয়ায় পোড়া গন্ধ। এল সন্দেহ।

হেমকুসুম কোথায়?

দেখলেন, হেমকুসুম তাঁর এক একখানি দামী স্যুট এবং সার্ট এনে জড়ো করেছিলেন উঠোনে, তাতে আগুন জ্বালিয়েছেন। তাঁর বাইরের পোশাকের কোন একখানিও আর অবশিষ্ট রাখেন নি। কাল যে কী পরে কোর্টে যাবেন তারও ঠিকানা নেই। মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছিল, তবু স্থির এবং শান্ত মনে চিন্তা করলেন অতুলপ্রসাদ। ঘুম এল না চিন্তার ভারে। কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌছনো গেল না। অবশেষে ভোর হল।

ভোর হলে তিনি অন্য কোনখানে চলে যাবার জন্যে মনস্থির করলেন। ভৃত্যকে বললেন তাঁর যা কিছু বাকি জামা-কাপড় পোশাক-আশাক যেন তাঁর স্যুটকেসে গুছিয়ে দেয়। তিনি একটু একা বাইরে যাবেন। বিছানাপত্র সে যেন বেঁধে-ছেঁদে রাখে; তারপর বললেন, কোচওয়ানকে বল গাড়ি বার করতে, আমি একটু ঘুরে আসব। এই বলে তিনি গাড়িতে বেরিয়ে পড়লেন। বন্ধুবরের বাড়িতে গিয়ে বললেন, আমি

কিছুদিনের জন্যে কলকাতা যাব মনস্থ করেছি। আমার হাতের মামলা-মোকর্দমাগুলো তুমিই দেখো। মুন্সিজী তোমাকে সব কাগজপত্রগুলো দিয়ে যাবে।

বেশিক্ষণ দাঁড়াতে ইচ্ছে হল না। শরীর যেন ভাল মনে হচ্ছিল না। অতুলপ্রসাদ বিদায় নিলেন। বাড়িতে এসে মুন্সিজীকে বললেন, আমি কিছুদিনের জন্যে বাইরে যাচ্ছি। মেমসাহেব ও দিলীপ থাকবে। তুমি এসে রোজ দেখাশোনা করবে। আমি চলে গেলে আমার গাড়ির কোচওয়ানকে ছুটি দিয়ে দিও। আমার খিদমৎগার ভৃত্যও বলছিল দেশে যাবে। তাকেও দেশে পাঠিয়ে দিও। আয়া, মালি, খানাসামা ও মেমসাহেবের গাড়ি থাকবে। দেখবে এদের যেন কোন কষ্ট না হয়। আমি মাঝে মাঝে তোমাকে চিঠি লিখব। এখানকার খরচপত্রেরও ব্যবস্থা করে যাচ্ছি। আমার বন্ধু ব্যারিস্টার সাহেবের কাছে তুমি তোমার মোকর্দমার কাগজপত্র নিয়ে যাবে। তিনিই সব কাজ করবেন। তিনি যা বলবেন তাই কোরো তাঁর কথা-মতো।

ভাবলেন একবার হেমকুসুমের সঙ্গে দেখা করে যাবেন। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন হেমকুসুমের ঘরের দিকে। তারপর কি মনে করে ফিরে এলেন। এসে আরাম কেদারায় শুয়ে ভাবলেন আপন মনে হেসে, এর আগেরবার মিটমাট হয়েছিল সত্যকুমারের জন্যে। কিন্তু বোধহয় মিটমাট রফা তাঁদের মধ্যে কোনদিনই হবে না, কোনদিনই তাঁদের মনের মিল হবে না। আশ্চর্য, কেমন করে মনে মিল হয়েছিল সেকথা ভেবে এখন আশ্চর্য মনে হয়। ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

ঘুম ভেঙে দেখলেন, অফিস-ঘরে মক্কেলরা বসে আছেন। এঁরা এখনো জানেন না সেন সাহেব লখনউ থেকে বিদায় নিচ্ছেন। মুন্সিজীর কথা ওঁরা অনেকেই বুঝতে পারছেন না, বিস্ফারিত নয়নে তাকিয়ে আছেন। অনেকে নানা প্রশ্নে মুন্সিজীকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছেন। অতুলপ্রসাদ তাঁদের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে ভৃত্যকে বললেন, কোচোয়ানকে বল গাড়ি বার করতে, স্টেশন যাব। আর তুমি আমার জিনিসপত্রগুলো গাড়িতে তুলে দাও। দেরি কোরো না। আমার ট্রেনের সময় হয়ে গেছে। আর আমি কোথায় যাচ্ছি মেমসাহেব যদি প্রশ্ন করেন তবে বোলো জানি না, আমাদের কোন কথা বলে যাননি।

একথা বলে অতুলপ্রসাদ কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন। তারপর তাঁর প্রিয় ভিক্টোরিয়া ফিটন গাড়িতে চড়ে কোচোয়ানকে বললেন, স্টেশন চলো।

(চৌদ্দ)

এরপর যবনিকা উঠল ১৯১৬ সালে। অতুলপ্রসাদ পারিবারিক কারণে লখনউ ত্যাগ করে কলকাতাবাসী হয়েছেন। ইচ্ছা কলকাতায় বাস করে এখানেই ব্যারিস্টারি করবেন। ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ, লর্ড সত্যপ্রসন্ন সিংহ এবং কলকাতার আরো কয়েকজন তাঁকে অনুপ্রেরণা দিলেন। কলকাতায় বাস করে এখানেই প্র্যাকটিস করুন, কেন অত দূরে আমাদের ছেড়ে থাকবেন !

অতুলপ্রসাদ ফ্ল্যাট ভাড়া নিলেন ওয়েলেসলি স্ট্রীটের মোড়ে ওয়েলেসলি ম্যানশনে। লখনউ ত্যাগ করে এসে রোজকার অশান্তির হাত থেকে মুক্তি পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। শান্তি পেলেন।

কলকাতায় এসে মায়ের সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁর অতুল কলকাতায়·· মায়ের প্রতিদিনের প্রতীক্ষা চলে। অতুল এলেন মায়ের কাছে। মায়ের স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে, সে রূপ নেই। মা জীবনে শোক তাপ কম ভোগ করেন নি। বেশি দুঃখ এবং শোকে মানুষ অনেক সময়ে পাগল হয়ে যায়, কিন্তু তিনি ভগবানের মুখ চেয়ে সকল কিছু সহ্য করেছেন। তাঁর অতুলের জীবনও নানা পরীক্ষা নানা সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলেছে। তিনি বুঝতে পারেন তাঁর স্নেহের ধন অতুল মাঝে-মাঝে ভেঙে পড়ে মাঝে-মাঝে অধৈর্য হয়, কিন্তু তিনি জানেন ভগবানের প্রতি বিশ্বাসই তাকে সহ্য করবার শক্তি দেবে, বল দেবে। ঈশ্বর-বিশ্বাসী, ঈশ্বর-নির্ভর হওয়া ছাড়া উপায় নেই। শান্তি নেই।

অতুলপ্রসাদ সুবালা মাসীদের সঙ্গে দেখা করলেন। ছেলেবেলার দিনগুলোর কথা স্মরণ হল। মেসোমশাই ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য। সাহানা, সুপ্রভা, রেণুকা, কনক, উষা এদের শেখা নতুন গানগুলো শুনলেন, শুনে ভুল ত্রুটি শুধরিয়ে দিলেন।

অমল একদিন এসে বললে, চলুন সাহিত্যিক শিল্পীদের আড্ডায়। কলকাতা সাহিত্যের রঙ্গভূমি। কয়েক বছর আগে অমল হোম অতুলপ্রসাদকে সঙ্গে নিয়ে ভারতী অফিসের বৈঠকে উপস্থিত হয়েছিলেন। পরিচয় হয়েছিল সেদিন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তর সঙ্গে কবি অতুলপ্রসাদের। সেদিনের কথা কি ভোলা যায় !

*"বন্ধু-মহলে অতুলপ্রসাদের গানের ও অতুলপ্রসাদ মানুষটির কথা অনেক গল্প করলাম। তাঁর কোন গান তখনও বের হয়নি। ভারতী অফিসে আমাদের প্রতিদিন বৈঠক

* সাহিত্যপ্রেমিক এবং সুসাহিত্যিক অমল হোম তাঁর 'স্মৃতিকথা' প্রবন্ধে (উত্তরা আশ্বিন সংখ্যা ১৩৪২) লিখেছেন কলকাতায় ফিরে এসে।

বসত। মণিলাল এবং সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন বন্ধুমহলের মধ্যমণি। আর ছিলেন চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। এখানে বেসুরো হারমোনিয়ামের সঙ্গে আমরা ততোধিক বেসুরো গলা মিলিয়ে গাইতাম :

বঁধুয়া, নিদ নাহি আঁখিপাতে।

সত্যেন্দ্রনাথ যোগ দিতেন তার সঙ্গে। বর্ষার সন্ধ্যাগুলি মূর্ত হয়ে উঠত গানের কলিতে :

গগনে বাদল, নয়নে বাদল
জীবনে বাদল ছাইয়া—
এসো হে আমার বাদলের বঁধু
চাতকিনী আছে চাহিয়া।

অতুলপ্রসাদের গানের ভক্ত হয়ে উঠলেন সত্যেন্দ্রনাথ। তাঁর তাগিদেই আমি অতুল-প্রসাদকে লিখলাম আপনার নতুন গান যা হচ্ছে আমায় পাঠিয়ে দিন। চিঠি লেখামাত্রই জবাব পেলাম—স্নেহপূর্ণ পত্র, তাঁর গান সত্যেন্দ্রনাথের (দত্ত) ভাল লাগাতে পরম আনন্দ এবং গৌরব বোধ করেছেন। কিন্তু কোন গান পাঠাননি। লিখেছেন, সুর ছাড়া আমার লেখাগুলি বড় ছন্দহীন। ছন্দের রাজার কাছে তা কি করিয়া পাঠাব? এবার যখন কলিকাতায় আসব তখন একদিন সত্যেন্দ্রবাবুকে, আপনাকে, এবং আপনার বন্ধুদের গান শুনাইব। কিন্তু অতুলপ্রসাদের নতুন গান শোনবার ও শেখবার সুযোগ ঘটে গেল অপ্রত্যাশিতভাবে আমার পরম আত্মীয় ও বন্ধু সুকুমার রায়ের পত্নী অতুলপ্রসাদের মাসতুত বোন শ্রীমতী সুপ্রভা রায়ের কাছে। একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করলাম একখানি সুরম্য চামড়ায় বাঁধানো খাতা—আগাগোড়া অতুলপ্রসাদের স্বহস্তে লেখা স্বরচিত সঙ্গীতে ঠাসা। গানগুলি সত্যেন্দ্রনাথ-সমীপে পৌছে দিলাম। তখন তিনি আনন্দ প্রকাশ করলেন······কিছুদিন পরে অতুলপ্রসাদের চিঠি পেলাম কলকাতায় আসছেন। তাঁর মেসোমশাই শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য মহাশয়ের বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা হল। সকালবেলা প্রাণকৃষ্ণ আচার্য মহাশয়ের কন্যাকে গান শোনাচ্ছেন, শেখাচ্ছেন। সে মন্ত্রমুগ্ধ কণ্ঠস্বর হ্যারিসন রোডের ট্রামের ও মোটরের ঘর্ঘর ধ্বনি ছাপিয়ে তাঁর সুরলহরী মুগ্ধ করেছিল। বাড়ি ফিরে এলাম। কথা হল পরদিন সন্ধ্যায় তিনি ভারতী অফিসের বৈঠকে আসবেন—সত্যেন্দ্রনাথের থাকা চাই। তাঁর সঙ্গে পরিচয় লাভের জন্যে অতুলপ্রসাদ উৎসুক। দুই কবির পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। দু-জনেই স্বল্পভাষী, মধুর স্বভাব। অক্লান্ত-কণ্ঠ অতুলপ্রসাদ গানের পর গান গেয়ে শোনালেন।"

সাহিত্য-প্রেমিক অমল হোম সেদিন ওয়েলেসলি ম্যানশনে এসে অতুলপ্রসাদকে

বললেন, চলুন আমাদের ক্লাবে। অতুলপ্রসাদের মাসতুত ভাই শিশিরকুমার দত্ত বললেন, যখন এসেছ তখন আমাদের মন্‌ডে ক্লাবে নাম লেখাও।

মন্‌ডে ক্লাব?

হ্যাঁ, হ্যাঁ আমাদের মণ্ডা ক্লাব।

কি বলছ আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

তবে শোন আমাদের মণ্ডা ক্লাবের ইতিহাস আর সুকুমারের কথা।

সুকুমার? আমাদের সুকুমার?

বাঙলা দেশ তো সাহিত্যের রঙ্গভূমি। এই সাহিত্যের রঙ্গভূমিটিতে আর এক সাহিত্যচক্র, নাম—মন্‌ডে ক্লাব। শিশুসাহিত্যিক সুকুমার রায়ের অনবদ্য সৃষ্টি ননসেন্স ক্লাব। তারই রূপ বদলিয়ে নাম বদলিয়ে অনেক বড় হয়ে হল মন্‌ডে ক্লাব। সোমবারের নাম অনুসারে রাখা হল মন্‌ডে ক্লাব, আসলে আড়ালে সকলে বলে মণ্ডা ক্লাব—মণ্ডা মিঠাই না হলে কি ক্লাব চলে! সুকুমার রায়ের নামকরণ—নামকরণে অনবদ্য সুকুমার। মন্‌ডে ক্লাবের বৈঠক প্রত্যেক সভ্যদের বাড়িতে হয়। যাঁর বাড়িতে অধিবেশন বসে মণ্ডা মিঠাই খানা-পিনার সমস্ত ব্যবস্থা তিনি করেন। অধিবেশনে নানান বিষয়ে আলোচনা হয়: সাহিত্য সঙ্গীত বিজ্ঞান গণিত; আসলে যদিও সঙ্গীত ও কাব্যালোচনাই প্রধান।

বাঃ, বেশ বেশ।

তোমাকেও আমাদের মধ্যে আসতে হবে ভাইদাদা, আমাদের শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে।

হবে, হবে।

কবে!

চল, একদিন যাওয়া যাবে।

মন্‌ডে ক্লাবের সাহিত্য-প্রেমিক বন্ধুরাও অতুলপ্রসাদকে বললেন, আপনি যখন কলকাতায় এসেছেন আমাদের বৈঠকে যোগ দিন।

অতুলপ্রসাদ বললেন, বাংলাদেশে সেই কারণেই তো এলাম। গল্পে গানে হাস্য-পরিহাসে সমবয়সী অল্পবয়সী সকলকে একান্তভাবে আপনার করে নিলেন। অতুলপ্রসাদের গানের ভক্ত হলেন মন্‌ডে ক্লাবের বন্ধুরা।

সেই সময় মন্‌ডে ক্লাবের প্রাথমিক সভ্য ছিলেন সুকুমার রায়, তাঁর দুই ভাই সুবিনয় ও সুবিমল রায়, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, অমলচন্দ্র হোম, হিতেন্দ্রমোহন বসু, ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, শিশিরকুমার দত্ত, কালিদাস নাগ, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, হিরণকুমার স্যান্যাল, শ্রীশচন্দ্র সেন, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, ধীরেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত, জীবনময় রায়।

অতুলপ্রসাদের মাসতুত ভাই শিশিরকুমার দত্ত মনডে ক্লাবের সর্বসম্মতিক্রমে সেক্রেটারি নির্বাচিত হন।

মনডে ক্লাবে এলেন অতুলপ্রসাদ। মনডে ক্লাবের বৈঠকের জন্যে অতুলপ্রসাদের ফ্ল্যাটের বসার ঘরে একজোড়া তক্তাপোষ পড়ল। তার ওপর পাতা হল পুরো গালিচা। তারপর চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় ইত্যাদি দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার যেরকম বিরাট আকার ধারণ করল তাতে ক্লাবের বৈঠক অন্য কোথাও বসা কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। প্রত্যেক বৈঠকেই সুনিবিড় সঙ্গীত চর্চা চলে, কাব্যালোচনা চলে। অতুলপ্রসাদ প্রায় প্রত্যেক বৈঠকেই স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন এবং সঙ্গীত শোনান।

শুধু যে নিজের ফ্ল্যাটের অধিবেশনে অতুলপ্রসাদ উপস্থিত থাকেন তা নয়, অন্য সব সভ্যদের বাড়ির অধিবেশনগুলিতেও পৌঁছে যেতেন। বৈঠক অনেকের বাড়িতেই বসে। ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের গঙ্গার উপরে মেয়ো হাসপাতালের ছাদে, নরেন্দ্রনাথ সেন স্ট্রীট ও সুকিয়া স্ট্রীটের অমল হোমের বৈঠকখানায়, গড়পারে সুকুমার রায়ের ড্রইংরুমে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সুকিয়া রো-র পৈতৃক বাসভবনে, বিজয়চন্দ্র বসুর চিড়িয়াখানার ভিতরের কোয়ার্টারে। বিজয়চন্দ্র বসু ছিলেন চিড়িয়াখানার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, কালিদাস নাগের মামা। চিড়িয়াখানায় সেই প্রথম মনডে ক্লাবের সকল সভ্য মিলিত হয়েছিলেন। একখানি ছবি তোলা হল, সেই প্রথম এবং শেষ ছবি মনডে ক্লাবের সকল সভ্যদের—অতুলপ্রসাদ সেখানে মধ্যমণি। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছিল। জোৎস্নায় চিড়িয়াখানার ঝিলে সেদিন চমৎকার রোয়িং করা গেল। আর একবার মনডে ক্লাবের সকল সভ্যরা স্টীমার ভাড়া করে চললেন কোলাঘাট। ভোরবেলা স্টীমার কলকাতার চাঁদপাল ঘাট থেকে নোঙর তুলল। যাত্রা শুরু হল। গঙ্গাবক্ষে কোলাঘাট। কলকল জলস্রোত দিগন্তপ্রসারী বেলাভূমি আর একটানা স্টীমারের যান্ত্রিক ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে চলল আনন্দ-উৎসব সাহিত্যালোচনা আর জঠর তৃপ্তি। আর সকল কিছু ছাপিয়ে সকলের কণ্ঠে সেদিন রবীন্দ্রনাথ এবং অতুলপ্রসাদের গান। অপরাহ্নে কোলাঘাটে নেমে ডাক-বাংলোর ছাদে পূর্ণিমার নিশিযাপনের মধুর স্মৃতি মনে এঁকে ফিরে এলেন সকলে কলকাতায়। একবার কোন অধিবেশনে অমল হোম অস্কার ওয়াইল্ডের মানুষ ও তাহার কর্ম 'Man and his work' এই নামে খুব বড় একখানা প্রবন্ধ পাঠ করে উপস্থিত সভ্যদের বুঝি ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়েছিলেন। অতুলপ্রসাদ মনোযোগ দিয়ে প্রবন্ধখানি শুনে বললেন, পরের অধিবেশনে অস্কার ওয়াইল্ড সম্বন্ধে কিছু বলবেন। তার কিছুদিন পরে কালিদাস নাগের মামার আলিপুর চিড়িয়াখানার কোয়ার্টারে যখন মনডে ক্লাবের অধিবেশন বসল অতুলপ্রসাদ অস্কার ওয়াইল্ডের ট্রায়াল বৃত্তান্ত শোনালেন। অস্কার ওয়াইল্ডের যখন ট্রায়াল হয় তখন চিত্তরঞ্জন দাশ এবং

অতুলপ্রসাদ দু-জনেই ব্যারিস্টারি পড়ছেন। ওল্ড বেলীতে তাঁরা দু-জনেই বিচার দেখতে গিয়েছিলেন। Sir Edward Carsonএর জেরার জবাবে ওয়াইল্ডের মুখে কি রকম তুবড়ি ছুটেছিল সে গল্প করলেন।
মন্‌ডে ক্লাবের বৈঠকে অতুলপ্রসাদ একবার নির্বাচিত কয়েকটি কবিতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। আর একবার চেস্টারটনের 'ওয়ারশিপ অব্ দি ওয়েলদি' পাঠ করেন।*
কলকাতায় এসে পুরোনো বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হওয়ায় এবং সাহিত্যচক্রের মধ্যে থেকে মন যদিও কিছু ভাল ছিল তবু কোথায় যেন একটা অভাব-বোধ অনুক্ষণ জেগে থাকে। সে অভাব পূর্ণ হয় না বুঝি। ভুলতে পারেন না লখনউ—তাঁর অনেক দিনের অনেক বছরের পরিচিত জগৎটাকে—স্বদেশের আত্মীয়ের মত মানুষদের, মক্কেলদের। ······গোমতী নদীর জলধারা তেমনি বহে চলে সময়ের স্রোতে, কেশরবাগের মোড়ে টাঙ্গা-এক্কাওয়ালাদের সোয়ারির জন্যে প্রতীক্ষা. আমিনাবাদ ধীরে ধীরে জমজমাট হয়ে আসছে, কেশরবাগের রাস্তা ধরে ঘোড়ার খুরের শব্দ তুলে ধুলোর ঝড় উঠিয়ে গোমতীর লোহাপুলের দিকে দৌড় দিল এক্কা-টাঙ্গার দল। প্রিয় ওয়েলার ঘোড়া আর সাদা ফিটনের জন্যে বুঝি ক্ষণিক মন কেমন করে ···প্রতিদিনের ছোটখাট কথা কত যে মনে পড়ে !·· একটু পরে দিলীপের মাস্টার মহেশ আসবে। ওরা প্রাতঃভ্রমণে বেরোবে। ······আজ যেন বড় বেশি হেমকুসুমের কথা মনে পড়ে ; দিলীপকে একবারটি দেখবার জন্যে মন কেমন করে ওঠে। ভাল লাগে না কলকাতা।
তখন রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে। কলকাতা শহর থেকে হঠাৎ শান্তিনিকেতন চলে এলেন অতুলপ্রসাদ। কয়েকটা দিন রবীন্দ্র-সঙ্গমে অতিবাহিত করে ফিরে এলেন কলকাতায় ওয়েলেসলি ম্যানশনে, বৃদ্ধ খিদমৎগার নবাব আলির তত্ত্বাবধানে। কলকাতায় প্রভু ভৃত্যে সংসার। প্রভু কর্মস্থল থেকে না ফেরা পর্যন্ত অভুক্ত থাকে ভৃত্য। বড় বিশ্বাসী খিদমৎগার নবাব আলি।

একদিন লীডার সম্পাদক সি. ওয়াই. চিন্তামণি এলেন। পুরোনো দুই রাজনীতিবিদ বন্ধুর সাক্ষাৎ হল। দেশের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা হল। সি. ওয়াই.-এর গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের উপর বিশেষ আস্থা নেই। অতুলপ্রসাদ বললেন, দেখে নিও ওর মাঝেই মহা শক্তি লুকিয়ে আছে। আমার বিশেষ আস্থা না থাকলেও অনাস্থা নেই।···জ্ঞানী গুণীদের সমাগম হয় ওয়েলেসলি ম্যানশনে। সরোজিনী নাইডুর ভাই হারীন্দ্রনাথকে সেদিন বললেন, দেখে রেখ একদিন তুমি তোমার দিদিকে ছাড়িয়ে

* শ্রীঅমল হোমের 'স্মৃতিকথা' ও প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আমাদের মন্‌ডে ক্লাব' থেকে।

যাবে ঠিক। হারীন্দ্রনাথের তখন অল্প বয়স। গানে অপূর্ব গলা, তেমনি অপূর্ব তাঁর কবিতা রচনা করা। হারীন্দ্রনাথ এসে নেমেছিল অতুলপ্রসাদের বাড়ি তাঁর অতিথি হয়ে। অনেক দিন ছিল। মনডে ক্লাবের অনেক সভ্যবৃন্দ জমায়েত হতেন হাইকোর্টের বার লাইব্রেরিতে অতুলপ্রসাদের কাছে। যোধপুরী পাজামার ওপর কালো অথবা খয়েরি রং ইউনিফর্ম কোট, মাথায় রাজপুতানী পাগড়ি—এই ছিল তাঁর পোশাক। আর ছিল তাঁর অপরূপ রসিকতা। বড় রসিক মানুষ অতুলপ্রসাদ।

সেদিন এক পরিচিত ফরেস্ট অফিসার বন্ধু বললেন, সুন্দরবন চলেছি অফিসের কাজে ; যাবেন আমার সঙ্গে—কয়েকটা দিন বেড়িয়ে আসবেন? আপনার ভাল লাগবে। আমরা লঞ্চে যাব আর আসব ; আপনার কোন অসুবিধে হবে না।

অতুলপ্রসাদ রাজি হলেন।

স্টীম লঞ্চটি বেশ বড়। অতুলপ্রসাদের ভাল লাগল। দু-খানি ঘর—একটি খাবার ঘর ও একটি শোবার ঘর। বাথরুমে স্নানের ব্যবস্থা। একখানি ঘরে লেখাপড়া করার জন্যে ছোট্ট একখানি টেবিল চেয়ার পাতা। টেবিলে বই কাগজপত্র কালি—যেখানে যেমনটি ঠিক তেমনিই।

বন্ধু বললেন, আপনার প্রয়োজনে আসতে পারে তাই এই ব্যবস্থা হয়েছে।

লঞ্চের নিচের তলায় লঞ্চের ইঞ্জিন, লোকজনদের থাকার ব্যবস্থা একদিকে। রেলিং-দেওয়া ছোট একটা বারান্দা, দু-খানি বেতের চেয়ার পাতা। চেয়ারে আরামে বসে অতুলপ্রসাদ বললেন, বেশ ব্যবস্থা হয়েছে। খানা-টানার কি ব্যবস্থা করেছ হে?

ফরেস্ট অফিসার হেসে বললেন, সুন্দরবনে হরিণ শিকার যদিও বে-আইনী কিন্তু আপনি যখন আমাদের অতিথি তখন সব ব্যবস্থাই হয়েছে……হরিণের মাংসের রান্নারও ব্যবস্থা হয়েছে।

ভেরি গুড, অতুলপ্রসাদ হাসলেন—বে-আইনী কাজটাও তোমাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছি তাহলে—কী বল?

সন্ধ্যা নাগাদ লঞ্চ ছাড়ল। লঞ্চ এগিয়ে চলল মাঝ-দরিয়া ধরে কলকাতার সীমানা ছাড়িয়ে, কলকারখানার আলো-ধোঁয়ার রাজ্য পার হয়ে। সীমান্তের অন্ধকারে গাছের সারি। মিলন-পিয়াসী জোনাকীরা জলে-জলে সারা।

অতুলপ্রসাদ বললেন, একটু পরে চাঁদ উঠবে। আকাশ দেখে তাই মনে হয়।

বন্ধু বললেন, প্রোগ্রাম এমন করেছি যাতে পূর্ণিমার সময়টা আমরা বনে কাটাতে পারি। চাঁদের আলোয় সুন্দরবনের দৃশ্য অপরূপ—কিন্তু সে দৃশ্য বড় ভয়ঙ্কর, বড় নির্জন।

অতুলপ্রসাদ বললেন, আমি সে দৃশ্য দেখবার জন্য খুবই উদ্‌গ্রীব।

একটু পরে চাঁদ উঠল। স্নিগ্ধ আলোয় পৃথিবীর রূপ ফিরল। চন্দ্রালোকে জলতরঙ্গে

শত-শত চন্দ্রমা-মালিকার সৃষ্টি হল। নভোমণ্ডলে আলোকের ছটা। মুগ্ধ অতুলপ্রসাদ। লঞ্চ এগিয়ে চলল। তন্ময়তা ভাঙল বন্ধু যখন বললেন, আসুন আমরা খাবার ঘরে যাই, খাওয়া দাওয়া সেরে নিই। আপনার ক্ষিদে পায়নি? এখানে বসেই খানা খাবেন? খানসামাকে আনতে বলি?

অতুলপ্রসাদ বললেন, না চল খাবার ঘরে যাই।

খাওয়া শেষ হতেই তাঁরা দু-জনে বারান্দায় বেতের চেয়ারে এসে বসলেন।

বন্ধু বললেন, এমন পরিবেশে আপনি একটা কবিতা আবৃত্তি করুন।···বন্ধুর অনুরোধে অতুলপ্রসাদ কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করলেন; পরে কয়েকটি আপন গান গাইলেন। রাত হয়েছিল; তখন অতুলপ্রসাদ গান থামিয়ে বললেন, আর নয় চল, এবার ঘুমনো যাক।

লঞ্চের ভিতরে এসে দুই বন্ধু আপন-আপন শয্যায় শয়ন করলেন। পাশের জানলা দিয়ে গঙ্গার মনমাতানো বাতাস আসছিল। স্টীম-লঞ্চ চলছিল তার আপন গতিতে, ইঞ্জিনের একটানা শব্দ-তরঙ্গ তুলে। ইঞ্জিনের শব্দ, জলের শব্দ এবং বাইরের নিস্তব্ধ নিথর মৌন পৃথিবী চন্দ্রকিরণ মেখে গীতরূপে স্বপ্নের জাল বুনছিল। অতুলপ্রসাদ ঘুমিয়ে ছিলেন, রাত অনেক তখন, মুখে চন্দ্রকিরণ পড়ল এসে। মোহানায় এল লঞ্চ। হঠাৎ ঘুম ভেঙে চোখ মেলে চাইলেন। আস্তে আস্তে বিছানায় উঠে বসলেন। জানলার মধ্য দিয়ে দেখলেন চাঁদনি রাতের তরঙ্গায়িত মনোমুগ্ধকর ভাগীরথীর দৃশ্য। বিছানা থেকে নেমে দাঁড়িয়ে টেবিল থেকে কাগজপত্র কলম এনে জানলার পাশে বসলেন। মনের মধ্যের সুর মুক্তি চাইল। গুনগুন গাইলেন। তারপর কলম তুলে কাগজে লিখলেন······চন্দ্রকিরণে লিখতে অসুবিধা হল না কোন। লিখলেন—

আজি এ নিশি, সখী, সহিতে নারি।
কেবলই পড়িছে মনে যমুনা-বারি।
এমনি সোনার তরী ভেসেছিল নভোপরি—
নাহিক শ্যামের তরী, নাহি বাঁশরী।
ছিল গো সেদিন, সখী, হেন যামিনী।
আছে ফুল নাহি মধু,
আছে আশা নাহি বঁধু,
আছে নিশা, নাহি শুধু অভিসারী।
মিলন-মধুর নিশি আসিবে না আর,
আজি এ চাঁদনী ধরা বিরহ-বেদন-ভরা,
আকাশের গ্রহ-তারা শ্যাম-ভিখারী।

গান লেখা হলে বেহাগের সুরে গুনগুনিয়ে জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে গাইলেন। ভয়, পাছে বন্ধুর ঘুম ভেঙে যায়। গান থামতেই বন্ধু মুগ্ধভাবে বললেন, আমার জীবন সার্থক হল…এমন পরিবেশে আপনার গান শুনলাম! আর একটা গান আপনি গান।
গান থামিয়ে অতুলপ্রসাদ বললেন, তুমি বুঝি ঘুমোওনি? শুয়ে শুয়েই আমার গান শুনছিলে প্রথম থেকেই?

আপনিও তো ঘুমোন নি। কেন?

অতুলপ্রসাদ হাসলেন। বললেন, ঘুমিয়ে তো ছিলাম। চাঁদ বাদ সেধে ঘুম ছুটিয়ে দিল।

বন্ধু বললেন, রাত জাগলে আপনার শরীর খারাপ হবে। হেসে বললেন, ঝিলিমিলি নামিয়ে দিন, চন্দ্রকিরণ আসবে না। তাহলেই নিদ্রাদেবীর আগমন ঘটবে।

পরের দিন ভোরবেলা ইঞ্জিনের একটানা ঘর-ঘর শব্দে এবং একঝাঁক উড়ে-চলা পাখির কলকাকলিতে ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে চাইলেন অতুলপ্রসাদ। বন্ধু এসে সুপ্রভাত জানিয়ে আপন অফিসের কাজে ফাইল-পত্তরের মাঝে ব্যস্ত হলেন। অতুলপ্রসাদ আরাম-কেদারায় বসে তাকিয়ে রইলেন দূরে। মোহানা অতিক্রম করে লঞ্চ এল সুন্দরবন অঞ্চলের অসংখ্য খাঁড়ির একটিতে। সুন্দরবন এলাকা শুরু হল। সুন্দরী বৃক্ষের জঙ্গল। আরো কতরকমের গাছ, গাছে ফল ফুল, নানান পাখির কল-কাকলিমুখর বনভূমি। বন ঘন থেকে ঘনতর হল,—সূর্যরশ্মির প্রবেশ নিষিদ্ধ। ভয়াবহ! বড় উদাসী…তবু সুন্দর। মুগ্ধ অতুলপ্রসাদ লিখলেন—

ওরে বন, তোর বিজনে সংগোপনে
কোন্ উদাসী থাকে?
আমার মনের বনের উদাসীরে
ডাকে সে আজ ডাকে।
নিজে সে নীরব হয়ে রয়,
শোনে সে ফুল যে কথা কয়;
তরুর হিয়া আলিঙ্গিয়া লতার অনুনয়,
শোনে সে লতার অনুনয়।
পাখিদের প্রগল্‌ভতা দেয় কি ব্যথা তাকে?
তারে কেউ পায় নাকো ডাকি,
থাকে সে সদাই একাকী;
কোন একাকী করল তারে এমন একাকী?
বৃথা খোঁজে চন্দ্র-তপন পাতার ফাঁকে ফাঁকে।

বুঝি সে কৃষ্ণ আঁধারে
যেন কেউ দেখতে না পারে
আপন মনে খুঁজে বেড়ায় গোপন সখারে।
বলে মোর পাগলা পরান খোঁজে সে আমাকে !*

বন্ধুর সঙ্গে সুন্দরবনে আরো কয়েকটি দিন কাটিয়ে নতুন জীবনের আস্বাদ গ্রহণ করে ফিরে এলেন অতুলপ্রসাদ কলকাতায়।

তারপর আরও এগিয়েছে কিছুদিন। চলেছে মনডে ক্লাবের অধিবেশন। ওয়েলেসলি স্ট্রীটের বৈঠকখানায় রবিবারে রবিবারে সাহিত্য-বাসর, সঙ্গীতের অনুষ্ঠান। চলছে কোর্ট কাছারি মক্কেল কেস···এমনি দিনে একদিন সন্ধ্যায় ওয়েলেসলি স্ট্রীটের ওয়েলেসলি ম্যানশনের ফ্ল্যাটের দরজার 'ডাকার ঘণ্টা' অধৈর্য হয়ে বাজল। বৃদ্ধ খিদমৎগার নবাব আলি দরজা খুলে ধরামাত্রই ঈষৎ কৃশ এবং দীর্ঘ একটি মানুষ খিদমৎগারকে প্রায় ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ঘরে ঢুকে এল। নবাব আলি আগন্তুকের পিছু পিছু এসে দেখে, সাহেব এবং আগন্তুক সাহেব ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ। ভৃত্য অবাক চোখে তাকিয়ে রইল।

অতুলপ্রসাদ বললেন, দাদা, তোমাকে কতদিন পরে দেখলাম বল তো !

সত্যপ্রসাদ বললেন, হাঁ ভাই, কতদিন পর ! শুনেছিলাম তুমি কলকাতায় এসেছ, তোমার ঠিকানা খুঁজে খুঁজে আমি হয়রান। তুমি ভাই আমাদের আর কোন খবর রাখ না !

অতুলপ্রসাদ বললেন, তুমি তো বর্মা থেকে ফিরে এসে এখন লাকসামে আছ। দেখ, আমিও খবর রাখি তোমার, যদিও চিঠিপত্র লিখতে পারি না। তাছাড়া আমার চিঠিপত্র লেখাও ঠিক আসে না···তবু আমার মনটা তোমাদের ঘিরেই থাকে সব সময়।

সত্যপ্রসাদ হেসে বললেন, জানি জানি। তা তুমি কবে আসছ লাকসামে—আমার ওখানে ? চল আমরা একসঙ্গে বেড়িয়ে আসব ঢাকা, আমাদের গ্রামখানি থেকে। কতদিন গ্রামখানিতে যাইনি বল তো ! মনে পড়ে না তোমার ঢাকার মিরাতারের বাসা, লক্ষ্মীবাজারের দিনগুলো, ছেলেবেলার বন্ধু-বান্ধবদের !

মনে পড়ে বৈকি।

ওঃ ! জান, কত কথা যে আমার জমা হয়ে আছে !

---

* ওপরের কবিতাটি সুন্দরবন যাত্রাপথে রচিত। সম্পূর্ণ কবিতাটি রচনার পর শেষ অংশটি পরিবর্তন করেন। কোন একজন ফরেস্ট অফিসার বন্ধুর সঙ্গে অতুলপ্রসাদ ১৯১৬ সালের কোন এক সময়ে সুন্দরবন ভ্রমণে গিয়েছিলেন। এই তথ্যটুকু নানা সূত্রে জানতে পারা যায়।

আমারও, দাদা!

তারপর দুই ভাই দুই বন্ধুতে কত সুখ-দুঃখের কথা হয়। অতুলপ্রসাদ বললেন, দাদা তুমি আমার জন্যে একটু অপেক্ষা কর, আমি শীঘ্রই যাব তোমার কাছে, একটু সময় হাতে পেলেই।

সত্যপ্রসাদ ফিরে চলে গেলেন লাকসামে তাঁর কর্মস্থলে। মন ভাল লাগছিল না, তাই কিছুদিনের মধ্যেই অতুলপ্রসাদ দাদার কাছে লাকসামে চলে এলেন। সত্যপ্রসাদ অতুলপ্রসাদকে কাছে পেয়ে খুউব খুশি। স্ত্রী সুরবালাকে বললেন, অতুল এসেছে। অতুলকে ভাল খাওয়াও-দাওয়াও। দেখো অতুলের যেন কোন কষ্ট না হয়, অতুল সাহেব মানুষ। স্ত্রীকে বিব্রত করে তুললেন।

অতুল বললেন, দাদা তুমি থাম! তুমি কি চাও আমি চলে যাই? সুরবালাকে বললেন অতুলপ্রসাদ, বৌঠান, আমি সাহেব-টাহেব নই। আমি খাঁটি বাঙালী, মনে-প্রাণে বাঙালী। উচ্চহাসি হাসেন অতুলপ্রসাদ। হাসিমুখ সব সময়েই। আসর জমিয়ে বসে নানান মজার গল্প-কথা বলেন। এত হাসতে পারেন যে ওঁর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাসা বোধহয় আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এত হাসি, তাই বোধহয় মনে এত দুঃখ—যারা যত হাসে তাদের মনে ততটা দুঃখ। অথবা কি জানি, হেসে হেসে বোধহয় তারা দুঃখ ভুলতে চায়। খাওয়া-দাওয়ার পর কত রাত ধরে দুই ভাইয়ে কত গল্প চলে। দু-জনে দু-জনের দীর্ঘ বিচ্ছেদ-সময়কার ঘটনাবলীর কথা বলে, সুখ-দুঃখের কথা প্রকাশ পায়। অতুলপ্রসাদ-হেমকুসুমের বর্তমান সম্পর্কের কথা জানতে পেরে সত্যপ্রসাদ দুঃখিত হলেন।

ক-দিন সত্যপ্রসাদের কাছে লাকসামে থাকবার পর অতুলপ্রসাদ বললেন, দাদা আমার বড় ইচ্ছে, এত কাছে যখন এসেছি একবার আমাদের দেশটা আমাদের গ্রামটা ঘুরে আসি। আমাদের দেশ, আমাদের গ্রাম, কতদিন আমাদের মাতৃভূমিকে দেখিনি! তুমিও তো বলেছিলে, তুমি আমার সঙ্গে চল না।

সত্যপ্রসাদ জানালেন, ছুটি পাওয়ার বড় অসুবিধে এখন।

অতুলপ্রসাদ বললেন, ঠিক আছে, এক কাজ করা যাক। দেশ থেকে ফিরে আসি, তারপর কিছুদিন দার্জিলিং বেড়াতে যাব ইচ্ছে আছে…তুমি এর মধ্যে ব্যবস্থা করে ফেল ছুটির। দু-জনেই দার্জিলিং যাব।

সত্যপ্রসাদ বললেন, আচ্ছা, আমি চেষ্টা করছি ছুটির জন্যে।

অতুলপ্রসাদ দিনকয়েক পরে লাকসাম থেকে ঢাকা এসে উপস্থিত হলেন। ঢাকাতে এসে কিছু কাজে আটকে পড়লেন। গ্রামে, অর্থাৎ দেশে যাওয়া আর হল না, সময় ছিল না। দূর থেকেই মনে পড়ল গ্রামের সেই হোগলাবন, কাজলদিঘি,

ক্ষেত-ভরা ধান, বকুলতলার মাঠ, গ্রামের চাষী-ভাইদের। সবকিছুই কি এখন বদলে গেছে ?

পুরোনো মানুষরা বিদায় নিয়েছে ? দৃষ্টিভঙ্গিরও বদল হয়েছে ? মনে পড়ে বাবা মার সঙ্গে কতবার পুজোর ছুটিতে দেশে গ্রামের বাড়িতে যাওয়া হয়েছিল। আজ যাওয়া হল না।

* * *

এদিকে হেমকুসুম বাংলা দেশ থেকে দূরে যুক্তপ্রদেশের রাজধানী লখনউয়ে পুত্র দিলীপকে নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। একাকী জীবন, মাঝে মাঝে অসহ্য হয়ে ওঠে। জীবনে যত নিঃসঙ্গতা বোধ জাগে, তা ছাপিয়ে অভিমান, শেষে ক্রোধ এসে জমে। প্রতিশোধের স্পৃহা মনের কোণে বাসা বাঁধে।

মাঝে মাঝে মনে হয় হেমকুসুমের, যা কিছু দোষ শুধু কি তাঁরই ? যা কিছু অন্যায় অবিচার তার দায়ে তিনিই দায়ী, আর কি কেউ নয় ? কেন ? অতুলপ্রসাদ তাঁর সান্নিধ্য থেকে মুক্ত হয়ে লখনউ থেকে সুদূর বাঙলা দেশে পৌছলেন, আর সকলের চোখে হেমকুসুম অপরাধী হলেন ! কিন্তু এত সহজে অতুলপ্রসাদ মুক্তি পাবেন না ! হেমকুসুম অতুলপ্রসাদকে মুক্তি দেবেন না !

দিলীপ পড়ছিল কনভেন্ট স্কুলে। সে-বছর দিলীপের পড়াশোনা এবং পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হল না। ছেলেবেলাতেই নানান অসুখ-বিসুখ করে সে কিছু মনে রাখতে পারে না। সব কিছু যেন কেমন ভুল হয়ে যায়। ওর পড়াশোনা আর হবে না। দিলীপের মাস্টারমশায় মহেশ এসে হেমকুসুমের কাছে বিদায় চাইলেন। মহেশ এম-এ পাশ করেছে ভালভাবে, আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে বিশেষ কেউ নেই। লখনউতে একমাত্র বাবা ছিলেন। বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। মহেশ এসে জানালেন হেম-কুসুমকে লখনউতে তার আর মন ঠিক থাকছে না। বাংলাদেশে ফিরে যাবে ! কলকাতায় পৌছে কোন একটা চাকরি-টাকরি খুঁজে নেবে।

হেমকুসুম বললেন, তুমি এখানে ছিলে আমার তবু একজন সঙ্গী ছিল, কথা বলার, দেখাশোনার, ও সাংসারিক নানান কাজে সাহায্য করার।···একটু থেমে বললেন, কী প্রয়োজন তোমার কলকাতায় যাওয়ার ! তার থেকে তুমি যেরকম দিলীপের গার্জেন টিউটর হয়ে আছ, সেইরকমই থাক। তোমার কোন অসুবিধে হবে না। তোমার হাত-খরচা বাড়িয়ে দেব।

মহেশের অসুবিধে কিছুই হবার নয়। কারণ, তার যখন যে-জিনিসের প্রয়োজন, হেমকুসুমের প্রখর দৃষ্টি তৎক্ষণাৎ সেদিকে পৌছে যায়। কোন অসুবিধে নেই—তবু কোথায় যেন একটা অস্বস্তি। ব্রাহ্মণ যুবক কৃতজ্ঞ। তবু অস্থির।

হেমকুসুমের অর্থের অভাব নেই।…

অতুলপ্রসাদ কলকাতা হাইকোর্টে প্রচুর অর্থ উপার্জন করছেন। প্রতি মাসে হেমকুসুমের নামে টাকা পাঠিয়ে থাকেন। টাকা পাঠিয়েই যেন তাঁর সকল কর্তব্য শেষ। হেমকুসুম ভাবেন—টাকাটাই কি সব! মনে মনে স্থির করেন, টাকা আমি আর নেব না।

একদিন সত্যকুমার এলেন। বললেন, বৌঠান কেমন আছেন? দাদার চিঠিপত্র পেয়েছেন?

হেমকুসুম বললেন, কলকাতায় পৌঁছে পর্যন্ত তিনি আমাকে একটা চিঠিও লেখেন নি। কিন্তু আমি শুনেছি তিনি সকলকে প্রায়ই চিঠি লেখেন। আমাদের মুন্‌শিকেও চিঠিপত্র লেখেন। অথচ আমাদের কোন চিঠিপত্র লেখার ফুরসত হয় না। টাকা পাঠিয়েই বোঝেন কাজ সারা হল।

সত্যকুমার সান্ত্বনা দিলেন। বললেন, বৌঠান আপনি উতলা হবেন না। দাদা আমার শিবতুল্য লোক। রাগ নিশ্চয়ই পড়বে একদিন, সেদিন আপনার কাছে নিশ্চয়ই ছুটে চলে আসবেন।

হেমকুসুম বললেন, না সত্যকুমার সে দিন আর নেই। কলকাতায় তাঁর আপন জনেরা তাঁর মনের আগুনকে আরো জ্বালিয়ে দিচ্ছে আমার বিরুদ্ধে। নাহলে তিনি এতদিনে ফিরে আসতেন। তুমি তো এতদিন আমাকে দেখছ। আমি কি এত মন্দ যে আমার সঙ্গে থাকা যায় না? অবশ্য আমার একটা দোষ আছে আমি জানি—আমি রাগ সংবরণ করতে পারি না—আমি বড় অভিমানিনী, আমি বুঝতে পারি। তিনিও তা জানেন। অথচ আমি যদি কোন কথা বলি উনি সে কথা কোনদিন রাখবেন না, শুনবেন না—সে কাজ করবেনই আমার কথা না শুনে। কেন বল তো!

সত্যকুমার চুপ করে রইলেন।

মহেশ বিমর্ষ থাকে কেন যে হেমকুসুম বুঝতে পারেন না।

তুমি পাশ করেছ ভালভাবে, এখন এখানেই চেষ্টা করলে তো চাকরি পেতে পার। তোমার এত ভাবনা চিন্তার দরকার কী।

মহেশ হাসে।

মহেশ একটা চাকরি জোগাড়ের চেষ্টা করে। দেশ-বিদেশের কাগজেপত্রে দরখাস্ত ছাড়তে শুরু করে, যদি মনের মত একটা অধ্যাপনা জুটে যায়। অবশেষে বাংলা-দেশে কলকাতা শহরের দক্ষিণ অঞ্চলের সাউথ সাবার্বান কলেজ* থেকে ডাক এল। মাহিনা তারা ভাল দেবে, চাকরিটা ভাল। চিঠি পেয়ে মহেশের মন উৎফুল্ল হল। চিঠি

* সাউথ সাবার্বন কলেজ—বর্তমানে আশুতোষ কলেজ।

হাতে নিয়ে হেমকুসুমের বাংলোয় এল মহেশ। নতুন চাকরির কথা জানাল আর বলল, ক-দিনের মধ্যে তাঁকে কলকাতায় পৌঁছে চাকরিতে যোগদান করতে হবে। শুনে হেমকুসুম মনে বড় আঘাত পেলেন, তাঁর মন চঞ্চল হল।

অনেক দিনের সম্পর্ক এমন একদিনে শেষ করা যায়! মহেশেরও কষ্ট হচ্ছিল।

হেমকুসুম বললেন, তুমি চলে গেলে, মহেশ, আমার ছেলেটার কী যে পড়াশোনা হবে ভেবে আকুল হচ্ছি। ওর জন্যে আমার যত ভাবনা!

মহেশ একটা প্রস্তাব দিল। হেমকুসুমকে বললে, আপনারা আমার অনেক উপকার করেছেন, আমি আপনাদের কাছে খুউব ঋণী। দিলীপের পড়াশোনার ক্ষতি হোক আমি চাই না। তাই আপনার কাছে প্রস্তাব করছি, মিঃ সেন তো কলকাতায় আছেন, আমি কলকাতায় চলেছি, আপনি দিলীপকে সঙ্গে নিয়ে আমার সঙ্গে চলুন কলকাতায়। আপনাকে মিঃ সেনের বাড়িতে পৌঁছে দেব। দিলীপ এবং আপনি ওখানেই থাকুন। দিলীপ পড়াশোনা করুক কলকাতায় কোন ইস্কুলে থেকে। আমিও ওর পড়াশোনার বিষয়ে সবরকম সাহায্য করব। বাংলাদেশে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এনট্রান্স্ পরীক্ষার অনেক সুবিধে করে দিয়েছেন, ওখানে দিলীপের পাশ করার সুবিধে হবে।

হেমকুসুমের কথাটি মনঃপূত হলেও অতুলপ্রসাদের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে সেখানেই বাস করার কথাটি মনে ধরল না। কেনই বা তিনি প্রথমে স্বামীর কাছে যাবেন, যখন স্বামী তাঁকে লখনউতে একলা রেখে চলে গেছেন? অসম্ভব!

প্রথমে বিরক্তি এল মনে, তারপর ঘিরে ধরল সেই পুরাতন প্রাণঘাতী রাগ। মনে মনে জ্বললেন সেই অন্তর্জালায়; অল্পক্ষণের মধ্যে সমস্ত শরীরকে কাঁপিয়ে তুলল। রাগ যখন মনে আসে, সমস্ত শরীর অবসন্ন বোধ হয়।

মহেশ তৈরি হল। লখনউয়ের যা কিছু আত্মার টান, মায়া মমতা তার থেকে মুক্ত হল।

হেমকুসুম বললেন, কলকাতায় মাকে চিঠি লিখছি, মায়ের ওখানে প্রথমে নামব। তুমি কলকাতা যাওয়ার বন্দোবস্ত কর।

সত্যকুমার এর মাঝে একদিন অফিস-ফেরতা এলেন। সত্যকুমারকে হেমকুসুম তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা বললেন। সত্যকুমার সকল কিছু শুনে চুপ করে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, আপনি যা ভেবেছেন ঠিকই। ছেলের ভবিষ্যৎ আপনাকে আগে ভাবতে হবে বৈকি। আপনার সেখানকার খরচপত্তরের কথা ভেবেছেন? আমার মনে হয় দাদাকে সব কথা জানানো উচিত। আপনি বলেন তো দাদাকে আমি চিঠি লিখতে পারি।

হেমকুসুম বললেন, তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না। আমার নিজের যথেষ্ট টাকা

আছে। আমাকে কারো সাহায্য করার প্রয়োজন হবে না। আমি আমার ছেলেকে মনের মতন করে মানুষ করব। আমি দিলীপকে সঙ্গে নিয়ে মহেশের সঙ্গে কলকাতায় যাচ্ছি। কোথায় উঠব এখন বলতে পারব না, আর আমার ঠিকানা যদি জানতেও পার কোনদিন তোমার দাদাকে জানাবার চেষ্টা কোরো না।

সত্যকুমার বিব্রত বোধ করলেন। বন্ধুরা কয়েকজন বলাবলি করলেন কাজটা ঠিক হল না। মহেশ মনে মনে ভীত হল। হেমকুসুম বললেন, মহেশ, আমাকে ও দিলীপকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় যেতে তোমার কি ইচ্ছে নয়! মহেশ বলল, একথা কেন বলছেন? তবে আমার মনে হয় আপনি আমার সঙ্গে এ-সময়ে কলকাতায় গেলে সেন সাহেব কিছু মনে করবেন।

হেমকুসুম বললেন, তা যদি কিছু মনে করেন করবেন। তিনিও তো আমাকে লখনউতে রেখে চলে গেলেন একলা।...এখন থেকে আমি আমার মনের মত চলব। তুমি কি ভয় পাচ্ছ মহেশ?

মহেশ বললে, না।

এক সন্ধ্যায় হেমকুসুম লখনউ শহর ত্যাগ করে অনির্দিষ্ট ঠিকানায় মহেশের সঙ্গে কলকাতাগামী মেল ট্রেন ধরলেন।

* * * *

ওদিকে অতুলপ্রসাদ লাকসাম থেকে ঢাকা পৌঁছে গেলেন। অনেকদিন পর দেশে এসে দেশের দুরবস্থা দেখে খুউব দুঃখ হল। আত্মীয়স্বজনেরা কে কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে। অপরিচিত নতুন মুখ, নতুন জীবন সব। কেউ কাউকে চেনেন না। ঢাকা শহর বদলিয়ে গেছে। বিনয়মামার সঙ্গে দেখা হল। বিনয়মামা ঢাকাতেই বসবাস করেন, পৈত্রিক জমিজমা দেখাশোনা করেন। পুরোনো স্কুল কলেজের বন্ধুরা কে কোথায় চলে গেছে। বিরাট একটা পরিবর্তন সারা জগৎটা জুড়ে নেমেছে যেন। কোথাও গিয়ে স্বস্তি নেই—কোথাও শান্তি নেই। লাকসামে ফিরে এলেন অতুলপ্রসাদ। সত্যপ্রসাদকে বললেন, তৈরি হয়ে আছ তো দাদা? চল বেরিয়ে পড়ি দার্জিলিং।

সত্যপ্রসাদ বললেন, চল আমি তৈরি।

দিন কয়েকের মধ্যেই অতুলপ্রসাদ সত্যপ্রসাদ দুই ভাই—দুই বন্ধুতে দার্জিলিঙের উদ্দেশ্যে শিলিগুড়ি রওনা হলেন। সকালে শিলিগুড়ি স্টেশনে নেমে জলযোগ সেরে দার্জিলিং-গামী ছোট্ট ট্রেনে উঠে বসলেন। ট্রেন পাইন বনের মধ্য দিয়ে চড়াই-উৎরাই পথে এগিয়ে চলল। খুউব ভাল লাগল সকালের ঠাণ্ডা বাতাস। সকালের আলো পাইনের বন ছুঁয়ে আলো-আঁধারিতে স্বপ্নরাজ্য করে তুলল। কবির মন আন্দোলিত হল।

সত্যপ্রসাদ বললেন, তুমি কবিতা লেখ, স্বপ্নলোকে ঘুরে বেড়াও; আমি ততক্ষণে বাস্তবের জগতের খবরাখবর আজকের খবরের কাগজ থেকে সংগ্রহ করি, কী বল ? অতুলপ্রসাদ হাসলেন মৃদু মৃদু। মনে সুর দোলা দিল। লিখলেন—

এই বনেতে বনমালী, কোথা তব বনফুল ?
কার লাগি ধ্যায় এত দলে দলে অলিকুল ?
সুরভি পবন মোরে
ঘুরাইছে মিছে ঘোরে,
শুধু কি ফুটাও কাঁটা,
ফুটাও না কি মুকুল ?
গহনে বিহগ হেন আমারে ভুলায় কেন ?
এত গন্ধ এত গান সকলি কি মহা ভুল ?
বড় সাধ ছিল মনে
ভরিব আঁচল বনে,
ভুলিব চরণে ব্যথা, নয়ন বেদন-দুল।

লেখা শেষ হলে গুন-গুন ভৈরবী সুরে গাইতে লাগলেন গান। ট্রেন এগিয়ে চলে। খেলাঘরের ট্রেন। ছোট-ছোট তিনটি বোগি। ছোট্ট ইঞ্জিনখানি। ট্রেন চলে ঝিকিঝিকি। এল কার্শিয়ং, গেল বাতাসিয়া লুপ। ঘুমে আচ্ছন্ন ঘুম পিছনে সরে গেল, ট্রেন এগিয়ে চলেছে। সবুজ এই পাহাড় বন উপত্যকা। মেঘমালার দেশে নানান রঙের মেলা। সুন্দর! অতুলপ্রসাদ লিখলেন—

কে হে তুমি সুন্দর,
অতি সুন্দর, অতি সুন্দর!
কভু নবীন ভানু ভালে,
কভু ভূষিত নীরদমালে,
কভু বিহগকূজিত কুহক কণ্ঠে
গাহিছ অতি সুন্দর!
কভু নির্মল নীল প্রাতে
কনককিরীট মাথে
অভ্রভেদী অচলাসনে
রাজিছ অতি সুন্দর!
কভু পুষ্পিত নভ-কুঞ্জে
তব নৈশ বংশী গুঞ্জে;

কভু পীত-জ্যোৎস্না-বসন শ্যাম—
মূরতি অতি সুন্দর!

দার্জিলিং এসে দুই ভাই নিরিবিলিতে হোটেলে পাশাপাশি দুখানি ঘর নিলেন। কিন্তু অতুলপ্রসাদ আপন শয্যায় শয়নের অল্পক্ষণ পরেই দাদার শয্যায় এসে দাদার বুকে মাথা রেখে শুয়ে থাকতেন। নীরবতার মাঝেই অতুলপ্রসাদের প্রাণের বেদনা সত্যপ্রসাদ অনুভব করতেন। অতুলপ্রসাদও সত্যপ্রসাদের সহানুভূতির স্নিগ্ধ ছোঁয়াটুকু প্রাণভরে গ্রহণ করতেন। কত বিনিদ্র রজনী গেছে দুই ভাইয়ের আন্তরিক দুঃখসুখের গল্পে গল্পে। সকাল হবার আগেই দুই ভাই বেড়াতে যেতেন। মেঘমালার দেশ দার্জিলিং—শৈলাবাসের রানী। কখনো চড়াই ভেঙে, কখনও উৎরাই বেয়ে নেমেছেন নিচে। পাইন বনের ধারে ধারে—আলো আঁধারিতে—সূর্যের সাতটি রঙের স্বপ্নের পুরীতে। রাত থাকতে যাত্রা করে টাইগার হিলের ভোরের সূর্যোদয় দেখে কবির মনে ভাবের বন্যা নেমেছে কখনও। পর্বতের শীর্ষদেশে দাঁড়িয়ে কখনও বলেছেন—প্রকৃতির এই সৌন্দর্য দুঃখ শোক সব ভুলিয়ে দেয়। কখনো বলেছেন, পর্বতশীর্ষে এসে দাঁড়ালে মন বড় উদার হয়। এই বিরাটের মাঝে অসীমের মাঝে নিজেকে ক্ষুদ্র—অতি ক্ষুদ্র বলে মনে হয়…চার দেয়ালের ছোট্ট আবদ্ধ ঘরে উদার হাওয়া যায় না, তাই সেখানে মন বড় অনুদার। এত হিংসা দ্বেষ ক্ষুদ্রতা।

বলেছেন দিলীপের জন্যে মাঝে মাঝে বড় মন কেমন করে। জানো দাদা, কতদিন ছেলেটাকে দেখিনি। হেমকুসুম রাগ করে তাকে আমার চোখের আড়ালে দূরে সরিয়ে রেখেছে।

কখনো অভিমান করে বলেছেন, যাব না। কোথাও যাব না, এখানেই থাকব। চলতে চলতে পথের ধারে বসেছেন অতুলপ্রসাদ সত্যপ্রসাদ।…পথের ধারে পাথরে বসে বিহঙ্গের কাকলির মত তাঁর নতুন নতুন গান শুনিয়েছেন, মুগ্ধ করেছেন দাদাকে অতুলপ্রসাদ। তখন বাঙলা দেশে তাঁর গানের কী আর প্রচলন ছিল।

বোহেমিয়ান কবি অতুলপ্রসাদ, চারণ কবি অতুলপ্রসাদ গান গাইলেন অকস্মাৎ সেদিন…

যাব না, যাব না, যাব না ঘরে,
বাহির করেছে পাগল মোরে।
বনের বিজনে মৃদুল বায়,
দুলে দুলে ফুল বলে আমায়,
ঘরের বাহিরে ফুটিবি আয়
পুলক ভরে॥

আকাশের দু-তীরে দু-বেলা
আলো কালো করে হোলিখেলা,
আমার পরানে লেগেছে রঙ
কালোর পরে ॥
নীল সরে হেমতরী-'পরে
হাসে নব বিধু লাজ-ভরে।
'এস বধূ' বলে ডাকে মোরে
মোহন স্বরে *

অতুলপ্রসাদের মাসতুত ভাই শিশিরকুমার দত্ত দার্জিলিং এলেন। অকস্মাৎ দেখা তাঁদের দার্জিলিঙের রাস্তায়। শিশিরকুমারের মুখে অতুলপ্রসাদ শুনলেন হেমকুসুমও দিলীপকে সঙ্গে নিয়ে দার্জিলিং এসেছেন। শিশির তাঁদের দার্জিলিং এনেছেন। শিশিরকুমার বললেন, হেমকুসুমের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে হয় তো বল আমি হেমকুসুমকে তোমার কথা বলি।

বিশ্বাস হয় না হেমকুসুম ও দিলীপ এসেছে দার্জিলিঙে! তবে কি তাঁর জন্যেই লখনউ থেকে ছুটে এল এই দার্জিলিঙে হেমকুসুম? বিশ্বাস হয় না! অবিশ্বাসই কি হয়? বরং অবিশ্বাসের হাতে আপনাকে সমর্পণ করে সুখী হতে ইচ্ছে জাগে। দিলীপের জন্যে বড় মন কেমন করে। একমাত্র ছেলে—কতদিন তাকে দেখেন নি অতুলপ্রসাদ!

শিশির বললেন, তুমি রাজি হলেই হল। তাহলে হেমকুসুমকে বলি। তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে এই ভরসা মনে এনেই দার্জিলিঙে এনেছিলাম ওদের। যাক তুমি যে রাজি হয়েছ ভাইদাদা তাতে আমি খুব খুশি। এবার তোমাদের মিলন হোক। তাকে আমি নিয়ে আসব তোমার কাছে।

শিশির হেমকুসুমকে বললেন, ভাইদাদা তোমার দেখা পাওয়ার জন্যে ব্যস্ত। তুমি রাজি হলেই তোমাকে আর দিলীপকে ওঁর কাছে নিয়ে যাব।

…কিন্তু আমি যে ওঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করব তোমার মনে এ বিশ্বাস কে জন্মালো? আমি যাব না। যাও এ-কথা জানিয়ে দাও।…

কিন্তু হেম, কথাটা আর-একবার ভেবে দেখ। মনে কর……

আমার ভাবনার কিছু নেই।

হেমকুসুম রাজি হলেন না অতুলপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করায়। কেন যে, কেউ বলতে পারল না। জানালেন দার্জিলিঙে তিনি বেড়াতে এসেছেন, কারো সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে নয়। কোন শর্ত মেনে নিয়ে তিনি এই পাহাড়ি শহরে আসেন নি। শিশির-

* সত্যপ্রসাদ সেনের ডায়েরি থেকে। কবিতাটি দার্জিলিঙয়ে রচিত।

কুমার দত্ত স্তব্ধ হয়ে শুনলেন। পরে অতুলপ্রসাদকে সে-কথা জানালেন। পুত্র দিলীপকে একবারটি চোখে দেবার কামনা জানালেন, সে আবেদনও মঞ্জুর হল না। হেমকুসুম নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন। শিশিরকুমার সে কথা অতুলপ্রসাদকে জানিয়ে এলেন। অতুলপ্রসাদ আর একবার শিশিরকুমারকে বললেন, তুমি একবারের মত আমার ছেলেকে লুকিয়ে আমার কাছে এনে দাও। তাকে অনেকদিন দেখিনি, ওঁর জন্যে আমার বড় মন কেমন করছে— একবার দেখতে চাই। তুমি দিলীপকে একবার আমার কাছে এনে দিতে পার না?

শিশিরকুমার বললেন, আচ্ছা আমি চেষ্টা করব। আমি দিলীপকে তোমার কাছে এনে দেব ভাইদাদা, তুমি কিছু ভেবো না।

কিন্তু হেমকুসুমের চোখের সামনে থেকে দিলীপকে আনা কি কম কষ্টকর! হেমকুসুম চোখে চোখে রাখেন দিলীপকে। এবং ওঁর সন্দেহ শিশিরকুমারকে। তবুও···

দু-একদিনের মধ্যেই বেড়াতে যাওয়ার নাম করে দিলীপের হাত ধরে শিশিরকুমার অতুলপ্রসাদের হোটেলে পৌঁছে গেলেন। পর-পর আরো কয়েকদিন এলেন। পিতাপুত্রের মিলন হল। সে দৃশ্য বুঝি দেখা যায় না! *

কয়েকদিন পরে অতুলপ্রসাদ সত্যপ্রসাদকে বললেন, চল দাদা এবার ফেরা যাক। তুমি তো তোমার কর্মস্থলে ফিরছ না?

হঠাৎ অতুলপ্রসাদ স্থির করলেন আবার লখনউ ফিরে যাবেন। হেমকুসুম যখন কলকাতায়, তখন তাঁর কলকাতায় থাকা চলবে না। ভাবলেন, তাহলে কোথায় যাওয়া যায়! মন বলল, লখনউ ফিরে চল। সেই পরিচিত শহর, পরিচিত জগৎ, পরিচিত লোকেদের মাঝে···ওদের তো প্রয়োজন ব্যারিস্টার সেন সাহেবকে, মডারেট নেতা মিঃ এ. পি. সেনকে। ভাল লাগে লখনউ ফিরতে; তবু কলকাতা ত্যাগ করে, এই সাহিত্যের রঙ্গভূমি ছেড়ে চলে যেতে মন চায় না।

২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯১৭ মনডে ক্লাবের পক্ষ থেকে কবি অতুলপ্রসাদ সেনকে বিদায় সম্বর্ধনা জানালেন ক্লাবের সভ্যরা দুঃখিত মনে। তার দু-চারদিনের মধ্যে অতুলপ্রসাদ শহর কলকাতা ছেড়ে ফিরে চলে এলেন পুরনো কর্মক্ষেত্র নবাব শহর লখনউ।

---

* শ্রীমতী কুমুদিনী দত্ত (শিশিরকুমার দত্তর স্ত্রী) এবং শ্রীদিলীপকুমার সেনের বক্তব্য অনুসারে।

পনের

একমাত্র ছেলে দিলীপকে নিয়ে দার্জিলিং থেকে ফিরে এসে হেমকুসুম প্রথমে উঠলেন ১০।১ ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতে। তারপর ৩৩।১ ডি অথবা ১১।১ বি ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতে। হেমকুসুমের বাবা তখন অল্প দূরে স্টোর রোডের তাঁর আপন বাড়িতে সপরিবারে থাকতেন। মহেশ উত্তরপাড়া থেকে সাউথ সাবার্বন কলেজে যাতায়াত করত। কলেজ-ফেরতা প্রায় প্রত্যেক দিন দিলীপদের বাড়ি পৌছে গিয়ে দিলীপের পড়াশোনার বিষয়ে সাহায্য করত। হেমকুসুমের সাংসারিক নানা কাজে নানা বিষয়ে সাহায্যে আসত।

মহেশকে হেমকুসুম বললেন, এবার দিলীপকে একটা ইস্কুলে ভর্তি করে দাও। দিলীপ ভর্তি হল মিত্র ইনস্টিটিউশনের নিচু ক্লাসে। ছেলেবেলায় শক্ত অসুখে তার শারীরিক এবং মানসিক ক্রমবিকাশে কিছুটা বাধা হয়েছিল, তাই বয়সের তুলনায় দিলীপকে বিদ্যালয়ের নিচু ক্লাসেই ভর্তি হতে হয়েছিল। মহেশ কলকাতায় এসেও তার ছাত্রকে নিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করছিল কিভাবে তার বুদ্ধির বিকাশ হয়, পড়াশোনায় মন দিতে পারে। উত্তরপাড়া থেকে কলেজে যাতায়াতে অনেক অসুবিধে হচ্ছিল, মহেশ ভাবল কলেজের কাছাকাছি থাকলেই ভাল হয়। রোজ অত দূরে যাতায়াত করতে হয় না, হেমদিদিরও দেখাশোনা করা যায়।

কয়েক মাস পরে মহেশ চক্রবেড়িয়া রোডে উঠে এল। চক্রবেড়িয়া রোড থেকে হেমকুসুমের ল্যান্সডাউন রোডের বাসস্থান কাছাকাছি। মহেশ কলেজ যাওয়ার আগে বা পরে এসে খবরাখবর নিত, দিলীপের পড়াশোনা দেখত।

মহেশ প্রায়ই হেমকুসুমকে বলত, আপনার বড় কষ্ট হচ্ছে। আপনি একজন রান্নার লোক রাখুন। আপনি নিজে হাত পুড়িয়ে রান্না করবেন না। আপনার এসব অভ্যাস নেই।

মহেশ মাঝে মাঝে অনুযোগ করে, আপনার এভাবে এখানে থাকার কোন মানেই হয় না। সেনসাহেবের কাছে আপনি ফিরে চলুন, আমি আপনাকে লখনউ পৌছে দিয়ে আসব।

হেমকুসুম মহেশের কথায় মত দিতে পারেন না, যদিও মাঝে মাঝে তাঁর লখনউয়ের জন্যে মন ব্যাকুল হয়। মন ব্যাকুল হয় অতুলপ্রসাদের জন্যে ; একবার চোখের দেখা পেতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু মনের সে-ইচ্ছেকে বোধহয় জোর করে দমন করতে হয়।...

যদিও হেমকুসুমের অনেক গুণ—তিনি চিত্রশিল্পী একজন, ভাল বেহালা-বাজিয়ে, পিয়ানো বাদিকা, রুচিসম্পন্না, প্রেমময়ী, সেবাপরায়ণা, মধুর ভাষিণীও, তবু ওই এক দোষ তাঁর—দুরন্ত রাগ। রাগ যখন মনে জমা হয়, রূপ বদলিয়ে যায়। রাগে অন্ধ হেমকুসুম বড় ভয়ঙ্করী। দার্জিলিঙে শিশিরকুমার দিলীপকে অতুলপ্রসাদের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন একথা জানতে পেরে হেমকুসুমের রাগের কথা শিশিরকুমার ভুলতে পারেন না। অথচ দার্জিলিঙে যখন শিশিরকুমারের সঙ্গে হেমকুসুম গিয়েছিলেন তখন কি জানতেন না তাঁর স্বামী অতুলপ্রসাদ দার্জিলিঙে আছেন? মনের কোণে ক্ষীণ বাসনা কি ছিল না তাঁর স্বামীর সঙ্গে দেখা হবে!

কলকাতায় অনেক আত্মীয়স্বজন চারিদিকে ছড়িয়ে বাস করে। হেমকুসুমের তাঁদের কারো সঙ্গে কোন প্রয়োজন নেই। তবু মায়ের জন্যে বাবার জন্যে মন কেমন করে, তাই কখনও-কখনও স্টোর রোডে বাপের বাড়ি মা-বাবাকে দেখে আসেন।...এমনিভাবে বিচ্ছেদের মাঝে কয়েক বছর এগিয়ে গেল। গ্রীষ্মের ছুটিতে অতুলপ্রসাদ মাঝে মাঝে কলকাতায় এসেছেন; নেমেছেন হোটেলে, কখনো বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে। যেমন, ডাঃ দ্বিজেন মৈত্রের মেয়ো হাসপাতালের কোয়ার্টারে। কোয়ার্টারের খোলা ছাতে গঙ্গার ধারের হাওয়ায় আসর জমিয়েছেন গানের—মনমাতানো গান। কখনো নেমেছেন এসে মাসতুত ভাই শিশিরকুমারের বাড়িতে; তখন মন্ডে ক্লাবের বন্ধুরা তাঁকে ঘিরে ধরেছে। কলকাতায় এসে নেমেছেন কখনো মেসোমশাই ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্যের কুঠিতে, সুবালা মাসি ও তার মেয়ে উষাকে গান শিখিয়েছেন—সুবালা মাসি তো তাঁর গান বাংলা দেশে প্রথম প্রচার করলেন, পরে অবশ্য অতুলপ্রসাদের গান প্রচারের প্রধান কৃতিত্ব পেতে পারেন শ্রীদিলীপকুমার রায় এবং শ্রীমতী সাহানা দেবী। গান শিখিয়েছেন সুপ্রভা, কনক দাসকে। হাসি খুশিতে, সরস গল্পে, গানে প্রাণবন্ত পুরুষটির অভিযাত্রা। তাঁর সঙ্গে কে কয়েক পা চলল আর কে কয়েক পা চলতে পারল না পিছিয়ে পড়ল বা বসে পড়ল তা দেখবার দরকার নেই। ছোট, উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চল, কাজ কর। পিছনে দেখবার প্রয়োজন নেই। জীবনে যাত্রাটাই বড়। পথ চল আর প্রাণ খুলে হাস। জীবনে বিষণ্ণতার কোন প্রয়োজন নেই। বিষণ্ণ মন এবং অভিমান দৈন্য আনে জীবনে। জীবনকে দুঃসহ করে তোলে। কলকাতায় এসেও অতুলপ্রসাদ হেমকুসুমের সঙ্গে দেখা করেন না। হেমকুসুমও অতুলপ্রসাদের সঙ্গে কোনরকম সম্পর্ক রাখতে ইচ্ছুক নন। বিচ্ছেদ হওয়াই স্থির হল, তাঁরা দু-জনে দু-জনের জীবন থেকে সরে দাঁড়াবেন। অভিমান করে দু-জনে বিচ্ছিন্ন আগেই ছিলেন, এখন বিচ্ছেদ চিরজীবনের মত—কোর্ট কাছারি কিছু হল না...দু-জনেই আপনা আপনি স্থির করলেন। অতুলপ্রসাদ মাসে মাসে হেমকুসুমকে পাঁচশো টাকা পাঠাবেন,

হেমকুসুম প্রাপ্তিস্বীকার করবেন। দিলীপ বছরের কিছু সময় মায়ের কাছে থাকবে, কিছু সময় বাবার কাছে থাকবে। আর কোন যোগসূত্র থাকবে না।

তবু যোগসূত্র বোধহয় মহেশ। মহেশ তখন সাউথ সাবার্বন কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপকরূপে যোগ দিয়েছে। একার সংসার। ভোর-বেলা নিজের হাতে রান্না সেরে ছোটে কলেজে। কলেজে পড়ানো এবং অবসর সময়ে পাঠাগারে পড়াশোনার পর ছুটতে হয় টিউশানিতে। বাড়ি ফেরার পথে রোজকার মত একবার হেমকুসুমের বাড়ি আসা, দিলীপের স্কুলের পড়া তৈরি করে দেওয়া, তাকে নতুন পড়া দেওয়া-নেওয়া। পড়ানো শেষ হতে না হতেই হেমকুসুম মহেশের চা-জলখাবার নিয়ে এসে সামনে রেখে চেয়ার টেনে মুখোমুখি বসে তাকে খাওয়ান।…এ যেন রোজকার নিয়ম।

হেমকুসুম বলেন, একা মানুষ তুমি, এত খাটার দরকার কী? খেটে খেটেই জীবনটা শেষ করবে নাকি?

মহেশ কিছু বলে না, হাসে। হেমকুসুম জানেন মহেশের তিন কুলে কেউ নেই। মহেশ বড় পরোপকারী মানুষ। অন্যের অনেক বিপদ-আপদ মাথায় তুলে নিয়েছে, খাটতে পারে প্রচণ্ড, আর সকলের উপকার করে বেড়ায়। ও যদি শোনে ওর কোন অনাত্মীয় অপরিচিত পুরুষ একাকী রোগগ্রস্ত অসহায় অবস্থায় আছে, ও সব কাজ ফেলে তার কাছে ছুটে যায়, আন্তরিক সেবা-শুশ্রূষায় সারিয়ে তোলে।* টাকা কড়ি শ্রম সেবা দিয়ে কোন কিছুর অভাব রাখে না। তাই বোধহয় তার টাকার এত দরকার, এত পরিশ্রম করে সে। উপকার করা যার নেশা, সে বোধহয় সারাটা জীবন পরের উপকার করে যায়।

প্রতি সন্ধ্যায় সেই একই ঘটনা। ক্লান্ত শ্রান্ত মহেশ আসে, দিলীপের পড়াশোনা দেখে। নীরবে হেমকুসুমের মুখোমুখি বসে থাকে। হেমকুসুমের বেদনায় ব্যথিত হয়। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে—হেমকুসুম যাতে সুখী হয়, বিচ্ছেদের অবসান হয়। …মহেশ হেমকুসুমকে না জানিয়ে কলকাতার সব খবর জানিয়ে লখনউতে অতুলপ্রসাদকে মাঝে মাঝে চিঠি লেখে। দিলীপ মাঝে মাঝে লখনউ চলে যায়। দিলীপ যখন থাকে না, লখনউতে যায় তার বাবার কাছে মহেশের তখন কাজ বেড়ে যায়, ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতে আসার সময়ই পায় না। কত কাজে মহেশকে থাকতে হয়! চার দেয়ালের বন্ধ ঘরে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে হেমকুসুমের একাকী জীবনে। ইচ্ছে হয় খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে একবুক নিশ্বাস নিতে, কিন্তু অনেক ইচ্ছেই অপূর্ণ

*যক্ষ্মারোগগ্রস্ত এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের সেবা করার সময় যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে মহেশের মৃত্যু হয়।

থেকে যায়। কলকাতার আকাশে করুণা নেই—ধোঁয়া আর মলিনতা ঘিরে চিরকাল এখানে অন্ধকার নেমে আসে। ব্যর্থতার বোঝা বয়ে মানুষরা টলতে টলতে পথ চলে। হেমকুসুমের মনে কোন সুখ নেই, কোনদিন কোন সুখ ছিল না, থাকবেও না। দুঃখ যেন চিরকালের সাথী। মাঝে মাঝে একাকীত্বের বেদনা অস্থির করে তোলে তাঁকে।

হেমকুসুমের শরীরটা ক্রমে যেন দুর্বল হয়ে উঠছে। কয়েক মাসের মধ্যে হেমকুসুম শয্যা নিলেন।

মহেশ বলল, আমি অতুলদাদাকে একটা খবর দিই। তাঁকে সকল কথা জানিয়ে একটা চিঠি লিখি।

অসুস্থ শরীর। তবু হেমকুসুম বললেন, না তাকে কোন খবর দেবার দরকার নেই। কোন চিঠি লিখবে না মহেশ। আমার শরীরের কোন কথা জানাবে না।

কিন্তু ভেবে দেখুন, আপনার শরীরের যে অবস্থা তাতে ওঁকে খবর দেওয়া উচিত।

আমার জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না। কারও ভাবনার প্রয়োজন নেই। তুমি যদি কোন চিঠি লেখ, তোমার আমার সম্পর্ক শেষ হবে।

মহেশ ভাবনায় পড়ল। তাকে এই ভাবনা থেকে উদ্ধার করল দিলীপ। সে এসে মার পাশে দাঁড়িয়ে বললে, মা আমি লখনউ যাচ্ছি—বাবাকে খবর দেব। তোমার এত অসুখ, বাবা জানবেন না, এ ঠিক নয়। বাবা তোমাকে ভালভাবে চিকিৎসা করাবেন। তুমি ভাল হয়ে যাবে মা।

আমি বেশ ভাল আছি বাবা, আমার কোন অসুখ নেই।

না, তুমি ভাল নেই। মা তোমার লখনউয়ের জন্যে মন কেমন করে না? আমার বাবার জন্যে মন কেমন করে। এখানে আমরা আর কতদিন থাকব! মা তুমি লখনউ চল। তোমার কথা শুনে বাবা নিশ্চয়ই আমাদের নিয়ে যাবেন।

হেমকুসুম কিছু বলেন না। তাঁর বুঝি যৌবনের নানা রঙের নানা স্মৃতি-ঘেরা লখনউ টানে। বিয়ের পর লণ্ডন থেকে ফিরে কলকাতা, রংপুর; বাংলা বিহার কোথাও তাঁদের আস্তানা জুটল না, শেষে সুদূর সেই নবাব শহরে। সেদিনের দিনগুলো কী আনন্দময়ই না ছিল! তবে কেন এমন হল? হেমকুসুমের এই অসুস্থতা—এ কি কেবল শরীরের জন্যেই, মন কি আর-এক কারণ নয়? দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করেন হেমকুসুম। রাগের কথা মনে হলে মনে পড়ে, অন্যায় এবং অসম্ভব একগুঁয়েমির জন্যে মায়ের কাছে কতদিন বকুনি এবং শেষে কিল-চড়-চাপড়টা খেয়েছেন। তখন কতদিন অতুলপ্রসাদ দু-হাত বাড়িয়ে মায়ের মারের হাত থেকে বাঁচিয়ে তাকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছেন। তারপর আরো কত দিন গিয়েছে। এই একগুঁয়ে মেয়েটা—মামাতো

বোন হেমকুসুম বিয়ে হয়ে কার হাতে গিয়ে পড়বে, কত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা কত দুঃখ লেখা আছে এই ভয়ে তিনি সারা। ভাবতে ভাবতে কোন এক সময়ে অতুলপ্রসাদ নিজের মনকে সমর্পণ করেছিলেন, এবং শেষে বিবাহ করলেন হেমকুসুমকে! আত্মীয়-স্বজন বিরূপ; দুজনে বোম্বে চলে গেলেন। বম্বে থেকে সাগরপারে। সেদিন দুজনে কারো কথায় কান পাতেন নি।···তবে কেন এমন হল, এ কোন্ গ্রহে?

দিলীপের মুখ থেকে হেমকুসুমের অসুস্থতার খবর শুনে অতুলপ্রসাদের কিছু ভাল লাগে না। সকল সময়ে বিষণ্ণ মনে থাকেন, বন্ধু-বান্ধব এলে যা একটু কথায় কথায় মনটা প্রফুল্ল হয়। কাজে তেমন উৎসাহ জাগে না। ভাবেন, এই তো মানুষের জীবন! এর জন্যে মানুষ গর্ব করে, রাগ-অভিমান করে। কখন কার ভাগ্যে কী লেখা আছে কে বলতে পারে! হেমকুসুমের এত রাগারাগি, মান অভিমান; এখন অসুস্থ শরীরে সে কতই না অসহায়! দিলীপের মুখে সব কথা শুনে হেমকুসুমের জন্যে হঠাৎ যেন মন কেমন করে ওঠে। হেমকুসুম আজ লখনউয়ে নেই, তাই আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব পরিচিতদের লখনউ আগমন। লখনউয়ে অতুলপ্রসাদের বাড়ি যেন পান্থশালা—শুধুই অতিথির আনাগোনা, আসল মানুষের দেখা নেই। এতদিনে বুঝি তাঁকে মনে পড়ল হেমকুসুমের।······

অতুলপ্রসাদ খুব চিন্তিতভাবে দিলীপকে বললেন, কলকাতায় তোমার মায়ের ঠিকমত চিকিৎসা হচ্ছে তো? ডাক্তার কী বলেন? এখন কেমন আছেন? আমার কাছে তোমার মাকে যত তাড়াতাড়ি পার নিয়ে এস। আমি এখান থেকেই তাঁর চিকিৎসা করাব। তোমরা আমাকে চিঠিপত্র লেখ না কেন?

মা লিখতে বারণ করেছিলেন। মার ইচ্ছে নয় মার অসুখের কথা তোমার কাছে লিখে জানাই। মহেশকাকা কলকাতাতে ডাক্তার ডেকেছিলেন, তাঁরা দেখে গেছেন। ওষুধপত্র আনা হয়েছে। মহেশকাকা মায়ের অনেক সেবাশুশ্রূষা করছেন। তুমি নিজে না আনলে মা কখনই লখনউ আসবেন না।

বেশ তো, আমি নিজে গিয়ে নিয়ে আসব তোমার মাকে কলকাতা থেকে। জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার পড়াশোনো কেমন হচ্ছে?

হচ্ছে না, দিলীপ বললে। আমি পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছি। প্রথম কারণ মায়ের সেবা-শুশ্রূষা করতে করতে পড়াশোনা করতে পারিনি, দ্বিতীয়, আমার পড়া মনে থাকে, না। আমি ভাবছি অন্য কিছু শিখব। কোন কিছু ট্রেনিং নেব।

কী শিখতে চাও তুমি?

ফার্মিং শিখব, আমার অনেক দিনের ইচ্ছে।

বেশ তো, তোমাকে না-হয় দেরাদুন পাঠানো যেতে পারে ওই জন্যে। তুমি বাবা

একটা কাজ কর, তোমার মাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কলকাতা থেকে নিয়ে এস। আমার এখন এদিকে একটা কাজ আছে, একদম সময় পাচ্ছি না—কোর্টের ছুটি নেই। তুমিও তো এখন বড় হয়েছ। মায়ের শরীর তো এখন একটু ভাল আগের থেকে, না? পারবে না!

দিলীপ বললে, পারব।

দিলীপ ফিরে চলে গেল কলকাতায়। কলকাতা থেকে ফেরার তোড়জোড় করতে লাগল। কলকাতায় এসে শুনল মহেশকাকা বিবাহ করেছেন একটি দুঃস্থ ঘরের মেয়েকে। মহেশকাকার মত মানুষ হয় না। মেয়েটির বাবার অসহায় অবস্থা দেখে মহেশকাকা অল্পসময়ের মধ্যেই তার বাবাকে কথা দিয়ে তাকে বিবাহ করেছেন। বিবাহ করে দূরে অন্য জায়গায় বাসা নিয়েও মাকে দেখাশোনা করছেন। সেবা শুশ্রূষা করছেন স্বামী স্ত্রী মিলেই। মহেশকাকা খুব কর্তব্যপরায়ণ নির্ভীক পুরুষ।

দিলীপ বললে, মা তুমি চল, তোমার আর কোন আপত্তি শুনব না।

এটুকুই যেন শোনার অপেক্ষায় ছিলেন হেমকুসুম। অভাব দু-জনেই অনুভব করছিলেন। হেমকুসুমের অসুস্থতা বুঝি সাময়িকভাবে মিলনের সেতু হয়ে দেখা দিল।*

অতুলপ্রসাদ হেমকুসুমকে লখনউ নিয়ে এলেন। লখনউ এনে জানালেন, তোমার যদি আমার সঙ্গে একই বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে না হয় তো বল, তোমার জন্যে আর-একখানা বাড়ি ভাড়া নিয়ে রাখি। তোমার গাড়িও থাকবে, দিলীপও থাকবে। সেখানে তোমার কোন কষ্ট হবে না।

হেমকুসুমের চোখদুটি জলে ভরে এল।—বললেন, আমি এখানেই থাকব।

---

* অন্য আর এক সূত্রে জানা যায়, অতুলপ্রসাদের এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ার চেষ্টায় এ পর্যায়ে কবি ও কবিপত্নীর মিলন হয়।

ষোল

সেই ঘর, সেই জানলা। জানলার ধারে হাস্নাহানার ঝাড়টি ঠিক তেমনি গন্ধ ছড়ায় সন্ধ্যার মুখে। কেশরবাগের মোড় ধরে এক্কা-টাঙার তেজী ঘোড়া খুরে আগুনের ফুল্‌কি ছুটিয়ে চলে তেমনি। ভোর হতে না হতেই ফুলওয়ালীর দল ফুল বেচে চলে; সবজিওয়ালারা তিন চাকার গাড়িতে সবজি বোঝাই করে হেঁকে যায়। সানাই বাজে দূরে ভৈরবীতে···যদিও সবকিছু পরিচিত তবু কেমন যেন অপরিচয়ে মাখা এক অজ্ঞাত রহস্যময় জগতের গন্ধ ভেসে আসে; সত্যি, কতগুলো বছর এর মধ্যে পার হয়ে গেছে। হেমকুসুম চোখ মেলে তাকিয়ে অতুলপ্রসাদকে দেখলেন। প্রৌঢ়ত্বের সবকটি চিহ্ন এখন তাঁর অঙ্গে, তবু এখনও যেন তিনি পরিপূর্ণ যৌবনের অধিকারী, উদ্দাম প্রাণময়তায় ভরপুর।

অতুলপ্রসাদ হেমকুসুমকে উৎসাহ দিলেন। বললেন, তোমার দেখাশোনা পরিচর্যার জন্যে একজন পরিচারিকা আমি নিযুক্ত করে দিলাম। খাও-দাও বিশ্রাম কর। ডাক্তার যেভাবে চলতে বলবেন সেভাবে চলবে। ওষুধপত্র যা যা খেতে বললেন খাবে, বিরক্ত হয়ো না। লখনউয়ের সেরা সেরা ডাক্তাররা তোমায় দেখে যাবেন। অবশ্য আমার মনে হয় তুমি এখন অনেকটা সুস্থ; তোমার মুখ দেখে আমার তাই মনে হয়। তোমাকে আমি নৈনিতাল, আলমোড়া, দেরাদুন, মুসৌরী নিয়ে যাব। কোন্ শহরটা তোমার পছন্দ বল?

হেমকুসুম চোখ ফিরিয়ে তাকিয়ে অতুলপ্রসাদকে দেখলেন। প্রথম দৃষ্টিতে তাঁকে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল বলে মনে হলেও তিনি ঠিক আগের মত নেই, তাঁর শরীরের অবস্থা সম্বন্ধে জানতে হেমকুসুম জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলেন।

অতুলপ্রসাদ হেসে বললেন, আমিও আর আগের মত স্বাস্থ্যযুক্ত নেই হেমকুসুম। আমার রক্তচাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। ডাঃ ভাটিয়া নুন কম খেতে বলেছেন কিছুদিন। অত বাধা-নিষেধ ভাল লাগে না।

কিন্তু তাতে তো আবার স্বাস্থ্য খারাপ হবে।

কী জান, নিজেকে অসুস্থ মনে করলেই অসুস্থ মনে হয়। খাও-দাও আনন্দ কর, দেখবে সব রোগ তোমাকে ছেড়ে পালিয়ে গেছে। ডাক্তাররা অতিরিক্ত সাবধানী। দিলীপের মুখে কলকাতা থাকতে শুনেছিলাম কোর্টে কাজ করতে করতে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে?

ও কিছু নয়।

সব কথা আমাকে বল, লুকিও না।

শোন তবে। একদিন কোর্টে আরগুমেন্ট করতে করতে শরীরটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আরগুমেন্টের মাঝে বার-লাইব্রেরিতে এসে বসেছিলাম, জুনিয়ারদের সঙ্গে আলোচনা করছি, এমন সময়ে মাথাটা কেমন ঘুরে গেল—প্রবল জ্বর এল। বেহুঁস অবস্থা। আমার জুনিয়ার অ্যাডভোকেট-প্লীডার সকলে আমাকে ধরাধরি করে গাড়িতে তুলে দিল, কেউ কেউ বোধহয় আমার সঙ্গে বাড়ি পর্যন্ত এসেছিল।

হেমকুসুম বললেন, তারপর?

তারপর আর কী! তুমি তো তখন কলকাতায়, কে আর আমার সেবাশুশ্রূষা করবে। ভাগ্যিস সুবালামাসী ছিলেন এই আউট্রাম রোডের বাড়িতে, মায়ের মত সেবা-শুশ্রূষায় আমাকে সারিয়ে তুললেন। সুবালামাসী যদি সে সময় লখনউ না থাকতেন, সত্যি তাহলে আমাকে অসুবিধেয় পড়তে হত।

সুবালামাসীর কথায় এবং প্রশংসায় হেমকুসুমের মুখ বিকৃত হয়। এখনও হেমকুসুম সহ্য করতে পারেন না অতুলপ্রসাদের মাকে, বোনেদের, মাসীদের, মামাদের। প্রশংসা এবং নিন্দা কোন কিছু নয়।

কোর্টের কাজেকর্মে নানা মক্কেলদের আহ্বানে মাঝে মাঝে অতুলপ্রসাদকে কানপুর, আগ্রা, দিল্লী, বম্বে, মাদ্রাজ, কলকাতা সব জায়গায় ছুটতে হয়। তাছাড়া তাঁর আরো কত কাজ। মডারেট লিডার এ. পি. সেন, সমাজসেবী অতুল সেন। তাঁর অনবরতই নানান জায়গা থেকে ডাক আসছে। এই তো সেবার একদিনের জন্যে গেলেন এলাহাবাদে কোর্টের কাজেই; উঠলেন তেজবাহাদুর সাপ্রুর অতিথি হয়ে। কাজ শেষ হতে সন্ধ্যারাতে সেদিনই এলাহাবাদ থেকে মোটরযোগে লখনউ যাত্রা করলেন, সঙ্গে এক্সট্রীমিস্ট অমল হোম এবং মডারেট নেতা সি. ওআই. চিন্তামণি। তাঁরা দু-জনে আউট্রাম রোডের বাসায় আনন্দে কয়েকটা দিন কাটিয়ে গেলেন। অমল ও চিন্তামণি দুজনেই বেশ অস্বস্তি বোধ করছিল একসঙ্গে গাড়িতে আসতে।

কেন, কেন? হেমকুসুম বললেন।

অমল যে চরমপন্থী, আর আমরা—আমি ও চিন্তামণি যে মধ্যপন্থী! চিন্তামণি তো অমলকে দেখেই রেগে আগুন, শেষে অনেক করে বুঝিয়ে শুঝিয়ে নানা ঠাট্টা করে ঠাণ্ডা করে তবে নিয়ে এলাম লখনউতে; কয়েকটা দিন আমার এখানে কাটিয়েও গেল দুজনে।*

---

* শ্রীঅমল হোম লিখেছেন, '১৯২০ সালে আমি "ট্রিবিউন"-এর কাজে ইস্তফা দিয়ে লাহোর ছেড়ে, এলাহাবাদে মতিলাল নেহরুর 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' কাগজে যোগ

আমি যখন এখানে থাকি না তখন তোমার এখানে সব সময়ে লোকজন আসে দেখছি। এটা কিন্তু আমি পছন্দ করি না।

অতুলপ্রসাদ হাসেন।

হেমকুসুম বলেন, যাই হোক, তুমি কিন্তু এত পরিশ্রম কোরো না। তোমার জন্যে আমার বড় ভয় হয়। একদিনে সকালে এলাহাবাদ গিয়ে সারাদিন নানা কাজকর্ম করে ফিরে এলে সেদিন রাত্রে লখনউতে, এত পরিশ্রম ভাল নয়। বয়সও তো হয়েছে। শরীরের দিকে দৃষ্টি রাখ।

অতুলপ্রসাদ বলেন, আমার শরীরে এখনও আগেকার মত শক্তি ; পরীক্ষা করবে নাকি ! আমি বুড়ো হইনি…! সেদিনই না এসে উপায় ছিল না। লখনউতে আমার

দিলাম। ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কাগজের নৌকা তখন এক্সট্রীমিজম্‌এর ভরা পাল চড়িয়ে ছুটেছে। বিপিনবাবু সম্পাদক রঙ্গ আয়ার আর আমি তাঁর দুই সহকারী সাব-এডিটররা এক-একজন অগ্নিশলাকা। মডারেটদের মুণ্ডুপাত করা আমাদের নিত্যকর্ম, বিশেষত ইউ. পি-র মডারেট লীডারদের। তেজবাহাদুর কাশ্মীরী হয়েও পার পান না। জগৎনারায়ণ প্রায়ই খোঁচা খান, তবে চিন্তামণির ওপর রাগটাই আমাদের বেশি, কেননা তিনি লীডারের সম্পাদক। জহরলালজী তবু খুশি নন। প্রায়ই বলেন বড় ফ্ল্যাট হয়ে যাচ্ছে, যেন আরও একটু সুর চড়ালে ভাল হয়। এহেন অবস্থায় একদিন দুপুরে অফিসে বসে কাজ করছি। জুন মাস, অসহ্য গরম ; চতুর্দিকে খস-খস টাঙানো—হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে সেই অগ্নিকুণ্ডে এক্সট্রীমিস্টদের কেল্লায় প্রবেশ করলেন মডারেট লীডার মিস্টার এ. পি. সেন। সদাহাস্য-বিকশিত সস্মিত বদন। সাব-এডিটরেরা বিস্মিত, রঙ্গ আয়ার একটু অপ্রস্তুত ; কোথায় যেন বাধছে—আমি তাড়াতাড়ি এসে সম্বর্ধনা করে বসালাম। এইদিন সকালে এলাহাবাদ হাইকোর্টে একটা মকর্দমার কাজে তিনি এসেছেন, রাত্রেই ফিরে যাবেন। বললেন আজ শনিবার, কাল তো তোমার ছুটি। আজ চল আমার সঙ্গে লখনউ,—মোটরে যাব রাত্রিতে। তিনি ডক্টর তেজবাহাদুর সাপ্রুর অতিথি। খাওয়া-দাওয়া সেরে সেখানেই গেলাম। তেজবাহাদুর সাপ্রু ঠাট্টা করে বললেন, মডারেটদের বাড়িতে কি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টদের আসতে হয় ! অতুলপ্রসাদ হেসে বললেন, তাই তো আমি নিজে গিয়েছিলাম। একটু পরে দেখি শ্রীযুক্ত চিন্তামণি এসে উপস্থিত। তাঁকেও অতুলপ্রসাদ লখনউ নিয়ে যাচ্ছেন। আমার তো চক্ষুস্থির ! প্রতিদিন যাঁর সম্বন্ধে কটুকাটব্য না করে আমরা জলগ্রহণ করি না, তাঁর সঙ্গে একত্র গমন ও বসবাস—সমস্যা বটে। চিন্তামণি মহাশয় স্বভাবতই গম্ভীর, যে কারণেই হোক আরো একটু গম্ভীর হলেন।

অনেক কাজ যে, এত কাজ ফেলে বেশি দিন অন্য কোথাও থাকতে পারি! আমি দূরে থাকলে লখনউবাসীদের চলবে না। আমিও ওদের ছেড়ে থাকতে পারি না।

গরম কাল এল। কোর্ট বন্ধ হতে তখনও দেরি আছে। অতুলপ্রসাদ হেমকুসুমকে বললেন, যাও, তুমি দিলীপকে সঙ্গে নিয়ে দেরাদুন মুসৌরি ঘুরে এস। তোমার শরীর ভাল থাকবে শীতের দেশে।

তুমি যেতে পারবে না?

আমার পক্ষে এখন তো যাওয়া হয়ে উঠবে না হেম! অনেক কাজ—একটার পর একটা কাজ এসে পড়ছে, এ কাজগুলো ছেড়ে কেমন করে যাই বল।

তবে যেও না। অভিমানিনী হেমকুসুম।

অতুলপ্রসাদ হাসলেন।

একদিন শুভদিন দেখে হেমকুসুম ও দিলীপ—মা ও ছেলে দেরাদুন এক্সপ্রেসে ওঠে বসলেন পাহাড়তলির দেশে যাত্রার উদ্দেশ্য নিয়ে। দেরাদুন থেকে চিঠিপত্র লেখেন দিলীপ ও হেমকুসুম। তাঁরা দেরাদুনের একখানা বড় হোটেলে ঘর নিয়েছেন, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন দেরাদুন, মুসৌরি, হৃষীকেশ, হরিদ্বার। হরিদ্বার হৃষীকেশের গঙ্গায় স্নান বড় মনোহর। প্রাণ মন শীতল করে তোলে। হেমকুসুমের যে বেড়াতে ভাল লাগছে একথা জেনেও মন তৃপ্ত হয় অতুলপ্রসাদের। বেড়ানোর মত আনন্দ আর কোথায় আছে! বেড়াও আর মানুষ দেখ, মানুষের সঙ্গে পরিচয় লাভ কর। দেশভ্রমণ তো নয়, মানব দর্শন। প্রকৃতির হাতে শিক্ষা নাও, তোমার মনে উদারতা নেমে আসবে—মনের নীচতা কেটে যাবে, তুমি মানুষ হবে। ভ্রমণ কর, ভ্রমণ কর··· বাইরের অন্তরের চোখ খোলা রেখে বেরিয়ে পড়, ঘুরে বেড়াও। চরৈবেতি।

হঠাৎ খবর এল, টাঙা থেকে পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনায় হেমকুসুম আঘাত পেয়েছেন। আঘাত লেগেছে পায়ে, গুরুতর আঘাত। খবর শুনে অতুলপ্রসাদ সেদিনই রওনা হলেন

> আমার অবস্থা সহজেই অনুমেয়। অতুলপ্রসাদ ব্যাপারটা বুঝলেন। গাড়িতে উঠে চিন্তামণি মহাশয়কে বসালেন আমাদের দু-জনের মাঝখানে। তারপর আরম্ভ করলেন যত খোশগল্প, আর চিন্তামণি মহাশয়ের মৃদু মৃদু leg pulling. গভীর নিশুতি রাতে মোটর চলছে, নীরব পথ মুখরিত হয়ে উঠেছে হাস্য-ধ্বনিতে। চিন্তামণি না হেসে পারছেন না। এমন করে সমস্তটা সহজ করে দিলেন অতুলপ্রসাদ। যে দুদিন আমরা তাঁর বাড়িতে দুজনে ছিলাম কেউ কোন কুণ্ঠা বোধ করিনি। পরস্পরের সহজ সম্বন্ধটাই ফুটে উঠল পোলিটিকাল কোন্দলের উপরে, আর সে শুধু অতুলপ্রসাদের গুণেই।

দেরাদুন। দেরাদুন পৌছেই তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন লখনউ। লখনউয়ের খ্যাতনামা ডাক্তারদের কল দেওয়া হল। সকলে একে-একে পরীক্ষা করলেন। আঘাত থেকে জটিলতর অবস্থার উদ্ভব হল। সেইসঙ্গে শরীরে নানা উপসর্গ দেখা দিল। শরীর এবং স্বাস্থ্যের জন্যে তাঁকে পাহাড়ে স্বাস্থ্যকর জায়গায় পাঠানো হল ; কোথায় সম্পূর্ণ সেরে সুস্থ হয়ে উজ্জ্বল হয়ে ফিরে আসবেন, তা নয়, এ কী অদৃষ্টের পরিহাস!

অসহ্য যন্ত্রণায় হেমকুসুম কাতরোক্তি করেন। অতুলপ্রসাদ চিন্তিতভাবে তাকিয়ে হেমকুসুমকে সাহস জোগান : তুমি ভাবনা কোরো না হেমকুসুম, আমি তো আছি।

ভাবনা করার অবশ্য কারণ ছিল ডাঃ ভাটিয়ার কথায়। ডাঃ ভাটিয়া বললেন, আমার মনে হচ্ছে মিসেস সেনের শরীরে একটা অপারেশন করার দরকার হতে পারে।

অতুলপ্রসাদ বললেন, ডাক্তার, অপারেশনে হেমকুসুমের স্বাভাবিক সুস্থতা ফিরে আসবে ?

ডাঃ ভাটিয়া বললেন, চেষ্টা করা ছাড়া উপায় নেই। আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আপনার ভয় নেই।

হেমকুসুম অপারেশনের আগে ভয় পান স্বাভাবিকভাবেই।

অপারেশনের সময় স্বাক্ষর করতে এসে মুহূর্তের জন্যে কলম-ধরা হাতখানি কাঁপে বুঝি অতুলপ্রসাদের। যদি কিছু ঘটে যায় অকস্মাৎ হেমকুসুমের! সে যে হবে বড় দুঃখের, বড়ই দুঃখের! তার থেকে থাক, যেমন আছে তেমন থাকুক হেমকুসুম। তবু হেমকুসুম আছে—ওর অস্তিত্বটুকু অনেকখানি অতুলপ্রসাদের মনে। কিন্তু এ দ্বিধা বুঝি ক্ষণিকের। দুর্বলতা অতিক্রম করে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হন অতুলপ্রসাদ। সকল পথের শেষে তিনিই— আদি এবং অন্ত। ঈশ্বর-নির্ভর না হয়ে উপায় কী!

ঈশ্বরের ইচ্ছায় সবকিছুই মঙ্গলরূপে সম্পন্ন হল। অপারেশন সাকসেসফুল। ডাঃ ভাটিয়া বললেন, মিসেস সেন এখন দ্রুত আরোগ্যের পথে মিঃ সেন। না, আপনার ভাবনার কিছু নেই। আপনি এখন আপনার কাজকর্মে সম্পূর্ণভাবে মন দিতে পারেন।

অতুলপ্রসাদ হেমকুসুমের বিছানার ধারে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, এখন কেমন মনে হচ্ছে হেম ?

হেমকুসুম বললেন, ভাল। আমাকে উঠিয়ে বসিয়ে দাও। ঘরের মধ্যে শুয়ে শুয়ে পিঠে ব্যথা হয়ে গেল…জানলাটা খুলে দাও না একটু, বাইরের আলো দেখি।

অতুলপ্রসাদ সযত্নে চাদরটি গায়ে জড়িয়ে দিয়ে হেমকুসুমের পিঠে বালিশের দেয়াল তুলে দিয়ে আধ-শোয়া করে শুইয়ে দিলেন। পরে এগিয়ে গিয়ে জানলা খুলে দিয়ে বললেন, দেখো ঠাণ্ডা যেন না লাগে। আমার বড় ভয় হয়!

আলোয় ভরে গেল ঘরদুয়ার, বারান্দা। হেমকুসুম তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। পরে ক্লান্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

অতুলপ্রসাদ বললেন, তুমি শুয়ে থাক, বিশ্রাম কর ; আমি ঘুরে আসি হেম। সি. ওয়াই. চিন্তামণি এসেছেন, তাঁর গলা শুনতে পাচ্ছি ; বিশ্বেশ্বরনাথ, সৈয়দ ওয়াজির হোসেন সাহেব আমার জন্যে অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করছেন। লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-সভার জরুরি মিটিং আছে আজ। কদিন থেকে রাফায়েল ক্লাব বেঙ্গলী ক্লাবের সভ্যদের আনা-গোনা শুরু হয়েছে—ওদিকে অনেকদিন যেতে পারিনি······কত দিক সামলাই বল তো! সকলে কেন যে আমাকে এত ডাক দেয়, আমার জন্যে প্রতীক্ষা করে আমি বুঝি না···আচ্ছা আমি আসি—আসি, বুঝলে!

তুমি তাড়াতাড়ি এসো, আমার বড় ভয় করে।

আমি যাব আর আসব। তুমি কিছু ভেব না হেম। কপালে হাত ছুঁইয়ে অতুলপ্রসাদ বিদায় নিলেন। হেমকুসুম প্রতীক্ষা করে রইলেন।

প্রতীক্ষা করে আছেন আরো অনেকে। প্রতীক্ষায় আছেন সেন সাহেবের জন্য লখনউয়ের জ্ঞানী গুণী মানুষরা।

জ্ঞানী গুণীদের কদর জানেন সেনসাহেব—পর্ণকুটিরে ভৈরবী ঠুংরি শুনতে গিয়েছেন। বৃদ্ধ ওস্তাদ কেঁপে অস্থির—সেনসাহেবকে কোথায় বসাবেন, কোথায় জায়গা দেবেন। তবু বোধহয় মনে মনে বৃদ্ধ ওস্তাদ প্রতীক্ষা করছিলেন সমঝদার আসবেন তাঁর এই পর্ণকুটিরে, তাঁকে কদর করবেন। পর্ণকুটিরে ভাঙা খাটিয়ায় বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান শুনেছেন অতুলপ্রসাদ, তারিফ করেছেন। শুধু শুকনো মুখে নয়, ওস্তাদের ছেলের হাতে নোট গুঁজে দিয়ে কিসী রোজ তসরিফ নিয়ে আসতে অনুরোধ করেছেন। বৃদ্ধ ওস্তাদের প্রতীক্ষার অবসান হয়েছে। সমঝদার সেনসাহেব এসে তাঁকে 'কদর' দান করেছেন। প্রতীক্ষা করেছেন ওয়াজিদ আলি শায়ের দরবারের শেষ গায়ক ছোট মুন্নে। অতুলপ্রসাদ তাঁকে সাদরে তাঁর বৈঠকখানায় জায়গা দিয়েছেন। তালিম হোসেন লখনউয়ের শেষ বিখ্যাত সানাইয়া। ওর ভৈরোঁ আর টোড়ি। ইউসুফের সেতারের হাত বড় মিঠে। ওকে রাখলে হয় না? বরকতের ছড়ির টান ভাল। নিয়ে এস তাকে। ওদের মাইনে করে রাখব।

ধনী-দরিদ্র, মডারেট-এক্সট্রীমিস্ট, রাজা-নবাব রৈসবায়ৎ, অধ্যাপক, স্কুলমাস্টার, উকিল, ব্যারিস্টার, হিন্দু মুসলমান সকল শ্রেণীর সকল সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁর জন্যে প্রতীক্ষা করে আছেন। বৃহত্তর পৃথিবী তাঁর জন্যে বসে আছে। অনুক্ষণ ডাক দেয়। সময় কোথায় ঘরের ডাকে সাড়া দেবার। এ জীবন কতটুকু, কতটুকু অবসর!*

* * *

হেমকুসুম একটু একটু করে বিছানা থেকে উঠে বসলেন। দাঁড়ালেন আপন পায়ে দুর্বল

* 'অতুলপ্রসাদ'—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ।

শরীরটার ভার নিয়ে। দেয়াল ধরে ধরে পায়ে পায়ে চলে-ফিরে বেড়ালেন। সেদিন অতুলপ্রসাদ এলেন। এলেন যখন, অভিমানে আর রাগে হেমকুসুম মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

আমি আর তোমার সঙ্গে থাকব না।

হেমকুসুম, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না।

আমি আর তোমার সঙ্গে থাকব না। আমি দিলীপকে সঙ্গে নিয়ে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। আমাকে ডাকতে পারবে না। হেমকুসুমের মনে নানা সন্দেহ সংশয়। এল প্রাণঘাতী সেই পুরোনো রাগ। দিলীপ তুমি আমার সঙ্গে চল, যদি তুমি আমার ছেলে হও।

এর পরের ঘটনা আমরা দেখতে পাই, অসুস্থ হেমকুসুম পুত্র দিলীপের হাত ধরে কৈশরবাগের মোড়ের বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন। বাড়ি ভাড়া নিলেন লালবাগ মহল্লায়।

একদিন অতুলপ্রসাদ লালবাগের বাড়িতে এলেন। বললেন, হেমকুসুম চল, কেন তোমরা এমন কষ্ট করে আছ! হেমকুসুম লালবাগের বাড়ি ছেড়ে দিতে রাজি হলেন না। মনের দুঃখে কৈশরবাগের বাড়িতে ফিরে চলে এলেন অতুলপ্রসাদ।

১৯২৩-এর জানুয়ারি মাসে হঠাৎ সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ আসছেন মার্চ মাসে বম্বে যাওয়ার পথে লখনউতে। অতুলপ্রসাদের বাড়িতে তিন-চার দিন থাকবেন। ১লা মার্চ থেকে সম্ভবত ৪ঠা মার্চ।

ভাল একটা সম্বর্ধনা দিতে হবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে। লখনউয়ের বিশিষ্ট অধিবাসীরা একত্রিত হলেন।

সত্যকুমারকে ডেকে পাঠালেন অতুলপ্রসাদ। সত্যকুমার তখন কলকাতা থেকে ফিরে এসে বাস করছেন অতুলদার বাঙলোর হাতার দোতলায় মক্কেলদের জন্য থাকার বাড়িতে। সত্যকুমারের বড় দুঃসময় চলছিল কয়েক বছর। মাত্র ছয় মাসের মধ্যে ওর আঠারো বছরের জোয়ান ভাই, এবং পরে ওর প্রথম মেয়েটা মারা গেল।* সিমলার ভাল চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাধ্য হয়ে ফিরে আসতে হল কম মাইনেতে লখনউয়ে। সত্যকুমার বড় ভেঙে পড়েছে; ওকে সান্ত্বনা দেওয়া দরকার। জীবনে দুঃখ বেদনা তো আছেই; তাই বলে কি মন সকল সময়েই দুঃখ বেদনায় ঘিরে থাকবে!

সত্যকুমার কোথায়? যোগীনবাবু আদিত্য দ্বিজেন পাহাড়ি গিরীশ অখিল বীরেন† এরা কোথায়? আরে ডাক, ডাক!

---

* সত্যকুমার মুখোপাধ্যায়কে সান্ত্বনা দিয়ে অতুলপ্রসাদের পত্র—

স্নেহাস্পদেষু — 3 Banks Rd.
Lucknow 21. 7. 21.

সত্যকুমার, তোমার শোকাবেশময় পত্রখানি পাইয়াছি। কি যে লিখিব জানি না। তাঁর নিয়ম ও অভিপ্রায় বুঝি না। যতদিন দুঃখের অতীত না হওয়া যায় ততদিন দুঃখ সহ্য করিতে হইবে এই বুঝি। যে হস্ত আঘাত করে সে হস্তই ধরিয়া থাকা ছাড়া আর উপায় নাই। তিনিই ক্রমে ক্রমে তোমাদিগকে সান্ত্বনা দিন এই প্রার্থনা করি। তোমার পিতাঠাকুর ও মাকে আমার ভক্তি-পূর্ণ প্রণাম জানাইও। তোমরা দুজনে স্নেহ-সম্ভাষণ নিও।

তোমার অতুলদাদা

† পাহাড়ি সান্যাল, দ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল, দ্বিজেন্দ্র আদিত্য, যোগীন বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশ ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্রনাথ রায়, অখিল বন্দ্যোপাধ্যায় এঁরা সকলে ছিলেন বাঙালী যুবক সমিতির উৎসাহী সভ্য।

সত্যকুমাররা বললেন, দাদা আপনি ভাববেন না বেশি। আপনার শরীর খারাপ হবে। কবিকে আমরা তাঁর উপযুক্ত সম্মান দিতে চেষ্টার কোন কার্পণ্য করব না।
ভাবব না? সেকি, কবিগুরু লখনউ আসছেন আর আমি স্থিরভাবে বসে থাকব একথা কেউ ভাবতে পারে! জবরদস্ত অভিনন্দন জানাতে হবে প্রবাসে কবিগুরুকে। বল তোমরা কিভাবে কবিগুরুকে অভিনন্দন জানাবে?
অতুলদাদার ব্যাঙ্কস রোডের বাড়িতে ক্লাবের পাণ্ডাদের একটা জোর সভা হয়ে গেল। সভায় প্রোগ্রাম স্থির হল। অতুলদাদা বললেন, কবির আগমন উপলক্ষে আমি একখানি গান বাঁধব। সভার শুরুতে তোমাদের গান গাইতে হবে। তারপর পাহাড়িকে বললেন, তোমাকে গানখানি গাইতে হবে। আমার কাছে এসে খবর নেবে। আমার গানখানি লেখা শেষ হলে তোমাকে শিখিয়ে দেব, কেমন?
বঙ্গীয় যুবক সমিতির ছেলেরা খুব উৎসাহের সঙ্গে ক্লাবঘর পরিষ্কার করে। সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখে। ক্লাবের কর্তাব্যক্তিরা রবীন্দ্র-সম্বর্ধনার জন্যে যাতে কোন খুঁত না থাকে প্রবাসে এই লখনউ শহরে তার জন্যে বিশেষভাবে ব্যস্ত হলেন। ঘন-ঘন সভা ডাকা হল।
পাহাড়ি অতুলদার বাড়িতে পৌঁছে গেল। কী অতুলদা, রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনার জন্যে নতুন গানখানা লিখবেন বলেছিলেন, লেখা হয়েছে অতুলদা?
অতুলপ্রসাদ যেন কেমন অন্যমনস্ক। শুনেও শোনেন না সেকথা। আপন কাজে ব্যস্ত।
হবে হবে পরে হবে, কাল এসো পাহাড়ি। অতুলদা বললেন।
পাহাড়ি ফিরে আসে। পরের দিন আবার যায় অতুলদার বাড়ি। অতুলদা বলেন, আজ একেবারে সময় পাইনি পাহাড়ি, গান লেখা হয়নি। তুমি কাল এসো। পাহাড়ি চলে যায়। পরের দিনও সেই এক কথা। না পাহাড়ি—গানটা লেখা হয়ে ওঠেনি, তুমি কাল এস। গান লেখা হলেই তোমাকে সুরটা তুলে দেব।
এমনি করে রবীন্দ্রনাথের লখনউ আগমনের দিন এগিয়ে আসে। পাহাড়ি ভাবে, অতুলদা কি গান লেখার কথা ভুলে গেছেন! নানান কাজে অতুলদার মনে থাকছে না বোধহয়। এতদিনেও গান লেখা হল না। অতুলদা গান লিখবেন, গানে সুর দেবেন, আমাকে শেখাবেন, অন্যান্য সঙ্গীদের শেখাবেন, কী করে সম্ভব! রবীন্দ্রনাথের লখনউ আগমনের দিন যে এগিয়ে এল।
দিন সাতেক মাত্র বাকি। অতুলপ্রসাদের মনের মত গান লেখা আর হয় না, যে গানখানি ক্লাবের ছেলেরা গাইবে। প্রতিদিন প্রাণপাত চেষ্টা করেন লেখার, কিন্তু মনের মতন সঙ্গীতটি ধরা পড়ে না। অমনোনীত কবিতাগুলি ব্যঙ্গ করে খণ্ড-খণ্ড রূপে

লেখার টেবিলের নিচের বাস্কেটটা উপচে উঠে। অবশেষে রবীন্দ্রনাথের লখনউ আসার কয়েকদিন আগে অতুলপ্রসাদ তাঁর গানের কলি খুঁজে পেলেন ; লিখলেন :

'চাহ রে আজি ভারতমাতার প্রতি।'

গানটি রচনা হলে তাতে সুর সংযোজিত হল। সেই গানখানি ক্লাবের ছেলেদের শিখিয়ে দিলেন তালিম দিয়ে। কবিগুরু লখনউ পৌছলে ক্লাবের কোন্ সভ্যের কি কাজ সব শিখিয়ে পড়িয়ে দিলেন। পাহাড়ির ওপর নির্দেশ হল গান শেষ করে এগিয়ে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের পায়ের ধুলো নেবার।*

অবশেষে রবীন্দ্রনাথ লখনউ এলেন প্রায়। অতুলপ্রসাসের কেশরবাগের মোড়ের মাথার বাঙলো বাড়িখানির রঙ করার কাজ শেষ হল। সাজানো গোছানো হল ঘরদোর। রবীন্দ্রনাথ লখনউয়ে যে কটা দিন থাকবেন সে কদিন যাতে ঘরে-বাইরে তাঁর কোন অসুবিধা না হয় তার জন্যে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হল। লোকজনের অভাব হবে না—খানসামা বেয়ারা আর·ড্রাইভার সব সময়েই তাঁর ইঙ্গিতের অপেক্ষায় থাকবে। তাছাড়া বাঙালী যুবক সমিতির সদস্যরাও সব সময়েই সামান্য কর্ম করতে পেলে আনন্দিত হবে। অতুলপ্রসাদ নিজেও রইলেন রবীন্দ্রনাথকে দেখাশোনার জন্যে—কোন কিছুরই অভাব নেই—তবু অভাব শুধু একটি মানুষের জন্যে। রবীন্দ্রনাথ যদি প্রশ্ন করেন—হেমকুসুমকে দেখছি না—তখন কী উত্তর দেবেন অতুলপ্রসাদ! কেমনভাবে বলবেন হেমকুসুম আছে এই লখনউতেই অন্য কোনখানে?……কিন্তু কেন দূরে আছে হেমকুসুম? কেন এত অপমান করে, কেন এত রাগ? কবিগুরুর লখনউ আসার আগে সে কি একবার আসতে পারে না এ বাড়ি, তুলে নিতে পারে না এ সংসারের হালখানি…না, বোধহয় সে আসবে না।

কিন্তু সেদিন এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। হেমকুসুম দিলীপের হাত ধরে কৈশরবাগের মোড়ের বাংলোখানিতে এসে দাঁড়ালেন। অতুলপ্রসাদ বিস্মিত, পুলকিত।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ লখনউ আসছেন, তাঁর বাড়িতে উঠছেন, আর হেমকুসুম তাঁর দেখাশুনো করবেন না? কবির সুবিধে অসুবিধে দেখতে হবে না! লোকজনের হাতে সবকিছু ছেড়ে দিলেই হবে? শেষে বদনাম হবে হেমকুসুমের, লখনউয়ের বাঙালীদের অতুলপ্রসাদও একবার হেমকুসুমকে খবর দিতে পারতেন। কবি রবীন্দ্রনাথ লখনউ আসছেন একথা শুনে হেমকুসুম কিভাবে স্থির থাকতে পারেন!

তুমি যে এসেছ আমি কী যে খুশি হয়েছি হেম…কী যে আনন্দ আজ আমার মনে!

অভিমান-ভরা গলায় হেম বললেন, তবু তুমি তো আমায় খবর দাও নি। —কবি কবে আসছেন?

---

* শ্রীযুক্ত পাহাড়ি সান্যালের কাছে শোনা।

এসে পড়লেন প্রায়, অতুলপ্রসাদ খুশিভরা গলায় বললেন। তুমি এসেছ, এবার লেগে যাও কবির ঘরদুয়ার সাজাতে। মনে রেখো, কবি সৌখীন মানুষ।
হেমকুসুম বললেন, আমি যখন ঘরে এসেছি তোমাকে ভাবতে হবে না।
অতুলপ্রসাদ এদিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে অন্যদিকে ব্যস্ত হলেন। ক্লাবের সভ্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে কবিকে রাজোচিত সম্বর্ধনায় স্টেশন থেকে বাড়িতে মিছিল করে আনার পরিকল্পনা করলেন। মহম্মদাবাদের মহারাজার কাছ থেকে তাঁর ল্যাণ্ডো চাওয়া হল। তাকে ফুল লতা পাতা দিয়ে সাজানো হল। লখনউয়ের বিখ্যাত সানাইওয়ালা তালিম হোসেন এবং তাঁর পার্টিকে ডাক দেওয়া হল। ক্লাবের কনসার্ট পার্টি তালিম দিয়ে নিজেদের তৈরি করে নিল। তারা বাদ্য-বাজনা সহকারে মিছিলে যোগ দেবে।
কবিগুরু লখনউ এলেন। লখনউ স্টেশনে জনারণ্য। লখনউয়ের যুক্তপ্রদেশবাসীরা কবিগুরুকে দর্শন করতে আর মিছিলে যোগ দিতে এগিয়ে এল। ল্যাণ্ডো গাড়ির ঘোড়া খুলে দিয়ে যুবকেরা কবির গাড়ি নিজেরাই টেনে নিয়ে চলল। কবির যাত্রাপথের দুধারে উৎসুক জনতার ভিড়। পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছিল। গানে বাজনায় জয়ধ্বনিতে লখনউয়ের আকাশ বাতাস মুখরিত হল। কবি লাজুক কণ্ঠে চুপিচুপি বললেন অতুলপ্রসাদকে, 'অতুল এ কী করেছ ?'
অতুলপ্রসাদের বাড়ি তীর্থক্ষেত্র হল। শিক্ষিত জনসাধারণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ এসে কবিকে অভিনন্দন জানিয়ে গেলেন। লখনউয়ের প্রবাসী বাঙালীদের তরফ থেকে আন্তরিকতভাবে তাঁকে অভিনন্দন দেওয়া হল। অতুলপ্রসাদ ও হেমকুসুমের আতিথ্যে এবং ব্যবহারে কবি সন্তুষ্ট মনে বিদায় নিলেন।*
কবি চলে যেতেই খবর এল, বাংলাদেশ থেকে বাংলার বাঘ স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আসছেন মে মাসে। মে মাসে দারুণ গরম লখনউয়ে। তা হোক, সেই গরমের মধ্যেই কুইন্স স্কুলের মাঠে স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে অভিনন্দন দেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে একথালা মিষ্টান্ন নিবেদন করা হল। তিনি মিষ্টান্নে পরিতোষ সহকারে মন দেওয়ার কালে অতুলপ্রসাদ গান ধরলেন :

আ মরি বাংলা ভাষা,
মোদের গরব মোদের আশা···

স্যর আশুতোষ মিষ্টি খাওয়া শেষ করে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে এগিয়ে এসে অতুলপ্রসাদকে সজোরে আলিঙ্গন করে আশীর্বাদ করে বজ্রগম্ভীর নিনাদে বললেন, 'ধন্য অতুল, ধন্য লখনউয়ের বাঙালী সমাজ! বাংলার এত দূরে থেকেও বাংলা ভাষার এত আদর এত কদর আমার কর্ণকুহর শীতল করে দিল।'

* শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসুর রচনানুসারে।

ভাষণ শেষ হলে ছেলের দল স্যর আশুতোষকে একে-একে প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য ব্যস্ত হল। অভ্যর্থনা-সভা শেষ হলে মহা উল্লাসে ছেলের দল তাঁকে গাড়িতে চড়িয়ে শোভাযাত্রা করে অতুলদাদার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যে যার বাড়ি চলে গেল। *

সেবার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ইউনিভারসিটিতে কয়েকটি বক্তৃতা দিলেন। কয়েকটি সুন্দর দিন অতুলপ্রসাদের বাড়িতে কাটিয়ে স্যর আশুতোষ ফিরে গেলেন কলকাতায় তাঁর কর্মভূমিতে।

কবি চলে যেতে অতুলপ্রসাদের আনন্দমুখর বাড়ি ক্ষণিকের জন্য ঝিমিয়ে পড়েছিল। তারপর আরো কিছুদিন পর এসেছিল এক আনন্দের জোয়ার। তারপর হেমকুসুমের সেই একঘেয়ে জীবন। কাছারি আর নানান কাজ আবৃত করল অতুলপ্রসাদকে। অবসরটুকু যা মেলে, দেশের কাজে নানান প্রয়োজনে নানা মানুষ জড়ো হয়ে হেমকুসুমের সময়টুকু হরণ করে নিয়ে যায়।

প্রতি রবিবার অতুলপ্রসাদের বাড়িতে সাহিত্যসেবী সঙ্গীতসেবীদের বৈঠক বসে। জ্ঞানী গুণী কৃতী বাঙালীর—যেমন ধূর্জটিপ্রসাদ, জ্ঞানেন্দ্র চক্রবর্তী, নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত, রাধাকমল রাধাকুমুদ ভ্রাতৃদ্বয়, অধ্যাপক বিনয় দাশগুপ্ত, ডাক্তার বিজনবিহারী, অধ্যাপক শম্ভূশরণ রসরাজ, দুর্গাদাদা, শিল্পী অসিতকুমার হালদার এঁদের সমাবেশ হয়। এসে উপস্থিত হয় নির্মল দে (ক্ষেপা), সত্যকুমার।

মাঝে মাঝে স্বল্পবাক অধ্যক্ষ শ্রীশ সেনও দেখা দিতেন। সকলেই স্বলিখিত কবিতা বা গল্প পাঠ করতেন। অতুলপ্রসাদ ও ধূর্জটিপ্রসাদ গান পরিবেশন করতেন, আর কেউ কেউ খোশগল্পে আসর জমিয়ে রাখতেন। মজলিশটি বেশ আনন্দের উৎস ছিল…হবে না কেন? বিদায়ের আগে যেরকম ভুরিভোজের ব্যবস্থা অতুলপ্রসাদ করেছিলেন তা অভূতপূর্ব।*

সেদিন মুসলমান কবি হামিদ আলি খাঁ এলেন। বললেন, চলুন অনেকদিন মুসায়েরায় যাইনি। যাবেন?

চলুন, বেশ তো আমি রাজি।

বাঈজী-পাড়ায় বিখ্যাত ঠুংরি গানের আকর্ষণে গান শুনতে যেতেন। গান শুনলে নাওয়া খাওয়া বুঝি ভুলতেন। ধূর্জটিপ্রসাদ লিখেছেন: "আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অন্য ধরনের। আরো অনেকের মত আমি তাঁর কর্মান্তের, বিরামের সঙ্গী ছিলাম। আমাদের পরিচয় হয় সঙ্গীতের দৌতে, সঙ্গীতের আসরে। কৈশরবাগে তখন তিনি থাকতেন, অনেক রাত পর্যন্ত গান বাজনা হত। তারপর কত আসরে বসে তাঁর সঙ্গে গানবাজনা শুনেছি তার সংখ্যা নেই। ভাল গান বাজনা শুনলে তিনি বালকের মত অধীর হয়ে উঠতেন, অস্ফুট চিৎকার করতেন, মুখ দিয়ে উর্দু জবান বেরুত, এক স্থানে

* সত্যকুমার মুখোপাধ্যায়ের ডায়েরি থেকে।

বসে থাকতে পারতেন না, আবার তৎক্ষণাৎ লজ্জিত হতেন। কতবার বলেছেন, 'দেখ একটু ব্যাকুল বা বেসামাল হয়ে পড়লে আমার জামা ধরে টেনো। তোমাকেই বা কে সামলায় তার ঠিকানা নেই।'

শারীরিক উত্তেজনা অল্পক্ষণের জন্যেই তাঁকে অভিভূত করত; তারপর ধীরে ধীরে তাঁর মুখে সর্বাঙ্গে এক সস্মিত কমণীয়তা নামত।*

গান গান আর গান। হেমকুসুম ক্ষুব্ধ হন। হেমকুসুম দু-এক ঘণ্টা অতুলপ্রসাদকে কাছে পাওয়ার কামনা করেন। তাঁর সঙ্গে গল্প করতে, আরো কত সংসারিক কাজ তো থাকতে পারে, একথা কেন অতুলপ্রসাদ বোঝেন না। হেমকুসুমের অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে ভোলেন অতুলপ্রসাদ। বাইরের নানান কাজে ব্যস্ত কবি, সময়মত বাড়ি ফেরা হয় না বুঝি। কখনো দেরি হয়।

তাঁকে যে সকলে চায়,—সকলেরই কাজের মাঝে। ডাকে সাড়া না দিয়ে উপায় কী! তাঁকে সকলেই ভালবাসেন, হেমকুসুমের তাতে আপত্তি। মনের ক্ষুদ্রতা সঙ্কীর্ণতা দীনতা কবির চোখে বিষ। মানুষের হৃদয় হবে বিশাল সাগরের মত, অন্তরীক্ষের মত। মানুষকে ভালবাস, জীবে প্রেম কর। অতুলপ্রসাদ গাইলেন—

সবারে বাসরে ভালো,
নইলে মনের কালো ঘুচবে না রে।
আছে তোর যাহা ভালো
ফুলের মত দে সবারে।
করি তুই আপন আপন
হারালি যা ছিল আপন;
এবার তোর ভরা আপণ
বিলিয়ে দে তুই যারে তারে।
যারে তুই ভাবিস ফণী;
তারো মাথায় আছে মণি,
বাজা তোর প্রেমের বাঁশি—
ভবের বনে ভয় বা কারে?
সবাই যে তোর মায়ের ছেলে;
রাখবি কারে, কারে ফেলে?
একই নায়ে সকল ভায়ে
যেতে হবে রে ওপারে।

---

* ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের রচনা থেকে।

বুঝলেন না শুধু হেমকুসুম অতুলপ্রসাদকে। কৈশরবাগের বাড়ি ছেড়ে আবার তিনি চলে গেলেন দিলীপকে সঙ্গে নিয়ে লালবাগ মহল্লায়।

আঠারো

সম্ভবত ১৯২৩ সনের কোন এক রাত। খাওয়া-দাওয়ার পর অতুলপ্রসাদ সেন বললেন, সি. ওয়াই., তোমার কিছু ট্রিক্স দেখাও।

কথা হচ্ছিল সেদিন স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন মানুষদের ঘিরে কার কিরকম স্মৃতিশক্তি ইত্যাদি। সেদিনকার আড্ডায় ছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রাধাকুমুদ রাধাকমল ভ্রাতৃদ্বয়, সি. ওয়াই. চিন্তামণি, গোকরণ মিশ্র, অতুলপ্রসাদ এবং আরও কয়েকজন।

অতুলপ্রসাদ বললেন, সি. ওয়াইয়ের স্মৃতিশক্তির তুলনা নেই। সি. ওয়াই., তোমার ট্রিক্স দেখাও।

সি. ওয়াইয়ের এক গাল ভরা পান। মুখের কোণে সিগারেট, তার ধোঁয়ায় এক চোখ বন্ধ। শুরু হল ট্রিক্স।

z অক্ষর যার আদিতে সেইসব নাট্যশালার নাম কর। হল। তারপর পোপেদের নাম, সন তারিখ। গোকরণ মিশ্র বললেন, কে আর তোমার ভুল ধরতে যাচ্ছে! আমাদের কি কিছু মনে আছে? যা মনে আছে এখন বল দেখি। বোম্বাই হাইকোর্টের চীফ-জাস্টিসরা কে কবে চাকরি করেছেন?

গোকরণ মিশ্রের কথা শেষ হল না। চিন্তামণি গড়-গড় করে বলে যেতে লাগলেন। বিশ্বেশ্বর নাথ শ্রীবাস্তব বাধা দিলেন। বললেন, ও সব চালাকি চলবে না। আমি একটা সাল বলছি। কোন্ কোন্ স্বনামধন্য উকিল এই সালে জন্মেছিলেন?

সি. ওয়াই. বললেন, কোন্ দেশের?

এই অঞ্চলের?

আবার গড়-গড় করে নাম উচ্চারিত হল।

অতুলপ্রসাদ বললেন, এই সালের একটা তারিখে আসা যাক। এবার বল কোন্ তারিখটা, তারিখটা আমার মনে নেই। চিন্তামণি দু-জনের নাম বলে বললেন:

And last but not the least, my friend on the right. অর্থাৎ অতুলপ্রসাদ।

অতুলপ্রসাদ খুব হেসে উঠলেন……এইবার তোমাকে পাকড়েছি! আমার জন্ম-তারিখ ভুল বলেছ।

চিন্তামণির কালো মুখ বেগুনি হয়ে উঠল। সিগারেটটা কল্কের মত ধরে টান দিতে লাগলেন প্রায় আধমিনিট। পরে চিন্তামণি বললেন, go and ask your mother.

অতুলপ্রসাদ উত্তর দিলেন, তার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তিনদিন পরে অতুলপ্রসাদ ধূর্জটিপ্রসাদকে বললেন, ওহে ধূর্জটি, লোকটাকে নিয়ে আর পারা গেল না। চিন্তামণির ডেটটাই ঠিক! পরে জানা গেল অতুলপ্রসাদের মা বছর-কয়েক আগে ছেলের জন্মদিন উপলক্ষে কলকাতায় তাঁর বন্ধুদের খাওয়ান। চিন্তামণি সেই সময়ে কলকাতায় ছিলেন, তিনি নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন।

সেদিন হাতে গোলাপ-কাটা কাঁচি নিয়ে ড্রেসিং গাউন পরে বাগানে বেড়াচ্ছেন অতুলপ্রসাদ। গানের আধখানা চরণের গুঞ্জনধ্বনি হচ্ছে, এমন সময়ে ধূর্জটিপ্রসাদ গিয়ে পড়েছেন।

এই যে! এস। কোথায় যে থাকো!

ধূর্জটিপ্রসাদ বললেন, নতুন গান বুঝি? বড় মিঠে স্বর তো, নতুন লিখলেন বুঝি?

হয়নি এখনো।

শোনান!

শুনবে?

এক্ষুনি।

তারপর গলার জড়তা ভেঙে আস্তে আস্তে গাওয়া।

গান গাওয়া শেষ হলে ধূর্জটি বললেন, ভাল হয়েছে।

ভাল হয়েছে?

আরো আছে নাকি গান?

সেদিন একটা কেসে মফস্বলে গিয়েছিলাম। নদীর ধারে একটা বাংলোতে থাকতে দিলে। তাই থাকতে পারলাম না না লিখে।

গান না লিখে? মক্কেল টাকা দিলে?

দিলে বৈকি!

নেই বুঝি কবিতাটা?

ছোট্ট ছেলের মত হাসতে হাসতে ধূর্জটিকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন বাগান থেকে বৈঠকখানায়। অফিস-ঘর থেকে উকিলের ডায়েরি নিয়ে এলেন, তারই পাতা থেকে গানের খসড়া বেরুল। চলল গান···

চলত গান সম্বন্ধে আলোচনা ধূর্জটি এবং অতুলপ্রসাদের মধ্যে।

অতুলপ্রসাদ নিজের গান আসরে গাইতে পারতেন না। সভায় অতি সহজে নিজের ওপর বিশ্বাস হারাতেন, মূল স্বর খুঁজে পেতেন না। ছোট আসরে অতুলপ্রসাদের গলা খুলত। সবচেয়ে ভাল·শোনাতো গুনগুন করে গাইবার সময়ে।

অতুলদা আপনি বাংলা ভাষায় ঠুংরি এনেছেন। যদিও মেটেবুরুজে ওয়াজিদ আলি শাহের

বন্দীজীবনের সময় থেকেই ঠুংরির ভাবপূর্ণ মধুর তানে বাঙলী অভ্যস্ত হয়ে এসেছে, তবুও আপনি বাংলার দূত হয়ে লখনউ-প্রবাসী হয়েছেন। একেই ইতিহাসের প্রতিশোধ বলে—আপনার লখনউয়ে প্রবাস বাংলাদেশের সঙ্গীতের ইতিহাসের আধুনিক অধ্যায়। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সঙ্গে আপনি যোগসূত্র বজায় রেখেছেন, এই যোগসূত্রের সাহায্যে বাউল কীর্তন ভাটিয়ালির মালা গাঁথা আপনার মৌলিকত্ব।

কিন্তু কিছু মনে করবেন না, রবীন্দ্রনাথের মৌলিকত্ব আরো উচ্চস্তরের। প্রধানত রবীন্দ্রনাথের কবিতা ভাষ্য ও ভাবের দিক দিয়ে সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে তাকে উপযুক্ত নতুন সুরে মূর্ত করা আরো শক্ত। দ্বিতীয়ত, গত দশ পনেরো বৎসর ধরে রবীন্দ্রনাথ সুরে এমন একটি সম্পূর্ণ নতুন ধারা এনেছেন যার সঙ্গীত হিসেবে মূল্য তানসেন কৃত দরবারী কানাড়া কিম্বা মিয়া কী মল্লার অপেক্ষা কম নয়। এক সময় ছিল যখন রবীন্দ্রনাথ হিন্দুস্থানী সুরের ছকে গান বসাতেন। যখন থেকে দেশ সঙ্গীত অর্থাৎ বাউল কীর্তন ভাটিয়ালের স্রোত তাঁর প্রতিভাকে অনুপ্রাণিত করলে তখনই তিনি নিজের সন্ধান পেলেন, স্বাধীন হলেন। এতদিন হচ্ছিল অনুকরণ, হাতে খড়ি। এখন শুরু হল সৃষ্টি। এই বোধহয় জীবনের রীতি। দেশের সন্ধান, দরবার ও নগরের বাইরের মাটি ও গ্রামের সন্ধান, শূদ্র ও যবনের সন্ধান যখন পাওয়া যায় তখনই মানুষ জাতি, সভ্যতা, নবজীবন লাভ করে। মাটির সন্ধান পেয়েছেন বলেই রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতকে নবজীবন দিতে পেরেছেন।…সে যাই হোক গত দু-তিন বৎসর রবীন্দ্রনাথ যেসব গান লিখেছেন তাতে না আছে মাটির গন্ধ না আছে পেঁয়াজের। সেসব একেবারে নতুন, তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি।

অবশ্য একথা ঠিক যে কোন ওস্তাদি সুরে তৈরি কানে আপনার গান রবীন্দ্রনাথের গান অপেক্ষা ভাল লাগবে, কারণ আপনার গানের সুর বিশুদ্ধ জাতের।

সঙ্গীতজ্ঞ ধূর্জটিপ্রসাদের ব্যাখ্যায় অতুলপ্রসাদ সঙ্কুচিত হতেন। ধূর্জটিপ্রসাদের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই, যা মনে ভাবেন তাই মুখে প্রকাশ করেন।

আপনার গানে খুব বেশি মুসলমানী চালের আমেজ আছে; তবে সে আমেজ ঠিক ধ্রুপদের নয়।

অতুলপ্রসাদ বলেন, তবে বোধহয় আমায় ছেলেবেলায় শোনা আগ্রানিবাসী কবি গোবিন্দ রায়ের গানের সুরগুলি প্রভাবিত করেছে। গোবিন্দ রায়ের 'কত কাল পরে আজি ভারত রে' শোননি? ছেলেবেলা থেকেই আমি ঠুংরি-ভক্ত হয়ে উঠি, তারপর লখনউতে এসে জাত ঠুংরি শোনবার প্রথম সুযোগ হল। তবে আমার ভাল লাগত ছেলেবেলা থেকে বাউল ভাটিয়ালি কীর্তন। আমার ঠাকুরদার গান এবং সুর আমাকে অনুপ্রাণিত করে। আমার বাবা হোলির গান লিখতেন। আমার দাদামশাই মামারাও

অনেকে সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তা ছাড়া খাল-বিল-ঘেরা আমাদের বাংলাদেশটায় আছে সুরের হাওয়া।

গানই তো আপনার জীবন, গানই তো আপনার প্রাণ। দিলীপকুমার রায় বলতেন অতুলপ্রসাদকে। ১৯২৩ সালে প্রথম নতুন করে পরিচয় হল দিলীপকুমার-অতুল-প্রসাদের। বিদেশ থেকে ফিরে দিলীপকুমার এলেন লখনউয়ে।

অতুলপ্রসাদ সেদিন গাইলেন—

ফুলে ও সুরে ভরেছ কবি প্রাণ!
কণ্ঠ তব গায় তো তারি গান!
ধরণী তুমি বরিলে আদরে।
বরদা তাই উথলে ও স্বরে।

গাইলেন তাঁর পেলব অভিমানী কণ্ঠে। দরদ ঢেলে সুরেলা মধুর কণ্ঠস্বরে। ক-জন বড় গায়কের মধ্যে সে মনোজ্ঞ সুর, সে দরদ মেলে? তাঁর মুখে এ গান শুনে কার না ইচ্ছে জাগে তাঁকে এই বলে অর্ঘ্য দিতে! দিলীপকুমার রায় গাইলেন—

সুরে তব প্রাণ আলা—ফুলে ভরা হিয়া।
কমনীয় গান মালা গাঁথো তাই দিয়া।
গন্ধে চিনেছ তুমি মলয়ের পথে:
সঙ্গীত সুধা ঢেলে চল জয়রথে।

কার মনে না হয় এ প্রাণ বড় বিরল, এ ধ্বনি ধূমের জগতের, যার কাছে একথা বলা ঢঙ নয়:

কুসুমের গন্ধে রূপে
সে আসে গো চুপে চুপে
মেঘের আড়াল হতে
ডাকে: আয় আয় আয়।
হে মোর অচেনা বঁধু
লুকায়ে থেকো না শুধু
এস করি পরিচয় মালায় মালায়।

দিলীপকুমার রায় এবং অতুলপ্রসাদ সেনের তখন খুব ঘনিষ্ঠতা, আর ধূর্জটিপ্রসাদ—তিনজনের রাজযোটক। তখন কেবল গান আর গান। লখনউয়ের যেখানে যে ওস্তাদ তার ঠিকানা শোনামাত্রই—তলব কর তসরিফ রাখিয়ে।

একদিন দিলীপকুমার রায়কে অতুলপ্রসাদ বললেন, কাল সন্ধ্যায় চাঁদের আলোয় একখানা গান রচনা করলাম।

সেকি অতুলদা, এতক্ষণ শোনাও নি ?

কি জানো, একটা কথা···ভাবছি···

ভেবো না অতুলদা, ভাবনা করা তোমার মানায় না, তুমি তো গান গেয়ে যাও। মনে নেই তোমার গান—

মিছে তুই ভাবিস মন
তুই গান গেয়ে যা গান গেয়ে যা
আজীবন।

অতুলপ্রসাদের গান রচনা করে গাইতে বড় কুণ্ঠা—অথচ আগ্রহ কি ছিল না !···গান গাইতে কি তিনি সহজে চাইতেন !

গান রচনা করেছেন সেও অপরাধ। কত সঙ্কোচ প্রচার করতে আপনাকে, অথচ গান রচনা এবং গাওয়ার আগ্রহ পুরোমাত্রায়। অনুপম কবি হারীন্দ্রনাথের এ কুণ্ঠায় সমর্থন :

"Tell me my love !
is it not more than wrong
To praise thy beauty
as I do in words !
Is song a sin ?
—and yet all life is song
From the huge planets
to the little birds."

কি জান দিলীপ, এ সঞ্চারীর সুরটুকু—

আহা, গাও না অতুলদা !

ভালো লাগবে কি ?

ফে—র ?

আচ্ছা আচ্ছা গাইছি শোন।

অতুলদা গাইলেন সেই গানটি—সেই বিখ্যাত গান—

"চাঁদনী রাতে কে গো আসিলে !
উজল নয়নে কে গো হাসিলে ?
মোহন সুরে ধীরে মধুরে
পরান-বীণায় কে গো বাজিলে !"

অতুলদা, এ যে একটা সুরের হাওয়া ! দিলীপকুমার রায় উচ্ছ্বসিতভাবে বললেন, আহা,

'চাঁদনির' রে গা রে পা'র ঐ আরোহণের পরেই 'আসিলে'র অবরোহণ পঞ্চম থেকে রেখার ছায়ানটের ঢঙে—দেশের সঙ্গে ছায়ার এ মিলন—

তু-তুমি আমাকে বড়…

একটু বাড়াইনি অতুলদা—বাংলায় ঠুংরির এ আমেজ তোমার আগে কেউ আনেননি, এ আমি তামা তুলসী গঙ্গাজল নিয়ে হলফ করে বলতে পারি—বিশেষ এ গানটির পেলব কবিত্বের সঙ্গে দেশ রাগিণীর নতুন চাল…

অতুলপ্রসাদের সদাস্নেহকোমল মুখখানি দিলীপকুমারের কথায় খুশিতে আরও কোমল হল। বললেন: আরও আছে, একটু পিলুও। বলে তর্জনী উঠিয়ে পিলুকে যেন ছুঁয়ে দেখিয়ে দিতে চান। মনে পড়ে দিলীপকুমারের অতুলপ্রসাদের হাতের সে ভঙ্গি—কণ্ঠস্বরের ইতস্তত সে জড়িমা। শীলতার স্বভাবনম্রতার এই আফোটা গন্ধ।

শোন সঞ্চারীটা—

হেম যমুনায় প্রেমতরী বায়
(কে) ডাকে আমায়—আয় গো আয়।
প্রভাত বেলায় সোনার ভেলায়
কেমনে চলে যাবে হায়!

গানের আর একটি কলি গাইলেন অতুলপ্রসাদ। উচ্ছ্বসিত দিলীপকুমার: অতুলদা, দেশের সঙ্গে পিলুর এ ধরনের মিশ্রণ অপূর্ব!

অতুলপ্রসাদ মুখ তুললেন। তখন তাঁর চোখে কুণ্ঠার কুয়াশা কেটে দেখা দিয়েছে প্রীতির সলজ্জ আভা। বললেন, স—সত্যি তোমার ভাল লেগেছে দিলীপ? দেখ আ—আমি কখনও কোনদিনও মনেই করতে পারিনি যে আ—আমার গান কারুর এত ভাল লাগতে পারে! কিন্তু দেখ, শেষের আভোগটা আমার ম—মনোমত হয়নি। আত্মপ্রশংসায় অতুলপ্রসাদের কথা পদে-পদে বেধে যেত।

পরে যখন হয়েছিল তখন গাইলেন:

তব সে কূলে যাব কি ভুলে
যে ভালবাসা বাসিলে।

আর একদিন গাইলেন:

শুধু তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিয়ো।
যে পথে চালাবে নিজে চলিব, চাব না পিছে,
আমার ভাবনা প্রিয়! তুমি ভাবিও,
(আর) তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিয়ো।

(দেখ) সকলে আনিল মালা, ভকতি-চন্দন থালা
আমার যে শূন্য ডালা তুমি ভরিও।
(আর) তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিয়ো।

গাইতে গাইতে তাঁর কণ্ঠ এসেছিল গাঢ় হয়ে। সে সন্ধ্যায় দিলীপকুমারকে এ গানটি শেখান অতুলপ্রসাদ। গান শিখিয়ে বললেন, দিলীপ, এ গানটি কিন্তু যার-তার কাছে গেয়ো না। এ গানটি আমার····· বড় ব্যথার দিনে লেখা!

রাত্রে একত্রে শয়ন করেছিলেন দিলীপকুমার অতুলপ্রসাদ। শুয়ে শুয়ে কত গল্প হয়। রাত বারোটা হবে, দিলীপকুমার বললেন, অতুলদা কেমন করে এত হাসতে পার তুমি এমন গান গাওয়ার পরেই?

অতুলপ্রসাদ মৃদু হেসে বললেন, দিলীপ, গান ও হাসিই আমার জীবন। গান গেয়ে আর হাসিমুখেই যেন এ জগৎ থেকে বিদায় নিতে পারি, ভগবানের কাছে এই আমার প্রার্থনা।

অতুলপ্রসাদের মুখে সকল সময়ে হাসি, মনে পাথর-চাপা দুঃখ বেদনা। সে বেদনা কোনদিন মুখে প্রকাশ পায় না। বোনেরা বিধবা হল। মা এসে রইলেন লখনউয়ে। অশান্তি। মা চলে গেলেন কলকাতায়, স্ত্রীও লখনউয়ে অন্য এক স্থানে বাসা বাঁধলেন। মা এলেন; বুকে তুলে নিলেন হিরণ-কিরণকে। প্রভার স্বামীর কর্মক্ষেত্রে গোলযোগ দেখা দিল। চাকরি নেই।···তোমরা আমার কাছে এস। বড় আন্তরিকভাবে ডাক দিলেন দাদা ছোট বোনেদের। হিরণ এল। কিরণ এল তার ছোট মেয়ে বুলবুলকে সঙ্গে নিয়ে। দাদার কাছে এসে বড় শান্তি মেলে। এমন করে ভালবাসে কে! এমন স্নেহের আশ্রয় আর কোথায় আছে! তাঁর বোনেরা আত্মীয় স্বজনেরা তাঁর গুণে মুগ্ধ। ভাগনে ভাগনিরা অকালে তাদের বাবাকে হারিয়ে বাবার মত স্নেহ পেয়েছে। তিনি তাদের অভাব কোনদিনও বুঝতে দেননি, স্নেহের ভালবাসায় কোন ফাঁক রাখেন নি।

কিরণের ছোট মেয়ে বুলবুল। কিরণ হিরণের সঙ্গে ব্যাঙ্গালোরে চলে গেল। বুলবুল থাক আমার কাছে; কোথায় যাবে! তবু একটা ছোট মেয়ে আছে, ঘুরে ঘুরে বেড়ায় সারা বাড়িময়; কী যে আনন্দ হয়! ও থাক আমার কাছে, তোরা যা ঘুরে বেড়িয়ে আয়।

বুলবুল, যাবি না আমার সঙ্গে!

না মা আমি বড়মামার কাছে থাকব।

হিরণ কিরণ চলে গেল।

বুলবুলের জ্বর হল। জ্বর কমে না। জ্বর নামে না; কেন? হল টাইফয়েড। চিন্তিত

অতুলপ্রসাদ। এ কী হল, মায়ের কাছ থেকে মেয়েকে চেয়ে নিলেন,—মেয়ে যে পালিয়ে যায়, রাখা গেল না! কিরণ ব্যাঙ্গালোর থেকে ছুটে লখনউ চলে আসবার তিনদিন পরে বুলবুল বিদায় নিল।

কিছুদিন পরে মনের দুঃখে কিরণ লখনউ ছেড়ে কলকাতায় চলে গেল। হিরণ ব্যাঙ্গালোরে। ছুটকি (প্রভা) ও ছুটকির স্বামী শেষাদ্রী দিদির কাছে ব্যাঙ্গালোরে। মা কোথায়? মা আজকে লখনউ, কাল কলকাতায়; ব্যাঙ্গালোরে কিরণ হিরণের বাড়িতে, অতুলের বাড়িতে—মায়ের কোথাও গিয়ে শান্তি নেই। মায়ের মন চঞ্চল হয় একের পর এক মৃত্যুর আঘাতে আঘাতে···ঘুরে ঘুরে বেড়ান শান্তির আশায়।

লখনউয়ে অতুলপ্রসাদ একাকী। হেমকুসুম অল্প দূরে লালবাগ মহল্লায় ক্যান্টনমেণ্ট রোডের বাড়িতে দিলীপকে নিয়ে বাস করছেন। এখানে এই নির্জন বাড়িতে অতুলপ্রসাদ লোকজনের হাতের উপর নির্ভর। বাবুর্চি বেয়ারা আয়া মালি যেন এদেরই সংসার, অতুলপ্রসাদ বাইরের মানুষ—অতিথি। তাঁর এ-গৃহ যেন পান্থশালা—যাত্রীরা দুদিনের জন্যে আসে আর যায়। দুদিনের হাসা কাঁদা। যার চিরকালের মত ঘর বেঁধে থাকবার কথা, সে থাকে দূরে।

সুবালামাসি লখনউ এসে পৌঁছে গেলেন। এসে অতুলপ্রসাদের সাংসারিক ভার আপন হাতে তুলে নিলেন। মাতৃস্নেহে ভরিয়ে দিলেন অতুলপ্রসাদের মন।

অতুলপ্রসাদের শরীরে আলস্য নেই। নিজের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য না রেখে দিনরাত কাজে ব্যস্ত। সারা দিনরাত তাঁর দেখা মেলা ভার। সুবালামাসী অনেক সময়ে বলেন, তোমার কাছে এলাম অথচ তোমাকে দেখতে পাই না। বলেছেন, তুমি যখন এত খাটো, তুমি অনেক টাকা উপার্জন কর; কিন্তু এত টাকা তুমি কী কর?

অতুলপ্রসাদ উত্তর দিতেন, আমি খাটি এবং যথেষ্ট টাকা উপার্জন করি সত্যি, কিন্তু সব খাটুনিই তো টাকা উপার্জনের জন্যে করি না। আমার কত কাজ আছে! লোকে সব কাজে আমাকে ডাকে। ডাকলে তো সাড়া না দিয়ে পারি না।

হেমন্তশশী যখন লখনউয়ে এসেছেন তখন অনেকদিন অনুযোগ করেছেন, বাবা অতুল, তুই কিছু টাকা জমিয়ে একটা জমি কেন। বাড়ি কর বাবা। এ-কথা বলে বলে হেমন্তশশী হয়রান। অতুলপ্রসাদ প্রত্যেক বারই হেসে বলেন, হবে মা, বাড়ি হবে। তোমাকে আমার বাড়িতে থাকতে হবে। তোমার নামে, তোমার জন্যেই একটা বাড়ি করব ঠিক দেখো।

কিন্তু অতুলপ্রসাদের ইচ্ছা ইচ্ছাই থেকে যায়, জমি কেনা আর হয় না। টাকা জমানো হয় না। যত্র আয় তত্র ব্যয়।

মা রাগ করেন। দাদাভাই সত্যপ্রসাদ রাগ করেন। মা বলেন সত্যপ্রসাদকে,

আমি তো বলে পারি না সত্য, দেখ তোর কথায় যদি অতুল খরচপত্র কমায়। নিজের ভবিষ্যৎটুকু ভাবতে হবে না ?

দাদা (সত্যপ্রসাদ) যখন মাঝে মাঝে ছুটি-টুটিতে লখনউ আসেন, তখন কতদিন অনুযোগ করেন, তুমি তো ইচ্ছে করলেই বাজে খরচ কমিয়ে টাকাটা জমিয়ে জমি কিনে বাড়ি করতে পার। পার না কি ? তবে সে চেষ্টা কর না কেন ?

অতুলপ্রসাদ হাসেন, বলেন, বাজে খরচ তো আমি করি না দাদা! মুন্সিদের প্রতি অতুলপ্রসাদের নির্দেশ ছিল, দাদা যখন লখনউ আসবেন, দাদাকে যেন জমা-খরচের খাতা দেখানো হয়। অতুলপ্রসাদ বলেন, দেখ দাদা, তুমিই দেখ, কোন্‌টা আমার অন্যায় খরচ। তুমি বল!

কিন্তু তুমি নিজের জন্যে কিছু ভাবো ? কিছু তো সংস্থান করবে নিজের জন্যে! বাজে খরচ তো দেখছি। এত সব প্রতিষ্ঠানে তোমার টাকার সাহায্য করার দরকারটা কী প্রত্যেক মাসে—এই যে এতগুলি প্রতিষ্ঠানে তুমি প্রতি মাসে টাকা পাঠাও! বুঝে-শুঝে দান কর না কেন!

আমার আবার ভাবনা! অতুলপ্রসাদ হাসেন। আমি শেষ জীবনে গিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনে থাকব। পঞ্চাশ টাকায় আমার বেশ চলে যাবে।

একবার বাংলাদেশে এসে সত্যপ্রসাদকে অতুলপ্রসাদ বললেন, দাদা, এবার একটা জমি কিনব মনে করছি। কেনায় কিছু সুবিধে হতে পারে। যে-জায়গাটা দেখেছি, তা লখনউ মিউনিসিপ্যালিটির—স্টেশনের কাছাকাছি ভাল জায়গায়।

সত্যপ্রসাদ আগ্রহ প্রকাশ করে বললেন, কী রকম দাম-টাম বলে ?

অতুলপ্রসাদ বললেন, জমির বার্ষিক খাজনা ৫০০ টাকার মত। যদি কুড়ি বাইশ বছরের খাজনা একসঙ্গে দিয়ে দেওয়া যায় তবে আর কোন খাজনা দেওয়ার দরকার নেই। জমিটা নিজস্ব হবে।

সত্যপ্রসাদ খুউব উৎসাহের সঙ্গে বললেন, জমিটা নিয়ে নাও। বাড়ির কাজ আরম্ভ করে দাও। শুরু করলেই শেষ করতে দেরি হবে না।

তোমাকে আর একটা কথা জানাই দাদা। একটা ঘটনা ঘটে গেছে। আমি যেখানে জমিটা কিনব ভাবছি, সে-জায়গাটার নাম লখনউয়ের পুরজনেরা আমার নামানুসারেই রেখেছে।

কী, কী বললে ভাই ?

আর বল কেন! সেবার আমি যখন কলকাতায় এসেছিলাম, সেই সময়টিতে আমার সম্মতির অপেক্ষা না করেই লখনউয়ের পুরজনেরা ওই জমিটার মধ্য দিয়ে একটা রাস্তা বার করে রাস্তাটার নাম দিয়েছে 'এ. পি. সেন রোড'। আমি দাদা এই নামকরণের ব্যাপারে খুব অসন্তুষ্ট হয়েছি।

দাদা বললেন, তোমায় যে লখনউবাসীরা কত ভালবাসেন, এ তারই নিদর্শন। অসন্তুষ্ট কেন হচ্ছ? না-না, এ-বিষয়ে আর কোন আপত্তি কোরো না যেন।

সেদিন সত্যকুমার এলেন।

অতুলপ্রসাদ ভোরবেলা উঠে ড্রেসিং গাউন পরে তাঁর লখনউস্থ বাসভবনের বাগিচায় মালির কাজকর্মের তদারকিতে ব্যস্ত ছিলেন। কোর্টের কাজে প্রায় সারা দেশ ঘুরে বেড়াতে হয়। কত কাজ তাঁর, তারই ফাঁকে ফাঁকে ফুল বাগিচার কথাও মনে থাকে। ছেলেবেলায় ঢাকার মিরাতারের বাড়িতে বাবার সঙ্গে বাগান করা, গাছকে যত্ন করতে শেখা, বাবা এবং ঠাকুরদার (মাতামহ কালীনারায়ণ গুপ্ত) কাছ থেকে 'বৃক্ষের প্রতি মমত্ববোধ' জ্ঞান অর্জন এবং অভ্যাস আজও অনেক কাজের মাঝে বাগানে এসে নিজ হাতে কাজ করার উৎসাহ জোগায়। গোলাপ তাঁর বড় প্রিয়। গোলাপ গাছের ঝাড়টি আগাছায় ভরে গেছে; মালির হাত থেকে গোলাপ-কাটা কাঁচি হাতে নিয়ে নিজ হাতেই ডালগুলি পরিষ্কার করছেন, এমন সময় সত্যকুমার এলেন।

সত্যকুমারকে দেখে অতুলপ্রসাদ বললেন, কি হে, তুমি অনেকদিন আসনি। তুমি কেন আমার এবাড়ি থেকে চলে গেলে মডেল হাউসে? তোমার ভাড়া-বাড়িতে থাকার দরকার কী! তোমার ওপর আমার ভীষণ রাগ হয়েছে।

সত্যকুমার হাসলেন। বললেন, আপনি আর আমাকে কত সাহায্য করবেন অতুলদাদা! আপনার দানের তুলনা নেই।

অতুলপ্রসাদ বললেন, যাক তুমি যখন এসেছ চল আজ জমিটার ব্যবস্থা করে আসি।

সত্যকুমার বললেন, নতুন স্টেশনের সামনে কংগ্রেসের মাঠে লখনউ মিউনিসিপ্যালিটির খালের ধারের জমিগুলি। ওখানে অনেকেই জমি নিচ্ছেন—আমাদের বিরাজ গুপ্ত, ডাঃ সেন, জজসাহেব যতীন বসু এবং আরো অনেকেই। পাড়াটা বেশ ভাল জমবে মনে হচ্ছে অতুলদাদা। সবথেকে ভাল হবে এ. পি. সেন রোডে কবি অতুলপ্রসাদ সেনের বাড়ি। মাকে একবার জমিটা দেখিয়ে দিন। মা খুশি হবেন খুউব।

ঠিক বলেছ, মাকে এবার কলকাতা থেকে নিয়ে আসব। আমার মনে একটা স্বপ্ন আছে, জান! আমার এখানে ছুটো বাড়ি হবে। একটা মায়ের নামে মায়ের জন্যে, আর একটা হেমকুসুমের।

নজুলের কাছ থেকে পাঁচ বিঘে জমি নেওয়া হল। দখল নিলেন পরে; সে-জমিতে খুঁটি দিয়ে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখলেন। মাকে এর মাঝে কলকাতা থেকে নিয়ে এলেন। মায়ের শরীর রোগে শোকে ছুঃখে ভেঙে পড়েছে। মেয়েগুলো বিধবা হল, ছুটি নাতনির অকালে মৃত্যু হল—কিরণের মেয়েছুটি।* ছোট জামাইটির চাকরির

* দার্জিলিঙে কিরণবালার বড় মেয়ের মৃত্যু হয়। কিরণের ছুই মেয়ে।

ক্ষেত্রে গোলমাল পাকিয়ে উঠল—আর একমাত্র পুত্র অতুলের জন্যে সব সময়েই ভাবনা মনটাকে ছেয়ে থাকে। তার মুখের দিকে বুঝি তাকাতে পারেন না হেমন্তশশী।...শরীর খারাপ হবে না মায়ের ভেবে ভেবে!

অতুলপ্রসাদ বললেন, মা তুমি এত ভেবো না, আমি বেশ ভাল আছি। তোমার তো খুশি হওয়া উচিত। তোমার ছেলের বাড়ি তৈরি শুরু হবে এবার। তোমার তো অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল, চল তোমাকে জমিটা দেখিয়ে নিয়ে আসি।

মা যেন কেমন নিরুৎসাহ বোধ করেন—কেন যে, সে-কথা বলা যায় না। অথচ ছেলের বাড়ি তৈরি শুরু হবে, মনে তো আনন্দ থাকা উচিত। জমি কেনা হয়ে গেছে।

অতুলপ্রসাদ খুব উৎসাহের সঙ্গে নিজেই নিজের বাড়ির নক্সা আঁকতে শুরু করে দিলেন। আজ এটা মনের মত হয়, তো কাল ওটা খুঁতখুঁত করে, আবার নতুন করে আঁকেন—আঁকান। বন্ধুবান্ধবদের দেখান, তাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করেন। ইট-সুরকি সিমেন্ট কাঠের দরদস্তুর খোঁজখবর নেন। আর টাকা জোগাড়ের চেষ্টা করেন। বাড়ি করা কি সহজ কথা! কত কাঠ-খড় পোড়াতে হয়।

অতুলপ্রসাদ বাড়ি তৈরির সবরকম বন্দোবস্ত করে ফেললেন। বাড়ি শেষ হলে মাকে দিয়ে গৃহপ্রবেশ করাবেন। দু-খানি বাড়ি হবে, চমৎকার নক্সা হল। বাড়ি তৈরি শুরু হবে ভিত পুজো করে, মা অসুখে পড়লেন।

মায়ের শরীরটা সত্যি খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভেতরে ভেতরে এত যে খারাপ হয়েছে কে ভাবতে পেরেছিল! ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অবস্থার ক্রমে অবনতি হল। শেষ সময়ে মা একবার জ্যাঠাইমাকে* দেখতে চাইলেন। বোনেদের কাছে আত্মীয় স্বজনদের কাছে জরুরি তার গেল। দূর দেশে অনেকে। ছুটে এলেন। বোনেরা কেউ কেউ শেষ সময়ে মাকে দেখতে পেলেন, কারুর বা শেষ দেখা আর হল না। ১৮ই বৈশাখ ১৩৩২ (ইংরিজি ১৯২৫) মা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। হেমকুসুম অসুস্থ শরীরে তখন দেরাদুনে। শ্রাদ্ধ-বাসরে দেরাদুন থেকে দিলীপ এল লখনউয়ে। বেদনাহত অতুলপ্রসাদ মাকে হারিয়ে পাগলের মত হলেন। কোর্টের কাজকর্ম, দেশের কাজকর্ম, জনসেবা, হাজারো কাজ থেকে মুক্তি চাইলেন। গুণমুগ্ধ দেশের মানুষ, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সান্ত্বনা দিয়ে সমবেদনা জানিয়ে চিঠি লিখলেন।

মায়ের শ্রাদ্ধবাসরে বেদনাহত অতুলপ্রসাদ প্রার্থনা জানালেন:

"বিশ্বজননী! সংসারে পাইয়াছিও অনেক, হারাইয়াছিও অনেক। কিন্তু এবার সকলের চেয়ে অমূল্য সম্পদ হারাইলাম—মা। তুমি আমাকে অনেক সুখে বঞ্চিত করিয়াছ,

* সত্যপ্রসাদ সেনের মা

কিন্তু একটি পরম সুখে একদিনের জন্তেও বঞ্চিত কর নাই ; সেটি অপূর্ব মাতৃ-স্নেহ, আজ তাহা হইতে বঞ্চিত করিলে। এক-এক সময়ে মনে হয় এখন কী লইয়া থাকিব, কে আমাদের সকল সুখে সুখী, সকল দুঃখে দুখী হইবে। শৈশব হইতে যৌবনে, যৌবন হইতে প্রৌঢ়াবস্থায়, প্রৌঢ়াবস্থা হইতে বার্ধক্যে আসিয়া পড়িলাম। মার কাছে চিরকাল শিশুই হইয়া রহিলাম। যখন 'মা' বলিয়া ডাকিতাম, আর মা যখন 'অতুল' বলিয়া ডাকিতেন, তখন ভুলিয়া যাইতাম যে এত বড় হইয়াছি। শৈশবে যেমন স্নেহের শাসন পাইতাম, সেদিনও সেইরূপ পাইয়াছি। হায়! আজ তেমন করিয়া শাসন করিবে কে? তেমন করিয়া সেবা করিবে কে? এই গৃহ রক্ষা করিবে কে? মাতৃহারা হইয়া নিজেকে নিঃসম্বল মনে হইতেছে। বিশ্বজননী, তুমি আমার সহায় হও।"

সস্ত্রীক মাসতুত ভাই শিশিরকুমার দত্ত সিমলা যাওয়ার পথে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে লখনউ এলেন। অতুলপ্রসাদকে শিশিরকুমার বললেন, চল তুমি আমার সঙ্গে ভাইদাদা। তোমার মন খারাপ, কিছুদিন আমার সঙ্গে ঘুরে আসবে চল। তোমার কোর্টও তো এখন বন্ধ হবে। কোন কথা শুনব না।

অতুলপ্রসাদ বললেন, আমার এখন কিছু কাজ আছে সেগুলো সেরে নিই। তোমরা যাও, আমি কিছু পরে তোমাদের সঙ্গে মিলিত হব।

শিশিরকুমার দত্ত সস্ত্রীক সিমলার পথে দিল্লী রওনা হলেন। সিমলায় এসে উঠলেন চার্চের নিচে বেলমণ্টএ। অতুলপ্রসাদ সিমলায় এসে সিসিল হোটেলে উঠলেন। সেখান থেকে কালেটন হোটেলে এলেন। কার্লটন হোটেল থেকে দাদা সত্যপ্রসাদকে লাকসামে চিঠি দিলেন :

Carlton Hotel
Simla
22. 6. 25.

দাদা

আমি ছুটিতে তিন সপ্তাহের জন্য সিমলাতে আসিয়াছি। শারীরিক ভালই আছি, কিন্তু মা হারা হওয়াতে মনটা মাঝে মাঝে বড় বিচলিত হয়। তাঁহার শ্রাদ্ধকার্য একরকম ভালভাবেই হইয়াছে। কলিকাতা হইতে প্রচারক গুরুদাস চক্রবর্তী আসিয়াছিলেন, রামকৃষ্ণ আশ্রমে প্রায় ১৫০০ রুগ্ন আতুর ও বিপন্নদের খাওয়ানো হইয়াছিল। মার নামে সেবাশ্রমে একটি শুশ্রূষালয় নির্মাণ করিবার জন্য ৩০০০ টাকা দিব প্রতিশ্রুত হইয়াছি। ফিরিয়া গেলে তাহার কাজ আরম্ভ হইবে। আরও ২৫০০ টাকা ব্রাহ্ম সমাজে প্রচারের কাজে দিব বলিয়াছি।......মারও ইচ্ছা ছিল জেঠিমার সঙ্গে দেখা করিতে—হইল না। ভগবানের নির্ভর ভিন্ন আর উপায় নাই!

তোমরা পুরী বেড়াইয়া আসিলে, এবং জেঠিমাতাঠাকুরানীকে তীর্থ দর্শন করাইয়া আনিলে, ভালই করিয়াছ। আমি লখনউ ফিরিয়া গিয়া টহুমাকে* একখানা গানের বই পাঠাইয়া দেব। দিলীপ শ্রাদ্ধের সময় আসিয়াছিল। এবং লখনউতে কয়েকদিন আমার কাছে ছিল। আবার জুলাই মাসে আসিবে। এখন সে দেরাদুনে। তাহাকে কোন একটি এগ্রিকালচার ফারমে ভর্তি করাইয়া দিব ভাবিতেছি। সেইজন্য লেখালেখি করিতেছি। তাহারও সেদিকে ইচ্ছা। তাহার মা এখন দেরাদুনে। আমাদের বিশেষ বন্ধু মেজর জ্যোতিলালের (বিহারী সেন মহাশয়ের পুত্র) বাড়িতে ইলেকট্রো চিকিৎসার জন্যে আছে। কয়েক মাস থাকিতে হইবে। মার পরলোক গমনের পরেই কোনরূপ অবস্থার পরিবর্তন আমার ইচ্ছা নহে। ভবিষ্যতের কথা এখন ভাবিতে পারি না।

আমার জন্যে ভাবিও না। যিনি দুঃখকষ্ট দিতেছেন তিনিই রক্ষা করিবেন। তোমরা সকলে আমার ভালবাসা জেন। আমি ৩রা জুলাই লখনউ ফিরিব। সেইখানেই পত্র লিখ।

তোমার ছোটভাই

অতুল

শিশিরকুমার দত্ত একদিন এসে বললেন, চল ভাইদাদা আমরা ভোজ্যি থেকে বেড়িয়ে আসি।

ভোজ্যি অর্থাৎ শতদ্রু নদীর উৎস।

বেশ তো, চল যাওয়া যাক। কে কে যাবে খোদন† ?

তুমি আমি আর কুমুদিনী। সঙ্গে আমাদের ঘোড়া থাকবে। খাবার দাবার সঙ্গে নেব। চমৎকার বেড়ানো হবে।

খুব ভাল কথা। চল যাওয়া যাক।

চলার পথে দুধারে বনরাজির শ্যামলিমা, কখনো রুক্ষ প্রান্তর, অজস্র ঝরনা, পাখির কলকাকলি, কখনো নিস্তব্ধ নিথর পৃথিবী, ধ্যানমগ্ন গিরিকন্দর। আপন মনে পথ চলেন অতুলপ্রসাদ। আজ বড় মৌন। চিরকাল তিনি হাস্যমুখী, হাসির ফোয়ারা। রসের রসিক অতুলপ্রসাদ আজ বড় ম্লান। আনমনে পথ চলেন। বড় করুণ পদক্ষেপ। কুমুদিনী বলেন, একটা গান করুন ভাইদাদা। শিশির বলে, এমন পরিবেশে একটা গান শোনাও।

---

* টহুমা—শ্রীমতী জ্যোৎস্না সেন (সত্যপ্রসাদ সেনের কন্যা)

† খোদন—মাসতুত ভাই শিশিরকুমার দত্ত

তিনজনে পথের ধারে কোন পাথরে বসেন।
সুমুখে ধ্যানগম্ভীর হিমালয়। তরঙ্গায়িত স্রোতধারা স্তব্ধ এ প্রান্তরে।
গিরিরাজের শিখর-দেশে শ্বেতশুভ্র কিরীটমালা রবির কিরণে উদ্ভাসিত। রক্তাভ বহু বর্ণে রঞ্জিত, বিচ্ছুরিত।
অতুলপ্রসাদ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। ধ্যানমগ্ন কবির দৃষ্টি যেন হারিয়েছে এই প্রকৃতির রাজ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে।
যিনি দুঃখ কষ্ট দিতেছেন তিনিই রক্ষা করিবেন। যে হস্ত আঘাত করে সে হস্তই ধরিয়া থাকা ছাড়া উপায় নাই। গুন-গুন করে ভেসে আসে গান। আত্মসমর্পণের বড় প্রিয় সে গান:

তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিয়ো।
যে পথে চলাবে নিজে, চলিব, চাব না পিছে,
আমার ভাবনা প্রিয়! তুমি ভাবিয়ো
(আর) তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিয়ো।

ভোজ্যিতে পৌঁছে শতদ্রুর উৎস-মুখ দেখে মন উদ্বেল আনন্দে নৃত্য করে ওঠে। দুঃখ-সুখের অতীত সেই চিরন্তনী আনন্দ-জোয়ারে চন্দ্রকিরণে ডাকবাংলোয় তিনটি দিন রাত উদ্‌যাপন করে মধুর স্মৃতি মনে এঁকে তাঁরা ফিরে এলেন সিমলায়।
সিমলা থেকে শিশিরকুমারদের কাছে বিদায় গ্রহণ করে নির্দিষ্ট দিনে অতুলপ্রসাদ ফিরে এলেন তাঁর কর্মক্ষেত্র লখনউ শহরে।

উনিশ

সময়ের স্রোত কাজের মাঝ দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায় অনেক দুঃখ। কর্মস্থলে ফিরে এসে আবার কাজের মাঝে ডুব দিলেন অতুলপ্রসাদ। চারবাগে এ. পি. সেন রোডএ বাড়ির নির্মাণ-কার্য চলছে। বাড়ির কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে, সেইজন্য শরীরের ওপর অত্যধিক পরিশ্রম হচ্ছে। কোর্টে যাবার আগে বা পরে একবার বাড়ির সামনে গিয়ে না দাঁড়ালেই নয়। বাড়ি তৈরির কাজ শেষ হয়ে আসে। অতুলপ্রসাদের মায়ের কথা মনে পড়ে—মায়ের কত আশা ছিল তাঁর অতুলের নিজের বাড়ি হবে। এখন প্রশ্ন জাগে মনে, কী প্রয়োজন ছিল এ বাড়ি তৈরির! মা চিরকালের মত বিদায় নিলেন, স্ত্রী তাঁকে একরকম ত্যাগ করে দূরে আছেন। কার জন্যে এ গৃহ নির্মাণ! তবুও বাড়ির জন্যে অজস্র ব্যয় হতে লাগল। মন বললে, নাই রইল কেউ, তবু তো আছে অনেকে। কেউ আপন নয়, কেউ পর নয়; আপন পর তো নিজের ওপর।

হেমকুসুম এখন অসুস্থ। দেরাদুনে রয়েছেন। দেরাদুনে টাঙা থেকে পড়ে সেই যে আঘাত পেয়েছিলেন, সে আঘাত বুঝি আর সারল না। লালবাগ মহল্লার বাড়িতে প্রথমে মা ও ছেলে একাকী বাস করছিলেন, অতুলপ্রসাদ তাঁদের সকল সুবিধা-অসুবিধা দেখছিলেন। হেমকুসুমের শরীর ক্রমে মন্দ থেকে মন্দতর হচ্ছিল। তাঁর চিকিৎসা না করলেই নয়। এমন সময়ে বিহারীলালের পুত্র মেজর জ্যোতিলাল এলেন। জ্যোতিলাল বন্ধু মানুষ, তিনি অতুলপ্রসাদকে বললেন, আমি হেমকুসুমকে দেরাদুনে নিয়ে গিয়ে ইলেকট্রো চিকিৎসা করে সুস্থতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে পারি। আমার মনে হয় হেমকুসুম ভাল হতে পারে। অতুলপ্রসাদ বললেন, আপনি যদি মনে করেন হেমকুসুম ইলেকট্রো ট্রীটমেণ্টে সুস্থ হবে, তবে তাই ব্যবস্থা করুন। ওর জন্যে আমি খুব চিন্তিত।

দিলীপকেও ডাকলেন : তোমায় একটা কাজকর্ম কিছু শিখতে হবে।

আমার তো ইচ্ছে বাবা ফারমিং শেখা, তোমাকে এর আগে বলেছিলাম।

আমার মনে আছে, তোমার জন্যে আমি লেখালেখি করে চলেছি।

অবশেষে দিলীপ দেরাদুনে একটা এগ্রিকালচার ফারমে শিক্ষানবিশ হয়ে প্রবেশ করল। ওদিকে অসুস্থ হেমকুসুমের ইলেক্‌ট্রো ট্রীটমেণ্ট চলল মেজর জ্যোতিলালের তত্ত্বাবধানে এভেন ফ্লেজারের নার্সিং হোমে। অজস্র অর্থব্যয় হতে লাগল, কিন্তু উন্নতির কোন লক্ষণ বিশেষ দেখা গেল না।...দিলীপের জন্যে ভাবনা, হেমকুসুমের জন্যে ভাবনা, বাড়ি দ্রুত সমাপ্তির মুখে—তার জন্যে ভাবনা। আরো কত, কত কাজ। হাজারো চিন্তা।

দাদা লিখলেন, তুমি আমার কাছে এস, কিছুদিন বেড়িয়ে যাও। কিন্তু সময় কি পান হাজারো কাজের মাঝে থেকে! কোর্টের কাজে লখিমপুর গিয়েছিলেন। ডাকবাঙলো থেকে লিখলেন :

Dak Banglo
Lakkhimpur
(Oudh)
19. 9. 25.

দাদা,

আজ তোমার পত্র পাইলাম। আমিও দেখিতেছি যে এ পূজার ছুটিতে আমার দেশে যাওয়া হইবে না। তাহার কারণ এই :

১। একটা কেসে এখানে এমন আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি যে ছুটিতে কাজ করিতে হইবে, আর ২।৩ অক্টোবরেও কাজ আসিয়া পড়িয়াছে।

২। ২।৩ দিনের জন্য দেরাদুন যাইতে হইবে, হেমকুসুমের শরীর বড়ই খারাপ

হইয়া পড়িয়াছে। তাহার চিকিৎসায় আবশ্যক। জ্যোতিলালের ট্রীটমেণ্টে কিছুই হইল না।

৩। তুমি ভাই বলিয়াছ যে দেশে গেলে কিছু টাকা সঙ্গে না লইয়া যাওয়া চলে না। যাহা কিছু হাতে আসে তাহা বাড়ির জন্যে খরচ করিতে যায়, এ যাত্রায় তাই যাওয়া ছিল না। দেখি যদি শীতকালে পারি। তোমরা আমার ভালবাসা নিও। আশা করি তোমরা সকলে ভাল।

তোমার ভাই
অতুল

সত্যপ্রসাদকে চিঠি লিখলেন অতুলপ্রসাদ ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯২৫।

তার কয়েকদিনের মধ্যেই অতুলপ্রসাদ দেরাদুন রওনা হলেন। হেমকুসুমের অসুস্থতার জন্যে খুউব চিন্তিত। মেজর জ্যোতিলালের চিকিৎসাতেও হেমকুসুমের শরীর কিছুমাত্র সারেনি। হেমকুসুমের স্বাস্থ্য যখন দেরাদুনে সারল না, তখন আর তাঁকে দেরাদুনে রাখার কোন প্রয়োজনই নেই। ওঁকে লখনউ নিয়ে এলেই হয়, লখনউতে এনে স্পেশালিস্ট ডাক্তারকে দেখিয়ে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করলে হয়। তাই মনে মনে ভেবে নিলেন অতুলপ্রসাদ, যত শীঘ্র সম্ভব হেমকুসুমকে লখনউতেই ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন।

দিলীপ তখন দেরাদুনে কোন একটি এগ্রিকালচার ফারমে ট্রেনিং নিচ্ছে। দিলীপকে দেখে বললেন, কেমন কাজকর্ম হচ্ছে তোমার, এ বিষয়ে মন বসছে তো? মনে মনে ভাবেন অতুলপ্রসাদ, শেষ পর্যন্ত এতেও মনস্থির থাকবে তো তাঁর একমাত্র ছেলের! বড় খামখেয়ালী ছেলে। ওর জন্যে কম ভাবনা!

দিলীপকে বললেন, তোমার শরীর কেমন? এখানে ভাল লাগছে তো বাবা?

দিলীপ বললে, হ্যাঁ ভাল লাগছে।

তোমার ছুটি কবে হচ্ছে? লখনউ যাচ্ছ কবে?

শীতকালে কয়েকদিনের জন্যে যেতে পারি।

মন দিয়ে কাজকর্ম কর, কেমন? তোমাকে মানুষ হতে হবে।

অতুলপ্রসাদ বললেন, তোমার মায়ের চিকিৎসা এখানে ভাল হল না, তাই ভাবছি তাঁকে লখনউতে নিয়ে ভাল করে ডাক্তার দেখিয়ে আবার নতুন করে চিকিৎসা করাবো।

দিলীপ বললে, হ্যাঁ সেই ভাল বাবা।

অতুলপ্রসাদ হেমকুসুমকে নিয়ে লখনউ ফিরে এলেন। উঠলেন আউট্রাম রোডের বাড়িতে। অসুস্থ হেমকুসুম বড় অসহায়। ওকে যেন চেনাই যায় না, বিছানায় মিশে গেছে শরীরখানা।

চারবাগের বাড়ি তখনও শেষ হয়নি, বারে বারে বাধা পড়ে কাজে। জমি কিনে কত পরিকল্পনা মনে এঁকে বাড়ি শুরু করবেন অতুলপ্রসাদ, মা হঠাৎ মারা গেলেন। মায়ের নামে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে একটা ব্লক তৈরির টাকা দিলেন। নানান ব্যাপারে বাড়ির কাজ বুঝি কিছুদিনের জন্যে থেমে যায়। এখন আবার হেমকুসুম অসুস্থ। হেমকুসুমের জন্যে জলের মত টাকা খরচ হয়। কিন্তু সেজন্যে কি বাড়ির কাজ বন্ধ থাকে! বাড়ির নির্মাণ-কার্যও চলে, হেমকুসুমের চিকিৎসাও চলল। অতুলপ্রসাদের পরিশ্রম ক্রমে অত্যধিক হয়ে উঠল।

হেমকুসুম সারাদিন শুয়ে একাকী। অতুলপ্রসাদ সে সময়ে কাজে ব্যস্ত থাকেন। অতুলপ্রসাদ যখন হেমকুসুমের পাশে এসে বসেন, হেমকুসুম বলেন, আমি আর চলতে পারব না কোনদিন! তুমি বল, আমি চলে-ফিরে বেড়াতে পারব?

অতুলপ্রসাদ বলেন, কেন পারবে না! তোমাকে ভাল ডাক্তাররা দেখে যাচ্ছেন, তোমাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলার জন্যেই তো তাঁদের এখানে আসা। তাঁরা তো আশা ত্যাগ করেননি।

কিন্তু দেরাদুনে জ্যোতিলাল আমাকে তো ভাল করে তুলতে পারল না।

তুমি মনে জোর আন হেম, দেখবে তুমি ভাল হয়ে গেছ।

মনে জোর আনতে চাই তো, কিন্তু শরীরটা।...পারি না।

না, মনে জোর আন নি; আনলে মুখের চেহারা অমন হত না।

আমি কোনদিন চলে ফিরে বেড়াতে পারব না। আমার পা-দুটি যেন কেমন অবশ বলে মনে হয়।

অতুলপ্রসাদ হেমকুসুমকে সাহস দিয়ে বলেন, তুমি চলতে ফিরতে পারবে বৈকি। এ তোমার মনের ভয়। তুমি এখন অনেক সেরেছ। ডাক্তার তোমাকে সাহস মনে এনে চলতেই বলেছেন। তুমি আমার হাত ধর। এস, আমার হাত ধরে ধরে চল।

না আমি চলতে পারব না, আমার ভয় করছে!

কিন্তু তোমাকে চলতেই হবে হেম। তুমি উঠে দাঁড়াও, আমার হাত ধর। ...এই তো দাঁড়িয়েছ...সাহস ফিরে এসেছে। চল, এগিয়ে চল।

সাহসে ভর করে হেমকুসুম পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেন। চলতে গিয়ে ক্লান্ত হন। থর-থর কাঁপে সারা দেহ। দু-হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়েন। অতুলপ্রসাদ সাহস দেন। সাহস দিয়ে প্রেরণা দিয়ে অতুলপ্রসাদ হেমকুসুমের মনের আস্থা ফিরিয়ে আনেন। নিজের ওপর আস্থা ফিরে আসায় হেমকুসুম অনেকটা সুস্থ হন।

ওদিকে অতুলপ্রসাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয় বুঝি। শয্যা ত্যাগ করেন কোন সকালে, তারপর কাজের চাকা ঘুরে চলে। কোর্ট যাওয়ার আগে পর্যন্ত অফিস-ঘরে মক্কেলদের

ভিড় ; তাদের বক্তব্য শোনা, নথিপত্র দেখা, তাদের বিদায় করে দিয়ে স্নান খাওয়া শেষ করেই ছোট কোর্টে। চলে কয়েক ঘণ্টা মানসিক পরিশ্রম, শারীরিক পরিশ্রমও কম হয় না সওয়াল করতে গিয়ে। কোর্ট থেকে ফিরতে না ফিরতেই আবার শুরু হয়ে যায় মক্কেলদের আনাগোনা। কোনদিন বা কারো সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে জাগে না। বড় ক্লান্ত মনে হয়। কত রাত গেছে নিদ্রাহীন আইনের বইয়ের পাতায় পাতায় ঘুরে ফিরে। আসে দুর্গত মানুষরা তাঁর কাছে আইনের আশ্রয় চেয়ে। তাদের ফেরাতেও মন চায় না।...কবি অতুলপ্রসাদের মন টানে রবিবারের আসরটি। এই আসরে এসে যখন বসেন তখন তিনি অন্য মানুষ। কোথায় শোক, কোথায় দুঃখ, অসুখ-বিসুখ, জ্বর জারি! এই পৃথিবীটা তখন কেবল গানের, হাসির, আনন্দের; এখানে এলে এই সাহিত্যজগতে সাংসারিক জগৎটা অনেক দূরের বলে মনে হয়। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, তাদের অস্তিত্ব অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়।

...প্রবাসে আমাদের একটা পত্রিকা প্রকাশ করলে কেমন হয়, আমাদের প্রবাসী বাঙালীদের মুখপত্র! বাঙলাদেশে বাংলা সাহিত্যের প্রবাহ চলছে যেমন চলুক। আমরা এখানে আমাদের কথা বলি।

কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় কাশী থেকে জানালেন, অতি উত্তম। আপনি যদি চেষ্টা করেন আমরা আপনার পিছনে আছি।

উঁহু, সে হবে না। আপনারা সকলে এগিয়ে আসুন আমার সামনে।

পত্রিকার ব্যাপারে কাজ করার জন্যে একজন সুযোগ্য কর্মী চাই। সে-ই সকল ভার নিক, আমরা তার সঙ্গে থাকব। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের তখন প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে। প্রকাশ হয়নি তখনও প্রবাসী বাঙালীদের মুখপত্র 'উত্তরা'র।

এলেন সুরেশ চক্রবর্তী।*

---

* সুরেশ চক্রবর্তী তখন তরুণ। কাশীতে একটি পত্রিকা প্রকাশ করলেন, নাম তার প্রবাস-জ্যোতি। মনে অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং অনেক স্বপ্ন নিয়ে সে পত্রিকার প্রকাশ হল। লেখক-গোষ্ঠিতে কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিতপ্রবর গোপীনাথ কবিরাজ, স্বনামধন্য আরো অনেকেই ছিলেন। কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন বললেন, সুরেশ, লখনউয়ে কবি অতুলপ্রসাদের কাছে যাও; লখনউয়ের স্বনামধন্য এবং অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী মানুষ। কবিতা নিয়ে এস, এবং কিছু গ্রাহক করিয়েও আনতে পারবে। গ্রাহক জোগাড় হবে—এ কথাতেই সুরেশ চক্রবর্তী খুউব উৎসাহিত হলেন। কারণ কবিতা পাওয়ার থেকে গ্রাহক সংগ্রহের আগ্রহটাই তখন সুরেশ চক্রবর্তীর কাছে কাজের কথা। কোন এক শনিবার ছুটলেন কাশী থেকে লখনউ। স্টেশন থেকে সোজা অতুলপ্রসাদের

আপনি বোধহয় চিনতে পেরেছেন, কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, আমাদের প্রবাস-জ্যোতি পত্রিকার জন্তে সুরেশ আপনার কাছে গিয়েছিল।

হ্যাঁ হ্যাঁ, চিনি বইকি, বিলক্ষণ চিনি।

আত্মপ্রকাশ হল কাশী লখনউ থেকে 'উত্তরা'র। 'উত্তরা অতুলপ্রসাদের মানস কন্যা। সে বছর লখনউয়ে বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন বসল। অতুলপ্রসাদ অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি। সম্মিলনের উদ্‌ঘাটন-দিবসে বললেন:

"আপনারা লখনউ নিবাসী বাঙালীদের বিনত্র নমস্কার গ্রহণ করুন। অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে সাদরে অভিনন্দন করিতেছি। এ সাহিত্যোৎসবে যোগদান করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন···হয়ত আপনারা ভাবিয়াছিলেন নবাব-প্রধান লখনউ নগরে নবাবোচিত সৌজন্য ও আতিথ্যের বিপুল ব্যবস্থা হইবে। সত্যি এককালে লখনউ নগর প্রচুর সুখ স্বচ্ছন্দতা, মনোরম সৌজন্য ও অপরিমেয় আতিথেয়তার জন্য সর্বত্র খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। একদিন স্বচ্ছল-অবকাশ-সাপেক্ষ মধুর সঙ্গীতে এদেশ ঝঙ্কৃত হইত। ঐশ্বর্য-পরিপুষ্ট শিল্পকলা এদেশে সকলের মনোরঞ্জন

বাড়িতে। ভৃত্য এনে বসিয়ে দিয়ে গেল যে ঘরে তার পাশের ঘরটিই বোধহয় স্নানের ঘর ছিল, কারণ জল ঢালার শব্দ আসছিল এবং তার সঙ্গে বা তা ছাপিয়ে গম্ভীর দরাজ গলায় গানের কলি। কিছু পরে চটি পায়ে তোয়ালেয় শরীর ঢেকে যে জ্যোতিষ্মান পুরুষটি স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি বললেন হাসি মুখে, বসুন আসছি। কর্মব্যস্ত মানুষ, তবু সময় দিলেন কিছুক্ষণ। বললেন, সোজা স্টেশন থেকে বুঝি? তবে তো খাওয়া দাওয়া কিছু হয় নি। খেয়ে যাবেন। জানতে চাইলেন কি জন্যে আগমন, কী করতে পারি।

সুরেশ চক্রবর্তী বললেন, আপনার কবিতা আমার চাই। তারপর আসল কথা বললেন: আপনার তো এখানে অনেক পরিচয়, আমাদের কাগজের জন্যে কিছু গ্রাহক জোগাড় করে দিন এবং আপনিও গ্রাহক হন।

অতুলপ্রসাদ বললেন, বেশ বেশ, আপনাকে গ্রাহকও নিশ্চয় দেব। তারপর গানের খাতাখানি এনে সুরেশ চক্রবর্তীর হাতে দিয়ে বললেন, যে গান আপনার ভাল লাগে নিন। সুরেশ চক্রবর্তী মনোনীত করলেন 'মোদের গরব মোদের আশা—আ মরি বাংলা ভাষা'।

অতুলপ্রসাদ বললেন, দেখি আপনি কী গান মনোনীত করলেন? দেখে বললেন, আপনার রুচি আছে।

অতুলপ্রসাদের বিখ্যাত গীতি কবিতাটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় সেই প্রবাসের অখ্যাতনামা পত্রিকাটিতে।

করিত। লখনউর রাজগণ যদিচ কুক্কুট কিম্বা বটের সংগ্রামে যেরূপ পারদর্শী ছিলেন রাজ্যশাসন বিষয়ে তদ্রূপ দক্ষ ছিলেন না, তথাপি তাঁহাদের অধিকাংশই উদারচেতা ও মুক্তহস্ত ছিলেন। মচ্ছিভবনের অধিষ্ঠাতা নবাব আসফদ্দৌলা সাহেবের দানশীলতা এরূপ জনবিশ্রুত ছিল যে, এখনও চৌকের কোন কোন বণিক প্রাতে আপনার বিপণি দ্বার উদ্‌ঘাটন করিবার পূর্বে এই মন্ত্র উচ্চারণ করে—জিসকো ন দে মৌলা, উসকো দে আসফদ্দৌলা।

...জনপ্রবাদ আছে যে লখনউর উদ্যানের অপূর্ব শোভা ও পুষ্পসম্পদ ভূতকালে নন্দনেও এত খ্যাতিলাভ করিয়াছিল যে, একদা নন্দনের উদ্যানপালক লখনউয়ের কুসুমসম্ভারের শোভা নিরীক্ষণ করিবার জন্য অবসর গ্রহণ করিয়া মর্ত্যভূমের উদ্যানভূমি লখনউ নগরে অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু অনতিকাল পরে স্বর্গরাজের নিকট এই পত্র লিখিলেন—'দেবরাজ ক্ষমা করিবেন, আমি আর নন্দনে ফিরিতে পারিব না।' কিন্তু যেদিন হইতে লখনউয়ের বাদশাহ 'ছোর চলে লখনউ নগরী' সেদিন হইতে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার শোষণ-যন্ত্র এদেশের বক্ষস্থলে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, সেদিন হইতে কমলার অনুকম্পা হ্রাস হইয়া আসিতেছে, বিশ্বকর্মা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমাদের অভ্যর্থনার দারিদ্র্য সেই অপহৃত বৈভবের অনুকৃতি মাত্র। 'ভুখা নবাবের' দেশে ভুখা বাঙালীর নিমন্ত্রণ তাই এত সাজ-সজ্জাহীন।

কিন্তু যদিচ লখনউর পুরাতন গৌরবরশ্মি নিতান্তই হীনপ্রভ হইয়াছে তথাপি এই মহানগরী সম্পূর্ণ হতশ্রী হয় নাই। এখনও এদেশ শস্য-শ্যামলা, এখনও পূতসলিলা, বঙ্কিমগতিতে গোমতী তাহার শীতল আলিঙ্গনে এ দেশকে সুশীতল করিতেছে। এখনও লোহিতাভ সন্ধ্যায় যখন লখনউয়ের সমাধিসৌধের উচ্চ মুকুট এবং শৃঙ্গাবলী আকাশপটে চিত্রিত হয় তখন গত গৌরবের ধূসর স্মৃতিতে আমাদের নয়ন মধুর বিষাদে আর্দ্র হয়। যদিও প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞগণ লখনউ নগরী হইতে চিরবিদায় লইয়াছেন তথাপি এখনও লখনউয়ের রাজপথ পথচারীর সুললিত সঙ্গীতে মুখরিত। এখনও সুকবিগণ তাঁহাদের মধুর 'মারসিয়া' সঙ্গীতে হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সকলের চিত্তবিনোদন করেন। এখনও 'মুসায়েরা' সম্মিলনে ধনী দরিদ্র শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত কাব্যমোদিগণ একাসনে বসিয়া এক পাত্রে কাব্যসুধা পান করেন। পুরাতন শিল্পকলা ও কারুকার্য যদিও এখন নিঃশেষপ্রায় তথাপি তাহার ক্ষীণাবশিষ্ট এখনও বিদ্যমান। যদিও মুসলমান রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান সভ্যতার প্রতিপত্তি প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে তথাপি এখনও অসামান্য সৌজন্য, উর্দু ভাষার অপূর্ব সৌষ্ঠব, কথোপকথনের মোহন প্রণালী, মনোহারী ভাববিন্যাস ইত্যাদি সভ্যতার বাহ্যিক নিদর্শন তিরোহিত হয় নাই।

তিন বৎসর পূর্বে কানপুরের কতিপয় সাহিত্যপ্রেমী বাঙালী বহির্বঙ্গে বাঙলা সাহিত্যের

প্রসার ও প্রতিষ্ঠার একান্ত আবশ্যকতা অনুভব করিয়া এই সাহিত্য-সম্মিলনের সূচনা করেন। যাঁহারা এই মহৎ ব্রত সাধনের প্রথম প্রদর্শক তাঁহাদের মধ্যে আমাদের পরম বন্ধু কানপুরের জনপ্রিয় লব্ধপ্রতিষ্ঠিত ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় অন্যতম। তৎপর-বৎসর ভাগীরথী তীরে পুণ্যভূমি কাশীনগরে তথাকার সাহিত্যানুরাগী ও উদ্যোগী বাঙালীগণ বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের এক চিরস্মরণীয় মহাসভার অনুষ্ঠান করেন। বর্তমান সাহিত্যজগতের শ্রেষ্ঠতম কবি অতুল প্রতিভা সম্পন্ন বাঙলার কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ সে সাহিত্য-যজ্ঞের পৌরোহিত্য গ্রহণ করেন ও সে অনুষ্ঠানের সফলতা সম্পাদন করেন। গত বৎসর গঙ্গা যমুনার সন্ধিস্থলে পবিত্র প্রয়াগ নগরীতে এই সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হয়··বাঙলা সাহিত্যজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত প্রবাসীকুলগৌরব শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সে সভার সভাপতিত্বে বৃত হন। কিন্তু অসুস্থতার জন্য সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাঁহার অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় সভাপতির কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। এ বৎসর লখনউ সে সৌভাগ্যের অধিকারী। কাশী কিম্বা প্রয়াগের ন্যায় এ তীর্থভূমি নহে, তথাপি এ প্রদেশ পুণ্যভূমি। পূর্বদিকে পুণ্যতোয়া সরযূর উপকূলে রঘুকুলমণির রাজধানী অযোধ্যা নগরী। পশ্চিমে গোমতী তীরে মহাভারত রচয়িতা ঋষিকুলপুঙ্গব বেদব্যাসের পবিত্র তপোবন নৈমিষারণ্য। উত্তরে দেব-ত্রাতা আত্মত্যাগের চরম আদর্শ রাজর্ষি দধীচির সমাধিভূমি এবং তীর্থ-সমূহের মিশ্রণভূমি মিশ্রিখ। দক্ষিণে পূতসলিলা জাহ্নবী। কেন্দ্রস্থলে বিনয়াবতার লক্ষ্মণদেবের রাজধানী ক্ষুদ্র গ্রাম লক্ষ্মণপুর—যেস্থলে আজ বৃহৎ লখনউ নগরী বিরাজিত। আমরা অযোগ্য হইলেও ভারতীর পূজার জন্য এদেশ অযোগ্য নহে। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে এ ভারতীর পূজায় ভারতীর বরকন্যা ভারতী সম্পাদিকা অধিনায়িকার পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

আমাদের এই নবীন শিশুটি আমাদের এত আদরের যে ইতিমধ্যে ইহার একাধিকবার নামকরণ হইয়া গিয়াছে। প্রথমে ইহার নাম রাখা হয় উত্তর-ভারতীয় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন। গত বৎসর ইহাকে 'প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। যদি এ সম্মিলন বাঙ্গালার বহির্ভূত বাঙালী-মাত্রের সম্মিলন হয়, তবে উহাকে উত্তর ভারতীয় বলা সঙ্গত নহে। কেন না মধ্যভারত ও দক্ষিণ ভারতে বাঙালী বাস করেন, তাঁহারাও এ সম্মেলনের সভ্যপদের অধিকারী। প্রবাসী নামটি অপেক্ষাকৃত সুপরিচিত, কিন্তু এ নামটিও সম্পূর্ণ নিরাপত্তিতে গ্রহণ করা চলে না···এখানে যাঁহারা দীর্ঘকাল ও বংশপরম্পরায় স্থায়িভাবে রয়েছেন তাঁহাদের ঠিক প্রবাসী বলা চলে না···প্রবাসী শব্দ দূরত্বব্যঞ্জক ও আগন্তুকতার পরিচায়ক।······

এমন বাঙালী বোধহয় কেহই নাই যাঁহারা সাহিত্য সম্মিলনের উপকারিতা সম্বন্ধে

সন্নিহান। এ দেশবাসী আমরা বহুকাল হইতেই মাতৃভাষার প্রসার সাধনকল্পে ও বাঙালী জাতির উন্নতি ও বৈশিষ্ট্য রক্ষার মানসে সম্মিলিত চেষ্টার আবশ্যকতা বিশেষভাবে অনুভব করিয়া আসিতেছি। ভগবৎকৃপায় আমাদের এ উদ্দেশ্য ফলবতী হইবার পূর্বাভাস দৃষ্টি-গোচর হইতেছে। কিন্তু আমাদের এ সম্মিলনকে স্থায়ী ও হিতপ্রদ করিতে হইলে যে নিরলস সাধনা ও দলবদ্ধ প্রয়াসের প্রয়োজন তাহা আমাদের ন্যায় জীবিকান্বেষী ও নিরবসর বাঙালীর সাধ্যায়ত্ত কি না সে সম্বন্ধে মনে দ্বিধা উপস্থিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে। তথাপি প্রবাসী বাঙালীদের হৃদয়ে অধুনা মাতৃভাষার প্রতি যে নবীন অনুরাগের উদ্দীপনা দেখিতেছি তাহাতে আশা হয় যে আমাদের এ নবপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্য-মন্দির নিতান্ত ভঙ্গুর হইবে না···

···প্রবাসী বঙ্গসন্তানদের অন্তত বৎসরান্তে একবার সাহিত্যোৎসবে সম্মিলিত হওয়ার সফলতা বহুবিধ।···কেবলমাত্র সামাজিক দিক দিয়া বিচার করিলেও ইহার উপকারিতা অতি সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। সামাজিক পরিচয় ও আত্মীয়তার সাফল্য হয়ত কেহ অস্বীকার করিবেন না, অথচ প্রবাসী বাঙালী আমরা অনেকেই পরস্পরের নিকট অপরিচিত···আমাদের অভাব, আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির পন্থা ও অন্তরায়, আত্মরক্ষার এক উপায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু একত্র হইবার সুযোগ না থাকায় পরিচয় ও ভাববিনিময়ের অভাবে আমরা বিচ্ছিন্ন, পরস্পরের সহায়তা হইতে বঞ্চিত সুতরাং আমরা দুর্বল। যদি সাহিত্যসূত্রে আমরা কখনও কখনও এক হইতে পারি এবং আমাদের শুভাশুভের আলোচনা করিবার অবসর পাই তবে আমাদের সমূহ লাভ। প্রবাসে বাঙলা সাহিত্যের প্রচার ও উন্নতিসাধন করিতে হইলে সাহিত্য সম্মিলন অপরিহার্য।

সর্বপ্রথম আমাদের কর্তব্য প্রবাসে বাঙালী বালক বালিকাদের বাঙলা শিক্ষার সুব্যবস্থা করা। যেখানে বহুসংখ্যক বাঙালীর বাস সেখানে সুপরিচালিত বাংলা স্কুল স্থাপন করা নিতান্ত আবশ্যক। তাহা ব্যায়সাপেক্ষ সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি সকলে নিজের উপার্জনের এক ক্ষুদ্রাংশও এ উদ্দেশ্যে ব্যয় করেন তবে অন্তত মেয়েদের একটি পাঠশালা উত্তমরূপে চলিতে পারে। প্রবাসে বাঙালীদের বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা অল্প হইবে না; কিন্তু যে বিদ্যালয়ে শিক্ষার খুউব সুবন্দোবস্ত আছে এরূপ বিদ্যালয় বিরল। এ বিষয়ে আমরা অলস ও উদাসীন। যাহাদের সাংসারিক অবস্থা স্বচ্ছল তাহাদের এ সম্বন্ধে গুরুদায়িত্ব আছে। দরিদ্র বাঙালী ভাইয়ের পুত্রকন্যারা যদি অর্থাভাবে বাংলা ভাষা শিক্ষা করিতে না পারে তাহা হইলে তাহাদের সাংসারিক স্বচ্ছলতা নিরর্থক। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে আমরা দেব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বংশধর। স্বর্গীয় তারকনাথ পালিত এবং রাসবিহারী ঘোষের স্বজাতি। আমাদের নিকট বিদ্যা বিতরণ

বিষয়ে দানশীলতার পরম সার্থকতা কেবলমাত্র শাস্ত্রের অনুশাসন নহে। উহা প্রত্যক্ষীকৃত সত্য।…তৎপরে বাঙালী জনসাধারণের মধ্যে বাঙলা সাহিত্যের প্রচার করিতে হইলে পাঠাগার স্থাপন করা প্রয়োজনীয়। পুস্তকালয়ের উদ্দেশ্য পাঠক সাধারণের মধ্যে সুশিক্ষা বিস্তার করা। যে সাহিত্য পাঠে মনের উচ্চবৃত্তিগুলি পরিস্ফুট হয় সেই সাহিত্যপাঠে পাঠককে প্রলুব্ধ করাই পুস্তকাগারের মূল উদ্দেশ্য। জনসাধারণ যাহা পাঠ করিতে চায় শুধু তাহা সংগ্রহ করাই পুস্তকাগারের কর্তব্য নহে।…লঘুসাহিত্যের প্রতি স্বতঃই লোকের আকর্ষণ অধিক ; যে সাহিত্য চিন্তাশক্তিকে সক্রিয় করে তৎপ্রতি সাধারণের দৃষ্টি অল্প। তাই সচরাচর পুস্তকাগারে গল্প ও উপন্যাসের বাহুল্য দেখিতে পাই। সে বিষয়ে আমাদের একটু সতর্ক হওয়া আবশ্যক। বাঙলা ভাষায় সুখপাঠ্য সদ্‌গ্রন্থের অভাব নেই।…সুতরাং আমাদের প্রবাসী পাঠক সমাজের একটু সাবধান হওয়া আবশ্যক।

…প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে সাহিত্য সাধনার একটা প্রবল ইচ্ছা দেখা দিয়েছে তাহার ফলে বাঙালীবহুল কাশী নগরী হইতে কয়েকখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে 'অলকা' অলিখিত, 'প্রবাস জ্যোতি' নির্বাপিতপ্রায়। সম্প্রতি সাহিত্যপ্রেমী শ্রীসুরেশ চক্রবর্তী কাশীধাম হইতে 'প্রবাসী বাঙালী' নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা বাহির করিতেছেন, আমি তাঁহার সাহিত্যোৎসাহের প্রশংসা করি এবং তাঁহার সুলিখিত পত্রিকার স্থায়িত্ব কামনা করি। আমি কিন্তু তাঁহাকে একটি মনোরম ও সারগর্ভ মাসিক পত্রিকা সম্পাদন বিষয়ে সহায়তা করিতে অনুরোধ করিতেছি। পত্রিকাখানি সচিত্র হইবে। উত্তর ভারতে আজকাল একাধিক খ্যাতনামা বাঙালী চিত্রশিল্পী বাস করেন। আমার বিশ্বাস এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার, শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত সারদা উকিল প্রমুখ চিত্রবিদ্যাবিশারদ বাঙালীদের সহায়তা অনায়াসে পাইতে পারি। সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক বন্ধুবর ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় এ কার্যে হস্তক্ষেপ করিবেন এরূপ আশা করি। পাটনা কাশী এলাহাবাদ লখনউ এবং লাহোর বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে সুযোগ্য বিদ্বান বাঙালী অধ্যাপনার কার্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা অনেকে সাহিত্যিক, সুলেখক। তাঁহারা কষ্ট স্বীকার করিলে অনেক সারগর্ভ প্রবন্ধাদি এ পত্রিকায় প্রকাশ হইতে পারে। ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, যদুনাথ সরকার প্রমুখ প্রবাসী ঐতিহাসিকেরা এ দেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধীয় অনেক অনাবিষ্কৃত তথ্য প্রকাশিত করিতে পারেন। যাঁহারা উর্দু ভাষায় পারদর্শী তাঁহারা দাগ, গালিব, জোখ, আমির, আতস্, রতননাথ, আকবর, হালি প্রভৃতি সুকবিগণের কাব্যভাণ্ডার হইতে রত্ন সঞ্চয় করিয়া আমাদের বাঙলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারেন। যাঁহারা হিন্দিভাষায় সুশিক্ষিত তাঁহারা তুলসীদাস,

সুরদাস, কবীর, বিহারীদাস, কেশবদাস, ভূষণ, মীরাবাঈ, পদ্মাকর, রহিম, হরিশচন্দ্র, প্রতাপ, শ্রীধর পাঠক প্রমুখ প্রসিদ্ধ হিন্দি কবিগণের কাব্যকুসুম হইতে মধু আহরণ করিয়া আমাদের মধুচক্রটিকে আরও মধুময় করিতে পারেন। এ দেশের তীর্থাদি, এ দেশের জনপ্রবাদ, এ দেশের লোকাচার ইত্যাদি সাহিত্যের প্রকৃষ্ট উপকরণ যথেষ্ট বিদ্যমান। আমার ধারণা এসব উৎকৃষ্ট উপাদান অবলম্বন করিয়া যদি একটি সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রবাসে নিয়মিতরূপে সম্পাদন করা যায় তাহা হইলে বহিঃবঙ্গীয় বাঙালীগণের মাতৃসাহিত্য সেবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করা হইবে, সাহিত্য-প্রেমিকদের মাতৃভাষায় প্রবন্ধ ও কবিতাদি রচনা করিতে উদ্বুদ্ধ করা হইবে।
প্রবাসী বাঙালীদের আর একটি দায়িত্ব আছে যাহা সাহিত্যসেবী বাঙালীদের মনে রাখা কর্তব্য। যাহাতে বাঙালী জাতি ভিন্ন এ দেশীয়দের মধ্যেও বাঙলা সাহিত্যের প্রতিপত্তি ও প্রসার সংসাধিত হইতে পারে সে বিষয়ে আমাদের যত্নবান হইতে হইবে। আপনারা লক্ষ্য করিবেন আধুনিক হিন্দিভাষা অনেকটা বাঙলা ভাষার অনুকরণে গঠিত হইতেছে। হিন্দি, মারাঠি, গুজরাটি ভাষায় বাংলা সাহিত্যের বিস্তর গ্রন্থাদি অনুবাদিত হইয়াছে। আমার বোধ হয় বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলি দেবনাগরী অক্ষরে প্রকাশিত এবং অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্যের উৎকৃষ্ট গ্রন্থগুলি সংক্ষিপ্ত টিকাসহ বাঙলা অক্ষরে মুদ্রিত করিলে আদান-প্রদানের দ্বারা বাঙলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি তো করা হইবেই, অন্যান্য ভারতীয় ভাষাকেও আমাদের বাঙলা সাহিত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত করা হইবে।·· কালে আমাদের বাঙলা সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের সাহিত্য হইবে। প্রবাসী বাঙালীদের যত্ন ও অধ্যবসায় দ্বারাই আমাদের এ অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে।···সাহিত্যপ্রেমী বন্ধুগণ, আমরা বহুদিন পরে প্রবাসে বঙ্গবাণীর উৎসব-মন্দির স্থাপন করিলাম। পুরোহিত কিম্বা উপাসকের অভাব হইবে না। কিন্তু ইহাকে চিরস্থায়ী করিতে হইলে হৃদয়ে ভক্তি চাই, গভীর নিষ্ঠা চাই, প্রচুর ধৈর্য চাই, নতুবা আমাদের সাহিত্য সাধনা নিষ্ফল হইবে। ক্ষণিক উৎসাহ কিম্বা ভাবুকতায় আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না, কার্যতৎপরতা, অধ্যবসায়, শৃঙ্খলা, স্বার্থত্যাগ, পরার্থপরতা ও সদ্‌গুণ সমূহের সমাবেশ হইলে তবে আমরা সফলমনোরথ হইব। ভগবৎচরণে প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের সাহিত্যসেবা সার্থক করুন।"

অধিবেশন চলার কালে অন্যান্য প্রস্তাবের মাঝে সম্মিলনের মুখপত্র স্বরূপ একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করা হবে বলে স্থির হয়ে নিম্নলিখিত ব্যক্তি সম্বলিত সমিতির ওপর ভার দেওয়া হল : শ্রীযুক্তা সরলা দেবী, শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন, ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, ফণিভূষণ অধিকারী, রঘুনাথ ভট্টাচার্য, সুরেশ চক্রবর্তী, অসিতকুমার হালদার, শচীন্দ্রনাথ ঘোষ, গোপালচন্দ্র

মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রচন্দ্র রায়, ডাঃ প্রসন্নকুমার আচার্য, দেবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, নির্মলচন্দ্র দে, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, যোগেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ, বিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। চার্চ মিশন স্কুল প্রাঙ্গণে শেষ অধিবেশন বসল। পত্রিকা পরিচালনার জন্যে ৩০০০ টাকার আবশ্যক। কী করে অত টাকা পাওয়া যাবে? নিম্নলিখিত উপায়ে।

একস্কালীন দান

মাসিক চাঁদা

গ্রাহক সংগ্রহ

অতুলপ্রসাদ সর্বপ্রথমেই দান করলেন তিনশত টাকা। নলিনবিহারী মিত্র এলাহাবাদ থেকে দুশো টাকা, ফণিভূষণ অধিকারী কাশী থেকে একশো টাকা, সুরেন্দ্রনাথ সেন কানপুর থেকে দুশো, সরলা দেবী লাহোর থেকে পঞ্চাশ টাকা, যোগেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ, রঘুনাথ ভট্টাচার্য, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গঙ্গাচরণ মুখোপাধ্যায় ৫০।২৫ টাকা। আরও অনেকেই দিলেন। অনেকে টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। পত্রিকার নামকরণ হল 'উত্তরা'। সম্পাদক—অতুলপ্রসাদ সেন ও রাধাকমল মুখোপাধ্যায়। সহ-সম্পাদক সুরেশ চক্রবর্তী। পত্রিকার প্রকাশ লখনউ থেকে, মুদ্রণ কাশীতে। শেষে কাশীর ভেলুপুরা থেকেই মুদ্রণ এবং প্রকাশ—উত্তরা মানেই সুরেশ চক্রবর্তী, সুরেশ চক্রবর্তী মানেই উত্তরা। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেছেন, 'উত্তরার প্রথম সংখ্যা বেরুল, তারপর সব উৎসাহরই প্রকৃতি অনুসারে এ উৎসাহে ভাঁটা পড়ল। অন্য শহর থেকে টাকা এল কিন্তু তাঁর দুরাশা পুরণের উপযুক্ত নয়। লাগে টাকা দেবে অতুল সেন। তিনি টাকা দিলেন...উত্তরার জন্যে প্রথমবার, দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার টাকা দিলেন। কিন্তু এ কথা না বলে থাকতে পারছি না—উত্তরার প্রতি মমতার সঙ্গে সুরেশ চক্রবর্তীর ওপর স্নেহ মিশে গিয়েছিল। তিনি সুরেশকে আন্তরিক স্নেহ করতেন। অনেক সাহিত্যিকের মতে উত্তরা একখানি ভালো কাগজ। দুচারজন নামজাদা সাহিত্যিকের মুখে এও শুনেছি যে উত্তরাই একমাত্র সাহিত্য পত্রিকা। তাঁকে এ খবর শুনিয়েছি। শুনে তাঁর মুখে হাসি এসেছে—আর একটু তোৎলামি করে, আধখানা ভাষায় আনন্দ প্রকাশ করেছেন: বেশ বেশ বেশ, লেখ লেখ ..আচ্ছা করে লেখ দিখিনি।—অতুলদা আপনি মুসেয়ারার মতন আর একটা প্রবন্ধ লিখুন।—তাই—তাইতো কখন লিখি বল? এরা যে ছাড়ে না। তোমরা সব লেখ।—অতুলদা—আমরা সকলেই লিখছি...কিন্তু আমাদের লেখাটাই উত্তরার সর্বস্ব নয়। আমি ভাই কবিতা দিতে পারি—তাও সময় কই? সময় পেলেই তিনি কবিতা ও গান লিখতেন আর সে গান প্রধানত উত্তরার জন্যে লেখা হোত।...যখন টাকা দেবার দরকার হোত না, যখন লেখা দিতে

পারতেন না তখন উত্তরার কল্যাণের জন্যে চিন্তা করতেন। উত্তরা যে তাঁর মানস কন্যা!"

'ধূর্জটিপ্রসাদ তখন থাকতেন লখনউ কলেজ-সংলগ্ন অধ্যাপক-নিবাসে। অতুলপ্রসাদ সময় পেলেই গাড়ি করে গিয়ে হাজির হতেন বন্ধুদের কাছে। কখনো বসে যেতেন আড্ডা জমিয়ে, কখনও বা দু-তিন জন বন্ধুকে তাঁর গাড়িতে তুলে নিয়ে বেরিয়ে যেতেন বেড়াতে। একদিন এমনি চলেছেন বেড়াতে। সঙ্গে রয়েছেন ধূর্জটিপ্রসাদ। কোন এক গলির মুখে এসে গাড়ি থামাতে বললেন অতুলপ্রসাদ। "এক্ষুনি আসছি, তোমরা ভাই একটু বসো।" বলে গাড়ি থেকে নেমে গলিতে প্রবেশ করলেন অতুলপ্রসাদ। ধূর্জটিপ্রসাদের মনে জাগল কৌতূহল। নিঃশব্দে অনুসরণ করলেন। ছোট একটা প্রায়-কুঁড়ে ঘরে ঢুকলেন অতুলপ্রসাদ। পকেটে হাত ঢুকিয়ে মুঠো ভর্তি করে নিয়ে এলেন—রুপোর টাকা আর নোট—যতটা পারলেন। ও কুটিরে শয্যাশায়ী এক বৃদ্ধের কাছে গিয়ে তার বালিশের তলায় গুঁজে দিলেন ঐ সমস্ত নোট, টাকা-কড়ি সব। চেয়ে দেখলেন না কত টাকা, গোনা তো দূরে। মুখ ফেরাতেই ধরা পড়ে গেলেন ধূর্জটিপ্রসাদের কাছে। "ওটা কী হল অতুলদা?" সকৌতুক প্রশ্ন ধূর্জটিপ্রসাদের।

লজ্জায় জড়িত কণ্ঠে অতুলপ্রসাদ হাসলেন। কিছু নয়! কথাটা বুঝি চাপা দিতে চেষ্টা করলেন। পরে বললেন, অতি তরুণ বয়সী ব্যারিস্টার এ. পি. সেন লখনউ এসেছেন ভাগ্য পরীক্ষা করতে। যেমন সাধারণত হয়ে থাকে—দিনের পর দিন যায় উপার্জন হয় না। মনে চিন্তা ভাবনা। সেই সময়ে এক মুসলমান ফকির তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, তোর অনেক টাকা রোজগার হবে বেটা, চিন্তা ভাবনা করিস নে। তার কথা তো মিথ্যে হয়নি!

তাই বুঝি মাঝে মাঝে তার ডেরায় এসে আপনি পকেট ভর্তি "সামান্য কিছু" টাকা-কড়ি বালিশের তলায় গুঁজে দিয়ে আসেন?

অতুলপ্রসাদ লজ্জিত হাসি হাসেন।*

সময় যায়।

এদিকে দুটি মাসের অক্লান্ত পরিশ্রমে হেমকুসুম দেয়াল ধরে উঠে দাঁড়ালেন। দেয়াল ধরে চললেন, তারপর দেয়াল ছেড়ে পা টিপে টিপে। তারপর অনেকটা স্বাভাবিক মানুষের মত চলে ফিরে বেড়ালেন যেদিন সেদিন মনে কী যে আনন্দ হল বোঝানো কি যায়! তখন অতুলপ্রসাদের কথাই একমাত্র মনে হল হেমকুসুমের। কিন্তু কোথায় অতুলপ্রসাদ! এঘর ওঘর ঘুরে···একতলায়···দরজা ধরে দাঁড়িয়ে দেখলেন—আসরে

* বিনয়কৃষ্ণ ঘোষের রচনানুসারে। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

অতুলপ্রসাদ ; তিনি খুউব হাসছেন। তাঁর উচ্চ হাসির দমকে ঘর কেঁপে উঠছে। তিনি অন্য জগতে—সেখানে শুধু হাসি গান আনন্দ আলোর বন্যা। তাঁকে ঘিরে বসে তরুণ-তরুণীরা। তাদের কণ্ঠে গান—হাসি :

মোরা নাচি ফুলে ফুলে দুলে দুলে,
মোরা নাচি সুরধুনী কূলে কূলে।
কখনো চলি বেগে, কভু মৃদু চরণে,
কখনো ছুটি মোরা ফুল ফল হরণে।
কোথা হতে এসেছি,   কবে যে ভেসেছি
তা গেছি ভুলে।

অতুলপ্রসাদ যেখানে মধ্যমণি সেখানে চিরনবীনতা, চিরসজীবতা বিরাজমান। সেখানে চির বসন্ত। ডাক দাও তাকে :

জাগো বসন্ত, জাগো এবে
মোদের প্রমোদকাননে।
তুমি জাগিলে জাগিবে ফুল,
বহিবে মলয় মৃদু-মৃদুল,
গাহিবে বিপিনে বিহগকুল
মোহনমধুর ভাষণে।
পরাও সবারে মোহন বাস,
জাগাও হৃদয়ে নবীন আশ,
হাসুক ধরণী মধুর হাস
তব শুভ আগমনে।

এলেন না শুধু হেমকুসুম।

হেমকুসুম আজ ভাল আছেন, খুব ভাল আছেন—একথা যাঁকে বলবেন বলে অনেক ঘর ঘুরে অনেক পথের শেষে যাঁর দেখা পেলেন তাঁকে যেন কেমন দূরের মানুষ বলে মনে হল।

হল অভিমান। অনেক ক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন হেমকুসুম, কেউ তাঁকে দেখল না। দু চোখ দিয়ে অভিমান-অশ্রুর বন্যা নেমে এল। আবার এল ঘর ছাড়ার পালা। একাকী আউট্রাম রোডের বাড়িতে অতুলপ্রসাদকে পেছনে ফেলে হেমকুসুম লালবাগের বাড়িতে চলে গেলেন।

কুড়ি

বছর শেষ হয়ে গেল। ১৯২৬ সালের শুরুতে অর্থাৎ জানুয়ারিতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এলেন লখনউতে সঙ্গীত-সম্মেলনে নিমন্ত্রিত হয়ে, সঙ্গে শিল্পী অসিতকুমার হালদার।... লখনউ সঙ্গীতের জায়গা। লখনউয়ের শেষ নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ্ সঙ্গীত ও বাদ্যে সুরসিক ছিলেন, অনেক গজলের লেখক ও সুরকার ছিলেন। মিউটিনির পর ইংরেজ রাজত্বের প্রথম দিকে বিন্দাদিন মহারাজ ঠুংরি গানে এবং কথক নাচে খুব নাম করে-ছিলেন। তাঁর ভাই কালকা মহারাজ তবলা বাদ্যে চৌকোস ছিলেন। বিন্দাদিন অনেক ঠুংরি গান রচনা করে সুরসংযোগ করেছিলেন, যাকে এখন বলা হয় 'লখনউ ঠুংরি'। বিন্দাদিনের তিন ছেলে—অচ্ছন, লচ্ছন ও শম্ভু মহারাজ। অচ্ছন মহারাজ রামপুর নবাবের সভাগায়ক হন। লচ্ছন এবং শম্ভু মহারাজ কথাকলি নাচে খুব নাম করেন। আউধের তালুকদার রাজা রাজেশ্বরবলী সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন—সমঝদার ছিলেন। একদিন তাঁর ইচ্ছে হল এই লখনউয়ে সারা ভারতের জ্ঞানীগুণী শিল্পীদের একত্রিত করে সঙ্গীত-সম্মেলন করবেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটি কমিটি করে বসলেন।...সঙ্গীত-সম্মেলন যে হবে তার খরচও আছে। রাজা-মহারাজাদের কাছে এ-বিষয়ে সাহায্য করার জন্যে প্রস্তাব গেল। অনেকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। অতুলপ্রসাদ কমিটির একজন সদস্য নিযুক্ত হলেন। সঙ্গীত-সম্মেলন হবে কেশরবাগের ওয়াজিদ আলি শাহের বারদুয়ারীতে। হাজার হাজার বিশিষ্ট শ্রোতা ও দর্শকদের বসার জন্য আয়োজন করা হল। তালুকদারদের কৈশরবাগের বাড়িগুলি দূর দূরান্তের গায়কদের থাকার জন্য চাওয়া হল। তাঁরা অনুমতি দিলেন। লখনউয়ে প্রথম সঙ্গীত-সম্মেলন; সকলের মুখে মুখে সে কথা। অতুলপ্রসাদের উৎসাহ খুব বেশি। গুণী সঙ্গীতশিল্পীরা একে একে লখনউ এসে পৌঁছলেন। বোম্বাই অঞ্চল থেকে এলেন ভাতখণ্ডের প্রিয় শিষ্য রতনঝনকার গুরু ভাতখণ্ডের সঙ্গে। বরদার মহারাজা পাঠালেন তাঁর সভাগায়ক আলাবান্দাকে এবং তাঁর জার্মান ব্যাণ্ডমাস্টারের সঙ্গে স্টেট ব্যাণ্ড পার্টি। মাইহার থেকে এলেন আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব তাঁর তারের ব্যাণ্ডপার্টিকে নিয়ে। মথুরা থেকে এলেন মথুরার বিখ্যাত ওস্তাদ চন্দন চৌবে, আরো এলেন সরোদে হাফিজ আলি খাঁ, ফিদা হোসেন, বীণায় মোরাদ খাঁ, সেতারে এনায়েত খাঁ। বাঙলা থেকে এলেন রাধিকামোহন গোস্বামী একজন নাম-করা পাখোয়াজ-বাদককে সঙ্গে নিয়ে। এলেন দিলীপকুমার রায়, এসে নামলেন তাঁর বন্ধু ধূর্জটিপ্রসাদের বাড়িতে। অতুলপ্রসাদের বাড়ি তখন সরগরম, ছোট বোন ছুটকি

তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে ব্যাঙ্গালোর থেকে এসে উপস্থিত। আছেন হেমকুসুম, আর এসেছে সাহানা তার শিশুপুত্রকে নিয়ে।

মামাতো বোন সাহানাকে কাছে পেয়ে অতুলপ্রসাদ খুব খুশি। সাহানা বড় চমৎকার গান গায়, ভগবৎদত্ত ক্ষমতা ওর গলায়। তাছাড়া শেখার আগ্রহ কম কি? যেখানে ও সুযোগ পেয়েছে, গানের তালিম নিয়েছে ভাইদাদার কাছে—দার্জিলিং, কলকাতা, শিমুলতলায়। যেখানে দেখা হয়েছে গান শেখার আগ্রহ। সঙ্গীতশিল্পী সাহানা দেবী বলেছেন: অতুলদার কাছে আমার প্রথম গান শেখা—'ভব পারে কেমনে যাব হরি।' গানটি শিখি দার্জিলিং-এ ম্যাকেঞ্জি রোডের ওপর ডাক্তার পি. কে. রায়ের 'রুবি হল' নামে বাড়িতে বসে। 'বধূ ধর ধর' গানটিও শিখি। অতুলদা সেবার ওই বাড়িতে ছিলেন। অতুলদার কাছে গান শেখার ইচ্ছে অনেক দিন থেকেই কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি···দার্জিলিং পাহাড়ে প্রথম সেই সুযোগ-সুবিধে পাওয়া গেল। সাহানা দেবী আর এক জায়গায় বলেছেন: সেবার 'গ্লেন ইডেন' দু-নম্বরের বাড়িতে স্যার নীলরতন, তাঁর মেয়েরা, অতুলদা ও আমি···আমরা সবাই একসঙ্গে বেড়াতে যেতাম। অতুলদা নানা গল্প করে আমাদের হাসাতেন। নিজেও হাসতেন প্রাণখোলা। এমনিতে তিনি ছিলেন শান্ত ধীর স্থির, খানিকটা লাজুক মিষ্টভাষী মোলায়েম প্রকৃতির। মানুষটি ছিলেন মজলিসী মেজাজের। কত গল্পের পুঁজিই যে ওঁর ছিল! একবার আমরা অনেকে ক্যালকাটা রোড বলে রাস্তাটি দিয়ে চলেছিলাম। এই রাস্তাটা ধরে সোজা গেলে দার্জিলিং-এর আগের স্টেশন ঘুম। ঘুম দার্জিলিং-এর চাইতে আরো উঁচুতে। সর্বদাই কুয়াশার মত মেঘে ঢাকা···চলতে-চলতে হঠাৎ কানে ভেসে এল মৃদু স্বরে গান। চেয়ে দেখি সামনে পাহাড়ের দিকে উদাস নয়নে তাকিয়ে অতুলদা গুনগুন করে গান গাইছেন 'কে হে তুমি সুন্দর, অতি সুন্দর।' মন যেন তাঁর কোথায় ভেসে গেছে। স্তব্ধ হয়ে শুনতে লাগলুম, আমার মনও ডানা মেলল। কিছুক্ষণ পর আমার দিকে একবার তাকিয়ে বলেছিলেন—গা না ঝুনু, গা না রে একটা গান। খানিক দূরে গিয়ে পাকা রাস্তা ছেড়ে দিয়ে পাকডাণ্ডী দিয়ে একটু ওপরে উঠে সুন্দর জায়গা দেখে বসলাম।···সকলের মধ্যে একটা স্তব্ধ ভাব যেন জমাট বেঁধে আছে, সেই সময় অতুলদা ধীরে ধীরে গান ধরলেন, 'পাগলা মনটারে তুই বাঁধ।' প্রাণ ঢেলে তিনি গাইলেন। অদ্ভুত একটা পরিবেশ সৃষ্টি হল। আমি গাইলাম তাঁর কাছে শেখা তাঁরই গান 'কী আর চাহিব বল, হে মোর প্রিয়।' চারিদিকে গগনচুম্বী সব ছন্দের দৃশ্য, তার ওপর অতুলদার গাওয়া ওই গান মনকে বেঁধে দিয়েছিল এমন সুন্দর সুরে যে, গান গাইতে গিয়ে দেখি গান আমার আসছে যেন অন্য কোন জগৎ থেকে। সে অভিজ্ঞতা কোনদিন ভুলবার নয়।

হঠাৎ একদিন শুনলাম রবীন্দ্রনাথ দার্জিলিং এসেছেন, আছেন 'আর্সনটুলি' নামক বাড়িতে। গগনেন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথের অতিথি হয়ে। সঙ্গে এসেছেন রথীবাবু ও প্রতিমাদি। তাঁরা উঠেছেন হোটেলে।

সেই আসরে গগনেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, অতুলদা, অবনীন্দ্রনাথের জামাতা মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।...একবার স্থির হল 'ঘুম রক' বলে যে পাহাড়ের চূড়া আছে সেখানে বনভোজন খাওয়া হবে। স্যর নীলরতনের মেয়েরাও যাবে আমাদের সঙ্গে। দলে ছিলেন প্রতিমাদি, রথীবাবু, অতুলদা, ডাক্তার দ্বিজেন মৈত্র ও আমি। ট্রেনে ঘুম পর্যন্ত গিয়ে তারপর হাঁটাপথ। গাড়ি থেকে নেমে আমরা হাঁটতে আরম্ভ করলাম। প্রতিমাদির জন্যে ডাণ্ডীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সুন্দর চওড়া রাস্তা, মনোরম সব দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা অগ্রসর হতে লাগলাম। বেশ খানিকটা দূর গিয়ে সেই পাহাড়ের চূড়ার পথে উঠতে আরম্ভ করা গেল।...সকলেই দেখি জোঁকের ভয়ে অস্থির ও তটস্থ। কার জুতোয় কখন জোঁক ঢোকে। এ রাস্তাতে নাকি অসম্ভব জোঁক। যথাস্থানে যখন উপস্থিত হলাম দেখা গেল দ্বিজেনবাবু হঠাৎ লাফাচ্ছেন। কী ব্যাপার! ভাইদা হেসে বললেন—ওহে লাফিয়ে আর কী হবে, ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও। রক্ত খেয়ে আপনিই পড়ে যাবে। তখন বোঝা গেল ব্যাপারটা। সকলেই হেসে উঠলেও প্রত্যেকেরই যথেষ্ট ভয় ও অস্বস্তি প্রকাশ পাচ্ছিল। জিনিসপত্র রেখে আমরা চারিদিক ঘুরে অবর্ণনীয় শোভা উপভোগ করছিলাম।...তারপর চলল গান গাইবার জন্যে অনুরোধ উপরোধ...অতুলদা গাইলেন—'মিছে তুই ভাবিস মন'। আকাশীদি (নীলরতন সরকারের মেজ মেয়ে) গাইলেন, আমিও গাইলাম, রথীবাবু গাইলেন রবীন্দ্রনাথের 'তোমার কাছে শান্তি চাব না' গানটি...দার্জিলিং-এ সেবার অতুলদা রবীন্দ্রনাথকে একসঙ্গে পেয়েছিলাম।

এখানে এই সঙ্গীত-সম্মেলনে এসে ঝুনু খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত ভুলে গেছে, কী তন্ময়তা ওর। ঝুনু (সাহানা), তোমাকে কিন্তু লখনউ থেকে সহজে যেতে দেওয়া হবে না, বিশেষত তুমি ও মণ্টু (দিলীপকুমার) যখন লখনউতে এসে গেছ। সাহানাকে নিয়ে সঙ্গীত-সম্মেলনে উপস্থিত থাকেন অতুলপ্রসাদ। চলল বেশ কয়েকদিন সঙ্গীত-সম্মেলন.. সারাক্ষণ, সারা দিন রাত সে যে কী পুলক!...সঙ্গীত সমঝদারদের সঙ্গে বসে সঙ্গীত শোনায় এক গভীর আনন্দ আছে। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে বসেন মণ্ডপের মাঝে সঙ্গীত-সভা আলো করে। বড় বড় ওস্তাদেরা ওস্তাদী গান গেয়ে সুরের কারুকার্য দেখিয়ে রাজা মহারাজাদের কাছ থেকে গিনির টাকার তোড়া, সোনা-রুপোর মেডেল, শাল-দোশালা পেলেন। রাধিকামোহন বাঙলার মুখ রাখলেন। আলাউদ্দিন ব্যাণ্ডপার্টি সমেত পুরস্কার পেলেন। আলাউদ্দিন শেষে বীরু মিশ্রের তবলার সঙ্গে বেহালা

বাজিয়ে সকলকে মুগ্ধ করলেন। আলাউদ্দিনের বেহালা বাজনা এবং বীরু মিশ্রের তবলার প্রশংসা লখনউবাসীদের মুখে মুখে ফিরতে লাগল। সেই আসরে মথুরার বিখ্যাত চন্দন চৌবে অপূর্ব মীড়ের কাজে গাইলেন। গুরু ভাতখণ্ডের নির্দেশে প্রিয় যুবক শিষ্য রতনঝনকার সঙ্গে সঙ্গে স্বরলিপি করে চললেন। চন্দন চৌবের গান শেষ হল, রতনঝনকারের নোট নেওয়া শেষ হল। ভাতখণ্ডে তাঁর প্রিয় শিষ্যকে বললেন, এবার তুমি শুরু কর। রতনঝনকার চন্দন চৌবের গানখানি গাইলেন। গান শেষ হলে রতনঝনকারকে চন্দন চৌবে আনন্দে জড়িয়ে ধরে বললেন, তুমি এ-গান এত তাড়াতাড়ি কী করে তুললে বাবুসাহেব! আমি যে এ-গান আমার গুরুর কাছ থেকে দু-মাসেও ভাল করে তুলতে পারিনি! তুমি যে আশ্চর্য খেল দেখালে! রতনঝনকার বললেন, এ আমার গুরু ভাতখণ্ডের কৃপায়।

সুদূর বোম্বাই থেকে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে এসেছিলেন এই লখনউ শহরে সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপনের জন্যে। স্থাপন করলেন। তাঁর দুই প্রিয় শিষ্য রতনঝনকার এবং আরও দুজন মুসলমান ওস্তাদকে সহকারী হিসেবে গ্রহণ করলেন। কিছুদিন পরে রাজা রাজেশ্বরবলীর চেষ্টায় এবং আরো অনেকের সাধু ইচ্ছায় 'মরিস কলেজ অব্ হিন্দুস্থানী মিউজিকের' প্রতিষ্ঠা হল। রতনঝনকার হলেন তার পরবর্তী অধ্যক্ষ। সেদিন কিন্তু দিলীপকুমার রায় তাঁর সুমিষ্ট সুমধুর কণ্ঠে যখন মিউজিক কনফারেন্সে গান শোনালেন, তখন বাংলার প্রবাসী বঙ্গবধূরা বললেন—এতক্ষণে যেন কান জুড়োলো। সঙ্গীত সম্মেলন শেষ হয়ে গেল। কিন্তু সঙ্গীত-সম্মেলন শেষ হলেই কি সঙ্গীত শেষ হয়! অতুলপ্রসাদ বললেন, আমাদের আরো কিছুদিন সঙ্গীতের আসর বসুক। ধূর্জটিপ্রসাদ সায় দিলেন এবং আরো অনেকে জোরের সঙ্গে অতুলপ্রসাদ ধূর্জটিপ্রসাদের প্রস্তাবে মত দিলেন। দিলীপকুমার ও সাহানা দেবীর গান শুরু হল প্রথমে গোকরণ মিশ্রর বাড়িতে, তারপর ঘুরে ঘুরে অতুলপ্রসাদের বাড়িতে, নয় তো ধূর্জটিপ্রসাদের বাড়িতে কিংবা রাধাকমল রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে। শিল্পী অসিত হালদার, বিনয় দাশগুপ্ত এঁদের কারো না কারো বাড়িতে প্রতিদিনই গানের আসর যত জমে, অতুলপ্রসাদের উৎসাহ তত বেড়ে যায়, সাহানা-দিলীপকুমারের ফিরে যাওয়ার দিন তত পিছিয়ে পড়ে। এক সময়ে অতুলদা ধূর্জটিদার মত সঙ্গীত-সমঝদারদের ছেড়ে সাহানাকে লখনউ ছেড়ে যেতে হল।

সঙ্গীত সম্মেলন হয়ে গেল। সঙ্গীত-শিল্পীরা একে একে বিদায় নিলেন। আবার রোজকার জীবন এল ফিরে,—সেই কোর্ট-কাছারি, মক্কেল মামলা, সওয়াল, মাঝে মাঝে চিঠিপত্র লেখা। উত্তরা সুরেশ চক্রবর্তী বেশ ভালই চালিয়ে যাচ্ছে। উত্তরার জন্যে সুরেশ মাঝে মাঝে তাগাদা দিয়ে চিঠিপত্র পাঠায়। লেখা আর কোথায় হয়ে ওঠে!

সময়ই পাওয়া যায় না। মাঝে কয়েকটা মাস স্বাস্থ্যটা একটু ভেঙে গেল। একটু সুস্থ হয়ে দাদা সত্যপ্রসাদকে ১৯শে মার্চ উনিশশো ছাব্বিশ তারিখে একটা চিঠি লিখলেন :

18 Outram Road
Lucknow
19. 3. 26

দাদা,

বহুদিন তোমাকে পত্র লিখি না, অপরাধ ক্ষমা করিও। আমার ইতিমধ্যে খুউব অসুখ গিয়াছে। এখন অপেক্ষাকৃত অনেক ভাল আছি, জ্বর হইয়াছিল, ম্যালেরিয়া কাশি ইত্যাদি। আরো উপসর্গ ছিল। এখন নাই। শরীর অপেক্ষা মনের অবস্থা আরো খারাপ। হেমকুসুমের শরীরের জন্যে অনেক সেবাশুশ্রূষা করা গেল, খরচও করা গেল কিন্তু হাড় যে ভাঙিয়াছিল তাহা সারিয়াছে বটে, শরীরও পূর্বাপেক্ষা ভাল কিন্তু মনের পরিবর্তন হইল না।

সেদিন রাগ করিয়া আবার বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, লখনউতেই অন্যত্র ছিল। শ্বশুর কে. জি. গুপ্তর সঙ্কটপূর্ণ ব্যারাম হওয়ায় কলিকাতায় সম্প্রতি গিয়াছে। আবার এখানেই ফিরিয়া আসিবে।...আবার পুরাতন ইতিহাস।...ছুটকি ও তাহার একটি মেয়ে ও ছেলে এখানেই আছে। তাহারা শারীরিক ভাল।
তাহার স্বামীর এখনও কাজ হয় নাই। কিরণ কলকাতায় তাহার নিজের বাড়ীতে, সেও ভালই আছে, হিরণ ও তাহার মেয়ে বাঙ্গালোরে। হেমকুসুমের জন্যে তাহাদের এখানে আনিবার জো নাই।
আমার বাড়ি সম্পূর্ণ তৈয়ার হইয়াছে। আর দু মাসের মধ্যেই নতুন বাড়িতে যাইব। প্রায় ৩৩ হাজার টাকা খরচ হইল, ঈশ্বরের ইচ্ছায় ধার করিতে হইবে না। শীতকালে পার তো একবার নিশ্চয়ই আসিও।
আশা করি তোমরা সকলে ভাল আছ। জেঠীমাঠাকুরানীকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম দিও, তোমরা আমার ভালবাসা নিও।

তোমার ভাই
অতুল

একুশ

চারবাগে এ. পি. সেন রোডে অতুলপ্রসাদের বাড়িখানি শেষ হল। ৩৩ হাজার টাকা খরচ করে সুরম্য অট্টালিকাখানি। তিনদিকে বাগিচা। লোহার ফটক থেকে লাল সুরকি-ঢালা রাস্তাখানি এগিয়ে এসেছে গাড়িবারান্দা পর্যন্ত। ফটকের পাশে শাদা পাথরে খোদাই করে লেখা 'হেমন্ত নিবাস'—এ-বাড়ির নাম। মায়ের স্মৃতি ঘিরে রইল এ-বাড়িখানি যতদিন এ বাড়ি থাকবে। ···মা আজ অনেক দূরে মনে দুঃখ এই।

১৯২৬ মে মাসের মাঝামাঝি কিম্বা শেষের দিকে অতুলপ্রসাদ তাঁর নতুন বাড়িতে 'জাঁকজমকে গৃহপ্রবেশ' করে উঠে এলেন। লখনউয়ের গণ্যমান্য লোকেরা নিমন্ত্রিত হলেন। আত্মীয়স্বজনেরা অনেকে এলেন। হেমকুসুম অনুপস্থিত। হেমকুসুমের বাবার খুব বাড়াবাড়ি অসুখের জন্য তখন তিনি কলকাতায়।

নতুন বাড়িতে এসে বোনেরা মাসিরা মাসতুত ভাই বোনরা ভাগ্নে ভাগ্নিরা মহা খুশি।

ভাইদাদা, শুনলাম এই বাড়ি নাকি তোমারই নক্সায় তৈরি? সুন্দর নক্সা করেছ।

সত্যি কী সুন্দর বাড়ি করেছ!

সত্যি, সত্যি সুন্দর।

ভাইদাদা এদিকে বুঝি টেনিস লন করবে? বড় চমৎকার হবে।

তোমার ফুলবাগানটা চমৎকার।

আমার একটা শখ ছিল নদীর ধারে হবে আমার বাড়ি।

ছেলেবেলার সেই পদ্মা-নদীটিকে কি অতুলপ্রসাদ ভুলতে পারেন!

একে একে আত্মীয়স্বজনেরা সকলে বিদায় নিলেন। সকলেরই আপন আপন সংসার। কে আর কতদিন কাজ ছেড়ে থাকতে পারেন। এত বড় বাড়ি তৈরি হল অথচ আপন মানুষ কই। দারওয়ান ভৃত্য বাবুর্চি বেয়ারা সরকার গোমস্তায় বাড়ি ভর্তি, কিন্তু মনের মানুষ কই! দিলীপ দেরাদুনে। দিলীপের জন্যে মাঝে মাঝে বড় মন কেমন করে। দিলীপ মনোযোগ দিয়ে কাজ শিখছে। ভাল করে কাজ শিখুক, ওকে নিয়ে বড় ভাবনা। হেমকুসুমের জন্যে ভাবনা। হেমকুসুম এখানে থাকলে আত্মীয়-স্বজনদের আনা যায় না—কেন যে তার রাগ এত সকলের ওপর!

আমার একা একা থাকতে ভাল লাগে না হেম, আমি বড় একাকী বোধ করি। তুমি যদি আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে আত্মীয়তা রাখতে ইচ্ছে না কর, আমাকে কেন বারণ কর। আমি সকলকে ত্যাগ করতে পারি না যে।

হেমকুসুমের এবারের চলে যাওয়াই শেষ যাওয়া, এরপর আর কোনদিন হেমকুসুম ও অতুলপ্রসাদ একসঙ্গে বাস করেন নি। হেমকুসুমের অভাব সবসময়েই জাগে কিন্তু নানান বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনদের আগমনের মধ্যে দিয়ে সে অভাব পূর্ণ হয়। কখনো কোন আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব তাঁর লখনউয়ের বাসভবনে পৌছলে তার জন্যে রাজসিক কাণ্ড শুরু হয়ে যায়। খাওয়া-দাওয়া থেকে তার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সকল রকম সুব্যবস্থা না করা পর্যন্ত তাঁর স্বস্তি নেই। 'বুকে সকল সময়ে অগ্নিগিরির বহ্নি জ্বলিতেছে, মুখে কিছু প্রকাশ পায় না। অতুলপ্রসাদের বাড়ি ছিল যেন আনন্দভবন। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন কেহ না কেহ সকল সময়েই তাঁর বাড়িতে থাকিতেন। তাঁহাদিগকে আনন্দে রাখিবার জন্য তাঁহার আন্তরিক চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। পত্নী গৃহত্যাগিনী, ভগ্নীরা পতিহারা তদুপরি পুত্রশোকাতুরা, অপরজন কন্যাপাগলিনী প্রায়। স্নেহময়ী জননী এত সাধের ভবন প্রস্তুত হইবার পূর্বেই চলিয়া গেলেন। এইসকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তাঁহার স্বাভাবিক মাধুর্য হারায় নাই। সর্বদা হাসিমুখে ধীর স্থিরভাবেই সবই সহ্য করিয়াছেন আর গাহিয়াছেন, তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিও।*

দাদা সেদিন লিখলেন, তুমি কিছুদিন ছুটি নিয়ে আমার কাছে থেকে বেড়িয়ে যাও। আমরা দুই ভাই চল একবার দেশে আমাদের গ্রাম থেকে ঘুরে আসি। কতদিন দেশে যাওয়া হয়নি। তুমিও তো দেশে যাওনি অনেক দিন। মনে পড়ে তোমার আমাদের গাঁয়ের সেই নদী, কাজলদিঘি, হোগলাবন, পীরের সিন্নি, গাজির গান আর ওই করিমভাইয়ের ভিটে? মনে পড়ে না—

"দেশের মাঠে খেতে-ভরা সব ধান,
পুকুর-পাড়ে বকুল গাছের গান,
তরুণ চাষীর করুণ বাঁশির তান
আকাশ-ভরা মেঘ ও পাখির দল।"

দাদা লিখলেন, দেশকে তুমি কেমন করে ভুলে আছ! এস একবার ছুটি নিয়ে এস। আমার কাছে চলে এস ভাই। তোমার জন্যে আমার বড় মন কেমন করে সব সময়ে, তোমায় কতদিন দেখিনি!

প্রবাসী মন দেশের জন্যে কেঁদে সারা। কিন্তু অবসর কোথায়!

অতুল লিখলেন দাদাকে, তুমি আমার কাছে ডিসেম্বরে এসো···তুমি এলে আমি খুউব খুশি হব। কতদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি···কতদিন যে······

---

* জাঠতুত দাদা ডাঃ সত্যপ্রসাদ সেনের ডায়েরি থেকে।

A. P. Sen Road
Charbagh
Lucknow.

দাদা,

ডিসেম্বর মাসে ছুটি নিয়া এখানে আসিবে শুনিয়া খুউব সুখী হইলাম।

আমি X'মাসের ছুটিতে দিন সাতের জন্যে দিল্লী যাইব। নতুবা ডিসেম্বর জানুয়ারি এখানেই থাকিব। তুমি কিন্তু নিশ্চয়ই আসিবে। আর আমার নতুন বাড়ি হইয়াছে না আসিলে চলিবে না। তোমরা সকলে আমার ভালবাসা লও। আশা করি তোমরা ভাল। আমি একরকম ভাল আছি। শেষাদ্রির—ছুটকির স্বামীর এখনও কাজ হয় নাই। হিরণ ছুটকিরা ব্যাঙ্গালোরে। কিরণ কলকাতায়।

ইতি তোমার ভাই
অতুল

দাদার ডিসেম্বরে লখনউ আসা হল না। সুবালামাসি এলেন মেয়ে উষাকে নিয়ে। উষার শরীর খারাপ হয়েছিল, জলহাওয়ার পরিবর্তনে শরীর সারবে এই আশায় সুবালা এলেন লখনউয়ে।···ডিসেম্বরের মাঝামাঝি অথবা শেষ সপ্তাহে দিলীপকুমার রায়ের আমন্ত্রণে শিমুলতলায় কয়েকটা দিন ছুটি কাটাতে এলেন অতুলপ্রসাদ। ৩১শে ডিসেম্বর ১৯২৬ অতুলপ্রসাদ এবং দিলীপকুমার রায় শিমুলতলা থেকে সটান বোলপুর উপস্থিত হলেন।

সকালবেলা কবির ওখানে পৌছতেই অতুলপ্রসাদ খুউব খুশি হয়ে কবিকে বললেন, 'আপনার শরীরটা খুব ফিরেছে দেখছি।'

কবি সহাস্যে বললেন, চুপ চুপ, ও কথা বোলো না। কালকেই এক ভদ্রলোকের আবির্ভাব হয়েছে, তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুবার্ষিকী সভায় আমাকে সভাপতি করতে কোমর বেঁধে মরিয়া হয়ে এসেছিলেন। তাঁকে বহু কষ্টে বিশ্বাস করিয়েছি যে আমি মরণাপন্ন। আচমকা আমি ভাল আছি জানলে তিনি দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে উঠবেন, যাবেন আমাকে টেনে নিয়ে। তখন তাঁর স্ত্রীর জন্যে প্রকাশ্য সভায় চোখের জল না ফেলে আমার আর উপায় থাকবে না।

অতুলপ্রসাদ হেসে বললেন, তাঁকে বিশ্বাস করালেন কী করে?

কবি কৌতুক করে হেসে বললেন. জানা চাই হে, জানা চাই। আঁটঘাট বেঁধেছি কি কম! পাছে ফস্কে যায় এই ভয়ে ওঁকে ঘটা করে বুঝিয়েছি যে এরূপ ক্ষেত্রে যিনি পতি তাঁরই সভাপতি হওয়া উচিত।'

এরপর বসল গানের আসর। কবি শ্রীমতী রমা মজুমদারের সঙ্গে গাইলেন :

তোমার বীণা আমার মন মাঝে।

অতুলপ্রসাদ গাইলেন তাঁর নিজের লেখা গান :

আমারে এ আঁধারে
এমন করে চালায় কে গো ?
আমি দেখতে নারি, ধরতে নারি,
বুঝতে নারি কিছুই যে গো !

* * *

পরের দিন ২রা জানুয়ারি, ১৯২৭। কথায় কথায় সেদিন এল মৃত্যুর প্রসঙ্গ। কবি বললেন, ইচ্ছা অপূর্ণ রেখে মরলে ফের জন্মাতে হয়...মৃত্যুর পরে আমাদের চৈতন্য লোপ পায় না। তারপর চিন্তিতভাবে বললেন, তবে আমাদের সে চৈতন্য এ চৈতন্যের জের টেনে চলে না।'

অতুলপ্রসাদ বললেন, পরিষ্কার কবে বলুন কথাটা।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, কি রকম জান, আমাদের জীবনে কি অনেক সময়েই অদলবদল হয়ে যায় না কোনো অভাবনীয় কিছু একটা ঘটলে। একটা নডচড় ভাঙচুর হলে যেমন সমস্ত দৃশ্যটা থাকে অথচ আগাগোডা বদলে যায় অনেকটা তেমনি। অর্থাৎ হয়ত আমাদের মনোভাব, প্রাণের সাডা দেওয়ার ভঙ্গি, হৃদয়ের ক্ষুধা-তৃষ্ণা আশা আকাঙ্ক্ষা সবকিছুর মধ্যেই একটা বড় রকমের রূপান্তর ঘটে। এ যদি জীবনের ভূমিকম্পেই ঘটে তাহলে মৃত্যুর ভূমিকম্পে আরো ঘটবে। এই তো মনে হয় বেশি করে...যেমন ধরো এটা শুধু একটা দৃষ্টান্ত মনে রেখো—ধরো এমনও হতে পারে যে মৃত্যুর পরে আমাদের পক্ষে প্রিয়জনের দূরে থাকা ও কাছে আসার মধ্যে আর কোন তফাত থাকবে না। তাই মৃত্যুর পরে চৈতন্য রইল বলতে আমি বুঝি না যে সেটা হল এই চৈতন্যেরই সম্প্রসারণ। আমার মনে হয় যে খুব সম্ভব সে চৈতন্যের মধ্যে একটা মূল ছন্দ যায় বদলে।

আরো বলেছেন, প্রতি মানুষকেই বিধাতা আলাদা আলাদা রূপে গড়েছেন আলাদা আলাদা অভিজ্ঞতার ছাঁচে ঢালাই করে। কিন্তু কয়েকটা আধার বেশি উৎরে গেল। এদের চরিত্রে একটু অভিনিবেশ দিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে তাদের অভিজ্ঞতার গঠন প্রকৃতি, গুণসমাবেশ ঘটনার যোগাযোগ সবেরই পিছনে যেন রয়েছে একজন অদৃশ্য কারিগরের, কি বলব, *design*—মতলব। তবে আমি এ ধরনের কথা বলতে অহঙ্কার করতে চাইনি বিশ্বাস কর। বরং উল্টো। কেননা আমি একথা বলেছি আমার আমিত্বকে ফাঁপিয়ে তুলতে নয়—এই সব যোগাযোগকেই বড় করে ধরতে।

অতুলপ্রসাদ বললেন, আপনি এত সঙ্কুচিত হচ্ছেন কেন এসব কথা বলতে ? আপনি

আরো পাঁচজনের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে চললেও তারা যে কাঁধে আপনার সমান নয় একথা কি চোখে ধরা না পড়ে পারে ?*

* *

দাদার ডিসেম্বরে লখনউ আসা হল না।

১৯২৭ ১০ই জানুয়ারি দাদা সত্যপ্রসাদ সেন সোদপুর থেকে লখনউ যাত্রা করলেন, তার কয়েকদিন আগেই অতুলপ্রসাদ বোলপুর থেকে কলকাতা হয়ে লখনউ ফিরে এসেছেন। সত্যপ্রসাদ কাটিহারে এসে রাত কাটালেন। ডায়েরিতে লিখলেন, "১১ জানুয়ারি সমস্ত দিন গাড়িতে চললাম। সোনপুর পোল ও স্টেশন খুব বড়। বি, এন, ডাবলু, আর-এর স্টেশানগুলি বেশ সুন্দর ও খাবার বেশ পাওয়া যায়। ছাপরায় নেমে কাশী যাওয়া যায়।"

"১২ই জানুয়ারি। Arrived Lucknow. found Subala & her daughter Usa Atul's plιce. স্টেশনে কোন লোক ছিল না। বড় ভাবনা হল অতুলের শরীরের জন্যে। পরে দেখি অতুল আমার চিঠি পায়নি। এই চিঠি চার পাঁচদিন পরে এসেছিল। মিঃ চিন্তামণি, ইউ. পি র মিনিস্টার, তাঁকে দেখলাম অতুলের অতিথি। আজ বিদায় গ্রহণ করলেন। অতুল বড় সুন্দর বাড়ি করেছে, নাম দিয়েছে 'হেমন্ত-নিবাস' অর্থাৎ খুড়িমার নামে। লখনউতে জ্ঞান রায়কে দেখলাম। তাঁকে দেখে পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ল। ঢাকাতে আমাদের মধ্যে আমার অতুলের ও জ্ঞানের খুব বন্ধুত্ব ছিল। জ্ঞানবাবুর (নন্টুবাবু) বাবা গোপীবাবুই খুড়োমহাশয়ের মৃত্যুর পর অতুলের টাকা কোথায় কি আছে বন্দোবস্ত করেন।

১৪ই জানুয়ারি। দিলীপ এল কলকাতা থেকে। হেমকুসুম ছয় সাত মাস হল কলকাতায় স্যার কে. জি. গুপ্তর বাড়িতে। স্যর কে. জি. গুপ্ত পরলোকগমন করেছেন। বাবা মারা যাওয়ায় হেমকুসুম খুউব কাতর। স্যার কে. জি. গুপ্ত হেমকুসুমকে পনেরো হাজার টাকা দান করে গেছেন।

সত্যপ্রসাদ দিলীপকে বললেন, তুমি তো ফার্মিং-এ ট্রেনিং নিলে এবার কী করবে বল ? দিলীপ জানায়, এবার একটা পোলট্রি করব ভাবছি জ্যাঠামশাই। ভাবছি কোথায় করা যায়।

তা এক কাজ কর না। তুমি বরং আমার সঙ্গে পূর্ব-বাঙলায় চল। ওসব অঞ্চলে পোলট্রি করতে পারলে তোমার প্রচুর লাভ হবে।

দিলীপ সরাসরি অস্বীকার করল, না জ্যাঠামশাই অতদূর আমি যাব না।

অতুলপ্রসাদ বললেন, তোমার জ্যাঠামশাই যা বললেন দিলীপ মন দিয়ে শোন। উনি

* দিলীপকুমার রায়ের 'তীর্থঙ্কর' থেকে।

যখন বলছেন ওখানে তোমার স্থবিধে হবে তখন নিশ্চয়ই স্থবিধে হবে বলেই বলছেন। আমারও বিশ্বাস ওখানে পোলট্রি করতে পারলে তোমার লাভ হবে। তোমার বাবা এবং জ্যাঠামশাই নিশ্চয়ই তোমার ভাল চাইবেন একথা মনে রাখছ না কেন। তোমার ভালোর জন্তেই তোমার জ্যাঠামশাই বলেছেন। ওঁর কি লাভ!

১৫ই জানুয়ারি। অতুলপ্রসাদের বাড়িতে চমৎকার এক সঙ্গীতের আসর হল।

...অতুলপ্রসাদ বললেন, দাদা তুমি যখন লখনউ এসেছ তখন এখানকার যন্ত্র-সঙ্গীত তোমাকে শোনানো যাক। তোমাকে শুনিয়ে আমার লাভ, আমিও কিছুক্ষণ তোমার সঙ্গে সঙ্গীতে ডুব দেব। শুনেছ এখানকার বিখ্যাত তবলা হারমোনিয়মের সঙ্গে সরোদ বাজনা?

বেশ শোনাও ভাই।

সেদিন সেখানকার বিখ্যাত তবলা হারমোনিয়াম ও সরোদ বাজনা শোনা হল।

২০ জানুয়ারি। দাদা লখনউ থেকে বিদায় নিলেন। যাবার আগে বলে গেলেন, তোমাকে একটা কথা বলব ভাবছি অতুল। সেদিন আমাদের দেশের গ্রামখানি থেকে কয়েকজন শিক্ষিত ভদ্রসন্তান আমার কাছে এসেছিলেন, তাঁদের ইচ্ছা গ্রামে আমাদের দেশে যাতে একখানা বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। আমার কাছে এসেছিলেন কিছু অর্থ সাহায্যের কামনা নিয়ে। আমি তোমার নামও বললাম। আমরা সকলে সাহায্য করলে বিদ্যালয় স্থাপন করা যায়।

অতুলপ্রসাদ বললেন, সাধু উদ্দেশ্য তাঁদের। আমি নিশ্চয়ই তাঁদের টাকা দেব। তোমাকেই আমি টাকা পাঠিয়ে দেব তুমি ওদের হাতে টাকা দিয়ে দিও।

বেশ তাই পাঠিও।

আচ্ছা শোন অতুল, আর একটা কথা বলি। আমরা যখন ওদের এত টাকা দিচ্ছি ওদের একটা কথা বললে কেমন হয়? ওদের বিদ্যালয়ের নামকরণ যেন বাবা ও কাকার নামেই করে।

অতুলপ্রসাদ হেসে বললেন, নিশ্চয়, বলবে বইকি।

সত্যপ্রসাদ অফিসের কাজে লাহোর যাত্রা করলেন। যাওয়ার সময়ে সত্যপ্রসাদকে অতুলপ্রসাদ বললেন, তোমার নামেই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্তে টাকা পাঠিয়ে দেব দাদা। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথায় আমার খুউব আনন্দ হচ্ছে। তোমার মনে পড়ে দাদা, মগর গ্রামে বাবা ছোট্ট একটা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন একসময়ে।

হ্যাঁ ভাই, মনে পড়ে বইকি। আমি তো সে গ্রামের বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছিলাম। গ্রামের কথা মনে পড়লেই কাকার সেই বিদ্যালয়ের কথা মনে পড়ে।

সত্যপ্রসাদ বিদায় নিলেন।

কিছুদিন পরে অতুলপ্রসাদ দাদা সত্যপ্রসাদকে চিঠি লিখলেন :

Hemanta Nibas
Charbagh, Lucknow

দাদা,

আজ তোমার নামে স্কুলের জন্যে ১০০২ টাকার একখানি চেক পাঠাইতেছি। স্কুলের নামের যে প্রস্তাব করিয়াছ "ভস্ত, তামটা, নিগুন, কাঞ্চনপাড়া গুরুপ্রসাদ রামপ্রসাদ ইনষ্টিটিউশন, মগর" তাহা আমি একেবারেই পছন্দ করি না। এত বড় নাম কখনই হয় না। নামটা একেবারেই শ্রুতিমধুর নয়। বরং হাস্যকর। আমি এ নামে রাজি নই।

শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে নামটি দিতে চাহেন সেটি বেশ। পঞ্চপল্লী গুরুরাম হাই স্কুল। আশা করি এ নামটি সকলের মনঃপূত হইবে। টাকা পাঠাইতে দেরি হইল। ছেলেরা যে চিঠি আমাকে দিয়াছিল সেটি এখনও পাইতেছি না।

কাহাকে লিখিতে হইবে জানাইও। উত্তর দিব।

আশা করি তোমরা ভালো আছ। আমি একরকম আছি। ব্লাড প্রেশারটা এখনো বেশ আছে বলিয়া মনে হয়।

তোমরা আমার ভালোবাসা নাও।

তোমার অতুল

দেশে-গ্রামে স্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। অতুলপ্রসাদ আরও কয়েক কিস্তিতে টাকা দান করলেন। টাকা না হলে স্কুল চলে! ইতিমধ্যে অতুলপ্রসাদের রক্ত-চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। কখনো কম হয় কখনো বেড়ে যায়। অতুলের শরীর ভাল নেই, ওর জন্যে দাদা চিন্তিত। সত্যদাদা পর-পর অনেকগুলি চিঠি লিখলেন। জবাব নেই।

শেষে অতুলপ্রসাদ লিখলেন :

Hemanta Nivas
Charbagh
Lucknow
3. 11. 27.

পরম সুহৃদ দাদা আমার,

বাস্তবিক আমার বড় অন্যায় হয়েছে এতদিন চিঠি লিখি নাই। তাই বলে মনে করো না আমাদের হৃদয়ের বন্ধন এতটুকু শিথিল হয়েছে।

আজ তোমাকে ৫০০ টাকার একখানা চেক পাঠাচ্ছি। দেশের জন্যে যে ভাবেতে খরচ করা উচিত মনে হয় করিও। আর কত আমাকে দিতে হবে তাও জানিও।

জেঠীমাকে আমার ভক্তিপূর্ণ ভালোবাসা জানিও। তোমরা সকলে আমার ভালোবাসা নিও। হিরণ সীতা এখন আমার কাছে আছে। সুবালামাসীর অবস্থা মুমূর্ষু। আজ টেলিগ্রাম এসেছে condition serious. তিনি এখন কলকাতায় আছেন। আমার শরীর পূর্বাপেক্ষা ভালো আছে। শেষাদ্রির এখনও কাজ হয় নাই, তবে আশা করছে শীঘ্রই দু-এক মাসের মধ্যে হবে। হলেই রক্ষা। ওদের ওপর দিয়ে বড় পরীক্ষা যাচ্ছে। কিরণ কয়েকদিনের জন্যে ছুটকির কাছে গিয়াছে, তারা শারীরিক ভালো আছে।

আজ আসি

তোমার ছোট ভাই অতুল

অতুল দাদাকে এর পরের চিঠি লিখলেন লখনউ থেকে ২৩। ৩। ২৮ তারিখে। নানা কাজে অতুলপ্রসাদ ব্যস্ত, সময় তাঁর কম, কিন্তু দু-কলম লিখে কি দাদাকে সুখী করতে পারেন না! অতুল, তুমি আসলে আমাকে ত্যাগ করতে চাও। জান না অতুল তোমার জন্যে, তোমার শরীরের জন্যে দিনরাত আমি কত ভাবনা করি। তুমি আমার কথা ভুলে গেছ!

তাই কি হয়? অতুলপ্রসাদ লিখলেন:

দাদা, প্রিয় বন্ধু আমার,

তোমার স্নেহপূর্ণ চিঠিখানি পেয়েছি। আমি কি এত বড় পাষাণ-হৃদয় যে তোমাদের ত্যাগ করব। আমি চিঠি লেখা সম্বন্ধে খুউবই অপটু এবং সেইজন্যে আমাকে অনেকে ভুল বোঝে কিন্তু আমার অন্তর তো তুমি জান। ক্ষমা করো।

দাদা, দিলীপের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। সে বলে ঢাকা বড় দূরে। অত দূরে যেতে চায় না। এদিকে সুবিধে হতে পারে কি না পোলট্রি ফারম এবং ভেজিটেবল গার্ডেন খোলবার তা একবার দেখতে চায়। এ নিয়ে তার প্রতি আমি খুব ক্ষুণ্ণ হয়েছি। সে হয়ত তোমার কাছে শীঘ্রই যাবে। তুমি তাকে বুঝিয়ে আবার বলো। তাকে নিয়ে আমি বড় মুস্কিলে পড়েছি। আমি বলেছি হয় আমি আর তুমি যা পরামর্শ দেব তা করবে নতুবা নিজের চেষ্টা দেখবে, আমি কিছু করব না। আর এও বলেছি যে লখনউর কাছে কোন ফারম খুলব না ইহা নিশ্চয়ই। এ কাছে থাকলে আমার ভগ্নস্বাস্থ্য একেবারেই যাবে। এ ক-দিনে বেশ সেরে এসেছি সবাই বলছে যে আমাকে খুউব ভালো দেখায়, অনেকদিন এমন সুস্থ চেহারা দেখেনি; আবার দিলীপের সাথে সাক্ষাৎ করলে যেটুকু লাভ হয়েছে সবটুকু যাবে। আমার ব্লাডপ্রেশার ২১৮ হয়েছিল তা ত জান। কলিকাতায় শেষে ১৭০ হয়েছে। হেল্‌থ্‌টাও কিছু ইমপ্রুভ করেছে ডাক্তারেরা বললেন।

আমি গরমের ছুটিতে একবার চাঁদপুর যাব জ্যেঠীমার সঙ্গে দেখা করব। পরে জানাবো ঠিক কবে যাব। আশা করি তোমরা ভালো আছ।

রাঁচীতে জায়গা পাওয়া যায় ১০০ টাকা বিঘা সেলামিতে। প্রায় ৩০ বিঘা পেতে পারি। সেখানে গেলে ফল খুউব ভালো হয় এবং তাতে নাকি লাভও আছে। আর সেখানে পোলট্রিও চলতে পারে। সেখানে স্কুল কলেজও আছে।

রাঁচি সম্বন্ধে তোমার কী মত জানিও।

তোমরা আমার ভালবাসা নিও

তোমার ভাই অতুল

অতুলপ্রসাদের কিছু জায়গা জমি কেনার ইচ্ছে ছিল রাঁচিতে। এবং হয়ত ইচ্ছে ছিল রাঁচিতে ছোট একখানি বাংলোবাড়ি তৈরি করার। রাঁচির আবহাওয়া ভাল, হেমকুসুমও সেখানে থাকতে পারে। ওর শরীরটা সেখানে ভাল থাকবে। দিলীপও একটা পোলট্রি করতে পারে। দিলীপের জন্যে সারাক্ষণ একটা ভাবনা। ওর বয়স তো হল, এখন একটা কিছু করা দরকার। কিন্তু কোন কিছুতেই ওর যেন মন বসে না। আজ এ কাজটা করবে ভাবে, কাল ও কাজটা। ও কোন কথা শুনতে রাজি নয়, কোন কথা মানতে রাজি নয়। মনটা মাঝে-মাঝে অতুলপ্রসাদের বড় বিষাদে ভরে যায়—একটিমাত্র ছেলে।······শেষ জীবনটা নানা ভাবনায় ভাবনায় গেল। একদিকে হেমকুসুমের ভাবনা, অন্যদিকে দিলীপের ভাবনা। দিলীপের একটা কিছু করে দিতে পারলে স্বস্তি। তারপর বিশ্রাম, সম্পূর্ণ বিশ্রাম। ঈশ্বরের কী ইচ্ছা কে জানে।

বাইশ

১৯২৮ থেকে ১৯৩০ দুটি বছর পার হয়েছে। অতুলপ্রসাদের কর্মময় জীবনের যাত্রা তেমনি ধারায় এগিয়ে চলেছে। চলেছে ব্যারিস্টারি, তেমনি মক্কেলদের ভিড়, কোর্ট-কাছারি, গান বাজনা, সুরসংযোজনা, সাহিত্যিক-শিল্পী গুণীজনদের আসা যাওয়া। ডাক পড়ে নানা সভাসমিতি থেকে উত্তরপ্রদেশের মডারেট নেতা মিঃ এ. পি. সেনের। ডাক পড়ে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে বঙ্গ সাহিত্য শাখার সভাপতিরূপে প্রায় প্রতি বছর। ডাকে লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কর্মকর্তারা। তাঁকে না হলে চলে না আউধ সেবা-সমিতির, রামকৃষ্ণাশ্রম, বালিকা বিদ্যালয়, অ্যাংলো-সংস্কৃত কলেজের। আছেন দিলীপকুমার রায়, দ্বিজেন সান্যাল, সাহানা দেবী, রেণুকা দাশগুপ্তা, চিত্রলেখা সিদ্ধান্ত, পাহাড়ি সান্যাল, টুলু সেন, সতী ঘোষ, বীণা চক্রবর্তী,

কনক দাস, বিনয় ঘোষ, হরিদাস গোস্বামী, কুমুদেশ (বদন) সেন, সুনীল সরকার, পুর্ণেন্দু চক্রবর্তী, হরিপদ রায়, আরো অসংখ্য অতুলপ্রসাদের গানের গায়কগোষ্ঠী। বিনয় ঘোষ বলেছেন, তখন বাংলা দেশ ভেসে যাচ্ছে সুরের প্লাবনে অপরূপ সুকণ্ঠ দিলীপকুমার রায়ের গানের বন্যায়। "গান তো শুনে আসছিলাম, গেয়েও আসছিলাম—বিশ বছর ধরে। কিন্তু গানের জান, প্রাণ, কলিজা যে কোথায় থাকে তার খবর প্রথম দিলেন দিলীপকুমার। ভক্ত হয়ে পড়ব এ আর বেশি কী! সাকরেদ বনে গেলাম হরিদাস গোস্বামী, কুমুদেশ সেন, রণজিৎ (টুলু) সেন, সুনীল সরকার, পুর্ণেন্দু চক্রবর্তী, হরিপদ রায়—আমাদের বন্ধুগোষ্ঠীভুক্ত কয়েকজন। অতুলপ্রসাদের কতকগুলি গান দিলীপবাবুর (আমাদের সবার মন্টুদা) মধুনিঃস্যন্দী কণ্ঠের জাদুতে তখন বাংলা দেশকে মুগ্ধ, মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল। ঐসব গান আমরাও শিখেছিলাম মন্টুদার কাছ থেকে এবং নানান আসরে গেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। পরে অতুলপ্রসাদের সঙ্গে পরিচয় ও তাঁর কাছে বসে তাঁর কাছেই গান শেখার সৌভাগ্য হয়েছে আমাদের অনেকের।

"অতুলপ্রসাদ সে সময়ে কলকাতায় কয়েকবার এসে নেমেছেন ভানু গুপ্ত মনু গুপ্তর পিতা হাকিম গুপ্ত সাহেবের বাড়িতে—প্রথমে স্টোর রোডে, পরে রাসবিহারী এভিনিউ হিন্দুস্থান রোড-এ। এক সন্ধ্যায় জোড়াসাঁকো, শিবঠাকুরের গলি ৩১ নম্বর বাড়িতে গিয়েছি, গুণী, শিল্পী, কদরদান মহলে বাড়িটি সুপরিচিত……দেখি, বীরবল; আর তাঁর পাশেই বসেছেন অতুলপ্রসাদ, মুখে স্মিত হাস্য। গাইলাম—'মেঘেরা দল বেঁধে যায় কোন্ দেশে।' অতুলপ্রসাদের গান গাইছি…যদি ভুলভাল হয়, যদি গাওয়া পছন্দ না হয়! অতুলপ্রসাদ বড় বড় চোখ মেলে, হাসি মুখে আস্তে আস্তে বললেন, 'বা! বেশ সুন্দর।' এরপরে তাঁকে দেখেছি সমবায় ম্যানশনে, পুরোনো হিন্দুস্থান বিল্‌ডিঙের 'আনন্দমেলা' (আনন্দবাজারের আনন্দমেলা নয়) প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক উৎসবে। অতুলপ্রসাদ প্রবাসী হয়েও ছিলেন আনন্দমেলার প্রেসিডেণ্ট। শ্রীযুক্ত হরিহর চন্দ্র মহাশয়ের অনুরোধে অতুলপ্রসাদ গানের পর গান গেয়ে শোনালেন। খাদের দিকে কণ্ঠস্বরে গুরুগাম্ভীর্যের সঙ্গে মাধুর্যের মিলন লক্ষ্য করবার মত। সে আসরে উপস্থিত ছিলেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, প্রিয়ম্বদা দেবী। অতুলপ্রসাদের গান শুনে আমার পিপাসা আরও বেড়ে গেল। বললেন, 'গান শিখতে চাও? বেশ তো এসো আমাদের বাড়ি। আমি আছি আমার ভাইয়ের বাড়ি স্টোর রোডে।'……অল্পদিনের স্বল্প পরিচয় আমার সঙ্গে। তবু লখনউ থেকে কলকাতায় এলে একখানা ছোট্ট চিঠিতে অতুলপ্রসাদ—'ভাই বিনয়, আমি এসেছি তুমি সুবিধামত অবশ্যই এসে দেখা করো। অতুলদা।'

গিয়ে হাজির হতেই স্মিত হাস্যমাখা মুখের অভ্যর্থনা। —এসেছ? বেশ বস, চা খাও আগে।'

'কে তুমি বসি নদীকূলে একেলা' গানটা শেখাতে শেখাতে মাঝখানে বললেন ঐ গানের ইতিহাসটা: 'একবার এক কমিশনে যাচ্ছি, গোমতী নদী দিয়ে নৌকা করে। মাঠের ভিতর দিয়ে এঁকে-বেঁকে চলেছে নদীটা। বেশ মিঠে হাওয়া বইছে। বসে বসে একটা বইয়ের পাতা উলটে যাচ্ছি। এমন সময়ে চোখে পড়ল, অল্প বয়সের একটা মেয়ে নদীর একেবারে ধারে বসে, কেমন আনমনা, কিছুই যেন দেখছে না। হাওয়ায় চুলগুলো উড়ছে এলোমেলো, আধময়লা ঘাঘরাটাও উড়ছে এদিকে সেদিকে। কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ নাই মেয়েটার। দেখে মনটা যেন কেমন উদাস হয়ে উঠল। উদাস করা একটা সুর মনে এসে গেল। তখন এই গানটা লিখে ফেললাম।' বললেন অতুলপ্রসাদ তাঁর সেই ঈষৎ হাসি আর একটুখানি লাজুক ভঙ্গি মেশানো ঢঙে। তারপর সবটা গান শোনালেন, শেখালেন।

স্মল কজেস কোর্টের জজসাহেব গুপ্তসাহেবের রাসবিহারী এভিনিউয়ের বাড়িতে সেবার উঠেছেন। সেখানে একদিনের আসরে এলেন শচীন দেব বর্মন, হিমাংশু দত্ত আর সে সময়ে একেবারে অজ্ঞাত অখ্যাতনামা কুন্দনলাল সাইগল। লখনউ থেকে রেলের চাকরি ছেড়ে ছুড়ে কলকাতায় এসেছেন ভাগ্যপরীক্ষা করতে। আছেন ওয়েলিংটন স্ট্রীটে। চমৎকার গান করেন, এই বলে তাঁর পরিচয় দেওয়া হল। সাইগল সবাইকে অবাক করে গাইলেন, 'কবে তুমি আসবে বলে, রইব না বসে।' রবীন্দ্রনাথের গান। কণ্ঠমাধুর্যে মুগ্ধ সবাই। অতুলপ্রসাদ খুউব তারিফ করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'পাহাড়ির সঙ্গে চেনাপরিচয় আছে নাকি?'

হ্যাঁ খুব দোস্তী আছে। বললেন সাইগল।

অনুরোধে সাইগল কয়েকটি গজল ও পাঞ্জাবী গীত গাইলেন।

কথায় কথায় একদিন 'উঠো গো ভারতলক্ষ্মী' গানটির কথা উঠল। বিনয় ঘোষ জিজ্ঞেস করলেন অতুলপ্রসাদকে, 'এ গানখানি কখন লিখেছিলেন?'

অতুলপ্রসাদ বললেন, 'ভেনিসে এক সন্ধ্যায় গণ্ডোলায় করে বেড়াচ্ছি। চারদিকে বাড়ির আলো, আকাশের তারা, জলের ঝিকিমিকি আর এধারে ওধারে গণ্ডোলার ছপ্‌ছপ্‌ শব্দ। চুপ করে দেখছি, শুনছি। হঠাৎ একটা গণ্ডোলা থেকে সুর ভেসে এল। বেহালা বাজাচ্ছে। চমৎকার লাগল সুরটা। গণ্ডোলা দূরে চলে গেলেও সুর কানে বাজতে লাগল। ফিরে এসে গানটা লিখে ফেললাম। দেশে ফিরেছি। গানখানা দু-চার জায়গায় গেয়েছি, অনেকে প্রশংসাও করেছেন। প্রথম কোথায় ছাপা হয়েছিল গানটা মনে নেই।... ..তখন ছিল প্রথম স্বদেশীর যুগ। প্রায়ই সভাসমিতি হয়।

একদিন ভবানীপুরের গঙ্গার ধারের একটা রাস্তা দিয়ে চলছি, হঠাৎ দূর থেকে কানে এল একদল ছেলের গানের সুর। ওরা একটু কাছে এলেই বুঝতে পারলাম ওরা আমার গানটাই গাইতে গাইতে যাচ্ছে। ভারি আনন্দ হল।*
বাংলা দেশের ঘরে ঘরে অতুলপ্রসাদের গান ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে পড়ছে—অতুলপ্রসাদের গান বড় প্রিয়, বড় অন্তরঙ্গ; হৃদয়ের কাছাকাছি। বাংলা দেশ তাঁকে ডাক দেয়, বাঙালী তাঁকে ডাকে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ অতুলের সঙ্গ কামনা করে অধীর হন। বলেন, তুমি আমার কাছে মোটেই আস না। এসে চলে যাও বড় তাড়াতাড়ি। বল কবে আসছ? কবে আসবে আবার?
হবে হবে দেখা হবে, বলেন অতুল ঘনিষ্ঠ উত্তপ্ত আলিঙ্গনে।
কবে দেখা কবে? বলেন রবীন্দ্রনাথ।

গোমতীর জলধারা বয়ে চলে। স্রোত সময়কে এগিয়ে নিয়ে চলে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের পট পরিবর্তন হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামে কত প্রাণ বিসর্জন হল। এলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে নতুন 'সত্যাগ্রহ' অস্ত্র হাতে নিয়ে। ধীরে ধীরে দেশের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন। ঘটে গেল জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড। পরিচালনা করলেন চম্পারন সত্যাগ্রহ, যোগদান দিলেন খিলাফত আন্দোলনে, প্রতিষ্ঠা করলেন সবরমতী আশ্রম, ইয়ং ইণ্ডিয়া, নবজীবন পত্রিকা··· দণ্ডিত হলেন ছয় বছর কারাদণ্ডে, হলেন বেলগাঁও কংগ্রেসের সভাপতি।···
১৯২৩ থেকে গান্ধীজীর আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হল পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাব গৃহীত হবার পর। গান্ধীজী গুজরাটের ডাণ্ডিতে লবণ আইন অমান্য করতে চললেন, সারা দেশে আইন অমান্যের জোয়ার। অতুলপ্রসাদকে এই সময়ে দেশ ছেড়ে যেতে হল দূর বিদেশে।
যাওয়ার আগে দাদাকে লিখলেন :

Calcutta
13. 5. 30.

দাদা, বন্ধু আমার,
···আজ বিলেত যাবার পথে বম্বে যাচ্ছি। বিলেতে পৌছে তোমাকে চিঠি লিখব। আমায় নিম্নলিখিত ঠিকানায় চিঠি লিখ :

A. P. Sen
C/o Messrs. Thomas Cook & Son
Berkely Street
Piccadilly
London

* বিনয় ঘোষের রচনানুসারে। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

আমি সেপ্টেম্বরের শেষে দেশে ফিরব। দেশেরও এখন যা অবস্থা! বিধাতার কী অভিপ্রায় জানি না।

আজ তাড়াতাড়ি

তোমার ভাই অতুল

এবার কোর্টের কাজে সুদূর ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে যাত্রা। প্রিভি কাউন্সিলে একটি মামলার তদারকিতে তাঁকে যাত্রা করতে হল। ঠিক এই সময়ে তাঁর দেশ ছেড়ে যেতে ইচ্ছা ছিল না। শরীরটা ঠিক আগের মত তত ভাল নেই। কিছুদিন থেকে বারে বারে নানা রোগের আক্রমণে তাঁকে কিছুটা দুর্বল করে তুলেছে। ১৯২২ থেকে মাঝে মাঝে রক্তচাপ বৃদ্ধি দেখা দিয়েছে, তখন কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। চিকিৎসকের কড়া নির্দেশ, এই সময়ে কাজকর্ম কিছু কম করুন, শুয়ে থাকুন।…কিন্তু কে শোনে কার কথা। শুয়ে বসে থাকলেই কি চলে! তাঁর উপর যে কতকগুলি মানুষের জীবন এবং জীবিকা নির্ভর করছে, মুখ চেয়ে বসে আছে।

যদিও এই বয়সে দূর পথে যাত্রায় কিছু কিছু ভাবনা আসছিল, তবু যৌবনের দিনগুলির কথা স্মরণ করে যৌবনের দেখা লণ্ডনে ফিরতে উৎসাহই জাগছিল। পরিচিত মানুষদের একবার খুঁজে দেখলে কেমন হয়……সে দেশটা কি এখনও সেইরকমই আছে! হয়ত সময় হাতে থাকবে না। হয়ত দেখা হবে না, খুঁজে পাওয়া যাবে না তাদের। চেনার সম্ভাবনাও নেই এ পরিণত বয়সে, দৃষ্টি বদলে গেছে। বাইরের অন্তরের রূপের পরিবর্তন হয়েছে, রুচিও বদলেছে, হয়ত সেই পরিচিত জগৎটাকে আর চেনা যাবে না।

বেশ তো, তাহলে না হয় সে দেশে ফিরে সে দেশের নবীনতাকে নতুন দৃষ্টি দিয়ে দেখা যাবে।

'গোলডার্স গ্রীন' পাড়ায় মিসেস লোকেন পালিতের বাড়িতে এসে নামলেন। মিসেস পালিত এখন এখানেই বাস করছেন।

মিসেস পালিত আগ্রহের সঙ্গে অতুলপ্রসাদকে এনে তাঁর বাড়িতে রাখলেন। মিসেস পালিতের কটেজের একখানি কামরা সুসজ্জিত ছিল অতুলপ্রসাদের জন্যই।

আপনি আসবেন আমি জানতুম। তাই এই ঘর সাজিয়ে রেখেছিলুম। আপনার কোন অসুবিধে হবে না।

আপনি কেমন আছেন? অনেক দিন পর আপনার সঙ্গে দেখা হল মিসেস পালিত।

আপনাকে অনেক দিন পর দেখলাম মিঃ সেন। কত দিন! আপনাকে যেন কিছু রোগা দেখাচ্ছে…আপনার অসুস্থতার খবর পেয়েছিলাম, ভাবনা হয়েছিল। আপনার মত প্রতিভা হয় না, একাধারে ব্যারিস্টার, সমাজসেবী, রাজনীতিবিদ, কবি।…

…ভারতবর্ষের কি খবর ?…ভারতবর্ষের জনসাধারণের…আমাদের রবীন্দ্র…রবীন্দ্রনাথ কেমন আছেন ? ওঁর কথা বলুন !

বিদেশী মহিলার কণ্ঠে অকুণ্ঠ জিজ্ঞাসা এবং ভারতপ্রেম ধরা পড়ে।

অতুলপ্রসাদ কণ্ঠস্বরে জড়িমা জড়িয়ে, হাসি মুখে কথা শেষ করেন। দেশের কথায় দুজনে মশগুল হয়ে পড়েন।

* * * *

প্রবাসী ভারতবাসীরা এসে ঘিরে ধরে লিবারেল নেতা মিঃ এ. পি. সেনকে। বাঙালীরা তাদের প্রিয় গীতিকার কবি অতুলপ্রসাদকে। 'উইক এন্‌ডে' কোথাও কোন সমুদ্রবেলায় যাওয়া হয়, নয় তো মিসেস পালিতের কটেজেই সঙ্গীতের আসর বসে যায়। কিছু কিছু সঙ্গীত-পাগল ছাত্র বলে, আপনাকে যখন কাছে পেয়েছি, আপনার কাছেই আপনার গান শিখব। আপনি আপনার গান শোনান, আমাদের শেখান।

সুরেলা দরদী গলায় অতুলপ্রসাদের গান শুরু হয়—

"তব অন্তর এত মন্থর আগে তো তা জানি নি", কিংবা

"মনরে আমার
তুই শুধু বেয়ে যা দাঁড়।
হালে যখন আছেন হরি
তোর যেমন ফাগুন তেমনি আষাঢ়
যখন যুঝবে তরী স্রোতের সনে—
মনরে আমার—
তুই টানিস আরো পরান পণে
যখন পালে লাগবে হাওয়া
সময় পাবি রে জিরোবার
মাঝির সেই গানের তানে
মনরে আমার, মনরে আমার—

মনে পড়ে যায় সেই শ্যামল বাঙলা দেশ, পাড়ভাঙা নদী-কূল। মেঘেরা দল বেঁধে যায় কোন্ দেশে। মনে পড়ে যায় পাখির গান। সেই খোলা মাঠ। বকুল ফুল, হরিরলুটের বাতাসা, স্নিগ্ধ মাটির গন্ধ, মায়েদের ভালোবাসা—সেই মিষ্টি দেশ সকলের সামনে এসে দাঁড়ায়, প্রাণের মাঝে ডাকে। মনে হয়, ভুলি নি, ভুলি নি, ভুলি নি। দূরদেশে থেকে মায়ের টান যেন বড় বেশি। হাজার হাজার মাইল দূরে বসে বাংলা দেশের প্রবাসী মানুষদের মন হঠাৎ বুঝি দেশের জন্যে কেঁদে কেঁদে সারা।

অতুলপ্রসাদ তখন গানে ও সুরে মাতোয়ারা :

ভেবেছিনু নাই-বা এলে
ওহে ভব নদীর মাঝি,
যাব চলে আপন পালে
অবহেলে।
এখন মাঝ-গাঙেতে টুটল দড়ি,
ভাঙা নায়ে উঠল বারি।
হে কাণ্ডারী……

ছাব্বিশ ইঞ্চি সুটকেস অক্লেসে হাতে নিয়ে দীর্ঘ জ্যোতিষ্মান পুরুষটি লণ্ডনের আণ্ডার-গ্রাউণ্ড ট্রেনে এসে উঠলেন। ফিরছেন গ্রীনউড। ট্রেনে এসে উঠল একজন ভারতীয় ছাত্র। চিনতে পেরে উৎসাহের সঙ্গে আলাপ শুরু করল ছাত্রটি। কথায় কথায় বললে, আমি আপনার গান গেয়ে থাকি। আপনার গান আমার খুব ভাল লাগে।

কী নাম তোমার ?

রণজিৎ সেন। যদিও টুলু সেন বলে আমাকে অনেকে জানেন। রণজিৎ আবার বললেন, আপনার গান আমি শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় এবং সাহানা দেবীর কাছ থেকে শিখেছিলাম। কিন্তু আজকে কী সৌভাগ্য আমার এইভাবে এই পরিবেশে এত দূর দেশে আপনার সঙ্গে দেখা! এবং আলাপ হওয়ার সৌভাগ্য যখন ঘটল তখন একটা আর্জি আছে!

কী বল তো ?

আমি আপনার গান আপনার গলায় শুনতে ইচ্ছা করি। তাতে আপনার গানের সঠিক সুর সম্বন্ধে অবহিত হব ; এবং আমাকে আপনার কয়েকটি গান শেখাতে হবে।

বেশ তো। তুমি এখানে কোথায় থাক ? চল না-হয় আমার সঙ্গে গোলডার্স গ্রীনে। তোমার ইচ্ছার জয় হোক।

পিকাডিলি স্টেশনে ট্রেন বদল করতে হবে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে আর একটা ট্রেন ধরতে হবে। সুটকেসটি হাতে তুলে নিয়ে ট্রেন থেকে নেমে এলেন, সঙ্গে রণজিৎ। অতুলপ্রসাদ বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে সুটকেস হাতে সিঁড়িতে উঠছিলেন। বয়সে তিনি প্রবীণ এবং সম্মানীয়, নবীন যুবকের চোখে ভদ্রতাবোধ জাগল। বিনীত সুরে রণজিৎ বললেন, আপনার সুটকেসটা আমার হাতে দিন।

অতুলপ্রসাদ বললেন, তুমি নিতে পারবে না রণজিৎ, সুটকেশটা খুব ভারি।

না না আমার হাতে দিন, আপনি কেন কষ্ট করবেন আমি সামনে থাকতে!

বেশ নাও, দেখ।

পিছন ফিরে অতুলপ্রসাদ দেখলেন, রণজিৎ সেন তাঁর স্যুটকেশটি বেশ কষ্টকর ভঙ্গিতে তুলে আনছেন। তাঁকে দেখে হেসে বললেন অতুলপ্রসাদ, বৃদ্ধের শরীরে এখনও তাহলে শক্তি আছে, কী বল! স্যুটকেসটা আমার হাতে দাও।

না না ঠিক আছে চলুন।

লজ্জিতভাবে রণজিৎ পা বাড়ালেন।

যে কটা মাস লণ্ডনে ছিলেন অতুলপ্রসাদ সে দিনগুলি কাটছিল মনের আনন্দে। মিসেস পালিতের আতিথ্যে অতিরিক্ত সুখস্বাচ্ছন্দ্য সৌজন্যে মাঝে মাঝে বিব্রত বোধও করছিলেন। এই দূর বিদেশেও সঙ্গীত সাহিত্যের আসর বসে যায়। যেখানেই অতুলপ্রসাদ সেখানেই মজলিশ। কবি রবীন্দ্রনাথ লণ্ডনে আসছেন রাশিয়া পরিভ্রমণ শেষে। অতুলপ্রসাদ খুব আনন্দিত, বিদেশে এসেও কবিগুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে ভেবে। দুই বন্ধুর দেখা হল।

উডব্রুক থেকে ৩০ মে লণ্ডনে এসে আর্যভবনে উঠলেন রবীন্দ্রনাথ। আর্যভবন ভারতীয় অতিথিশালা, বিড়লাদের প্রতিষ্ঠান। অতুলপ্রসাদ আর্য ভবনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। রবীন্দ্রনাথ পরিচয় করিয়ে দিলেন লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউসে ফ্রেস্‌কো অঙ্কনরত চারজন তরুণ শিল্পী যথাক্রমে রণদা উকিল, ধীরেন দেববর্মা, ললিত-মোহন সেন, সুধাংশু রায়চৌধুরী এদের সঙ্গে। চিত্রশিল্পী শ্রীরণদা উকিল লিখেছেন, 'আমাদের সঙ্গে কবি অতুলপ্রসাদের আগে কোন পরিচয় ছিল না। আমরা গিয়েছিলাম কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নিকটে সম্ভবত আর্যভবনে সাক্ষাৎ করতে। সেই সময়ে কবি অতুলপ্রসাদও সেখানে ছিলেন। কবিগুরু আমাদের সঙ্গে কবি অতুলপ্রসাদের আলাপ পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। আমার বেশ মনে আছে।' চারজন তরুণ চিত্রশিল্পীর আমন্ত্রণে ইণ্ডিয়া হাউসে দেয়ালচিত্র দেখতে গেলেন। তাঁদের ফ্রেস্‌কো চিত্র দেখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। তাঁরা তখন বললেন, আমাদের পেনিওয়ার্ন রোডের বাসাতে আপনাকে আসতে হবে। বলুন কবে আসবেন ; সেদিনই আপনার চায়ের নিমন্ত্রণ।

অতুলপ্রসাদ আমন্ত্রণ গ্রহণ করে বললেন, যাব, নিশ্চয়ই যাব, যাব বৈকি।

কয়েক দিনের মধ্যে চার-আঁকিয়ের পেনিওয়ার্ন রোডের ঘরে অতুলপ্রসাদ এলেন। চার বন্ধু অতুলপ্রসাদ আসবেন বলে চিত্রশিল্পীদের চিরাচরিত অগোছালো ঘরখানি ঝাড়পোঁছ করল, সাজালো গোছালো। ফুলদানিতে ফুল রাখল, ধূপ জ্বালাল। ফুলের গন্ধে, ধূপের গন্ধে, ভারতীয় পোশাকে মেজাজে, হাসিতে-খুশিতে ভরপুর হয়ে প্রবাসী কবির প্রতীক্ষায় রইল ওরা। চার বন্ধু স্থির করে, চায়ের আসরের শেষে

একটা গান-বাজনার আসর বসাতে হবে। শিল্পীর তো অভাব নেই। গান সকলেই কিছু না কিছু জানে, আর সবথেকে যিনি সেরা কবি সুরকার গায়ক তিনিও আছেন। তাঁকেও অনুরোধ করতে হবে গান গাওয়ার জন্যে।
তিনি যদি গান গাইতে অস্বীকার করেন ?
তাঁকে গাইতেই হবে গান !
চায়ের আসর শেষ হয়েছে, চিত্রশিল্পী ধীরেন দেববর্মা তাঁর এসরাজে ছড় টানলেন। মুগ্ধ সকলে। অকস্মাৎ ধীরেনের ছড়ের টানে এসরাজে অতুলপ্রসাদের গানের সুর ভেসে এল। বড় মধুর, মনমাতানো; হৃদয়ের গভীর তল থেকে বুঝি উঠে এল বড় করুণ সুর—ভেসে বেড়াল ধ্যানগম্ভীর পর্বতশিখর হতে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে-তরঙ্গে, সমুদ্র-সফেনে, বালুকাবেলায়। আলোড়িত হল মন। অব্যক্ত ব্যথা বেদনা মুক্তি চাইল কণ্ঠে। ধীরেনের এসরাজের সঙ্গে একের পর এক অনেকগুলি গান গাইলেন অতুলপ্রসাদ।
গান থামিয়ে অতুলপ্রসাদ বললেন, অনেক রাত হল, এবার আমি বিদায় নিই। চার বন্ধু বললে,চলুন আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।*

তেইশ

সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি বা অক্টোবরের প্রথম দিকে লণ্ডন থেকে অতুলপ্রসাদ ফিরলেন। বোম্বাই থেকে সোজা লখনউ—তাঁর কর্মভূমিতে। শীতের দেশে শরীরটা বেশ ভালই ছিল। ভারতবর্ষে ফিরে আসতে না আসতেই নানা রোগের আক্রমণ শুরু হল। গাউটের ব্যথা, ব্লাড প্রেশার, হজমের গোলমাল, সর্দি-কাশি ইনফ্লুয়েঞ্জা একের পর এক ঘিরে ধরল। শারীরিক অস্বস্তি এবং মানসিক অস্বস্তি প্রবল। স্ত্রী হেমকুসুম পক্ষাঘাতে পঙ্গু। চলৎশক্তিহীন। মাঝে মাঝে লালবাগের বাড়িতে হেমকুসুমকে দেখে আসেন। অতুলপ্রসাদের বলতে সাধ জাগে কেন তুমি এখানে একাকী বাস করছ চল আমার সঙ্গে চারবাগে তোমার বাড়িতে, কিন্তু বলতে পারেন না, কোথায় যেন একটা দ্বিধা। পাহাড়-প্রমাণ দ্বিধা এবং সংশয় তাঁদের দুজনের মাঝখানে। তা অতিক্রম করে দুজনের মধ্যে স্বাভাবিক কথাবার্তা স্বাভাবিক মানুষের মত ব্যবহার একেবারেই অসম্ভব। অথচ একাকী হেমকুসুমকে লালবাগের বাড়িতে রেখে যেতে ভরসা হয় না। হেমকুসুম বড় অসহায়, একাকী নিজের নিত্যপ্রয়োজনীয় কর্মগুলি সম্পাদনেরও শক্তি নেই।

---

* ঘটনাটি চিত্রশিল্পী শ্রীরণদা উকিলের উক্তি থেকে।

দিলীপকে বারে বারে সাবধান করেন অতুলপ্রসাদ। বলেন, তোমার মায়ের ওপর দৃষ্টি রেখো, মা যেন পড়ে না যায় দেখো, আয়াকে থাকতে বোলো তাঁর কাছে সব সময়ে। নিজেও পরিচারিকাদের নির্দেশ দিয়ে যান।

মাঝে মাঝে কিছুদিনের জন্যে বুঝি আসতে পারেন না। শরীর বাধ সাধে। এর ওপর খাটুনির কি শেষ আছে! বিলেত থেকে ফিরে আসবার পর দেখেন তাঁর অবর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক জরুরি কাজ মুলতুবি হয়ে আছে। জ্ঞান চক্রবর্তী, রাজকমল··· গেলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মন্ত্রণাকক্ষে। সেবা সমিতি থেকে, বয়স্কাউট থেকে ডাক আসে। রাধাকুমুদরা এসে নিয়ে যায়। অ্যাসোসিয়েশন থেকে ডাক আসে, ডাক আসে নানা বিদ্যালয়, কলেজ, নানান প্রতিষ্ঠান থেকে,—সেখানকার তিনি সভাপতি, কর্ণধার। বেঙ্গলী ক্লাব এবং ইয়ংম্যান অ্যাসোসিয়েশনের কর্ণধার কর্মীরা—সত্যকুমার, সুচারু সান্যাল, আরো অনেকে এলেন। ওরা বলেন, চলুন অতুলদা, ক্লাবে চলুন। আপনি এসে আমাদের মধ্যে বসলে আমরা খুউব শক্তি পাই।

নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই! তোমাদের কী নতুন প্লে শুরু করলে বল তো? তোমরা প্লে করবে, আর আমি যাব না এ হতে পারে?

এদিকে শরীরটা সত্যি আর চলে না। এত ছোটাছুটি, এত খাটাখাটি, এত চারদিক থেকে টানাটানি, তবু তিনি হঠাৎ ছুটি নিয়ে বসতে পারেন না। তাঁর ওপর নির্ভর কতকগুলি পরিবার; তাদের রুজি-রোজগার তাঁর হাতেই। তিনি যদি কোর্টের কাজকর্ম থেকে বিশ্রাম নেন তাঁর ওপর নির্ভরশীল পরিবারগুলি অন্নকষ্টের সম্মুখীন হবে। আসলে তিনি যে একটি প্রতিষ্ঠান। তবু তিনি কোর্টের কিছু কাজ থেকে হালকা হলেন। কোর্টের কাজে দূরে দূরে যাতায়াত কমিয়ে আনলেন। কাজের ভার তাঁর দুই জুনিয়ার ব্যারিস্টার হেমন্তকুমার ঘোষ এবং এস. সি. দাসের হাতে কিছুটা চাপিয়ে দিলেন। ডাক্তারের পরামর্শে গুরুপাক খাওয়া ছেড়ে দিলেন। অফিসের কাজ সেরে ফিরে এসে একটু নিশ্বাস নিতে শুরু করেন।

গুণগ্রাহী মানুষেরা সেনসাহেবের অসুস্থতার খবর পেয়ে আসেন দূর থেকে, ভগবানের কাছে, ঈশ্বরের কাছে, খোদার কাছে সুস্থতার প্রার্থনা জানিয়ে ধীরে ধীরে বিদায় গ্রহণ করেন। আত্মীয় স্বজনরা অসুস্থতার খবর পেয়ে অস্থিরচিত্ত হন। বড় বোন হিরণ বলেন, দাদা আমার কাছে ব্যাঙ্গালোরে এস, জায়গা পরিবর্তনে তোমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। কলকাতা থেকে মেজ বোন কিরণ লেখে, ভাইদা কলকাতায় এসে তোমার একজন ভাল ডাক্তার দেখানো উচিত। আমি তো মনে করি ডাঃ নীলরতন সরকারকে দিয়ে তুমি তোমার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাও। কেন তুমি এত দুর্বল হয়ে যাচ্ছ, বারে বারে ফিরে ফিরে অসুখে পড়ছ! তোমার শরীরের জন্য আমরা খুউব চিন্তিত।

দাদা লেখেন, তুমি আমার কাছে চলে এস। পূর্ববাংলায় দেশের খোলা হাওয়ায় শরীর তোমার ভাল হয়ে যাবে। লখনউয়ের জলহাওয়া তোমার স্যুট করছে না। তোমার এখন ব্লাডপ্রেসার কত? শরীর অবস্থা লিখে জানিয়ে ভাবনা দূর কর।

অতুলপ্রসাদ মনে করলেন, কলকাতায় কিরণের বাড়ি গিয়ে ভাল ডাক্তার দেখিয়ে শরীরটা পরীক্ষা করালে মন্দ হয় না। সব সময়ে মাথার যন্ত্রণা, বেদনা, শরীরের অস্বস্তি আর ভাল লাগে না। আর দেরি করা উচিত নয়।

সেদিন কোর্ট থেকে অন্য কোথাও না গিয়ে সোজা পৌঁছে গেলেন লালবাগ মহল্লায়, ক্যান্টনমেন্ট রোডের বাড়িতে হেমকুসুমের সঙ্গে দেখা করে আসতে।

হেমকুসুম শুয়ে ছিলেন। অতুলপ্রসাদ তাঁর শিয়রে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, কেমন আছ হেমকুসুম?

হেমকুসুম তাঁর গলার আওয়াজ শুনে ফিরে তাকালেন। তাঁর দু-চোখ দিয়ে অভিমানের অশ্রুধারা বইল। অনেকক্ষণ পর বললেন, তুমি অনেক দিন আস নি। আমার অনেকদিন কোন খোঁজ খবর নাও নি, আমি মরে গেছি না বেঁচে আছি।

এ কী অভিযোগ!

অতুলপ্রসাদ বললেন, তুমি আমার দিকে চেয়ে দেখ, তুমি বোধহয় আমাকে দেখনি। তোমার শরীর এত খারাপ দেখাচ্ছে কেন?

শরীরটা ভাল নেই হেমকুসুম। কাজকর্ম আজকাল বিশেষ আর করতে পারি না। কোর্ট থেকে ফিরে বিশ্রাম নিই। ভাবছি দু-এক দিনের মধ্যেই কলকাতায় যাব। ডাক্তার নীলরতন সরকারকে দিয়ে শরীরটা পরীক্ষা করাব।

হ্যাঁ যাও ঘুরে এস।

আমি যখন এখানে থাকব না, তখন তোমার এবং দিলীপের কষ্ট না হয় তার সব ব্যবস্থা আমি সেরে রেখেছি। ডাক্তারবাবু ঠিক সময়ে সময়ে আসবেন, তুমি নিয়মিত ওষুধ খেও, ইনজেকশান নিও, ডাক্তার যা বলেন শুনো। সাবধানে থেকো, বুঝলে হেমকুসুম!

দিলীপ, দিলীপ!

দিলীপকে ডাকলেন অতুলপ্রসাদ। বললেন, শোন। আমি সম্ভবত কাল বা পরশুর মেলে কলকাতায় চলে যাচ্ছি। তোমার মাকে দেখো, কেমন? সময়মত ওষুধ খাইও। টাকার দরকার হলে মুনসিজীর কাছ থেকে চেয়ে নিও, ঘোষকাকাকেও বলতে পার। তিনি তোমাদের সবরকম সাহায্য করবেন।

চারবাগের বাড়ি ফিরে এলেন অতুলপ্রসাদ। মিঃ এইচ. কে. ঘোষ এবং মিঃ এস. সি. দাশকে তাঁদের যে মামলাগুলি চলছিল সে সম্বন্ধে নানান উপদেশ দিলেন।

লখনউয়ের পরিচিত মানুষরা বন্ধুরা এলেন। বিদায় জানিয়ে তাঁরা বললেন, সেই ভাল, আপনি ভাল একজন ডাক্তার দেখিয়ে আসুন। আপনার শরীরটা সত্যি বড় ভেঙে পড়েছে। ধূর্জটিপ্রসাদ, জ্ঞান চক্রবর্তী, চিন্তামণি, নির্মল সিদ্ধান্ত, আদিত্য, সত্য-কুমারদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অতুলপ্রসাদ কলকাতাগামী ট্রেনে উঠে বসলেন।

অতুলপ্রসাদ ক্লান্ত শরীরে মনে কলকাতায় এসে পৌছলেন। স্টেশনে আত্মীয়-স্বজনরা এসেছিলেন ; শরীরের অবস্থা দেখে তাঁরা চিন্তিত হলেন।

ভাইদাদা, এ কী তোমার চেহারা হয়েছে!

না, এখন আর কোন কাজ করা চলবে না।

সত্যি আপনার শরীর স্বাস্থ্য খুউব ভেঙে পড়েছে।

এখানে তোমার সম্পূর্ণ বিশ্রাম। কোন সভা-সমিতি নয়, কোন গানের আসর নয়। কেউ যদি তোমাকে কোন সভায় সঙ্গীতের আসরে ডাক দিয়ে যায় দেখাবো তাকে। কিরণ বলে। বলে দেবো, তোমার কারো সঙ্গে দেখা হবে না। তুমি কারো সঙ্গে দেখা করবে না।

অতুলপ্রসাদ হাসেন।

না ভাইদাদা, তুমি হেসো না। তোমার শরীরটা আগে। ওদের সঙ্গে বকবক করলে গান গাইলে ওদের কী হবে? তোমার শরীরটা যাবে।......ওদের তো কিছু হবে না! আমার ভাইদাদার শরীর খারাপ হবে......তোমায় কোথাও যেতে দেব না। এবার তুমি আমার হাতে। আমার অনুমতি ছাড়া কোথাও আমার বাড়ি থেকে বেরুতে পারবে না।

কিরণের চোখদুটি বোধহয় ছলছল করে, কয়েক বছর আগে তার স্বামীকে হারিয়েছে, মেয়েদের হারিয়েছে। বড় দুঃখিনী!

কিরণ কল দেয় ডাঃ নীলরতন সরকারকে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে। ওঁরা অতুল-প্রসাদকে ভাল করে পরীক্ষা করেন। বিশ্রাম গ্রহণের জন্য পরামর্শ দেন। অতুলপ্রসাদ বিশ্রাম করেন। কিন্তু ডাক্তারের কথা শোনা কি তাঁর ধাতে সয়! আবার অত্যাচার।

কিরণের বাড়িতে একদিন অমল হোম এলেন।

অতুলদা, আপনার আসার খবর আমি কয়েকদিন আগেই শুনেছি। তখন থেকেই একটা চিন্তা এসেছিল মনে, এবারে রবীন্দ্রজয়ন্তী সভায় আপনাকে কিছু বলতে হবে। আপনাকে উপস্থিত থাকতে হবে।

চুপ চুপ! বলছ কী?

কেন? কী হল?

হেসে বললেন অতুলপ্রসাদ, যদিও আমার শরীরটা অনেকটা ভাল এখন, তবু কিরণ—আমার বোনটি যদি শোনে তুমি আমাকে কোন সভায় বক্তৃতা দিতে বা গান গাইতে নিয়ে চলেছ তাহলে···

তাহলে কী অতুলদা ?

বলে দিতে হবে !······শোন শোন, নিশ্চিত থাক আমি যাব, যাব কিরণকে লুকিয়ে।

না অতুলদা থাক, আপনার অসুস্থ শরীর।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী সভায় আমি যাব না, কী যে বল ! এ হতে পারে ?

সত্যিই তো, রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে অতুলপ্রসাদ উপস্থিত থাকবেন না এ কি কখনও হতে পারে !

যতই অসুস্থ হন না কেন, রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে অতুলপ্রসাদকে উপস্থিত থাকতেই হবে।

সেদিনের সভায় অতুলপ্রসাদ সুন্দর একটি বক্তৃতা দিলেন আর বন্দনা করলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের :

গাহো রবীন্দ্র-জয়ন্তী বন্দন,
ভকত জনে আনে পুষ্পচন্দন
    বরো বরণ্যে, জগত মান্যে,
    মুখর যাঁর গানে কাব্যকানন।
সাহিত্য আকাশে ভাতে যত রবি,
ইন্দ্র সবাকার, তুমি ওহে কবি,
    গৌড় গৌরবে তোমার সৌরভে,
    বিশ্ব বিমোহিত, মুগ্ধ গুণীজন।
হে অমর কবি. থাকো মরলোকে
বর্ষ বহু আরো মোদের সম্মুখে ;
    বঙ্গবীণা আরো বাজাও গুণী!
    মহান মোহন বাণী কহো শুনি।
রচো এ ভুবনে 'শান্তিনিকেতন'।
পূর্ণ হউক তব পুণ্যসাধন।

১৯৩১-এর গরমের কালটা—মে-জুন মাসটা কলকাতায় চিকিৎসায় চিকিৎসায় গেল। এখন অনেকটা সুস্থ। চিকিৎসক অনুমতি দিলেন, এখন কাজকর্ম করতে পারেন, তবে বেশি পরিশ্রম নয়।

অতুলপ্রসাদ লখনউ ফিরে এলেন তাঁর আপন কর্মক্ষেত্রে। আবার কাজের মাঝে ডুব দিলেন। লখনউ পৌঁছে দু মাস পরে দাদার চিঠি পেলেন, দাদা লিখছেন তাঁর দ্বিতীয়

মেয়ে সাধনার বিয়ে। বিয়ে হবে ২৫শে নভেম্বর। অতুলের নিশ্চয়ই আসা চাই।······
তুমি না এলেই নয়। এখন কেমন আছ অতুল ?
অতুলপ্রসাদ সম্মতি জানিয়ে চিঠি লিখলেন :

Charbagh
Lucknow
9. 10. 31.

দাদা,

আজ বিকেলে তোমার চিঠি পেলাম। প্রায় পাঁচ-ছয় মাস যাবৎ আমি বারে বারে গাউট-এ ভুগছি। আর ইদানীং ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়ে বড় দুর্বল হয়ে পড়েছি, কাশিটাও আছে তবে পূর্বাপেক্ষা একটু ভাল আছি। মোট কথা প্রায় ছয় মাস ধরে ভুগছি, এর ওপর কাজ করতে হচ্ছে, অনেকগুলি প্রাণীর জীবিকা আমার ওপর নির্ভর করে কিনা।

শিবুর বিবাহ ২৫শে নভেম্বর হবে শুনে বড় সুখী হলাম। শরীর নিতান্ত অসুস্থ না থাকলে নিশ্চয়ই যাব। শিবুকে আমার আশীর্বাদ পাঠিও। তুমি ছোট ভাইয়ের ভালোবাসা নাও। আশা করি সকলে ভাল আছে।

তোমার স্নেহের ভাই

অতুল

কিন্তু শরীর বাদ সাধল।
১৫-১১-৩১ তারিখে চারবাগ হেমন্ত নিবাস কুঠী থেকে দাদাকে পরের চিঠি লিখলেন :

দাদা,

বারবার ইনফ্লুয়েঞ্জা হওয়াতে আমি এত অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম আর ব্লাড-প্রেশার এত বেড়ে গিয়েছিল যে, আমি একটু ভয় পেয়েছিলাম। এখানকার ডাক্তারদের দেখিয়েছিলাম, তাঁরা কিছু করতে পারছিলেন না। ডেনহাম হোয়াইট যখন দেখলেন তখন আমার ব্লাডপ্রেশার ২১৪, খুবই হাই। কাশিটা বড় কষ্ট দিচ্ছে এখনও। তবে পূর্বাপেক্ষা একটু কম। মাঝে মাঝে জর হত সেটা এখন হয় না। ব্লাডপ্রেশারটা হয়ত সামান্য কম। দেখি নি। লিভারের অ্যাকশান ভাল হচ্ছে না, রং সাদা ছিল। এখন একটু ভাল হয়েছে, তবে ঠিক স্বাভাবিক হয় নি। ডেনহাম হোয়াইট চিকিৎসা ও ডায়েট-এর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন সেইমত চলছি। কিছু উপকার পেয়েছি। এখন সামান্য কাছারির কাজ ছাড়া আর কোন কাজ করি না। কাছারির কাজ না করলে ওদিকে চলে না—তারপর যতটা সম্ভব রেস্ট করি ও শুয়েই থাকি। বড় দুর্বল বোধ হয়।

শিবুর বিয়েতে যাব ঠিক করেছিলাম। কিন্তু শরীরের এ অবস্থায় যেতে পারব না। জানি তুমি খুব দুঃখিত হবে, আমিও সত্যি ভয়ঙ্কর দুঃখিত। ছোট ভাইকে স্নেহ এনে তার শরীরের অবস্থা ভেবে ক্ষমা করো।......শরীরটা ভাল থাকলে ভাবতাম না।......আমি বর-কন্যাকে আশীর্বাদ করি, তারা সুখে থাকুক, সকলকে খুশি করুক।

তোমরা আমার ভালবাসা নিও।

তোমার ছোট ভাই অতুল

১৫ই নভেম্বর খুব দুঃখিত মনে দাদাকে চিঠি লিখলেন অতুলপ্রসাদ যে, তাঁর প্রিয় ভাইঝি শিব্‌ বা সাধনার বিবাহে যেতে পারলেন না। কিন্তু ডিসেম্বরে তাঁকে লখনউ ত্যাগ করতে হল অসুস্থতার জন্যেই। আবার কলকাতায় কিরণের বাসায় ডাঃ নীলরতন সরকারের চিকিৎসায় ধরা-বাঁধার মধ্যে রইলেন। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে ধরাকাঠ শুরু হল। ঘোরাঘুরি পরিশ্রম নয়। আত্মীয়স্বজনদের রক্তচক্ষুর হাত এড়িয়ে কোন মানুষের প্রবেশ নিষেধ। কিরণের বাড়িতে তাঁর স্নেহের বন্দীজীবন শুরু হল।

চব্বিশ

ইদানীং অতুলপ্রসাদ প্রায়ই চিকিৎসা ও বিশ্রামের জন্যে কলকাতায় আসতেন। লখনউয়ের কর্মক্ষেত্রে এক মুহূর্ত তাঁর বিশ্রামের অবসর থাকত না। কলকাতায় এলেই কি বিশ্রাম হত? তাঁর বাসস্থানে গানের জলসা বসে যেত। বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন আসতেন, সঙ্গীতে তাঁর সমস্ত সত্তা ডুবিয়ে দিতেন। একবার বোন কিরণের বাসায় কবি রবীন্দ্র-নাথকে নিমন্ত্রণ করলেন। দিলীপকুমার রায়ও নিমন্ত্রিত হলেন একটি সর্ত সমেত, গান গাইতে হবে। গান গাইলেন দিলীপকুমার।

লখনউ যখন ফিরতেন প্রবাসী কবি অতুলপ্রসাদ, আত্মীয়স্বজনদের কেউ না কেউ তাঁর সঙ্গী হতেন। অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত প্রেমপূর্ণ ছিল তাঁর প্রাণ। তাঁর সংস্পর্শে যিনি এসেছেন অনুভব করেছেন সে কথাটি। বোনেরা বিপদে দুঃখে তাঁর আশ্রয়ে এসেছে। তিনি স্নেহময় ভাইয়ের কর্তব্য পালন করেছেন। ভাগ্নে-ভাগ্নীরা পিতৃহারা হয়ে তাঁর কাছে পিতৃস্নেহ পেয়েছে। তিনি তাদের পিতার অভাব কোনদিন বুঝতে দেন নি, কাছে এনে রেখে সস্নেহে তাদের সব অভাব ভরে দিয়েছেন। হিরণের একমাত্র ছেলে লণ্ডনে পড়তে গিয়ে ভীষণ অসুস্থ হল। হিরণ ভেবে আকুল। ঘোষ তুমি যাও হিরণকে সঙ্গে নিয়ে তাকে দেখে এস। যদি খুব অসুস্থ হয়ে থাকে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে চলে এস। যত খরচ-খরচা হয় আমি দেব।

হিরণের ছেলে মারা গেল ফিরতি পথে। জাহাজ থেকে তাদের নামিয়ে দেওয়া হল কোন দ্বীপে। হিরণের মন কেঁদে সারা। অতুলপ্রসাদ সান্ত্বনা দিলেন বোনকে।
ছোট বোন ছুটকির (প্রভা) স্বামী শেষাদ্রি আয়াঙ্গারের চাকরির ক্ষেত্রে চক্রান্ত, গোলযোগ, দুশ্চিন্তা, অশান্তি। মিঃ আয়াঙ্গারকে সান্ত্বনা দিলেন: তুমি তো সৎপথে আছ, কোন ভয় ভাবনা কোরো না। আমি তোমায় সাহায্য করব। কেউ তোমার গায়ে হাত দিতে পারবে না। তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। ছোট বোন এবং তাঁর ছেলেমেয়েদের এনে রাখলেন তাঁর চারবাগের বাড়িতে। তোমাদের কোন ভাবনা নেই, আমি তো আছি। আমি—অর্থাৎ অতুলপ্রসাদ সেন। সেই বিরাট ব্যক্তিত্বের আচ্ছাদনের নিচের সে আশ্রয়টুকুর কি কম মূল্য!
হেমকুসুম শুধু বুঝলেন না। হেমকুসুম প্রথম থেকেই জেদী। 'আপনাকে' ঘিরে তাঁর জগৎ। তার বাইরে পা বাড়াতে তিনি রাজি নন। তোমার আত্মীয় স্বজনদের জন্যে এই যে এত ভাবনা চিন্তা, এত খরচ-খরচা—এ কেন হবে? কেন তুমি ওদের বিলেত পাঠালে? কেন তুমি ওদের বিবাহের কথা ভাববে? ওদের নিয়ে কেন তুমি এত মত্ত আমি বুঝি না!
ওরা সকলেই আমার আপনার, যেমন তুমি। ওদের জন্যে আমার ভাবনা হয়, যেমন তোমার জন্যে, দিলীপের জন্যে আমার সব সময়ে ভাবনা হয়। ওরাও আমাকে বড় আপন বলে মনে করে। ওদের দুঃখকষ্টের দিনে, আনন্দের দিনে আমি যদি না দাঁড়াই, আমার যথাসাধ্য সাহায্য যদি ওরা না পায় ওরা কার কাছে দাঁড়াবে! কাকে কাছে পাবে!
আজ ২৫শে জানুয়ারি, ১৯৩২। ভাগনী রমলার বিবাহ। রমলা ও কুন্তলা প্রভার মেয়ে। প্রভারা লখনউয়ে ভাইদাদার আশ্রয়ে। রমলার বিবাহে উৎসব-অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি রইল না। চারবাগের বাড়ি আজ আনন্দমুখর। আত্মীয়স্বজনে ভরা। সারা বাড়িখানি আলোয় আলোয় হাসির বন্যায় ভরা।

দাদা, ২৫. ১. ৩২

আজ ভাগিনেয়ী রমলার বিবাহ। তোমার ভালোবাসা ও শুভাশীর্বাদ চাই। ভেবেছিলাম খুউব সংক্ষেপে কাজটা সারব, তা হল না। রমলা তোমার প্রেরিত টাকা পেয়ে খুউব খুশি হয়েছে।
তোমরা আমার ভালোবাসা নিও। আমি আজ একটু ভাল আছি। কিরণ সুবালা টেড বাবলি ও তাহার স্বামী প্রফুল্ল এসেছে। পরে জানাব বিবাহ-অনুষ্ঠান।
আশা করি ভাল আছ।

তোমার ভাই অতুল

১৯৩২ সাল থেকে অসুস্থতার কাল শুরু হল। মাঝে মাঝে শরীর ভাল থাকে, আবার আক্রমণ শুরু হয়ে যায়। চারদিক থেকে আক্রমণ : বাতের আক্রমণ, রক্তচাপ বৃদ্ধি, মাথার যন্ত্রণা, কিডনির অসুখ। কোর্টে যাওয়া মাঝে মাঝে স্থগিত রাখতে হয়। কিন্তু যাঁর উপার্জনে অনেকের নির্ভর—যিনি নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান তাঁর পক্ষে প্রতিদিন কার্যক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়া নিতান্তই প্রয়োজনীয়। তা নাহলে দিন চলা হয় ব্যাহত। অন্নকষ্টে পড়তে পারে অধীনস্থরা। দুহাতে যাঁর উপার্জন তাঁর ব্যয়ের আধিক্যও অত্যধিক।

বিশেষত অতুলপ্রসাদ, হৃদয় যাঁর বিশাল অন্তরীক্ষের মত।

'লাগে টাকা দেবে অতুল সেন।'

অমুক লোকটা আমায় ঠকিয়েছে হে, ওকে আর এক পয়সা দেব না।

তখনই দেখা গেছে অতুলপ্রসাদ তাঁকে ৫০০ টাকা দিয়েছেন। ধূর্জটিপ্রসাদরা বলাবলি করেছেন, ইতিপূর্বে মন হয়েছে তাই নিজের দুর্বলতা লুকোতে ব্যস্ত।

লখনউতে একজন পাগলী আছে, রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। এককালে বিখ্যাত গায়িকা ছিল। এখন অদ্ভুত টোরী আর ভৈরবী গায়। অতুলপ্রসাদ শুনেই সংবাদ-দাতাকে পাঁচ টাকা দিলেন, বললেন, তাকে নিয়ে এস। তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। টাকা ফেরত দেওয়ার সময়ে বললেন, ও তোমার কাছেই থাক, যখন খুঁজে পাবে ধরে এনো। এটা বোধহয় সুখবরের পুরস্কার। রাজকুমারের গজমতির মালাদান, না হয় সংবাদদাতাকে সাহায্য। যে খবর দিয়েছিল সে ছিল বিদেশী সঙ্গীত শিক্ষার্থী।

…ছোট মুন্নে—ওয়াজিদ আলি শাহর দরবারের শেষ গায়ক এসে জুটেছিল অতুলপ্রসাদ সেনের বৈঠকখানায়।

তালিম হোসেন লখনউয়ের শেষ বিখ্যাত সানাইয়া। কৈশরবাগে থাকতে ভোরবেলা ভেঁরো আর টোরী বাজাত। দূর থেকে অতুলপ্রসাদ সুর শুনতে শুনতে বলে উঠতেন, ইয়ান্থফের সেতারের হাত মিঠে; রাখলে হয় না!

বরকতের ছড়ের টান ভাল। নিয়ে এস তাকে।

চল হে ধূর্জটি এক ওস্তাদের গান শুনে আসি। চললেন কোন পর্ণ কুটীরে বৃদ্ধ ওস্তাদের ঠুংরী শুনতে। বৃদ্ধ ওস্তাদ তো কেঁপে অস্থির, সেন সাহেবকে কোথায় বসাবেন। সেই ছেঁড়া ভাঙা খাটিয়ার ওপর বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান শুনলেন। বেলা বারোটা হল। ওস্তাদের ছেলের হাতে দুখানি নোট গুঁজে দিলেন। পরে কিসী রোজ তসরীফ নিয়ে আসতে অনুরোধ করলেন।

গুণীদের কদর জানতেন অতুলপ্রসাদ। কদরদান বলতে যে কথাটি আছে তার সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত অতুলপ্রসাদ। দুহাতে যাঁর রোজগার চার হাতে তাঁর দান। তাঁর কাছে ঋণী

আউধ সেবা সমিতি, রামকৃষ্ণাশ্রম, হরিমতী বালিকা বিদ্যালয়, বাঙালী যুবক সমিতি, আরও কত প্রতিষ্ঠান। অর্থসাহায্য এবং পরিচালনা কোনটাকে তারা অস্বীকার করবে······আর অসুস্থতার জন্যে অতুলপ্রসাদ তাঁর আপন কর্মচারীদের জন্যে মাঝে মাঝে চিন্তিত হন।

১৯৩২-এর মে জুন মাস, কোর্ট বন্ধ। অতুলপ্রসাদ কলকাতা হয়ে কার্সিয়ং বেড়াতে গেলেন। প্রত্যেক বছরেই গরমের ছুটিতে কোথাও না কোথাও নৈনিতাল সিমলা আলমোড়া দার্জিলিং কার্সিয়ং বেড়াতে যান। কার্সিয়ং থেকে যখন কলকাতায় ফিরলেন তখন একটু সুস্থ। দাদা তখন চাঁদপুর ফিরে গেছেন। মনে আশা ছিল দাদার সঙ্গে দেখা হবে; অনেকদিন দাদার সঙ্গে দেখা হয়নি।

লখনউ ফিরে কিছুদিন সময় গেল, যখন অবসর পেলেন অর্থাৎ আগস্টের প্রথম সপ্তাহে দাদাকে লিখলেন: দাদা, অনেকদিন তোমাদের কোন খবর পাইনি। বৌঠান ও তোমরা কেমন আছ শীঘ্র জানিও। আশা করি বৌঠান সেরে উঠেছেন। আমি যখন কার্সিয়াং থেকে ফিরলাম তখন তোমরা চাঁদপুরে ফিরে গেছ। ···লখনউতে এক সপ্তাহ পূর্ব পর্যন্ত ভয়ঙ্কর গরম ছিল, এখন বৃষ্টি নেমে ঠাণ্ডা হয়েছে। আমি মোটের ওপর ভালোই আছি। তবে ব্লাডপ্রেসারটা মাঝে মাঝে বাড়ে। বিশেষ কোন গ্লানি বোধ করি না।······পত্রের উত্তর শীঘ্র দিও এবং তোমরা সকলে কেমন আছ জানিও।

তোমরা আমার ভালবাসা লও। তোমার ছোট ভাই অতুল

* * * *

সেবার বড়দিনের ছুটিতে গোরক্ষপুরে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে তাঁকে মূল সভাপতিরূপে অভিষিক্ত করা হল।······লখনউয়ের কর্মবহুল জীবনের কর্মভার থেকে একফাঁকে ছুটি নিয়ে এলাহাবাদ এলেন নির্জনে সম্মেলনের অভিভাষণ লিখবেন এই মনে করে। এলাহাবাদের গঙ্গার তীরের নির্জনে বসে ছেলেবেলার চেনা পদ্মাপারের গ্রামটির কথা মনে করে লিখতে বড় ভাল লাগে। মনে পড়ে কত কথা—পদ্মানদীর ধার, সেই খেলার মাঠ, পাখির গান, বকুল ফুল, হরির লুটের বাতাসা, মায়েদের ভাল-বাসা, ছেলেবেলার কত হাসি কত খেলা।

'আমার সেই মিষ্টি দেশটি আমার চোখের সামনে, আমার প্রাণের মাঝারে ভাসতে লাগল, ভাল করে মনে হল আমি ভুলিনি, ভুলিনি সেই দেশমাতাকে। যদিও প্রায় কত বৎসর যে সে গ্রামখানিতে যাই নি! দূর দেশে থাকলে কি হবে, মায়ের টান বড় টান।'

দেশের জন্যে বুঝি মন কেমন করে; দূর দেশে শ্যামল মাটি টানে বাঙালী কবির মন।

'প্রবাসী চলরে দেশে চল।'

'এ যেন প্রাণের প্রতিষ্ঠান। এমন মর্মস্পর্শী সুর কোথায় শোনা যায়! হৃদয় যেন কেমন করে ওঠে। মানুষ যৌবনে কর্মক্ষেত্রে পদ-প্রতিষ্ঠা খুঁজতে বিত্তার্জনে দেশে দেশে বেরিয়ে পড়ে, তার উদ্দাম আশা আকাঙ্ক্ষা তাকে সাহস দেয়, শক্তি জোগায়। সে সেখানে বাসা বাঁধে—ক্লাব, লাইব্রেরি, থিয়েটার ফাঁদে, ক্রমে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার জন্যে বিদ্যায়তন গড়ে তোলে। তার সকল উৎসাহ তখন সেইমুখো হয়ে তাকে আনন্দে রাখে। দেশ ঘরবাড়ি ক্রমে গৌণ হয়ে পড়ে। স্বাভাবিক। কিন্তু বয়স যখন অস্তের দিকে হেলে পড়ে তখন দেশ একে একে তার প্রাপ্য আদায় করতে থাকে—সেই ভিটা, সেই ঘরবাড়ি, সেই পারিপার্শ্বিক—বাল্যের খেলাধুলা থেকে উৎসব আনন্দ বিচরণ-স্থান নদীনালা বৃদ্ধ কুল বকুল গাছটি পর্যন্ত চোখের সামনে ফুটতে থাকে। সেখানে কত কথা কত গল্প, কত সরল সহজ ভালবাসা, কত স্নেহস্পর্শ ছড়ানো আছে। সেই বিস্মৃত দিনের কত কথাই মধুর হয়ে উদয় হয়। তাদের ফিরে পাবার ইচ্ছে জাগায়। তাদের জন্যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলার—যেন এখনো সেথায় গেলে সে দেখতে পায়।' কিন্তু যৌবনের কর্মক্ষেত্রকে ভুলতে পারা যায় না। জন্মভূমি না হলেও অন্নভূমি। এ দেশও দেশ। এ দেশে আমরা ঘর বেঁধেছি। নানা কাজে এদেশেই নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি। এদেশের লোকদের বড় আপনার মনে হয়। তাদের স্নেহ করি। তাদের সেবা করে আনন্দ পাই, কৃতার্থ হই; হয়ত এ-দেশেই ছাইটুকু রেখে যাব।

কেন তিনি একথা বললেন? এ যেন তাঁর শরীর ও মনের অবস্থার এক ভবিষ্যতবাণী তাঁর কলমের মুখে প্রকাশ পেয়েছিল। কারণ আমরা দেখলাম তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অসমাপ্ত অভিভাষণ মুখে মুখে বলেছেন, তাঁর একটি আত্মীয়া তা লিখে নিয়েছেন। অধিবেশনের কিছুদিন আগে থেকেই অতিরিক্ত রক্তচাপ দেখা দিল। ডাক্তার সম্পূর্ণ বিশ্রামের নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তখনও অভিভাষণের শেষ অংশ লেখা হয়নি। আত্মীয়া বললেন, কাজ নেই আপনার অভিভাষণ লিখে।

কিন্তু তাই কি হয়! রোগশয্যা থেকেই অসমাপ্ত অভিভাষণ মুখে মুখে বলা সাঙ্গ হল। এবং শুধু তাই নয়, ডাক্তারের নির্দেশ অমান্য করে রোগশয্যা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত দুর্বল শরীরে রেলপথের শত কষ্ট অগ্রাহ্য করে সেই শীতে গোরক্ষপুরের অধিবাসীদের ডাকে সাড়া দিতে সেখানে পৌছলেন। সম্মেলনের কর্মকর্তারা—লালগোপাল মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ, কেদারনাথ, কুমুদরঞ্জন সবাই তাঁর শরীরের জন্যে শঙ্কিত। তিনি বলেছেন, কিছু ভাবনা নেই, আমি বেশ ভাল আছি, বেশ ভাল। চলুন, আমায় অভিভাষণ দিতে হবে।

অভিভাষণ দিলেন :

প্রিয় সুহৃদবর্গ,

ডাক্তারের অনুশাসন পালন করলে আমার আসা হত না ; কিন্তু এতবার নানা কারণে এ-সম্মেলনের উৎসবে অনুপস্থিত হয়েছি যে, এবারে লজ্জার খাতিরেও আপনাদের সাদর নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারলাম না, এসে হাজির হয়েছি। আমার সভাপতিত্বের ও অভিভাষণের ত্রুটি মার্জনা করবেন এ আশা রাখি বলেই আসতে সাহসী হয়েছি।

যদি বলি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, তাহলে একটা মামুলি প্রথার কথা বলা হবে, যদিও কথাটা অতি সত্য। এর চেয়ে সত্যি কথা হবে আমি আমার পাতানো ভাইবোনেদের প্রাণের ভালোবাসা জানাচ্ছি, আর যাঁরা বয়োজ্যেষ্ঠ, তাঁদের সহস্র সহস্র শ্রদ্ধা অর্পণ করছি। আমি আপনাদের কাছে আসতে পেরে আপনাদের আনন্দে ও সাহিত্যসেবায় যোগ দিতে পেরে বড় সুখী হয়েছি।

যে উচ্চাসন আজ আপনারা আমায় দিলেন, তার যোগ্য আমি নই তা আমি জানি, আপনারাও জানেন। আর যদি তা না মানেন, তাহলে মানতে বেশি বিলম্ব হবে না। আমি যে আসন গ্রহণ করেছি তা সম্মানের উচ্চাসন বলে নয়, স্নেহের আসন বলে। সম্মানের সিংহাসনের চেয়ে স্নেহের কোল উঁচুতে। আজ আপনারা আমাকে দেশবাসীর কোলে স্থান দিয়েছেন, মাতৃভাষার অঙ্কে বসিয়েছেন, তাই আমার এত গর্ব। বাঙলা ভাষাকে সম্বোধন করে আমি লিখেছিলাম, 'মা তোমার কোলে তোমার বোলে কত শান্তি ভালবাসা।' প্রাণের কথাই লিখেছিলাম। যাক, ভূমিকা সংক্ষেপেই শেষ করি।

আমরা যে বাঙলার বাইরে এতগুলি বাঙালী প্রতি বৎসর একত্রিত হই এবং বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানের বাঙালীদের এ-অনুষ্ঠানে আহ্বান করি এবং তাঁদের নেতৃত্ব কামনা করি, তার একটা প্রধান কারণ হচ্ছে আমরা সকলে মাতৃভূমি বাংলাদেশের সঙ্গে মাতৃ-সাহিত্যের যোগসূত্র রাখতে চাই এবং সে-বন্ধন আরো দৃঢ়তর করতে চাই। যদিচ আমরা বাংলাদেশের বাইরে বাস করি, তবু নিজেদের প্রবাসী বলতে আমি সঙ্কোচ বোধ করি। ভারতে বাস করে ভারতবাসী নিজেকে পরবাসী কি করে বলব। সেটা বড়ই অশোভন। তাই আমি প্রথম থেকেই 'প্রবাসী' আখ্যার বিরোধী। একবার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এ-বিষয়ে আমার কথা হয়, তিনিও প্রবাসী নামের পক্ষপাতী নন। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'বাহির বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন' বললে কেমন হয় ? তিনি বলেছিলেন, বেশ ভাল কথা। 'বহির্বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন' বলতে পার অথবা 'বঙ্গেতর সাহিত্য সম্মেলন' বলতে পার। যদিও আমাদের এই সম্মেলনের একাধিকবার নাম পরিবর্তন হয়েছে, তবু আমি এ-বিষয়ে পরিচালকবর্গের দৃষ্টি

আকর্ষণ করছি। তবে এ-কথা বলতেই হবে 'প্রবাসী' নামটা চলে গেছে, কেমন যেন ছাড়ানো যায় না। প্রবাসী নামের যতকিছু আপত্তি উত্থাপন করি না কেন এ-কথা স্বীকার করতেই হবে বাংলাদেশ আমাদের আপন দেশ, আমাদের মাতৃভূমি, বাঙলা ভাষা আমাদের মাতৃভাষা। প্রতি বৎসর এই সম্মেলন যেন আমাদের এ-কথা নতুন করে মনে করিয়ে দেয়। এ-দেশকে আমরা দেশ বলে মনে করব, কিন্তু জন্মভূমি যে সকল দেশের চেয়েও আপন, তা ভুললে চলবে কেন। তাতে এ-দেশকে একটুও অবজ্ঞা করা হয় না। আমরা অনেক স্ত্রীলোককে মা বলে সম্বোধন করি, তবে মাতৃত্বের গৌরব বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যে মা পেটে ধরেছে, সে মা কিন্তু অন্য মায়ের চেয়ে একটু পৃথক ; সে জননী, শুধু মা নয়।

বাংলাদেশ আমাদের জননী এ-কথা মনে রাখা বড় দরকার। এ-সম্মেলনে প্রতি বৎসর আমরা যেন আমাদের সেই সুজলা সুফলা মাটিকে স্মরণ করি।

সেদিন আমার দেশের কয়েকটি ভাই আমাকে তাঁদের নবজাত পত্রিকার জন্যে একটি কবিতা পাঠাতে বিশেষ করে অনুরোধ করেছিলেন। তখন আমার গ্রামখানির কথা মনে পড়ে গেল। সেই পদ্মানদীর ধার, সেই খোলা মাঠ, পাখির গান, বকুল ফুল, হরির লুটের বাতাসা, মায়েদের ভালবাসা, ছেলেদের সঙ্গে খেলা সব মনে পড়ে গেল। আমার সেই মিষ্টি দেশটি আমার চোখের সামনে…আমায়…ডাকতে লাগল। ভাল করে মনে হল, আমি ভুলিনি, ভুলিনি আমার দেশমাতাকে, যদিও প্রায় তেত্রিশ বছর সে-গ্রামখানিতে যাইনি। দূর দেশে থাকলে কি হবে মার টান বড় টান। তাই মনে করে একটি কবিতা…সেই দেশের পত্রিকার জন্যে লিখে পাঠিয়েছিলুম, তা উদ্ধৃত করলে বেশি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সে-গানটিতে নিজেকে প্রবাসী বলেই উল্লেখ করেছিলাম। ক্ষমা করবেন।

প্রবাসী, চলরে দেশে চল।
আর কোথায় পাবি এমন হাওয়া এমন গাঙের জল।
যখন ছিলি এতটুক,
সেথাই পেলি মায়ের সুধা ঘুম পাড়ানো বুক ;
সেথাই পেলি সাথীর সনে বাল্যখেলার সুখ ;
যৌবনেতে ফুটল সেথাই প্রাণের শতদল।
চলরে দেশে চল্।
হরির লুটের বাতাসা, আর পৌষ মাসের পিঠা,
পীরের সিন্নি, গাজির গান, আর ওই করিমভাইয়ের ভিটা,
আহা মরি সেই স্মৃতি আজ লাগছে কত মিঠা!

শিউলি বেলী কদম-চাঁপা এমন কোথায় বল্।
চল্‌রে দেশে চল্।
মনে পড়ে দেশের মাঠে খেতভরা সব ধান,
মনে পড়ে পুকুর-পাড়ে বকুলগাছের গান,
মনে পড়ে তরুণ চাষীর করুণ বাঁশির তান,
মনে পড়ে আকাশভরা মেঘ ও পাখির দল।
প্রবাসী, চলরে দেশে চল্।

"যদিও এদেশ আমাদেরই দেশ, এদেশেই আমরা অনেকে ঘর বেঁধেছি, নানা কাজে এদেশেই অনেকে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি, এদেশের লোককেও বড় আপন মনে হয়, তাদের স্নেহ করি, তাদের স্নেহ পাই, তাদের সেবা করে আনন্দ পাই, কৃতার্থ হই, হয়ত বা এদেশেই ছাইটুকু রেখে যাব" * ; তবু সেই যে বড় নদীর দেশ, বর্ষা ও ঝড়ের দেশ, সেই যে ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট আমার ভাই-বোনগুলি, সেই যে ভাটিয়ালী বাউল ও কীর্তন গান, সেই যে ভাবপ্রধান মা তিনি আর সেই যে আমার অতি মিষ্ট বাংলা কথা ও বাংলা ভাষা সে যে আমার স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি। তাকে ভুলতে পারি না। দূরে থাকলেও সে-দেশ তো আমারই, সে-দেশের অধিবাসীরা আমারই ভাইবোন, এ-কথাটি আমাদের মনে রাখতেই হবে।

বহুকাল পূর্বে ছাত্রাবস্থায় বিলেতে অদ্বিতীয়া গায়িকা মাদাম পেটের মুখে একটি গান শুনেছিলাম Home sweet home, তা এখনও আমার কান ও প্রাণে মধুবর্ষণ করে। তবে একথা আমাদের মনে রাখতেই হবে যে, যদিও আমরা জন্মভূমি থেকে দূরে রয়েছি, তবু এদেশও আমাদের দেশ। এ আমাদের জন্মভূমি না হলেও কর্মভূমি, অন্নভূমি। অনেক বাঙালী আছেন যাঁদের এদেশ জন্মভূমি। এদেশ আমাদের জীবিকার সংস্থান করে দিচ্ছে। এদেশের অধিবাসীরা আমাদের ভাইবোন, ভাইবোন ভেবেই এদের বুকে টেনে নিতে হবে। এদের অন্তরের ভালবাসা দেওয়া চাই। মনে বা মুখে এদেশের লোকেদের তাচ্ছিল্য করলে নিজেদের হীনতা বা অনুদারতা প্রকাশ পাবে। চাণক্য বলে গেছেন, 'উদারচরিতানাম্ বসুধৈব কুটুম্বকম'—মনে রাখবার কথা, জীবনে পালন করবার কথা।

…এই গোরক্ষপুরের সন্নিকটেই দেবদেব বুদ্ধদেবের জন্ম ও মহাপ্রস্থানের স্থান। এই অতি পবিত্র দেশে দাঁড়িয়ে আমি আজ মানব-প্রীতির ও অহিংসার অবতার সেই

* প্রবাসী কবি অতুলপ্রসাদ ভাষণের পাণ্ডুলিপিতে এই উদ্ধৃত অংশে স্বহস্তে দাগ দিয়ে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে রেখেছিলেন, যা অল্পদিনের মধ্যে সত্য বলে প্রমাণিত হয়।

মহাত্যাগীকে স্মরণ করে তাঁকে শ্রদ্ধা ও ভক্তির অঞ্জলি অর্পণ করি। তাঁর উপদেশ জীবে প্রীতি জীবে দয়াকে এদেশের বাঙালীরা কখনও ভোলেনি। সিদ্ধার্থের জন্মভূমি আজ আমাদের এই কথাই বলিতেছে, 'বাঙালী মানব মাত্রকেই প্রীতির চক্ষে দেখিও। অহিংসা বিশ্বপ্রীতি জনসেবাই মানবের পরম ধর্ম।' হয়ত অনেকেই জানেন না যে, এক সময়ে আমাদের বাংলাদেশ বৌদ্ধরাজগণের অধীন ছিল। বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃতি প্রভাব ও প্রসার ছিল। জানি না, আমার মনে হয় যদি বৌদ্ধধর্ম এদেশ থেকে অপসৃত না হত, তাহলে হয়ত এদেশে এত দুর্গতি হত না। বৌদ্ধধর্মের সাম্য ও জাতীয়তা হয়ত ভারতবাসীকে এত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হতে দিত না। যে সাধনার উপায়গুলি বুদ্ধদেব নির্দেশ করে গিয়েছিলেন, তা আজ আবার মনে করবার দিন এসেছে—সৎদৃষ্টি, সৎসঙ্কল্প, সৎকার্য, সৎব্যবহার, সদুপায়ে জীবিকা অর্জন, সৎচেষ্টা, সৎস্মৃতি। আমি আমাদের বাঙালী ভাইবোনেদের বিশেষ করে আজ এই উপদেশটি মনে রাখতে অনুরোধ করি। তাহলে আমরা এদেশীয়দের সঙ্গে সখ্যভাব রক্ষা করে চলতে পারব।

এখন আমাদের নিজেদের কথা দু-একটা বলি। প্রথম কথাই হচ্ছে বহির্বঙ্গ বাঙালীদের মধ্যে মিত্রতা স্থাপন। এ মিত্রতার অভাব আমরা বেশ মাঝে মাঝে অনুভব করি। এ নিতান্তই আক্ষেপের বিষয়। দলাদলি এদেশের বাঙালীদের মধ্যে বিস্তর দেখতে পাই। বিজয়ার সাম্বৎসরিক আলিঙ্গন বাঙালীকে এ-অনিষ্টকরণ হতে মুক্তি দিতে পারে নাই। বড় দুঃখ হয় দেখলে যেখানে মুষ্টিমেয় বাঙালী সেখানেও মৈত্রীর অভাব, সেখানেও দলাদলির সৃষ্টি। যেখানে দুইশত বাঙালী সেখানে হয়ত দুটি ক্লাব, তিনটি থিয়েটার দল। এ যে অত্যন্ত অশোভন সকলেই স্বীকার করবেন। এতে বিভেদ তো হয়ই, বলক্ষয়ও হয়। আমরা যদি একত্র দলবদ্ধ হয়ে মিলে মিশে থাকি তাহলে আমরা বাইরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ও প্রতিযোগিতায় আরো ভাল করে আত্মরক্ষা করতে পারি। এ স্থূল কথাটি ভুলে যাওয়া আমাদের পক্ষে নিতান্ত হানিকর। আমি আমার বাঙালী ভাইদের বিশেষ করে মিনতি করি। এ দুর্ভাবনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে যেন সকলেই চেষ্টা করি।

আর একটি আমাদের প্রধান প্রয়োজন ও কর্তব্য বাংলার বাইরে বাংলা-সাহিত্যের ও ভাষার প্রচার। আমাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে তোমাদের বাঙালীজাতির সবথেকে গর্বের বিষয় কি? আমি তৎক্ষণাৎ কোন দ্বিধা না করে উত্তর দিই, আমাদের ভাষা। আমার নিজের গানের কথায়, 'মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাংলা-ভাষা'। ভারতের সমস্ত সাহিত্যের মধ্যে বাংলা-সাহিত্য যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কী করে করবে। জগৎ যে সে-কথা স্বীকার

করে বসে আছে। আজও জগতের নানা দেশ বাংলা-সাহিত্য-সম্রাট রবীন্দ্রনাথকে সম্মানের মুকুট পরাবার জন্যে লালায়িত। তারপর আমাদের শরৎচন্দ্র অকস্মাৎ এসে ভারতের সাহিত্যসভার প্রথম পংক্তিতে আসন গ্রহণ করেছেন। সকলেই বলেছেন এ আসন তাঁরই প্রাপ্য। ভারতের অন্য সব কথাসাহিত্য শরৎচন্দ্রের উপন্যাস ও গল্প অনুবাদ করে কৃতার্থ হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে একটা পুরোনো কথা মনে হল। তখন আমি পাঠ্যাবস্থায় বিলেতে ছিলাম। ১৮৯৩ সনের কথা। ছেলেবেলা থেকেই আমার বাংলা-সাহিত্যে একটু অনুরাগ ছিল। লণ্ডনে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের লাইব্রেরি জগৎ-বিখ্যাত পুস্তকশালা। অতবড় লাইব্রেরি বোধহয় জগতে একটাই আছে। সেখানে আমি মাঝে মাঝে অবসরে পড়তে যেতাম। লাইব্রেরির ক্যাটলগগুলির মধ্যে দেখি একটি বাংলা বইয়ের ক্যাটলগ। তাতে একটি জিনিস দেখে আমার বড় গর্ব হল। বাংলায় যত পুস্তক ছাপা হয়েছে এবং জগতের যে যে ভাষায় বাংলা পুস্তকের তর্জমা হয়েছে, তার তালিকাও তাতে দেখলাম। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের তর্জমা ভারতীয় ও ইউরোপীয় ভাষায় হয়েছে। কপালকুণ্ডলার তর্জমা করেছিলেন Mr H A. D. Philips I.C.S এবং সেই ইংরাজি তর্জমা থেকে জার্মান এবং অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় কপালকুণ্ডলা অনূদিত হয়েছে। যেদিন থেকে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে জিনিসটি আবিষ্কার করলাম, সেদিন থেকে মাতৃসাহিত্যের প্রতি অনুরাগ দশগুণ বেড়ে গেল। তারপর রবীন্দ্রনাথের তো কথাই নেই। যদি আপনারা কখনো বোলপুর যান, সেখানকার লাইব্রেরিতে দেখতে পাবেন জগতের এমন ভাষা নেই যে ভাষায় রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী অনূদিত হয়নি। দেখলে গর্বে বক্ষ স্ফীত হয়। এমন যে আমাদের ভাষা আমাদের প্রকৃষ্ট সম্পদ তা আমরা বঙ্গের বাইরের বাঙালীরা কি সম্ভোগ করব না? না করলে যে পাপ হবে। তাই বলি, এদেশীয় বাঙালী ভাইবোনেরা এদেশেও মাতৃভাষায় পূজা সমারোহ কর। এ পূজায় আমাদের যে শুধু আনন্দ (তাই নয়), এ-বিষয় আমাদের দায়িত্বও আছে। বাঙালী ছোট ছোট মেয়েরা যখন বাঙালী অলঙ্কারের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে এদেশীয় অলঙ্কারও পরে, বড় মধুর দেখায়। তেমনি আমরাও (যাতে) এ-দেশীয় সাহিত্যের ভূষণ-ভাণ্ডার থেকে রত্ন সংগ্রহ করে বাঙলা সাহিত্য-সুন্দরীকে নতুন ভূষণে সজ্জিত করতে পারি, এদিকে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। এক সময়ে বাঙলাদেশে কোন কোন সাহিত্যিকেরা ফারসী সাহিত্যে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন এবং তাঁরা ফারসী সাহিত্যের সাহায্যে বাঙলা ভাষার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেন। ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় পারস্য কবিতার অনুবাদ যথেষ্ট পাওয়া যায়। হাফিজের অনেক কবিতা তিনি অনুবাদ করেছেন অথবা তা অবলম্বন করে কবিতা লিখেছেন। 'কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে, দুঃখ বিনা সুখলাভ হয় কি মহীতে' ওটি তর্জমা, অথচ এ কথা দুটি সকল

বাঙালীর কণ্ঠেই শুনতে পাওয়া যায়। অনেকেই জানেন বৈষ্ণব পদাবলী বাংলা সাহিত্যের নতুন সম্পদ। চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, বিদ্যাপতির পদাবলী হিন্দী। ব্রজভাষা বাঙালীর ভাষা না হয়েও বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে। আমরা যাঁরা বাঙলার বাইরে থাকি, আমাদের কর্তব্য হিন্দী, উর্দু, ফারসী, গুরমুখী ইত্যাদি ভাষার উত্থান থেকে মধু আহরণ করে আমাদের বাংলা সাহিত্যকে আরো মধুময় করা। এই দায়িত্বর দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সাহিত্য সম্বন্ধে আরও দু-একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। প্রবাসী সাহিত্যসেবী বাঙালীদের প্রতি আমার দু-একটি নিবেদন আছে। অতি স্নেহ সহকারে ও শুভ অভিপ্রায়ে আপনাদের কাছে সে নিবেদন জানাচ্ছি। যদি কারও মনঃপূত না হয় তাহলে আমায় মার্জনা করবেন। যে নিবেদন করছি সাহিত্যসেবীরা সেদিকে মনোনিবেশ করলে সুখী হবো। আমার মতে সাহিত্যের উপকরণ সাধারণতঃ তিনটি। ভাব, ভাষা ও ভঙ্গি :

ভাব

যদি আমি ভাবের নিয়ময়তার পক্ষপাতী তথাপি আমি কখনও বলি না যে কতগুলি হিতোপদেশই সাহিত্যের একমাত্র লক্ষ্য। বর্তমান বাঙলা সাহিত্যে দু একটি জিনিস দেখে একটু দুঃখিত ও শঙ্কিত হই। কয়েকটি আবর্জনা আমাদের সাহিত্য সম্পদকে কিঞ্চিৎ মলিন করে তুলছে। কোন কোন লেখা অশ্লীলতার দোষে দুষ্ট। আর্টের দোহাই দিয়ে, বাস্তবতার দোহাই দিয়ে সাহিত্যে অশ্লীলতার প্রচলন ও প্রচার করলে অন্যায় করা হবে। উদীয়মান সাহিত্যিকেরা এ বিষয়ে একটু সতর্ক হবেন। বাস্তবতাকে বর্জন করলে সাহিত্য চলে না, একথা স্বভাবসিদ্ধ। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র কেউই বাস্তবতাকে উপেক্ষা করেন নাই। সত্যের ওপর সাহিত্যের আসন। তবে সব মলিন সত্য বা কুৎসিত বাস্তবতাই সাহিত্যের আধার নয়। কতগুলি বাস্তবতা সুসাহিত্যে বর্জনীয়। কেননা সাহিত্যের আশ্রয় শুধু সত্য নয়, শিব ও সুন্দরও সাহিত্যের আশ্রয়। যে সাহিত্য অ-শিব, অ-সুন্দর সে সাহিত্যে যত বাস্তবতা থাক না কেন তা পরিত্যাজ্য।

বর্তমান বঙ্গ সাহিত্যে আর একটি ত্রুটি কখনো কখনো লক্ষিত হয়, সেটি হচ্ছে ভাবের অস্পষ্টতা। ভাবের অস্পষ্টতার সঙ্গে আরও অস্পষ্টতা দেখতে পাই। সাহিত্য যদি এত দুরধিগম্য হয় যে তার অর্থ বুঝবার চেষ্টা পদে পদে প্রতিহত হয়, তাহলে সাহিত্য শুধু একটা সমস্যাতে দাঁড়ায়। সাহিত্যের লক্ষ্য বোধহয় তা নয়। অবশ্য এ দলের লেখকেরা হয়ত বলবেন এ পাঠকদের বুঝবার ক্ষমতার অভাব লেখকের লেখার দোষ নয়। কোন কোন স্থানে হয়ত একথা সত্য কিন্তু আমার মনে হয় না যে

একথা সম্পূর্ণ সত্য। কোন কোন স্থলে লেখকেরা হয়ত নিজেরাই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না কি লিখছেন। তাঁদের কাছে না বুঝতে পারা অথবা না বোঝাতে পারায়ও একটা আনন্দ আছে। সেই আনন্দে তাঁরা বিভোর। মাঝে মাঝে দেখতে পাই ভাব যখন খুব প্রচ্ছন্ন ও আচ্ছন্ন ভাষার আড়ম্বর ও সাজসজ্জা তত বেশি। ভাষার আচ্ছাদন ও আলোড়ন এত বেশি যে ভাবের শুভ-দৃষ্টির পথ রুদ্ধ হয়ে থাকে। সাহিত্যের উদ্দেশ্য পুরাতনকে নূতন করে দেখানো। যে নূতন ভাব-সৌন্দর্য পূর্বে চোখে পড়ে নাই, তা চোখের সামনে মনের সামনে ধরা; কিন্তু দেখতে পারা চাই। লেখক যদি শুধু নিজেই বুঝলেন বা না বুঝলেন আর কেউ না বুঝুন, তবে লেখার সার্থকতা কী। আমাদের নবীন লেখকদের এই বিষয়ে একটু সতর্ক হতে অনুরোধ করি। কালিদাস বলে গেছেন বাক্য এবং অর্থ দুয়ের সমাবেশ হলে তবে হর-পার্বতীর মিলন হয়। সাহিত্য সম্বন্ধেও তাই।

ভাষা

সাহিত্যের ভাষা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা বড় কঠিন। এ বিষয়ে গোঁড়ামি করা ধৃষ্টতা। সাহিত্যের ভাষা কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকবেই। ভাষায় বৈচিত্র্য অবশ্যম্ভাবী ও বাঞ্ছনীয়। ইহা লেখকের রুচি, শিক্ষা ও অভ্যাসের ওপর নির্ভর করে। আমি নিজে যদিও সরল ও সুপাঠ্য ভাষার পক্ষপাতী তবু আমি মার্জিত ও সংস্কৃতঘেঁষা খুব সম্ভোগ করি। কাঁচা বয়সে রবীন্দ্রনাথ মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভাষার বিদ্রূপার্থক সমালোচনা করেছিলেন, কিন্তু তারপরে তিনি সমালোচনার ভ্রম নিজে স্বীকার করেছিলেন। যে ভাষা শ্রুতিমধুর, যে ভাষা ভাবকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারে—যে ভাষা নিতান্ত আড়ষ্ট বা অস্পষ্ট নয় সে সাহিত্যের সমীচীন ভাষা। আমি নিজে সরল ভাষার পক্ষপাতী কিন্তু তরল ভাষার বিরোধী। আধুনিক সাহিত্যেও কখনও কখনও তরলতা লক্ষ্য করি। আমি নিজে লিখিত ভাষায় প্রাদেশিকতার আতিশয্য অপছন্দ করি। কলকাতার ভাষা যদিও সাহিত্যের ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে তবু তারও আতিশয্য নিরাপদ নয়। ধরুন যদি চট্টগ্রামবাসী কিম্বা শ্রীহট্টবাসী বা বঙ্গের অন্যান্য স্থানের সাহিত্যিকেরা জেদ ধরেন তাঁদের স্থানীয় ভাষাও বাঙলা সাহিত্যে চালাতে হবে তাহলে বাংলা সাহিত্যের কি দুর্দশা হবে বুঝতেই পারেন। মনে রাখতে হবে বাংলা সাহিত্য সমস্ত বাংলার সাহিত্য। বাঙালী যে যেখানে আছেন তাঁদের সাহিত্য। বড়ই গৌরবের বিষয় আমাদের বাঙালী মুসলমান ভাইদের মধ্যে অনেক সুসাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়েছে। অনেক স্থানেই তাঁদের বাংলা ভাষা বড় মনোরম। আমি তাঁদের রচনা খুব আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করি। তাঁরা অনেকেই সাহিত্যের উচ্চ স্থান অধিকার করেছেন। তাঁরা বাঙালী তাই তাঁদের ভাষাও

বাংলা। আমি অন্তরের সহিত কামনা করি হিন্দু-মুসলমান সাহিত্যিকদের ভাষায় যেন কোনরূপ প্রকট পার্থক্য না এসে পড়ে। উভয়ের আদর্শের আদান-প্রদানে যেন বাংলা সাহিত্যের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হয়।

ভঙ্গী

ভাষার ভঙ্গী অর্থাৎ স্টাইল সাহিত্যকলার এক প্রধান অঙ্গ। লেখকের ভাষার ভঙ্গীর ওপর তাঁর রচনার সম্মোহনতা অনেকটা নির্ভর করে। রচনার ভাব ও ভাষা যতই গুরুগম্ভীর হোক না কেন যদি তার প্রকাশভঙ্গী মনোরম না হয় তাহলে সাহিত্য হিসেবে সে রচনা পঙ্গু। রচনাভঙ্গীর কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। ভঙ্গীর বৈচিত্র্য সাহিত্যের ঐশ্বর্য। বড় বড় সাহিত্যিক যাঁরা, তাঁদের রচনাভঙ্গী মনোহারী ও স্বতন্ত্র। যুগ হিসেবে হয়ত সাহিত্যের স্টাইলের অনেকটা ঐক্য ও সমতা লক্ষ্য করা যায়, যেমন বৈষ্ণব কবিদের যুগ, মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের যুগ, বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ, রবীন্দ্র-নাথের যুগ আর এখন শরৎচন্দ্রের যুগ। এঁদের লেখার ছাপ সমসাময়িক লেখকদের ওপর পড়ে। এবং সেই যুগপ্রবর্তকদের স্টাইল সে যুগের স্টাইল বলা যেতে পারে। কিন্তু সুলেখক মাত্রেরই একটা নিজের প্রকাশভঙ্গী আছে যাহা অনুকরণীয়। অনুকরণের চেষ্টা বিস্তর হয়। কিন্তু সফলমনোরথ হওয়া ততটা সহজ নয়। যদিও বাস্তব অনুকরণ দুঃসাধ্য তবু সাহিত্যমহারথীদের প্রভাব এড়ানো সমসাময়িক লেখকের পক্ষে ততদূরই দুঃসাধ্য। বাংলা সাহিত্যের একচ্ছত্র সম্রাট রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের প্রভাব বাঙালী লেখকমণ্ডলীর ওপর অল্প বিস্তর পড়েছে। শত চেষ্টায় প্রকৃত অনুকরণ সহজ নয়, তেমনি শত চেষ্টায় প্রধান সাহিত্যিকের রচনাভঙ্গীর প্রভাব এড়ানো সহজ নয়। তবু আমি নবীন লেখকদের বলি তাঁরা যেন তবু অনুকরণের চেষ্টা না করেন, তাঁদের নিজস্ব স্টাইল যেটা আপনা হতে আসে সেটাকে যত্নে রক্ষা করেন। অজ্ঞাতসারে অপরের প্রভাব পড়ে পড়ুক। সুলেখকের স্টাইলের স্বকীয়তা অক্ষুণ্ণ রাখা বাঞ্ছনীয় মনে করি। মুখোস পরে নিজের আকৃতির দৈন্য অনেকদিন ঢেকে রাখা যায় না। নিজের সাহিত্যের আকৃতিকেই সুপরিমার্জিত করে স্বাভাবিক উপায়ে তাকে অন্তত হাস্যাস্পদ হতে হয় না।

উপসংহারে আমি গর্বের সহিত বলি, বর্তমান বাংলা সাহিত্যের যা কিছু ত্রুটি থাক না কেন, আমাদের বাংলা সাহিত্য ক্রমেই উন্নতির স্তরে আরোহণ করবে। একদিন তখন বাঙালী সাহিত্যে কয়েকজন মহারথী ছিলেন, আর বাকি সব নিম্নস্তরের। আজকাল সুসাহিত্যের স্তরও বিস্তর উঁচুতে—যাকে ইংরাজীতে বলে 'লেভেল' সেটি অনেক উন্নতি লাভ করেছে। যেটি খুবই শ্লাঘার বিষয়। যদি কিছুক্ষণের জন্যে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, কেদারনাথ প্রমুখ সাহিত্যিকদের লেখা ভুলে থাকা যায়, তবু সুপাঠ্য ও সুখপাঠ্য সাহিত্যের দৈন্য কেহ বোধ করবেন না। এটি খুব বড় কথা।

দীর্ঘ অভিভাষণ শেষে ক্লান্ত হয়েছেন অতুলপ্রসাদ। সভা শেষে সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অতুলপ্রসাদ বলেছেন, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি চারুচন্দ্র দাস মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে কি? আমি তাঁর বাড়িতে আছি। চলুন না, দেখাটাও হয়ে যাবে।

বেশ তো চলুন, দেখা করে আসি। চলতে চলতে অতুলপ্রসাদ কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেছেন, আমি আজই চলে যাব ভাবছি।

কেদারনাথ বলেছেন, আপনার না আসাই উচিত ছিল, কেন এমন শরীর নিয়ে আপনি এলেন?

অতুলপ্রসাদ হেসে বলেছেন, না এসে আমার উপায় ছিল না, ভদ্রলোকদের কথা দিয়েছিলাম যে।

অসুস্থ শরীর, তবু একজন মহিলা হঠাৎ তাঁকে গাইবার অনুরোধ করলেন। মহিলার অনুরোধে গাইতে হল। কাকেও ক্ষুণ্ণ করতে চাইলেন না। তাঁকে একেলা লখনউ ফিরতে দিতে ইচ্ছে ছিল না কেদারনাথ ও কুমুদরঞ্জনের। তাঁরা অতুলপ্রসাদের শরীরের জন্যে ভাবিত হলেন।

* * * *

গোরক্ষপুব অধিবেশনের পর লখনউতে ফিরে এলেন অতুলপ্রসাদ। লখনউ-এ কিছু মাস এগিয়ে গেল, শরীর সুস্থ হল না। ডাক্তারেরা বললেন, আপনার জলহাওয়া পরিবর্তন হওয়া দরকার। এখানে আপনার শরীর ভাল থাকছে না, আপনি সমুদ্রতীরে কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে আসুন। সমুদ্রের জলহাওয়া ব্লাডপ্রেশার রুগীদের পক্ষে ভাল।

দাদা লিখলেন, নদীতীরে তোমার জন্যে একখানা ছোট বাড়ি দেখে রেখেছি, চমৎকার জায়গা, তুমি আসবে লিখলে তোমার জন্যে বাড়িটা ভাড়া নিয়ে রেখে দেব, তুমি আমার কাছে এসে বিশ্রাম কর।

কিরণ লিখল, তুমি কলকাতায় এসো। নীলরতন সরকারের ট্রীটমেণ্টে তোমাব স্বাস্থ্যের একবার উন্নতি হয়েছিল। কলকাতার ডাক্তাররাই তোমার শরীর সারাতে পারবেন।

চৈত্র মাসে কলকাতায় যাওয়াই একরকম স্থির হল। অতুলপ্রসাদ সারাক্ষণ শুয়েই থাকেন, কাজকর্ম বন্ধ। লখনউ থেকে অতুলপ্রসাদ বিদায় গ্রহণ করছেন; এ কি চিরবিদায়ের আভাস! বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন, গুণমুগ্ধ লখনউয়ের অধিবাসীরা একে একে জড়ো হলেন দুঃখিত মনে লখনউ স্টেশনে। অনেকে বিদায় জানাতে এসে সাশ্রু-নয়ন হলেন। অতুলপ্রসাদ হেসে বললেন, আমার এখনও অনেক কাজ বাকি, আমাকে আবার লখনউ ফিরে আসতে হবে।

ডাকগাড়িতে সহযাত্রী ছিলেন কিছুদূর পর্যন্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়। প্রতাপগড় পর্যন্ত একসঙ্গে চললেন। তাঁর কাছে বিদায় নিতে হাত বাড়িয়ে চিরবিদায়ের আশঙ্কার ছায়া দেখে শিউরে উঠলেন রাধাকুমুদ, ভাবী দুর্ঘটনার ছায়া তাঁর মন ছেয়ে রইল। এমনকি অতুলপ্রসাদ শেষ পর্যন্ত কলকাতায় পৌছতে পারবেন কি না সে আশঙ্কাও রাধাকুমুদের মন অধিকার করে বসল। তাঁকে একাকী ট্রেনের মাঝে রেখে দিয়ে প্রতাপগড়ে নেমে গেলেন রাধাকুমুদ।

কলকাতায় এসে অতুলপ্রসাদ বালিগঞ্জে কিরণের বাড়িতে উঠলেন। যথারীতি চিকিৎসা শুরু হল। শরীর বুঝি কিছু সুস্থ হয়, তারপরই আবার অত্যাচার শুরু হল, ডাক্তারের কথা হেসে অমান্য করতে লাগলেন। কেদারনাথ এসে নেমেছিলেন অতুলপ্রসাদের বাড়ি থেকে অল্প দূরে ধূর্জটিপ্রসাদের বালিগঞ্জের বাড়িতে। প্রায়ই আসতেন, গল্প করতেন। সেদিন অতুলপ্রসাদ বললেন, আমি এখন বেশ ভাল আছি কেদারবাবু।

কেদারনাথ হাসলেন। বললেন, বেশ ভাল তো।

বিশ্বাস করুন।

যাবার আগে ঘনিষ্ঠ উত্তপ্ত আলিঙ্গনের মধ্যে দিয়ে এ কি শেষ বিদায়ের ইঙ্গিত? কেদারনাথ কেমন যেন বিষণ্ন মনে ফিরে এলেন।

অনেকদিন পর কি জানি কেন প্রফুল্লমনে অতুলপ্রসাদ দাদা সত্যপ্রসাদকে চিঠি লিখলেন :

P 27 Rash Behary Avenue
Calcutta 6-3-34

আমার পরম আপন দাদা,

কিরণের বাসায় তোমার স্নেহপূর্ণ চিঠিখানি পেলাম। আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিছু বলি। দু-মাস পূর্বে আমার ব্লাডপ্রেশার খুব বেশি ছিল, ২৩৫ হয়েছিল। বড় দুর্বল ও রোগা হয়েছিলাম। হঠাৎ একদিন বাঁদিকটা অবশ ও ঝিমঝিম বোধ হয়েছিল, সেটা এখনও সারে নি। সেই জন্যে কাজ ছেড়ে চিকিৎসার জন্যে এখানে এসেছিলাম। স্যর নীলরতন সরকার এবং অন্যান্য ডাক্তারেরা দেখেছিলেন। এসেই ইউরিন একজামিন করিয়েছিলাম তাতে সামান্য albumen ও cast পাওয়া গিয়েছিল। একেবারে প্রায় শুয়েই ছিলাম ৩।৪ সপ্তাহ। শুধু ফল খাচ্ছিলাম আর দুধ-দই, কিছু খই আর এক-বেলা সব্জি কিছু নুন না দিয়ে খাচ্ছিলাম। দুধ দই কিছু খাই। গত দুবারেও albumen ও cast পাওয়া যাচ্ছে না। দুর্বলতা কমেছে। বাঁদিকে যে

অবশ ও ম্লানো ভাব ছিল, তা সামান্য কমেছে। হাঁটতে কষ্ট হয় না। তবে হাতে ও পায়ে আড়ষ্ট ও জ্বালা-জ্বালা ভাব এখনও আছে, একটু কম। ওজনে খুউব কমে গিয়েছিলাম এখন সামান্য বেড়েছি। দু মাস কাজ ছেড়ে আছি। এখন আর চলে না। ডাক্তারেরা বলেছেন খুব light কাজ করতে পারি। তবে খাওয়া সম্বন্ধে খুউব সাবধান থাকতে হবে। আমি পরশু লখনউ ফিরে যাব। তাই এখন এ অবস্থায় চাঁদপুর যাওয়া হবে না। ভবিষ্যতে যাওয়ার ইচ্ছে রইল। সেখানে কি নদীর ধারে বাড়ি পাওয়া যাবে? এখন তো আবার ঝড়-বৃষ্টির সময় এসে পড়ল। চাঁদপুর কোন্ সময়ে স্বাস্থ্যকর ও সুবিধাজনক? লখনউয়ে জানিও। ভাল কথা, এখন প্রায় ১½ মাস থেকে ব্লাডপ্রেশার ১৮০ থেকে ১৯০-তে স্থির হয়ে আছে। ১৮০ আমার প্রায় নর্মাল অনেকদিন থেকে। আমার হেল্‌থ্‌-এ কোন দোষ নাই। কিডনি প্রায় সেরেছে, মাথাটা মাঝে মাঝে খুউব গরম হয়। আবার সেরে যায়। আমি যখন ফিরে যাব, তখন রমারা হয়ত আসবে। বেশ, দেখা হবে। আশা করি বৌঠান ও তোমরা সকলে ভাল আছ। সকলে আমার ভালবাসা নিও।

ইতি তোমার স্নেহের ভাই

অতুল

এক মাস এক দিন পরে সত্যপ্রসাদকে শেষ চিঠি দিলেন। এর মধ্যে লখনউয়ে উপস্থিত হয়েছেন। ডাক্তারের নির্দেশমত অল্প অল্প কোর্টে বেরিয়েছেন, কোর্টের কাজ কিছু করেছেন। আবার শরীর ভেঙেছে, কাজকর্ম থেকে বিদায় নিয়েছেন। স্থির করেছেন, পুরীতে স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য কিছুদিন গিয়ে বাস করবেন। পুরী যাবেন, অথচ হাতে টাকা নেই। কাজকর্ম বন্ধ। অথচ খরচের কি কমতি আছে! সকল কিছুই রাখতে হবে, কিছু ত্যাগ করা চলবে না। দান ধ্যান সমানে চলে—চির জীবন যেমন চলেছে তেমনি। আজ এলাহাবাদ থেকে লালগোপাল মুখোপাধ্যায় এলাহাবাদের কোন একটি বিদ্যালয়ের সাহায্যের জন্যে দানস্বরূপ কিছু টাকা চাইলেন: 'পাঠিয়ে দাও একটা একশত টাকার চেক।' সুরেশ চক্রবর্তীর 'উত্তরা' চলছে না। 'এই শেষবার, আর নয়।' রামকৃষ্ণাশ্রম; ব্রাহ্মসমাজের উন্নয়নমূলক কাজ হবে; দাও, দাও টাকা; ওদের তো দিতেই হবে। বিধবা মা তাঁর মেয়ের বিয়ে দিতে পারছেন না—কত টাকা লাগবে জিজ্ঞেস কর···এখন উপায় নেই অথচ ইচ্ছা আছে। এ কি নবাব শহর লখনউয়ে বাস করে নবাবী দিলদরিয়া মন? তা নয়, এ তাঁর চিরকালের। ছেলেবেলায় ঢাকার মিরাতারে কিম্বা লক্ষ্মীবাজারের মামার বাড়িতে যখন ছিলেন, তখনও কারো দুঃখ-কষ্ট দেখলে

অস্থির হয়ে পড়তেন। কোন ভিখারী তাঁর কাছ থেকে কোনদিন রিক্ত হাতে ফিরতে পারত না। মুষ্টিভিক্ষার জায়গায় তার ঝুলি ভরে দিয়ে তাকে বিদায় দিতেন। মা কতদিন হাসিমুখে বলেছেন, অতুলের জন্যে আমার ভিক্ষার চাল সবসময়ে ভাঁড়ার ভরে রাখতে হয়, অল্প দিয়ে ওর তুষ্টি নেই।*

পুরীর সমুদ্রের জলহাওয়ায় শরীর ভাল হবে যখন ডাক্তারের অভিমত, তখন সেখানে যেতে হবে বৈকি।

টাকা চাই?

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা ধার নিলেন। ড্রাইভার এসে বললে, সাহাব, একটা কথা বলব যদি মেহেরবানি করেন—

কী, বল না—কী বলবে?

দেশে বাড়িতে অসুখ বিসুখ করেছে আমার পরিবারের। ছুটি চাই।

বেশ, যখন তোমার পরিবারের অসুখ করেছে, যাও ছুটি দিলাম।

ড্রাইভার একটু ইতস্তত করে বললে, সাহাব, আর একটা কথা বলব? যদি মেহেরবানি করে আমাকে কিছু টাকা দেন হুজুর ধার।

কত টাকা চাই?

বড় অসুবিধায় পড়েছি সাহাব, ৫০০ টাকা হলে এ-যাত্রায় আমি বিপদ থেকে পার হতে পারি।

তুমি কিছু কাজ কর না, তুমি এক পয়সা পাবে না!

ড্রাইভার জানে তার আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে থেকে পাঁচশো টাকা তিনি তাকে দিলেন। জানেন হয়ত সে দেবে টাকা, হয়ত নাও দিতে পারে, তাই বলে তার অসময়ে অতুলপ্রসাদ টাকা দেবেন না! কেউ বিপদের সময়ে তাঁর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে অথচ সাহায্য পাবে না এ কি কখনো হয়েছে! এক মাস এক দিন পরে অতুলপ্রসাদ দাদাকে চিঠি লিখলেন।

পুরীর যাত্রাপথে লখনউ থেকে কলকাতা এসে পৌঁছেছেন, কলকাতা থেকে চিঠি লিখলেন। সত্যপ্রসাদ চিঠিখানি পেলেন দু-চারদিন পরে।

Calcutta 13. 4. 34.

দাদা,

তোমার পি-সি পেয়েছি। আমি পরশু পুরী যাচ্ছি। সেখানে একটি ছোট বাড়ি নিয়েছি। ছুটকি, কুন্তু ও দিলীপ আমার সঙ্গে যাচ্ছে ও থাকবে।

---

* শ্রীমতী সুবালা আচার্যের রচনা থেকে। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

একা থাকব না। পুরী শুনেছি ব্লাডপ্রেশারের জন্তে ভাল। এখন ব্লাডপ্রেশার কম আছে। বাড়ির ঠিকানা সেখানে গিয়ে তোমাকে জানাবো। তোমরা আমার ভালবাসা নিও।

তোমার ভাই অতুল

পুরীর ঠিকানা :—

রায়বাহাদুর মহেন্দ্রলাল মিত্রর কুঠি,
পাথরপুরী

পঁচিশ

১৯৩৪এর এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি মাস-খানেক বা মাস-দেড়েকের জন্তে স্বাস্থ্য উদ্ধারের আশায় কলকাতায় কিরণের বাড়িতে থেকে পুরী যাত্রা করলেন অতুলপ্রসাদ। সেই সময়ে পুরীর আবহাওয়া বেশ ভাল। সঙ্গে চলল একমাত্র ছেলে দিলীপ, ছোট বোন প্রভা (ছুটকি) আর তার মেয়ে কুন্তু। সকলের মনেই খুব আনন্দ বেড়াতে যাওয়ার নামে। মহেন্দ্রলাল মিত্রের বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছে।

পুরী যখন যাচ্ছি তখন একবার আমরা কোনারকের সূর্যমন্দির দেখে আসতে পারি তো?

ভুবনেশ্বর আমরা যাব না?

আর চিল্কা লেক?

কোনারকের সূর্যমন্দির কত দিন আগে হয়েছে বাবা?

সম্ভবত ত্রয়োদশ শতাব্দীতে।

পুরী থেকে অনেক জায়গায় যাওয়া যায়, না!

কুন্তুর মা দিলীপের ছুটকি পিসি বলেন, দেখ দিলীপ-কুন্তু, তোমরা পুরী গিয়ে কোথাও বেড়াতে যাবার নাম করবে না। যদি বেড়াতে যেতে হয় কোথাও তোমরা দুজনে যেও, দাদাকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কোরো না। আমরা পুরীতে কী কারণে এসেছি জান তো, শুধু বিশ্রামের জন্তে। পুরী থেকে কোথাও যাওয়া চলবে না।

আহা ওদের আনন্দে বাধা দিচ্ছিস কেন ছুটকি!

পুরীতে পৌছে দাদাকে বলেন ছুটকি, চুপচাপ এখানে শুয়ে বসে বিশ্রাম নিতে হবে তোমাকে। দূরে কোথাও বেড়াতে যাবার নাম করবে না। শুধু যেতে পার সমুদ্রের ধারে। আমরা সকলে সকালে-বিকেলে সমুদ্রের ধারে বেড়াবো, সকলে অল্পক্ষণের জন্তে স্নান করব সমুদ্রে। বেশি পরিশ্রম নয়।

বাজার-টাজার যেতে পারব না ? নিজের হাতে বাজার করার সুখ থেকে আমায় বঞ্চিত করবে ? নিজের হাতে বাজার করার মত আনন্দ আর আছে !

এখন নয়, তোমার শরীর একটু ভাল হোক। তারপর নিজের হাতে বাজার কোরো, মন্দির দেখতে যেও। এখন শুধু বিশ্রাম।

অতুলপ্রসাদ ছোট বোনের স্নেহের শাসনটুকু উপভোগ করেন। প্রথম-প্রথম পুরীতে পৌছে বেশি ঘোরাঘুরি পরিশ্রম শরীরে সহ্য হবে না অতুলপ্রসাদ জানতেন। সেইজন্যে পরিশ্রমের কোন কাজ করার ইচ্ছেও নেই। এসেছেন যখন বিশ্রামের জন্যে, তখন যতটা সম্ভব বিশ্রামই হোক। সকাল সন্ধ্যায় বালুকাবেলায় দিলীপ ও কুন্তুর হাত ধরে ঘুরে বেড়ান অতুলপ্রসাদ, হাঁটতে হাঁটতে ফ্ল্যাগ-স্টাফ পর্যন্ত, অন্যদিকে স্বর্গদ্বার। বালির ওপর বসেন, দিলীপ এবং কুন্তু পাশে বসে থাকে। বালুকাবেলায় নানা মানুষের পায়ের ছাপ, ছুটোছুটি খেলা, নুলিয়াদের স্নান করানো, স্নানার্থীদের জলেতে হুটোপুটি, জেলেদের মাছ ধরা ও সমুদ্রে সংগ্রাম, সমুদ্রের অবিরাম ঢেউ আর গর্জন, ঝড়ের মত হাওয়া, আর পরিষ্কার নীল আকাশ—সব মিলিয়ে বেশ ভালই লাগে। সমুদ্রের ওজোন-ভরা আঁসটে হাওয়ায় প্রথম-প্রথম একটু অস্বস্তি হলেও এখন সয়ে গেছে। খোলা হাওয়া শরীরের সব ক্লান্তি, সব অবসন্নতা মুছে নিয়ে যায়।

মাঝে মাঝে কুন্তু এবং দিলীপ হাত ধরে টানে, চল সমুদ্রে স্নান করতে যাই।

বেশ তো চল।

অনেকক্ষণ ধরে স্নান-পর্ব চলে।

সমুদ্রস্নানে বাতাসে ভ্রমণে শরীর ধীরে ধীরে বল ফিরে পায় যেন। একদিন দেখা হয়ে গেল সমুদ্রবেলায় এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য এবং অধ্যাপক সাতকড়ি দত্তর সঙ্গে, তাঁরা একদল ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে বালুকাবেলায় বেড়াচ্ছিলেন। অতুলপ্রসাদকে দেখে সদলবলে এগিয়ে এলেন।

আপনি কবে এলেন, আপনার শরীর অসুস্থ শুনেছিলাম ? দক্ষিণারঞ্জন বললেন।

অতুলপ্রসাদ হেসে বললেন, শরীরের জন্যই তো পুরীতে আসা। আপনারা দেখছি বিরাট দল নিয়ে পুরীতে……

আমাদের ইউনিভারসিটির মিউজিয়ামের জন্যে প্ল্যাণ্ট কালেকশনে বেরিয়ে পুরীতে এসে পৌছেছি। আমরা কয়েকটা দিন এখানে এখন থাকব স্থির করেছি, হেসে বললেন দক্ষিণারঞ্জন। আসলে আমাদের রথ দেখা কলা বেচা দুই কাজই হচ্ছে। দক্ষিণারঞ্জনের মুখেই শুনলেন লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জ্ঞানেন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় সস্ত্রীক পুরীতে এসে পৌছেছেন, নেমেছেন বি. এন. আর. হোটেলে।

জ্ঞান চক্রবর্তী এসেছেন ? আমাদের লখনউয়ের মানুষ—দেশের মানুষ ; কী যে ভাল

লাগছে! এই পৃথিবীটা গোলাকার; ঠিক দেখা হয়ে যায় কোথাও না কোথাও চেনা-পরিচিত মানুষদের সঙ্গে।
জ্ঞান চক্রবর্তী এলেন সস্ত্রীক তাঁর বিদেশী পুত্রস্থানীয় কাইটেল সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে মহেন্দ্রলাল মিত্রের কুঠিতে অতুলপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করতে। কুশল বিনিময়ের পর তিনি বললেন, আপনি কবে এলেন অতুলবাবু?
এলাম এপ্রিলের সতেরো-আঠারো তারিখে। আপনি কবে এলেন?
এই তো কয়েকদিন হল। শুনেছেন, কৈলাসনাথ কাটজু সাহেবের সঙ্গে গান্ধীজী এসেছেন পুরীতে। গান্ধীজীর সঙ্গে তো আপনার আলাপ আছে।
আছে, আছে।
যাবেন নাকি?
যাওয়া যায়। নিশ্চয়ই যাব। গান্ধীজীকে আমার ভাল লাগে। গান্ধীজীকে আমি শ্রদ্ধা করি। আমার অনেক মতবাদ ওঁর সঙ্গে মেলে।
গান্ধীজীরও আপনাকে ভাল লাগে। আপনার গান শুনেছেন। ওই যে ওই গানটি, 'কে আবার বাজায় বাঁশি এ-মধু কুঞ্জবনে', গান্ধীজীর খুব প্রিয় গান। গান্ধীজী যদি শোনেন আপনি এখানে এসেছেন, তিনি নিশ্চয়ই আপনাকে গান শোনাবার জন্যে ডাক পাঠাবেন।
গান্ধীজী আমাকে গান গাইতে বললে গান শোনাব বইকি!
মিঃ সেন, আপনাকে লখনউতে যেরকম দেখেছিলাম, এখন তার থেকে একটু ইমপ্রুভড্ মনে হচ্ছে।
হ্যাঁ এখন নিজেকে একটু ভাল মনে করছি। শরীরে একটু যেন জোর পাচ্ছি।
জ্ঞান চক্রবর্তী বললেন, আমার ওখানে আপনি কবে আসছেন? একদিন খাওয়া-দাওয়া গান-বাজনা করা যাক।
এই যাব একটু সময় পেলে।
অল্পদিনের মধ্যেই পুরীর সমুদ্রের হাওয়ার গুণে অতুলপ্রসাদের ভাঙা স্বাস্থ্য অনেকটা জোড়া লাগল। তিনি তখন সবল হয়ে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছেন পুরীর রাস্তায়। সমুদ্রে দুবেলা অনেকক্ষণ স্নান করছেন। মনেই হয় না তাঁর শরীরে কোন অসুখ-বিসুখ থাকতে পারে। তাঁর বলিষ্ঠ চলার ভঙ্গি, দীর্ঘ জ্যোতিষ্মান শরীর পুরীর মানুষদের কৌতূহলী করে তুলেছে: কে এই মানুষটি, কী এঁর পরিচয়? ইতিমধ্যে বোন কিরণ এসে পৌঁছে গেল পুরীতে ভাইদাদার বাড়িতে। লখনউ থেকে এলেন রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়। অতুলপ্রসাদকে দেখে তাঁরা খুউব খুশি হলেন।
রাধাকুমুদ বললেন, আপনার শরীরের জন্যে আমি বড় ভাবছিলাম। সত্যি, জানেন,

কয়েক মাস আগে আপনাকে যখন ট্রেনের কামরায় রেখে প্রতাপগড়ে নেমে গেলাম, তখন কী যে দুর্ভাবনা হচ্ছিল কী বলব !

এখন কী রকম মনে হচ্ছে ?

এখন আপনি কিছুটা সেরেছেন।

অতুলপ্রসাদ বললেন, কিছুটা মানে ? আমি সম্পূর্ণ সেরেছি। জান, এখানে এসে এই পুরীর জল-হাওয়ার গুণে আমি আবার আগের জীবন ফিরে পেয়েছি। এখানে এসে কতকগুলি গানও লিখে ফেললাম। শরীর ভাল থাকলে গানও আসে। আর একটা কথা, আমার পরিচয় এখানকার লোকেরা পেয়েছে, আর একটা কাণ্ড ঘটে গেছে।

কেন, কী কাণ্ড হল !

গান গাইতে হবে।

গান ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানেও মজলিশ-টজলিশ আছে দেখছি, রোজই একটা না একটা লেগে আছে। ওরা আমাকে বলে গান গাইতে হবে। আপনার গান আমরা শুনতে চাই, আপনাকে যখন হাতে পেয়েছি।

গাইছেন নাকি গান ?

একটু-আধটু গাইছিও। গান গাইতে আমার বিশেষ ক্লান্তি আসেনি কোনদিন, এখন একটু আধটু কষ্ট হয়। তবে গান গাইলে মনটা খুব খুশি হয়। ওরা যখন আমাকে আদর করে ডাক দেয় তখন কি না গিয়ে পারি—বল তুমি, পারি কি ?

অধ্যাপক দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য তাঁর দলবল-সমেত নেমেছেন দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী মহাশয়ের বাড়ি। দক্ষিণারঞ্জন নিজে সঙ্গীতজ্ঞ, সঙ্গীতরসিক। একদিন এসে অতুলপ্রসাদকে ধরে নিয়ে গেলেন তাঁদের আড্ডায়। সেদিন অতুলপ্রসাদ সেখানে অনেকগুলি স্বরচিত গান গাইলেন। দক্ষিণাবাবুও অনেকগুলি গান সকলকে শোনালেন। চমৎকার একখানা গানের আসর দক্ষিণাবাবুর বাসায় হল।

গান্ধীজী অতুলপ্রসাদকে ডাক পাঠালেন। জানালেন, আপনি যখন এখানে, আপনার গান শোনার জন্যে অতুল আগ্রহ নিয়ে আমি প্রতীক্ষা করে আছি।

বেশ তো, গান্ধীজী যখন ডেকে পাঠিয়েছেন, তখন যাওয়া যাবে। একদিন তাঁকে গান শুনিয়ে আসব। গান্ধীজী যেন কী গান ভালবাসেন! 'কে আবার বাজায় বাঁশি এ-মধু কুঞ্জবনে'। বেশ, সেই গানই শোনানো হবে। একই সুরে সেই গানটির হিন্দী অনুবাদ হয়ে গেল, অনুবাদ করলেন অতুলপ্রসাদ। তারপর গান গেয়ে শোনালেন গান্ধীজীকে সুরেলা মধুর ছন্দে।

শরীর এখন বেশ সুস্থ। দুর্বলতা নেই। বেশ সতেজ শরীর। সমুদ্রের হাওয়া

দেড় মাসের মধ্যে তাঁর শরীরকে আশ্চর্যরকম সারিয়ে তুলল। ফিরে এল সেই উজ্জ্বলতা।

পুরীর জীবন ক্রমে একঘেয়ে হয়। কাজের মানুষদের পক্ষে অলস ভাবে ছুটি উপভোগ করাও অসহনীয়। অতুলপ্রসাদ বললেন, চল্ ছুটকি আমরা এবার ফিরে যাই। আর পুরী ভাল লাগে না। কতদিন আর কাজকর্ম ছেড়ে থাকব।

ছুটকি বললে, যাবে যে, শরীর তোমার সুস্থ হয়েছে, সেরেছে কি?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, অনেক ভাল, বেশ ভাল।

পুরী থেকে প্রথমে কলকাতায় এলেন পরিজনসহ, তারপর দিলীপকে নিয়ে পুরাতন কর্মক্ষেত্র লখনউয়ের পথে পা বাড়ালেন অতুলপ্রসাদ। তাঁকে দেখে, কাছে পেয়ে লখনউয়ের বন্ধুবান্ধব, ভক্ত পুরবাসীদের মনে আনন্দ আর ধরে না। অনেকে আশ্বস্ত হয় তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখে। পুরীর সমুদ্র তাঁকে নতুন জীবন, উজ্জ্বল স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দিয়েছে। তিনি এখন তবে অনেকদিন আমাদের মধ্যে থেকে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলি উপহার দেবেন।

কিন্তু কে জানত, ক্ষণিকের এই উজ্জ্বলতা, ক্ষণিকের এই দীপ্ত শিখার মাঝেই মহাকালের মহাসমাধির ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে!

ছাব্বিশ

আজ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের সেই ৫০০০ টাকার শেষ কিস্তিটা শোধ করে দিয়ে এলাম, জান হেমন্ত। আর কোন ভাবনা চিন্তা নেই, আমার উইলটাও হয়ে গেছে। তোমরা দুজন, ঘোষ আর দাশ আমার দুই জুনিয়র সাক্ষী রইলে। আমার সব কাজ শেষ, এবার নিশ্চিন্তে আরাম।

ব্যারিস্টার হেমন্তকুমার ঘোষ হয়ত সেদিন বলেছিলেন, আপনার এত তাড়াতাড়ি উইল করার কোন দরকার ছিল না, আপনি এখনও অনেক দিন বাঁচবেন। আপনাকে আজ সত্যি খুব bright মনে হচ্ছে।

সেদিন ২৪ আগস্ট, শুক্রবার, ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দ। বাংলা ৭ই ভাদ্র, ১৩৪১ সাল।

আমি বলছি তো আমি সম্পূর্ণ সেরে গেছি, আমার শরীরে কোন বেদনা নেই, কোন ক্লান্তি নেই; আমি খাটতে পারি কুড়ি বছর আগে যেরকম খাটতাম। কী, তুমি কি আমার শক্তি পরীক্ষা করতে চাও নাকি?

ব্যারিস্টার হেমন্তকুমার ঘোষ হেসে বললেন, না, না।

সেদিন তাঁকে খুউব উৎফুল্ল এবং উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। পুরীর সামুদ্রিক জলহাওয়ার গুণে তাঁর শরীরের সব অসুখ যেন সেরে গেছে। একেবারে নীরোগ বলে মনে হচ্ছিল।

পরের দিন ২৫ আগস্ট, শনিবার, বাংলা ৮ই ভাদ্র। সেদিন সকালে হঠাৎ কি মনে হল, তিনি পাড়ার চেনা জানা মানুষদের বাড়িতে গেলেন, হাসিমুখে সকলের খবরাখবর নিলেন, কে কোথায় আছে, কে কেমন আছে ইত্যাদি···প্রাতঃভ্রমণে প্রতিদিনই বেরোতেন। সকলের খবরাখবরও নিতেন। কিন্তু সেদিন যেন বিশেষ করে প্রতিটি চেনা-জানা মানুষের সংবাদ জানার জন্যে ব্যাকুল। ব্যারিস্টার ঘোষকে বললেন, তোমার মেয়েরা কোথায়? তাদের অনেকদিন দেখিনি। ডাক তো দেখি, তারা সকলে কেমন আছে! হেমন্তর একটি মেয়ের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, আদর করলেন। রাধাকৃষ্ণ শ্রীবাস্তবের বাড়িতে যখন পৌছলেন, রাধাকৃষ্ণ বড় জামবাটি-ভরা দুধ ব্যারিস্টার সাহাবের জন্যে সামনে এনে বললেন, আইয়ে আইয়ে সেন সাহাব, পিজিয়ে। ছেলেমানুষের মত হেসে সেনসাহেব সে-দুধ পান করলেন।

প্রাতঃভ্রমণ সেরে ফিরে এলেন অতুলপ্রসাদ। সুবালামাসি এবং তাঁর মেয়ে উষা কিছুদিন আগেই লখনউ থেকে কলকাতায় ফিরে গেছেন। চারবাগের বাড়িতে কেবল দিলীপ। অসুস্থ হেমকুসুম ক্যান্টনমেণ্ট রোডের বাড়িতে। হিরণ বিলেতে, কিরণ নৈনিতালে, প্রভা কলকাতায়, দাদা পূর্ববাংলায়—একাকী অতুলপ্রসাদ, দীর্ঘ দেহ, মুখে সকল সময়ে হাসি, ফিরে আসছেন তাঁর চারবাগের শূন্য প্রাসাদ হেমন্তনিবাসে। প্রাসাদ তো নয়, পান্থশালা। হৃদয়-ভরা দুঃখ, মুখে হাসি সবসময়ে, কণ্ঠে গান··· বেশ কিছুদিন আগে অতুলপ্রসাদ গান গেয়েছিলেন, তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিও। শ্রোতা ছিলেন দিলীপকুমার রায়। গাইতে গাইতে তাঁর কণ্ঠ এসেছিল গাঢ় হয়ে সে সন্ধ্যায়। দিলীপকুমার রায়কে সেদিন সে গানটি শেখান, বলেন, দিলীপ এ গানটি কিন্তু যার-তার কাছে গেও না। এ গান আমার বড় ব্যথার দিনে লেখা। তারপর প্রাণখোলা হাসি হেসে মাতিয়ে তুললেন সকলকে।

অনেক রাত্রে একসঙ্গে শুয়ে অতুলপ্রসাদ দিলীপকুমারকে বলেছেন, জান মণ্টু কী আমি প্রার্থনা করি ঈশ্বরের কাছে?

দিলীপকুমার বলেছেন, কী অতুলদা?

অতুলপ্রসাদ বলেছেন, শ্মশানে যেদিন আমাকে নিয়ে যাবে সেদিন চিতায় শুয়ে হঠাৎ যেন একবার সকলের দিকে চেয়ে হেসে চোখ বুজোই।

সেদিন কি তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর যাওয়ার সময় হল? এ জগতের বাইরের কোন রহস্যময় জগৎ কি তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাক দেয়? এ জগতের মানুষকে ছেড়ে যেতেও কষ্ট হয় বুঝি। এদের দুঃখ-বেদনা, দৈন্য-দুর্দশা তাঁর মনকেও বেদনা দেয়···তাই কি তিনি বলেছেন, আমি হাসি মুখে যেতে চাই!

তুমি যখন পৃথিবীতে এলে তুমি কেঁদেছিলে, জগৎ হেসেছিল। এখন তুমি এমন

কাজ করে যাও যাতে এ-লোকের খেলা শেষ হলে তুমি হাসতে হাসতে চলে যাবে, জগৎ তোমার জন্যে কাঁদবে।

অতুলপ্রসাদ প্রাতঃভ্রমণ সেরে ফিরে এলেন তাঁর চারবাগের বাড়ি হেমন্তনিবাসে। প্রতিটি মানুষ বোধহয় নিঃসঙ্গ, একাকী, জীবনভোর। এসেছে একাকী, যেতেও হবে একাকী···কেউই আপন কেউই পর নয়। আমাদের এ হাসা-কাঁদা দুদিনের। কে বলতে পারে, আজ কিম্বা কালই এ খেলার শেষ হবে। আমরা বিদায় জানাব এ জগৎকে। ভৃত্যেরা শশব্যস্ত হয়ে ছিল। মালি ফটক খুলে সরে দাঁড়িয়ে সাহেবের পথ করে দিয়েছিল। ফুলবাগিচার মাঝ দিয়ে লাল সুরকি-ঢালা পথ। পায়ে পায়ে চলে এসে দাঁড়িয়েছিলেন বোধহয় ফুলবাগিচায়। ফুল তিনি ভালবাসতেন, রক্তগোলাপ। নিজের হাতে ফুলগাছের তদারকি করতেন। সেদিনও হয়ত মালির সঙ্গে ফুলগাছ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, উপদেশ দিয়েছেন অথবা মৃদু ভর্ৎসনা করেছেন রোজকার মত। নিজের হাতে গোলাপ-কাটা কাঁচি নিয়ে ঝোপঝাড় পরিষ্কার করতে নিজেই বাগানের কাজে নেমেছেন। বাগানের কাজে ছিল তাঁর ভীষণ শখ। বাগিচায় দাঁড়িয়ে মায়ের নামের স্মৃতি-ধরা তাঁর আপন প্রিয় প্রাসাদখানির দিকে তাকিয়ে ছিলেন। মাকে মনে পড়েছিল হয়ত বেদনাভরা হৃদয়ে—মা চিরকাল একাকী জীবন কাটিয়েছেন ; হেমকুসুম, সেও চিরটা কাল একাকী জীবন কাটালো। বড় দুঃখী হেমকুসুম। সংসারটা কেমন যেন ছন্নছাড়া হয়ে গেল। অথচ কত যত্নে এ সংসার গড়ার ইচ্ছে ছিল, আশা ছিল মনে। মনে আশা ছিল এক সুস্থ সুখী পরিবারের···কিন্তু সব আশা ভেঙে খান-খান হয়ে গেল। কেন ? সে কথার কে উত্তর দেবে!

কী জানি কেন আপন ছেলে দিলীপ, তার কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস পড়ল। ক্ষণিকের জন্যে দাঁড়ালেন গাড়িবারান্দার নিচে। তারপর সিঁড়ি ধরে দু-ধাপ উঠে ডাকলেন—

দিলীপ···দিলীপ!

দিলীপ এল।

বললেন, বেলা হয়েছে নাও স্নান করে নাও। আমরা একসঙ্গে খেতে বসব। খেতে খেতে তোমার সঙ্গে একটা বিষয়ে কথা বলব। দেরি কোরো না।

দিলীপ স্নান সারতে গেল। তিনি লেখার টেবিলের কাছে চেয়ার টেনে বসে এলাহাবাদে কোন একজন পরিচিত মহিলাকে চিঠি লিখলেন। চিঠির শেষে লিখলেন, আমি যাবার আগে কাউকে যেন কষ্ট না দিই, ও নিজে না কষ্ট পাই এই কামনা করি। চিঠি লেখা শেষ হলে হঠাৎ মনে হল কে যেন একখানা অটোগ্রাফের খাতা রেখে গেছে। টেবিলের ওপরই ছিল কালো কাগজের মলাট-দেওয়া খাতাখানি, হাতে দিয়ে কলম তুলে লিখলেন—

"যে জন রহিতে চায় নিজ রুদ্ধ ঘরে
হারানিধি নিরবধি সেই খুঁজে মরে।"

লেখা শেষ করে স্নান সেরে ভাত খেতে বসেছেন। সুস্থ মানুষ, সবল মানুষ। ভাত খেয়ে কোর্টে যাবেন। দিলীপ এসে সামনে দাঁড়ালো। দুজনে খেতে বসলেন। দিলীপের সঙ্গে সামান্য দু-চার কথা···শরীরটা যেন কেমন করে উঠল। রগ-দুটো ধরে গেল, মাথা গরম হল।

দিলীপ বলল, কী হল? অমন করছ কেন? শরীরটা কি খারাপ মনে হচ্ছে?

না, ঠিক আছি। তুমি খেতে বস। গম্ভীর ও ক্লান্ত স্বর অতুলপ্রসাদের।

কয়েক মুহূর্ত গেছে, দিলীপ চিৎকার করে বললে—বাবা······

খেতে খেতে চামচেটা তাঁর হাতের মুঠো থেকে খসে পড়ে গেল প্রথমে। তারপর তিনি চেয়ার থেকে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তখনই তাঁকে ধরাধরি করে তুলে এনে খাটে শোয়ানো হল। দিলীপ ছুটে গিয়ে ব্যারিস্টার এইচ. কে. ঘোষ এবং ব্যারিস্টার মিঃ দাসকে খবর দিল। হেমন্ত ঘোষ ডাঃ সেনকে ডেকে আনলেন; ডাঃ হেমন্ত মিত্র এলেন, কর্নেল হাণ্টার, ডাঃ ব্যাস—চিকিৎসকে চিকিৎসকে ছেয়ে গেল তাঁর চারবাগের বাড়িখানি।

সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হয়ে অতুলপ্রসাদ অজ্ঞান, এ সংবাদ ছড়িয়ে গেল সারা লখনউ শহরময়। হিতাকাঙ্ক্ষী অগণিত জনসাধারণ ভেঙে পড়ল এ. পি. সেন রোডে হেমন্তনিবাসের সামনে। আরোগ্যের খবরাখবর পাওয়ার জন্যে জনসাধারণের চলল ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিশ্চল নিস্তব্ধ উৎকণ্ঠিত উদ্বিগ্ন প্রতীক্ষা।

বেলা তখন একটা দেড়টা হবে। একখানি গাড়ি এসে হেমন্তনিবাসের সামনে দাঁড়ালো। গাড়ির মধ্যে একটি মহিলা। অসুস্থ, শোকে অবসন্ন, দু-চোখে অঝোর জলধারা। হাত তুলে সে অশ্রু মুছে নেওয়ার শক্তি নেই। শরীরের একটি অঙ্গ অসাড় অবশ চিরকালের মত—তিনি হেমকুসুম।*

এই প্রথমবার এবং সম্ভবত শেষবার চারবাগে হেমন্তনিবাসে এলেন হেমকুসুম। এই ঘর এই বাড়ি তাঁর স্বামীর, এখানেই আজ কোন একখানি ঘরে তাঁর স্বামী মুমূর্ষু, মৃত্যুপথ-যাত্রী······আজ এখানে অবারিত দ্বার নয়। জনসাধারণের প্রবেশ নিষেধ। শান্তি-ভঙ্গ হবে এই আশঙ্কায় সেনসাহেবের কুঠি হেমন্তনিবাসের পথ চিরকালের জন্য বন্ধ। আমার স্বামীর বাড়ি। স্বামীর বাড়ি···আমার বাড়ি···একথা বলতে কুণ্ঠা জাগে।

কালো কাপড়ে ঢেকে শরীরটাকে বয়ে নিয়ে স্বামীর শিয়রে একবার এসে দাঁড়ান।

* সত্যকুমার মুখোপাধ্যায়ের পুত্র সঞ্জীবকুমার মুখোপাধ্যায়ের কাছে শোনা, তাঁর চোখে দেখা।

তারপর সকলের অলক্ষ্যে সকলের সেবা শুশ্রূষার মাঝে নিজেকে অপাংক্তেয়, নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় ভেবে অশ্রুপূর্ণ চোখে হেমন্তনিবাস ছেড়ে চলে গেলেন হেমকুসুম।

* * * *

ঘুম আসে না হেমকুসুমের। শরীরে যন্ত্রণা, মনে যন্ত্রণা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা। রাত তখন একটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিট। হাওয়ায় বোধহয় কপাট খুলে গেল, অতুলপ্রসাদ এসে হেমকুসুমের শিয়রে দাঁড়ালেন।

তুমি কখন এলে···কেমন করে এলে গো, সদর দরজা বন্ধ, কে খুলে দিল তোমায় ?

অতুলপ্রসাদ খুব হাসছেন, আর তাঁর সেই রসাত্মক কণ্ঠস্বর : কেন, তুমিই তো।

তাঁর চেহারায় হঠাৎ যেন তারুণ্য ফিরে এসেছে। এসে দাঁড়িয়েছেন অবিকল সেই পোশাকে, যখন প্রথম দেখা হয় বিয়ের রাতে।

কুসুম, কুসুম, তোমার জন্যে আমার বড় মন-কেমন করছিল, তোমাকে আমার একবারটি দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল। তুমি তখন গেলে অথচ তোমার সঙ্গে কোন কথা বলতে পারলাম না, দেখ তো ! তাই এলাম। তুমিও আমার কথা শুয়ে শুয়ে ভাবছিলে বুঝি, তাই না ?

হেমকুসুম হাসলেন, তোমাকেও চোখের দেখা পেতে আমার ইচ্ছে হয়েছিল গো। তুমি এসেছ যখন, আমার বিছানার পাশে একটিবার বসো। তুমি সেরেছ, সুস্থ হয়েছ— আমার কী যে আনন্দ হচ্ছে ! আমার গায়ে একটু হাত বুলিয়ে দাও।

কুসুম, অতুলপ্রসাদ যেন কিছু বলতে চেষ্টা করলেন, কিছু দ্বিধাগ্রস্ত। হেমকুসুমের শয্যার পাশে বসলেন। দুলে উঠল পালঙ্খানি। ধীরে ধীরে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। বললেন, কুসুম তুমি ভাল হয়ে যাবে, সুস্থ হয়ে উঠবে······কুসুম, কুসুম, তোমাকে আমি অনেক দুঃখ দিয়েছি, তোমার জন্যে আমার দুঃখ হয়। তোমাকে আমি সুখে রাখতে পারি নি কোনদিন।

কেন তুমি সুখে রাখনি গো ? বল !

তুমিও তো আমাকে দুঃখ দিয়েছ। আঘাত করেছ। সুখ কেড়ে নিয়েছ, শান্তি নিয়েছ। প্রতি দিনে প্রতি মুহূর্তে যে আঘাত করেছ আমায় সে আঘাতে আমি ভেঙে খান-খান হয়েছি···অপ্রত্যাশিত ছিল তোমার এ আঘাত······কেন আমাকে এত আঘাত দিলে কুসুম ! উত্তেজিত, ক্ষুব্ধ অতুলপ্রসাদ।

বিশ্বাস করো গো, আমি তোমাকে আঘাত দিতে চাই নি···চাই নি, আমি তোমাকে ভালবেসেছিলাম, এখনো ভালবাসি, কিন্তু তুমি আমাকে ভালোবাসনি, আমাকে ভুলে অন্যকে নিয়ে থাকতে চেয়েছ, অন্যকে পেতে চেয়েছ—আমি জানি।···আমার দুর্নাম, তাই তোমারও দুর্নাম এ লখনউ শহরে। কিন্তু এ কথা জেনে রাখ সকলকে ত্যাগ করেও তোমাকে নিয়ে থাকতে চেয়েছি···তুমি বারে বারে আমাকে ভুল করেছ।

কী বললে ! ভুল ? এদেশে আমাদের বিয়ে হল না, তাই আমি তোমাকে বিয়ে করার জন্যে কত দূরে বিদেশে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমার ভালবাসায় কি কোন ফাঁক ছিল ? মনে পড়ে তোমার লণ্ডন-কলকাতার দিনগুলো···মনে পড়ে কুসুম, তোমার সে সব দিনগুলোর কথা ? যখন প্রথম আমরা এলাম এই প্রবাসে লখনউ শহরে, তখন আমি ছিলাম অখ্যাত অজ্ঞাতনামা একজন ব্যারিস্টার। তারপর আমাদের প্রতিষ্ঠা লাভের জন্যে দুজনেরই কী প্রাণান্তকর পরিশ্রম ! তুমি তো সেদিন সব সময়েই আমার পাশে ছিলে। আমাদের মনে কত আশা ছিল আকাঙ্ক্ষা ছিল···তোমাকে পেয়ে আমার মন ভরেছিল—মন ভেবেছিল সব পূর্ণ হল। কিন্তু এ কোন্ অপূর্ণতা···কী পেলাম তোমার কাছ থেকে ! বল, আমি কী পেলাম ? তুমি কী দিয়েছ আমাকে ? ভালবাসা ? কোথায় তোমার ভালবাসা—কতটুকু ভালবাসা ?

বিশ্বাস কর গো, আমি তোমাকে মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসি।

ভালবাসো, তাই আমাকে ছেড়ে বারে বারে চলে গিয়েছিলে।

চলে গিয়েও চলে যেতে পারলুম কই ?

ভালবাসো, তাই আমাকে অপমান করেছিলে বারে বারে···ভালবাসো···তাই··· ভালবাসো !···তুমি ভালবাসো···

তুমি বিশ্বাস কর !

বিশ্বাস নেই এ জগতে কোথাও। ভালবাসাও নেই, কোথাও নেই সৎ মানুষ··· কেবল স্বার্থপরতা আর স্বার্থপরতা ! লোভী মানুষ, নীচতা, নোংরামি এ জগৎময়··· ভালবাসা, প্রেম কোথাও নেই। তবু আমি পেয়েছি কুসুম, আজও এ জগৎ চলে যাঁর জন্যে, যিনি ক্ষমাপরায়ণ, সেই সত্যকে। যাকগে, আমি যাই হেম, আমার সময় হয়ে গেছে—আমাকে যেতে হবে।

হেমকুসুম হাত বাড়িয়ে অতুলপ্রসাদকে ধরতে গেলেন, পারলেন না। হেমকুসুম বিছানায় শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলেন অঝোরধারে। বালিশ থেকে অতি কষ্টে মুখ তুলে বললেন, একটু দাঁড়াও লক্ষ্মীটি। রাগ কোরো না। আমার কথা শুনে যাও। একটু দাঁড়াও তুমি। আবার কবে আসছ ?

আর আমার আসার প্রয়োজন ফুরিয়েছে হেম।

তুমি যেও না···আমার একটা কথার জবাব দিয়ে যাও···তুমি যে বল ঈশ্বর···

সহসা হেমকুসুম দেখলেন, অতুলপ্রসাদ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন ক্ষমাসুন্দর হাসিতে। হাত তুলে তাঁর চিরাচরিত ভাবাবেগে সুরেলা গলায় বললেন, দেখ, এতক্ষণ যা বললাম ভুলে যাও। তুমি অনুতাপ বা দুঃখ কিছুই কোরো না, কেমন ? তুমি···তুমি যা দিয়েছ প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে সে তোমারই দান, তার তুলনা নেই। ভগবানেরও বোধহয়

এই ইচ্ছে ছিল, এই হোক আমার প্রাপ্য। আমরা অবশ্য দুঃখ পেলাম।...আচ্ছা চলি, চলি কুসুম। ভাল থাক এই কামনা করি।

হাওয়ায় দরজায় শব্দ হল। কার যেন পদধ্বনি দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল। আধো ঘুমে আধো জাগরণে হেমকুসুম অতি কষ্টে বিছানায় উঠে বসলেন।...তিনি কি এসেছিলেন? তিনি কি চলে গেলেন...তবে কি তিনি নেই? দু-চোখে হেমকুসুমের জলধারা। শুধু জমে-থাকা স্মৃতি, শুধু স্মৃতি।

* * *

ঘুম ভেঙে লখনউবাসী শুনল, তাদের প্রিয় সেনসাহেব আর নেই। লখনউয়ের আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল সে কথা। জজরা কাছারি বন্ধ করে দিলেন। উকিলেরা বার লাইব্রেরিতে শোকসভা ডাকলেন। লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল-কলেজ বন্ধ হল। সারা লখনউ শহর হিন্দু মুসলমান ক্রিশ্চান নির্বিশেষে ভেঙে পড়ল হেমন্তনিবাসের সামনে তাদের প্রিয় সেনসাহেবকে শেষ দর্শনের জন্যে। শোকের সংবাদ লখনউ অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়ল বাংলা দেশে। বাংলা দেশের, সারা ভারতের নানান সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় কালো রেখার বন্ধনে চিত্রসহ কবি-ব্যারিস্টার-রাজনীতিবিদ অতুলপ্রসাদ সেনের মৃত্যুসংবাদ প্রকাশিত হল। বাংলা দেশের মানুষ মর্মাহত হয়ে শুনল, তাদের প্রিয় গীতকার কবি অতুলপ্রসাদ আর মরলোকে নেই। সাঙ্গ হল কাঁদা হাসা।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ব্যথিত মনে কবি অতুলপ্রসাদের স্মরণে রচনা করলেন—

বন্ধু তুমি বন্ধুতার অজস্র অমৃতে
পূর্ণপাত্র এনেছিলে মর্ত্য ধরণীতে।
ছিল তব অবিরত
হৃদয়ের সদাব্রত,
বঞ্চিত করোনি কভু কারে
তোমার উদার মুক্ত দ্বারে॥
মৈত্রী তব সমুচ্ছল ছিল গানে গানে
অমরাবতীর সেই সুধা-ঝরা দানে।
সুরে-ভরা সঙ্গ তব
বারে বারে নব নব
মাধুরীর আতিথ্য বিলালো;
রসতৈলে জ্বেলেছিলে আলো॥

দিন পরে গেছে দিন, মাস পরে মাস,
তোমা হতে দূরে ছিল আমার আবাস।
"হবে হবে দেখা হবে"
এ কথা নীরব রবে
ধ্বনিত হয়েছে ক্ষণে ক্ষণে
অকথিত তব আমন্ত্রণে ॥
আমারো যাবার কাল এলো শেষে আজি
"হবে হবে দেখা হবে" মনে ওঠে বাজি
সেখানেও হাসি মুখে
বাহু মেলি ল'বে বুকে
নব জ্যোতি-দীপ্ত অনুরাগে,
সেই ছবি মনে মনে জাগে ॥
এখানে গোপন চোর ধরার ধূলায়
করে সে বিষম চুরি যখন ভুলায়।
যদি ব্যথাহীন কাল
বিনাশের ফেলে জাল
বিরহের স্মৃতি লয় হরি'
সব চেয়ে সে ক্ষতিরে ডরি ॥
তাই বলি দীর্ঘ আয়ু দীর্ঘ অভিশাপ,
বিচ্ছেদের তাপ নাশে সেই বড়ো তাপ।
অনেক হারাতে হয়
তারেও করিনে ভয়;
যতদিন ব্যথা রহে বাকি,
তার বেশি যেন নাহি থাকি ॥

বছর ঘুরে গেল। দেখতে দেখতে আরও একটি বছর গেল কোন্ অতীতের কোলে। অণুক্ষণ সেই মুখ মনে পড়ে, সেই কণ্ঠস্বর, হাসি, গান, অভিমান-ভরা মুখখানি। আরো কত যে ছোটখাটো কথা, কত ঘটনার মালা। ভোলা যায় না।

কেন মিছে রাগ এ জীবনে? কেন এত রাগ দ্বেষ, কেন? শরীরে যন্ত্রণা, মনে যন্ত্রণা, দুর্বল শরীর....আর কত কাল, কত দূরে নিয়ে যাবে হে ঈশ্বর!

জুন মাসের প্রচণ্ড গরম। পশ্চিমের শহরগুলির উপর দিয়ে সে বছর প্রচণ্ড গরম হাওয়ার ঝড় বয়ে চলেছে। প্রচণ্ড রোদ, উত্তপ্ত আকাশ বাতাস, জনপ্রাণীহীন পথঘাট;

সকলেই ঘরের কোণে আশ্রয় গ্রহণের জন্য ব্যস্ত। এমন দিনে হেমকুসুমের শেষ দিন উপস্থিত হল। তাঁর স্বামীর মৃত্যুর দুটি বছরের পর আরও কয়েকটি মাস পার হয়েছে। দৈনিক কাগজের পাতায় নানান সংবাদের মাঝে ছোট্ট কালো রেখায় ঘেরা একখানি সংবাদ প্রকাশিত হল :

"পরলোকে শ্রীযুক্তা হেমকুসুম সেন

দয়াবতী পুণ্যশীলা মহিলার মৃত্যু

শ্রীযুক্তা হেমকুসুম সেন গত বুধবার রাত্রে লক্ষ্মৌস্থ তাঁহার নিজ বাটিতে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বহুদিন যাবৎ পক্ষাঘাত রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন।…স্বর্গীয়া হেমকুসুম সেন অত্যন্ত দয়াশীলা ও পুণ্যবতী ছিলেন। লখনউর বহু জনহিতকর ও মহিলা প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এতদ্ব্যতীত সঙ্গীতেও তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি এস্রাজ ও পিয়ানো বাজনায় বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। তিনি স্বর্গীয় স্যর কে. জি. গুপ্তর দ্বিতীয়া কন্যা এবং বিখ্যাত গীতি কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ স্বর্গীয় অতুলপ্রসাদ সেনের পত্নী।"

পরিশিষ্ট

সত্যপ্রসাদ সেনের ডায়েরি

(অতুলপ্রসাদ প্রসঙ্গে)

(সত্যপ্রসাদ সেন পরলোকগত কবি অতুলপ্রসাদ সেনের জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র। বাল্য, কৈশোর এবং প্রথম যৌবন সত্যপ্রসাদ কবি অতুলপ্রসাদের সঙ্গে পূর্ববাঙলার ঢাকা শহরে অতিবাহিত করেন। সেই কারণে কবি অতুলপ্রসাদের বাল্যজীবনের একমাত্র তথ্য-নির্ভর সম্পূর্ণ চিত্র সত্যপ্রসাদ সেনের ডায়েরিতে পাওয়া যায়। অতুলপ্রসাদের বাল্য জীবন, কবির অন্তরঙ্গ পারিবারিক ঘটনা, কবির ব্যথিত হৃদয়, বৈরাগী মন, ভালবাসার কথা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। সেগুলি এই জীবনকাব্য-কাহিনী রচনার ক্ষেত্রে অনেকখানি উল্লেখযোগ্য ও মূল্যবান। সত্যপ্রসাদ সেন অতুলপ্রসাদের কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে অনেকখানি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। সেই কারণে কবিবর অতুলপ্রসাদের কাব্যগ্রন্থ এবং আরো কয়েকটি অপ্রকাশিত গীতিকবিতা লোকচক্ষুর সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। সত্যপ্রসাদ সেন কয়েক বছর আগে পরলোক গমন করেছেন। তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী জ্যোৎস্না সেন তাঁর পিতার ডায়েরি এবং আরো কিছু মূল্যবান কাগজপত্র দিয়ে তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে অনেক সাহায্য করেছেন। নিচে সেই ডায়েরি থেকে কিছু কিছু অংশ তুলে দেওয়া হল।)

"আমার জন্ম ১৭৯৩ শকাব্দ ২৩শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার। দক্ষিণ বিক্রমপুর পরগনা, জেলা ফরিদপুর, মায়েলামে একটি গণ্ডগ্রামে আমার জন্ম হয়। পিতা গুরুপ্রসাদ সেন, মাতা সারদাসুন্দরী। আমার একজন মাত্র কাকা ছিলেন, তিনি ডাঃ রামপ্রসাদ সেন। আর দুজন পিসিমা। বড় পিসিমা বাবারও বড় ছিলেন। প্রথমে বড় পিসিমা, তারপর বাবা, তারপর ছোট পিসিমা। সকলের ছোট ছিলেন আমার কাকামহাশয়।

পিতা বোধহয় বড়পিসিমার বাড়িতে থাকিয়া কবিরাজি শিখিয়াছিলেন। তিনি কবিরাজি করিয়াই সংসার চালাইতেন। অনেকদিন পর্যন্ত তিনি বরিশালের মধ্যে মোহাদিগঞ্জে থাকিয়া চিকিৎসা করিয়াছিলেন। আয়ও বোধহয় সামান্য ছিল। বাবা খুউব মিতব্যয়ী ছিলেন। তিনি ঋণকে বড় ভয় করিতেন। তিনি সর্বদাই বলিতেন অঋণী অপরাধীনের মত সুখী কেউ হয় না। আমিও যেদিন হইতে টাকা উপার্জন করিতে আরম্ভ করিলাম তখনই বাবাকে আনিয়া রাখিয়াছিলাম।

১২ই জানুয়ারি, ১৯২৭

Arrived Lucknow. Found Subala and her daughter Usha Atul's place.

স্টেশনে কোন লোক ছিল না। বড় ভাবনা হয়েছিল। পরে দেখি অতুল আমার পত্র পায় নাই। এই পত্র চার-পাঁচ দিন পরে আসিয়াছিল। মিঃ চিন্তামণি যিনি যুক্তপ্রদেশের মিনিস্টার ছিলেন তিনি অতুলের গেস্ট। আজ চলিয়া গেলেন। অতুল বড় সুন্দর একখানি বাড়ি করিয়াছে, নাম দিয়াছে 'হেমন্তনিবাস' অর্থাৎ খুড়িমার নামে। রাস্তার নাম হইয়াছে এ. পি. সেন রোড। উষার অসুখ। তাই উহারা চেঞ্জে আসিয়াছে। আমার খুড়িমার অভাব আমার প্রাণে বারে বারে জাগিতেছে।

১৩ই জানুয়ারি, ১৯২৭

অতুলের বাড়ি দেখিয়া সুখমিশ্রিত কষ্টই বেশি হইতেছে। হতভাগ্যকে একটা সরাই-খানার মালিকের মত মনে হইতেছে। আজ দুজন কাল দুজন আসিতেছে যাইতেছে। যাহার সকল সময়ে আসিয়া অতুলের সেবা করার কথা তাহার উদ্দেশ নেই। অতুলের বুকের আগুনের কথা মনে করিয়া বাড়ির সৌন্দর্য ম্লান হইয়া যায়।

লখনউতে নসুবাবুকে দেখিলাম। তাঁহাকে দেখিয়া বহুকালের পুরাতন কথা স্মরণ হইল। তিনিও খুউব খুশি হইলেন। একসময়ে ঢাকাতে আমাদের শৈশব হইতেই উঁহাদের সঙ্গে আমাদের খুউব মাখামাখি ছিল। খুড়োমশাইয়ের মৃত্যুর পর নসুবাবুর বাবা গোপীবাবুই অতুলের টাকা পয়সার কোথায় কি আছে বন্দোবস্ত করেন। বিনয় নসুবাবুর ছোট ভাই। আমাদের সমবয়সী, অন্তরঙ্গ।

১৪ই জানুয়ারি, ১৯২৭

দিলীপ আসিল কলিকাতা হইতে। সুবালা ও তাহার মেয়ে উষা অতুলের বাড়িতে আছে। উষার স্বাস্থ্য ভাঙিয়াছে। সুবালার মধুর ব্যবহার আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে। সে-ই বাড়ির কর্ত্রীর ভার নিয়াছে। উষার স্বভাব বড়ই মধুর। একটুও অহঙ্কারের লেশ নাই। আমার খুড়িমার অভাব সুবালা দূর করিতে চেষ্টা করিতেছে। কী আশ্চর্য মাতৃভাব তাহাতে ফুটিয়া রহিয়াছে।

১৫ই জানুয়ারি, ১৯২৭

লখনউয়ের বিখ্যাত হারমোনিয়াম ও তবলা ও সরোদ বাজনা অতুলের বাড়িতে শুনিলাম।"

২০শে জানুয়ারি সত্যপ্রসাদ অফিসের কিছু কাজকর্মের জন্য অমৃতসর যাত্রা করলেন। পরে উত্তর ভারত ঘুরে ৩১শে জানুয়ারি কর্মস্থল চাঁদপুরে ফিরে এলেন।

২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৯২৭

অতুলপ্রসাদের পিতা ডাঃ রামপ্রসাদকে স্মরণ করে সত্যপ্রসাদ লিখেছেন :

"শুনিয়াছি খুড়োমহাশয় ছোট পিসিমার বাড়ি পণ্ডিৎসায় থাকিয়া বাঙলা ও পারসী শিখিতেন। সেই সময়ে তাঁহার সহপাঠীদিগের মধ্যে কালীমোহন ও গোপীমোহন ঘোষ এই দুই ভ্রাতা ছিলেন। পরে উঁহারা খুড়োমশায়ের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। কালীমোহনবাবু গণিত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি দেরাদুনে কাজ করিতেন। তাঁহার বড় জামাতা প্রিন্সিপাল অপূর্ব দত্ত। খুড়োমহাশয় কিছুকাল জপসা ইস্কুলে পণ্ডিতের কাজ করিতেন। তখন তিনি সুপণ্ডিত দীননাথ সেন মহাশয়ের সংসর্গে আসেন। দীনবাবুর পুত্র ডাঃ প্রিয়নাথ সেন আমাদের সহপাঠী ছিলেন। তিনি পরে হাইকোর্টের উকিল হইয়া সুখ্যাতি অর্জন করিয়া অল্পদিনের মধ্যে পরলোক গমন করেন। আমরা প্রথম জীবনে দীনবাবুর নিকটে কিছুদিন শিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম। খুড়ো-মহাশয় পরে কলিকাতায় গিয়া সেখানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট পরিচিত হন। সহায়সম্বলহীন পূর্ববঙ্গবাসী যুবক নিজ অসমসাহসিকতার জন্যই সেই উদার ধর্মপরায়ণ মহর্ষির সহিত পরিচিত হইতে পারিয়াছিলেন, এবং তাঁহার প্রভাবেই ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। মহর্ষির দয়া ও সাহায্যে তিনি সে সময়কার মেডিকেল কলেজের বাঙলা ক্লাসে ভর্তি হইয়াছিলেন এবং সেখান থেকে পাশ করিয়া গভর্মেণ্টের কার্যে নিযুক্ত হন। ঢাকার পাগলা গারদের চার্জে কিছুকাল ছিলেন। কিন্তু তাঁহার চাকরি ভাল লাগে নাই, তাই অল্পকালের মধ্যেই চাকরি ছাড়িয়া ঢাকাতে স্বাধীনভাবে চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করেন এবং খুব সুখ্যাতি ও সম্মানের সহিত নিজ ব্যবসা পরিচালনা করিয়াছিলেন। চাকরিতে থাকার সময়ে তিনি ভাটপাড়া নিবাসী ঋষিতুল্য সাধু কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয়ের (স্যর কে. জি. গুপ্তর পিতা) প্রথমা কন্যা হেমন্তশশীকে ব্রাহ্মমতে বিবাহ করেন।

তেসরা মার্চ, ১৯২৭

"আমি আমার ৭ বৎসর বয়সেই মাতৃসমা খুড়িমা ও স্নেহময় খুড়োমহাশয়ের নিকট ঢাকায় যাই। (তিনি) ঢাকাতে 'নিউ মেডিকেল হল' নামে ডিসপেনসারি মিডফোর্ড হাসপাতালের সম্মুখে খুলিয়াছিলেন। উহাই তৎকালীন প্রাচীনতম ঔষধালয় ছিল। এইখানেই থাকিয়া কালীনারায়ণ ঘটক মহাশয় এবং অটল ভাইগণ কাজ শিক্ষা করিয়া পরে নিজেরা স্বাধীনভাবে চিকিৎসা করিয়াছিলেন। আমাদের বাসারও ডিসপেনসারিতে রোজই প্রধান ডাক্তারগণ মিলিত হইতেন। মেডিকেল স্কুলের টীচার দুর্গাদাস রায়, সূর্যনারায়ণ সিংহ, কাশীচন্দ্র দত্তগুপ্ত এবং প্রিয়নাথ বসু প্রভৃতি প্রতিদিন নিয়মিতভাবে সকালে আমাদের বাসায় চা খাইতেন। হাসপাতালের

কাজের পর ডিসপেনসারিতে বসিতেন, উহাই তাঁহাদের ক্লাব ছিল। সে সময়কার মেডিকেল স্কুলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন ক্রমবিক সাহেব। তিনি পাদরির ন্যায় অমায়িক ও দয়ালু ছিলেন। খালি পায়ে জল-কাদা ভাঙিয়াও রোগী দেখিতে যাইতেন। খুড়োমহাশয় ইংরাজি জানিতেন না, তথাপি সাহেবের ন্যায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতেন। আমাদের ফুলের ও তরকারির সুন্দর বাগান ছিল। খুড়োমহাশয় কি রাজনৈতিক কি সমাজনৈতিক সকল সভাতেই যোগদান করিতেন, বক্তৃতা করিতেন। আমাদের ছোট সময়ে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের মেয়ের বিবাহ নিয়ে ব্রহ্মসমাজে মতভেদ হওয়াতে খুড়োমহাশয় কেশবচন্দ্রের দলভুক্ত হইলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ভাঙিয়া নববিধান সমাজ আরম্ভ হইল (?) নববিধান সমাজের কোন জায়গা না থাকায় আমাদের বাসাতেই সমাজের কাজ হইত। পরে বাবুরবাজারে পাকা বাড়ি হইয়াছিল। এই সমাজ-ঘর নির্মাণের জন্যে খুড়োমহাশয় নিজে ভিক্ষার ঝুলি নিয়া দোকানদার প্রভৃতির নিকটস্থ হইতে লজ্জা বোধ করিতেন না। এইজন্য তাঁহার সম্মানিত আত্মীয়রা তাহাকে বিদ্রূপ করিলেও তিনি পশ্চাদপদ হন নাই। দুঃখের বিষয় তিনি জীবিতকালে এই সমাজের নির্মাণ শেষ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই।

আমরা মিরাতারের গলিতে যে বাসায় থাকিতাম তাহার মালিক ছিলেন কালীপ্রসন্ন বসু। এই বাসায় আমরা ১১ বছর ছিলাম। পাছে ১২ বৎসর থাকিলে আমাদের স্বত্ব জন্মে সেইজন্য আমরা এই বাসা ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছিলাম। তখন আমরা সকলে খুড়োমহাশয়ের শ্বশুরবাড়ি ১৩নং লক্ষ্মীবাজারে গিয়া থাকিতে আরম্ভ করিলাম। আর খুড়োমহাশয় ডিসপেনসারির নিকট এক বাসা নিয়া সেখানেই একা থাকিতেন। রাত্রে লক্ষ্মীবাজারে আসিতেন। কিছুদিন পরে তাঁহার পিঠে একটা ব্রণ হয়। তাহাই শেষে কার্বাঙ্কলে পরিণত হইয়া তাঁহার জীবন শেষ করে। খুড়োমহাশয়ের সাহস এত বেশি ছিল যে এই ফোড়া প্রথম অবস্থায় আয়নার সাহায্যে নিজেই কাটিয়াছিলেন। খুড়োমহাশয়ের বহুমূত্র ছিল। তাহার উপর এই উপসর্গই কাল হইয়া দাঁড়াইল। ব্যারাম বৃদ্ধির অবস্থায় তাঁহাকে লক্ষ্মীবাজারে আনা হইল। সেইখানেই তাঁহার জীবন শেষ হয়।* তাঁহার চিতাভস্ম বহুদিন এই বাড়িতেই ছিল। পরে আমি তাহা আনিয়া মগরে স্বগ্রামে স্থাপন করি। এজন্যে অতুল এবং ভগ্নিরা আমাকে সাহায্য করিয়াছিল। খুড়োমহাশয়ের মৃত্যুর সময়ে আমি 5th class-এ পড়ি। তাঁহার অবস্থা দিনের বেলায় খারাপ হয়, তখন আমি ডাঃ পি. কে. রায়কে সংবাদ দিলাম। তিনি ঢাকা কলেজের প্রফেসর ছিলেন ও মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান

* ডাঃ রামপ্রসাদ সেন পরলোক গমন করেন ১৬ই কার্তিক ১২৯১ শনিবার রাত্রি তিনটা।

ছিলেন। তিনি আসিয়া সকলকে সংবাদ দেন। রাত্রে খুড়োমহাশয়ের আত্মা চলিয়া যায়। ভোরে আমরা শ্যামপুর ঘাটে তাঁহার নশ্বর দেহকে ভস্মীভূত করিয়া আসি। নববিধানের প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গচন্দ্র রায়, গোপকৃষ্ণ সেন, দুর্গানাথ রায়, ঈশ্বরচন্দ্র সেন ইত্যাদি। ডাঃ পি. কে. রায় আসিয়াছিলেন। সমস্ত পথ 'জয় জয় সচ্চিদানন্দ' উচ্চারিত হইয়াছিল। খুড়োমহাশয় এক পুত্র অতুলপ্রসাদ, তিন কন্যা হিরণ কিরণ ও প্রভা রাখিয়া যান।

* * * *

খুড়োমহাশয় খুউব শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। তিনি প্রাতে বিছানায় থাকিয়াই "অয়ি সুখময়ী উষা কে তোমারে নিরমিল" এই গানটি গাহিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া শয্যাত্যাগ করিতেন। পরে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিতেন ও আমাদিগকে দু-একটি মুখস্থ করাইতেন তারপর হাতমুখ ধুইয়া স্নান করিয়া চা খাইতেন। তখন ডাক্তাররা আসিয়া যোগ দিতেন। তারপর যার যার কাজে যাইতেন। তিনি নিজে বাজার করিতেন। কারণ ভাল খাওয়ার দিকে তাঁহার খুউব ঝোঁক ছিল। বহুমূত্রের লক্ষণ দেখা দেওয়াতে আমাদের নিয়ম ছিল দিনের বেলায় ডাল ভাত সহ তরকারি ও রাত্রে মাংস খাওয়া। সেইজন্য বাবুর্চি ছিল। তাঁহার ধর্মবন্ধুগণের নাম পূর্বেই বলিয়াছি। জমিদারদের মধ্যে দিগুবাবু (ব্রজেন্দ্রকুমার রায়, বালিয়াটীর) ও প্রকাশচন্দ্র দাশ মহাশয়ের সঙ্গে খুউব ভাব ছিল। তাঁহারা প্রায় আসিতেন। উকিলদের মধ্যে আনন্দচন্দ্র রায়ের সঙ্গে খুউব ভাব ছিল। তিনি এখনও বাঁচিয়া আছেন। আমরা সর্বদাই সেখানে যাইতাম। আনন্দবাবুর ভাইপো সুধীরবাবু, সুবোধ প্রভৃতি আমাদের বাল্যসঙ্গী ছিল। সুবোধ খুউব ভাল গান করিতে পারিত। তাহার বাবা গোবিন্দ রায়ের রচিত গান "কত কাল পরে" ও "নির্মল সলিলে" সর্বদাই গাইত। তাহারা শৈশবে আগ্রায় ছিল বলিয়া হিন্দী গানও জানিত।

খুড়োমহাশয় শৈশবে নাকি হোলির গান রচনা করিতেন। অতুল বোধহয় কবিত্ব-শক্তি কিছু কিছু পৈতৃক ও অনেকটা মাতামহের নিকট লাভ করিয়াছে। খুড়োমহাশয় বৎসরে একবার বাড়ি যাইতেন। তখন খুউব ধূমধাম হইত। ১২৮৩ সন কার্তিক মাসে তিনি বড় এক বজরা করিয়া খুড়িমা ও অতুলকে বাড়ি আনিয়াছিলেন। তিনি যেদিন বাড়ি থেকে গেলেন সেদিনই খুব ঝড় হইয়া তাঁহার নৌকা পদ্মার উত্তাল তরঙ্গে পড়িয়া চূর্ণ হইয়া যায়। ইহাই ১২৮৩ সালের কুখ্যাত বন্যা। খুড়োমহাশয় অতুলকে কাঁধে করিয়া চরের ওপর দাঁড়াইলেন। সেখানেও বুক পরিমাণ জল। খুড়িমাও কাছে দাঁড়াইয়া। তখন তিনি অন্তঃসত্ত্বা। হিরণ তাঁহার গর্ভে। এ অবস্থা কল্পনা করিতেও শিহরিয়া উঠিতে হয়। ক্রমে ভোর হইলে দেখা গেল সে ঝড়ে কী বিষম ক্ষতি

হইয়াছে। ফরিদপুর নোয়াখলি বরিশালের অনেক স্থানেই এ ঝড়ের আঘাত লাগিয়াছিল

অতুলের জীবন দু-বার জলে বিপন্ন হইয়াছিল। একবার এই পদ্মার জলে, আর একবার ঢাকার খালের মধ্যে ঘোড়ার গাড়ি সমেত পড়িয়া অতি কষ্টে বাঁচিয়াছিল। তখন খুড়িমা সঙ্গে ছিলেন।

আমার জন্মের কিছু পূর্বেই কাকামহাশয় ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ পূর্বক বিবাহ করেন; সেইজন্য দেশের ব্রাহ্মণ সমাজ নাকি আমাদের বাড়ির লোকদিগকে একঘরিয়া করেন। তাহার ফলে আমাদের ধোপা নাপিত বন্ধ হয়। কেহ আমাদের বাড়ি যাইতেন না। আজ পর্যন্ত একদল ব্রাহ্মণ আমাদের বাড়ি যান না। (যদিও এখন তাঁহারা যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন।) শুনিয়াছি আমার জন্মের পর ও অন্নপ্রাশনের দিন ধোপা নাপিত না পাওয়াতে মা আমাকে কোলে করিয়া সন্ধ্যা পর্যন্ত কাঁদিয়াছিলেন। পরে চামটার ৺মাধব বাড়ুজ্জে মহাশয় তাঁহার অধিকারের ধোপা নাপিত পাঠাইয়া আমাদের উদ্ধার করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি খুব প্রতাপশালী ব্যক্তি ছিলেন। এই সূত্রে গাঁয়ে ব্রাহ্মণদের মধ্যে দুটি দল হইল। অন্যদিকে আমাদের নীচ হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে মধুর সম্পর্ক ছিল, আমরা কাউকে দাদা কাকা খুড়ো খুড়ী জ্যেঠী ইত্যাদি সম্বোধন করিতাম। এখন যেমন মুসলমান কি নীচ হিন্দুরা আমাদের ভাত খায় না, উহারা আমাদের ভাত খাইতে দ্বিধা করিত না। আমরা তাহাদের খাদ্য না খাইলে তাহারাই বা খাইবে কেন।

খুড়োমহাশয় বাড়িতে এক স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই স্কুলে আমি ৭ বৎসর বয়স পর্যন্ত পড়ি। বিষ্ণু পণ্ডিত তখন পণ্ডিত মশাই ছিলেন আর সারদা সেন মহাশয়কে দেখিতাম সাব ইন্সপেকটার। তিনি পরে ডেপুটি ইন্সপেকটর অব্ স্কুল ছিলেন। তাহার পুত্র রায়বাহাদুর ললিত ও রামতারণ (ডাক্তার) ঢাকায় থাকার সময়ে আমাদের খেলার সাথী ছিল। আমি ৭ বৎসর বয়সের সময়ে ঢাকায় খুড়ো-মহাশয় খুড়িমার কাছে আসিলাম। সেবার বাবা মাও আসিয়া কিছুদিন ছিলেন। তাঁহারা চলিয়া যাওয়াতে খুব কাঁদিয়াছিলাম। তখন ঢাকাতে দুর্গাদাসবাবু ডাক্তার একটা স্কুল খুলিলেন। আমরা সেই স্কুলে ভর্তি হইলাম। আমি, অতুল, দুর্গাবাবুর তিনপুত্র মনা (জ্ঞানেশ) মতা (পরেশ) ভুতো (দীনেশ), বঙ্গবাবুর ছেলে যোগেশ ও আরো কয়েকটি ব্রাহ্ম ছেলে ছাত্র হইলাম। পড়াশোনা কিছুই হইত না। এই রকমে দুই বৎসর গেল। তারপর আমরা ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে আমি 10th অতুল 9th classএ ভর্তি হইলাম। তখন পোপ সাহেব ছিলেন প্রিন্সিপাল আর কৈলাসচন্দ্র ঘোষ ছিলেন হেডমাস্টার। ঈশ্বরচন্দ্র বসু (স্যর জগদীশ বসুর খুড়ো) ছিলেন

অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাস্টার, তিনি পরে হেডমাস্টার হন। আমাদের সহপাঠীদের মধ্যে নগেন্দ্র নাগ বড় কেমিস্ট হইয়াছে। আমি যখন 5th class এ পড়ি তখন খুড়োমহাশয়ের মৃত্যু হয়। সেই অবধি আমরা লক্ষ্মীবাজারে খুড়োমহাশয়ের শ্বশুরবাড়ি ছিলাম। 1889এ আমি ও অতুল জুবিলি স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স দিই। আমি পাশ করিতে পারি নাই। 1890 আমি ঢাকা মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হই। তখন থেকে আমি মেডিকেল মেসে থাকিতাম। পানীবাবু ৫ টাকা মাসিক দিতেন। অতুল কয়েক মাস দিয়া বিলাত গেল।"

সত্যপ্রসাদ আর এক জায়গায় লিখেছেন, "আমাদের নিবাস জেলা ফরিদপুর, পরগণা বিক্রমপুর, গ্রাম মগর, পোস্ট অফিস পঞ্চপল্লী। মগর, চামটা, ভস্তা, নিলগুণ ও কাঞ্চনপাড়া এই পাঁচ গ্রামের নামে পঞ্চপল্লী পোস্ট অফিস ও পঞ্চপল্লী গুরুরাম (গুরুপ্রসাদ রামপ্রসাদ) হাইস্কুল মগর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়।

জন্মস্থান ও তারিখ

আমার জন্ম মগর গ্রামে ১২৭৮ সন ২৩শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার। পিতা কবিরাজ গুরুপ্রসাদ সেন, মাতা সারদাসুন্দরী।

অতুলের জন্ম ঢাকা শহরে ১২৭৮ সন কার্তিক মাসে এক রবিবারে। পিতা ডাঃ রামপ্রসাদ সেন। মাতা হেমন্তশশী।

অতুলের মৃত্যু ১৩৪১ ৮ই ভাদ্র শনিবার রাত্রি ১-৩৫ মিনিট (ইং মতে ২৬ ৮.৩৪ রবিবার), শ্রাদ্ধ ১৩৪১ ২৪শে ভাদ্র ইংরিজি ৯.৯ ৩৪ রবিবার।

বংশতালিকা

রামধন সেন
|
রাজবল্লভ সেন
|
(আমাদের পিতামহ) কৃষ্ণচন্দ্র সেন
|
দুর্গাপ্রসাদ — উমাতারা — গুরুপ্রসাদ — ভবসুন্দরী — রামপ্রসাদ

উমাতারা → কন্যা অন্নদা
ভবসুন্দরী → বিধু

গুরুপ্রসাদ → সত্যপ্রসাদ, সুমতি, কুমুদিনী, প্রিয়ভাষিণী, রমাপ্রসাদ
রামপ্রসাদ → অতুলপ্রসাদ, হিরণ, কিরণ, প্রভা
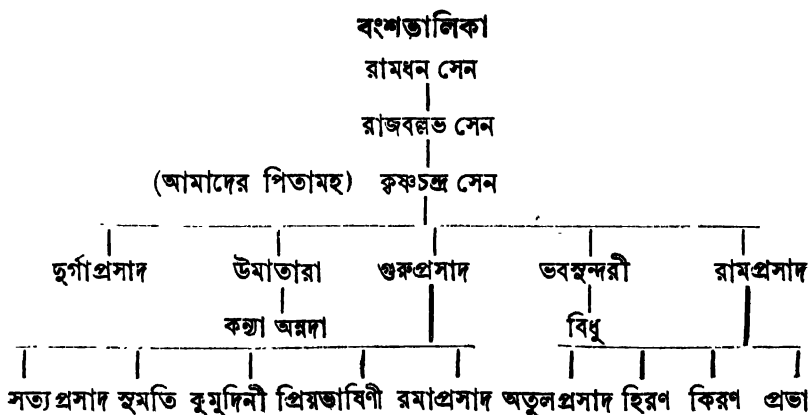
প্রাণাধিক ভাই অতুল, দেখিতে দেখিতে একপক্ষ কাল অতীত হইয়াছে তুমি আমাদের শোক সাগরে ভাসাইয়া গিয়াছ। তোমার অভাবে আত্মীয় স্বজনেরা হাহাকার

করিতেছে আর দেশবাসীরা তোমার জন্যে অশ্রুবিসর্জন করিতেছে। তোমার দান দক্ষিণার কথা অল্প লোকই জানিতে পারিত। তোমাকে দেশবাসী জানিয়াছিল তোমার গানের মধ্য দিয়া। তোমার গান আজ বাঙলার তরুণ তরুণীদের প্রিয় গান। সে গানগুলি রবিবাবুর ওপরে কি নিচে তাহা বুঝিবার সময় এখনও আসে নাই তবে তোমার অনেক গান কেহ কেহ রবিবাবুর গান বলিয়া ভুল করে তা আমি জানি।

ভাইরে আমাকে তো বড় আঘাত দিয়াছ। আর আমাদের দেখা হল না। শিশুকাল হইতে আমরা একত্রে ভোজন একত্রে শয়ন করিতাম। প্রাণের কত আশা আকাঙ্ক্ষার কথা পরস্পরের নিকট শুনিতাম। স্ত্রী পুত্রের সুখের দিক না চাহিয়া সমস্তই গরিব দুঃখীর জন্যে দান করিয়া গেলে। এই ছিল তোমার শেষ আকাঙ্ক্ষা। একথা তো অনেক আগেই আমাকে বলিয়াছিলে। তুমি তো রাজার মত চলিয়া গেলে। তোমার আত্মার কল্যাণ হোক।"

অতুল প্রসঙ্গে

"জিলা ফরিদপুর। পরগণা বিক্রমপুর। গ্রাম মগর নিবাসী ও লখনউ প্রবাসী অতুলপ্রসাদ সেন বার, এট, ল বিগত ৮ই ভাদ্র শনিবার (১২৪১) রাত্রি ১।৪৫ মিনিটের সময় আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবকে কাঁদাইয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। সমস্ত বাঙলা তাঁহার জন্যে কাঁদিতেছে। লখনউবাসীরা তথা সমগ্র আগ্রা-অযোধ্যাবাসীরা তাঁহার অভাবে হাহাকার করিতেছে। তাহার মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধে একটু ভুল আছে। বাঙলা হিসেবে শনিবার। ইংরেজি হিসেবে রবিবার। প্রত্যুষে সংবাদপত্রে তাঁহার আদি নিবাস ঢাকা জেলা বলা হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে আমাদের নিবাস পরগণা বিক্রমপুর, জিলা ফরিদপুর।

অতুলের পিতা আমার পিতা দুই সহোদর ছিলেন। অতুল আমার খুল্লতাত-পুত্র।

আমি আমার ৭ বৎসর বয়সের সময় হইতে ঢাকাতে খুড়িমা খুড়োমহাশয়ের নিকট গিয়া থাকি। তদবধি আমি ও অতুল দুই সহোদরের ন্যায় প্রতিপালিত হই। অতুল আমার ৫ মাসের ছোট ছিল। আমি ঢাকা যাইবার পূর্বেই অতুলের ভগ্নী হিরণের জন্ম হইয়াছিল। আমার পিতা ছিলেন কবিরাজ গুরুপ্রসাদ সেন, মাতা সারদাসুন্দরী। আর অতুলের পিতা ছিলেন ডাক্তার রামপ্রসাদ সেন ও মাতা হেমন্তশশী। আমার ৭ বৎসর বয়স হইতে প্রায় ২০ বৎসর বয়স পর্যন্ত অতুল ও তাহার ভগ্নীদের সঙ্গে একত্র কাটাইয়াছি।

পিতা ও পিতৃত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

পিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র সেন ছিলেন সামান্য অবস্থার বৈদ্য ভদ্রসন্তান। আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি খুব অল্পই ছিল। তথাপি তাহার দ্বারাই শুনিয়াছি সংসারযাত্রা নির্বাহ হইত। পিতামহের তিন পুত্র—জ্যেষ্ঠ দুর্গাপ্রসাদ, মধ্যম গুরুপ্রসাদ, কনিষ্ঠ রামপ্রসাদ আমাদের দুই পিসিমা ছিলেন। বড়পিসিমা বাবারও বড় ছিলেন, ছোটপিসিমা ছোট কাকার বড়। শৈশবে বাবা বড় পিসিমার বাড়ি 'কোটপোড়া' থাকিয়া সংস্কৃত ও আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেন ও কাকা ছোটপিসিমার বাড়ি পণ্ডিৎসায় থাকিয়া বাঙলা ও পারসী শিক্ষা করেন। এই সময়ে রাহাপাড়া নিবাসী গোপীমোহন ঘোষ ও কালীমোহন ঘোষ ভ্রাতৃদ্বয়ও খুড়োমহাশয়ের সহপাঠী ছিলেন। পরে তাঁহারা খুড়োমহাশয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। বাবা বাখরগঞ্জ জেলার মধ্যে মেহেন্দিগঞ্জে থাকিয়া কবিরাজী করিতেন। খুড়োমহাশয় কিছুদিন জপসা গ্রামে পণ্ডিতি করেন। এইখানেই সুপণ্ডিত দীননাথ সেন (সরকার) মহাশয়ের সহিত পরিচিত হন। দীনবাবু কেবল পণ্ডিত ছিলেন না, সুগায়ক ও ভক্ত ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্রও খুব বিদ্বান হইয়াছিল। দ্বিতীয় প্রিয়নাথ হাইকোর্টের উকিল আমাদের সহপাঠী ছিলেন। খুড়োমহাশয় জপসার কাজ ত্যাগ করিয়া নিঃস্ব অবস্থায় কেবল সাহসের উপর নির্ভর করিয়া কলিকাতায় যান। সেখানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত পরিচিত হন এবং তাঁহারই উৎসাহে মেডিকেল কলেজের বাঙলা ক্লাসে ভর্তি হন। মহর্ষির সংশ্রবে আসিয়া তিনি ব্রাহ্মধর্মে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। পরে দীক্ষিত হইয়া ব্রাহ্ম মতে রাজর্ষি কালীনারায়ণ গুপ্তের প্রথমা কন্যা হেমন্তশশীকে বিবাহ করেন। মেডিকেল কলেজ হইতে পাশ করিয়া তিনি বরিশাল মুন্সিগঞ্জ ও পরে ঢাকাতে সরকারী কাজে নিযুক্ত হন। এখানে তাঁহার পসার এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে তিনি সরকারী কাজ ছাড়িয়া নিজে ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং সেইসঙ্গে R. P. Sen & Co New Medical Hall ডিসপেনসারি খোলেন। এই ডিসপেনসারি ঢাকায় সেই সময়ের মধ্যে সর্ববৃহৎ ঔষধালয় ছিল। খুড়োমহাশয় ফুলের বাগানের জন্য বিশেষ যত্ন নিতেন। নিজে কোট-পেণ্টলুন পরিয়া কাজে যাইতেন। আমাদিগকেও কোট-পেণ্টলন পরিয়া শৈশবে স্কুলে যাইতে হইত। তিনি প্রত্যহ নিজে বাজার করিয়া দিতেন। তিনি নিজে খাইতেও পারিতেন ভাল। খাওয়ার দিকে নজরও ছিল। তাঁহার বহুমূত্রের পীড়া ছিল, সেইজন্য প্রতি রাত্রে খাওয়াতে মাংস থাকিত।

খুড়োমহাশয় শৈশবে হোলি ইত্যাদি পর্ব উপলক্ষে গানের দল করিয়া নিজে গান রচনা করিতেন। অতুলের মধ্যেও এই শক্তি বিকশিত হইয়াছিল। সমাজ সংস্কার কি রাজনীতি-ঘটিত যে-কোন সভাসমিতি হইত তিনি তাহাতে উপস্থিত থাকিয়া বক্তৃতা

করিতেন। কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বহুবিবাহ নিবারণ করিবার জন্য যে মহাপ্রাণ রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন সেই পুরুষ-সিংহকে খুড়ো-মহাশয়ের নিকট সর্বদাই আসিতে দেখিতাম। খুড়োমহাশয় তাঁকে উৎসাহ দিতেন শুনিয়াছি। খুড়োমহাশয় বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন। একসময়ে নিজেই বিধবা বিবাহ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন স্বীয় কন্যার বিবাহ কুচবিহারের মহারাজার সঙ্গে দেওয়াতে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল (৬ই মার্চ ১৮৭৮) তাহার ফলে কেশবচন্দ্র সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন ও 'নববিধান অথবা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' নাম দিয়া এক দল নিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।* ঢাকাতে এই আন্দোলনের ঢেউ পৌছাইয়াছিল, ফলে এখানে দুইটি দলের সৃষ্টি হইল। সাধারণ সমাজে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, অতুলের মাতামহ রাজর্ষি কালীনারায়ণ গুপ্ত, ডাঃ পি কে. রায়, প্রসন্নকুমার মজুমদার, রজনীকান্ত ঘোষ, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি, আর নববিধান দলে রইলেন বঙ্গচন্দ্র রায়, দুর্গাদাস রায়, দুর্গানাথ রায়, গোপী সেন, কৈলাস চন্দ্র নন্দী, বৈকুণ্ঠ ঘোষ প্রভৃতি। যতদিন না নববিধানের পাকা মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ততদিন প্রতি রবিবার উপাসনা আমাদের বাসায় হইত। পাকা মন্দিরের জন্যে খুড়োমহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন। মন্দির নির্মাণের জন্যে মান সম্মান ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁর মৃত্যুর অল্পকালের মধ্যেই আর্মানিটোলায় নববিধান ব্রাহ্মসমাজের মন্দির প্রস্তুত হইয়াছিল। খুড়োমহাশয় দেশে গিয়া হাটে বাজারে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার-কল্পে সভা করিয়া বক্তৃতা করিতেন। বাড়িতে সমবেত লোকদের সহিত জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতার আলোচনা করিতেন। কুসংস্কার দোষ তিনি মনে স্থান দিতেন না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি ঢাকাতে এক জুতার দোকান পর্যন্ত খুলিয়াছিলেন। সে সময় হিন্দুদের মধ্যে জুতার দোকানের কারবার করা খুউব হীন কাজ ছিল। আর যেবার পদ্মার ঝড়ে পড়িয়াছিলেন তখনও সকলের নিষেধ না মানিয়া ত্র্যহস্পর্শের দিনে বাড়ি থেকে বাহির হইয়াছিলেন। ভগবানের মঙ্গল হাত সর্বদাই রহিয়াছে ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন।

---

* সত্যপ্রসাদ সেন এই অংশে কিছু ভুল লিখেছেন। দেবেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের নাম 'আদি ব্রাহ্মসমাজ'। পরে কেশবচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের নাম 'নববিধান বা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' বলা হত। এবং পরে কেশবচন্দ্রের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে যে আদর্শগত মতবিরোধ দেখা দিল তাতেই শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্রাহ্মদের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের নাম 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' সর্বশেষে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কলিকাতায় পাঠাবস্থায় একটি স্ত্রীলোকের সহিত খুড়োমহাশয় পরিচিত হইয়াছিলেন। শুনিয়াছি ইহার নিকট অভাবের মধ্যে অর্থসাহায্য পাইতেন। সুদিনের দর্শন পাইয়াও খুড়োমহাশয় ইহাদের বিস্মৃত হন নাই। মৃত্যুর সময়েও ইহাদের জন্য কিছু সংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন।

খুড়োমহাশয়ের একান্ত পিড়াপিড়ির ফলে আমি সাত বৎসর বয়সের সময়ে পড়াশোনা করিবার জন্য ঢাকাতে নীত হইয়াছিলাম। সেখানে আসিয়া পাইলাম অতুলকে। অতুল আমার ৫ মাসের ছোট। তখন হিরণের জন্ম হইয়াছিল। কিরণ ও প্রভা (ছুটকি) পরে জন্মগ্রহণ করে। মায়ের অভাব ভুলিয়াছিলাম স্নেহময়ী খুড়িমার নিকট হইতে—মাতৃস্নেহের আস্বাদ পাইয়া অতুল ও আমি দুই সহোদরের ন্যায় প্রতিপালিত হইতে লাগিলাম। একত্র ভোজন, একত্র শয্যায় শয়ন। আমরা ছিলাম শৈশবের সহচর। একত্রে থাকিয়াও আমি অতুলের কোন গুণেরই অংশ পাইলাম না মনে করিয়া লজ্জায় ম্রিয়মান হইয়া পড়ি। শেষকাল পর্যন্ত আমাদের মধ্যে কেবল ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কই ছিল না, আমরা ছিলাম দুইটি অকৃত্রিম বন্ধু। আমার ঢাকা যাওয়ার অল্পকালের মধ্যেই ঢাকা মেডিকেল স্কুলের টিচার ডাক্তার দুর্গাদাস রায় মহাশয় একটি বিদ্যালয় খোলেন। সাধারণ স্কুলে ছেলেমেয়েদের নৈতিক শিক্ষা হয় না সেইজন্য তিনি এই স্কুল আরম্ভ করেন।...আমরা প্রায় দুই বৎসর ওই বিদ্যালয়ে থাকিয়া প্রায় কিছুই শিখিলাম না, তার কারণ তখনকার মাস্টার মহাশয়রা ছিলেন অন্নদাচরণ সেন, গুরুপ্রসাদ ভৌমিক ও দীননাথ সেন মহাশয়গণ। ইঁহারা ছিলেন নববিধান সমাজের লোক। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের ভিতর হইতে কতকজন ভিন্ন হইয়া নববিধান ব্রাহ্মসমাজ আরম্ভ করিলেন (?)। নববিধানের প্রচারকেরা প্রায় সকলে একটি বাড়িতে থাকিতেন। প্রাতের উপাসনায় প্রায় ১২টা ১টা বাজিয়া যাইত। খাওয়া দাওয়ার পর মাস্টারমহাশয়গণ আসিতেন, তখন দেড়টা দুটো। এখানে পড়াশোনা হয় না দেখিয়া খুড়োমহাশয় আমাকে কলেজিয়েট স্কুলের দশম শ্রেণীতে, অতুলকে নবম শ্রেণীতে ভর্তি করিয়া দিলেন। আমরা তখন নয়াবাজারের মিরাতারের গলিতে থাকিতাম সেখান হইতে বিদ্যালয় খুব দূর হইলেও কখনো গাড়িতে কখনো হাঁটিয়া বিদ্যালয়ে যাইতে লাগিলাম। তখন কলেজিয়েট স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন কৈলাসচন্দ্র ঘোষ আর কলেজের প্রিন্সিপাল পোপ সাহেব।

আমরা কেহ কেহ দুর্গাবাবুর স্কুল ত্যাগ করিলেও তাঁহার উৎসাহ দমে নাই। অল্প কয়েকটি ছাত্র লইয়াই স্কুল চালাইতে লাগিলেন। পরে 'মডেল হাই স্কুল' নাম দিয়াছিলেন। বোধহয় সেখান থেকেই তাঁহার প্রথম পুত্র জ্ঞানেশ ও বিমলানন্দ নাগ এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে এই স্কুলটি লোপ পায়। এই স্কুলের জন্যে

দুর্গাদাস বাবু খুব ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তবু তিনি যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতেন না। তিনি নিষ্ঠাবান ধার্মিক ত্যাগী পুরুষ ছিলেন। ইহারই একমাত্র কন্যা বিনোদমণিকে অতুলের মাতুল গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্ত (পানিবাবু) বিবাহ করিয়াছিলেন। আমি এই পানিবাবুর কাছে চিরঋণী। আমরা কলেজিয়েট স্কুলে থাকার সময়ে যে সকল ছাত্রদের সঙ্গে বিশেষ প্রীতি জন্মিয়াছিল তাহাদের মধ্যে নগেন্দ্রনাথ নাগ ও প্রাণকৃষ্ণ বসু অন্যতম। নগেন্দ্রের মামা ছিলেন ডাঃ পি. কে রায়। নগেনরা বারদীর জমিদার। স্যার জে. সি. বোসের একজন প্রতিষ্ঠাবান ছাত্র। নগেন বোধহয় আনন্দমোহন বসুর এক কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রাণকিশোর ডাঃ পি. কে. রায়ের এক কন্যাকে বিবাহ করিয়াছে। আর আমাদের সতীর্থদের মধ্যে ছিল নলিনী নাগ আর নগেন্দ্র সোম। নগেন্দ্র সোম কবিশেখর উপাধি পাইয়াছে। সে মাইকেলের একজন জীবনী লেখক ও বাঙলা সাহিত্যে সুপণ্ডিত। তাদের সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয় নি। আগেই বলেছি আমাদের ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বসু। বৈকুণ্ঠ রায়, রজনী ঘোষ প্রভৃতি আর পণ্ডিতদের মধ্যে ছিলেন প্রসন্ন বিদ্যারত্ন ও সারদা পণ্ডিত মহাশয়, পরে তাঁহারা ঢাকা কলেজের প্রফেসর হইয়াছিলেন। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন পোপ সাহেব। আমার এখনও বেশ মনে পড়ে তিনি কি করিয়া এক অক্ষরে তাঁর নামটি সহি করিতেন। পোপ সাহেব ভালো ক্রিকেট খেলিতে পারিতেন। তিনি কলেজ ও স্কুলের ছাত্রদের মধ্য হইতে বাছিয়া খেলোয়াড় সহ কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে ম্যাচ খেলিয়া জিতিয়া আসিলেন। তখন ঢাকার ছাত্রদের নাম পড়িয়া গেল। বোধহয় প্রেসিডেন্সির সঙ্গেও একবার জিতিয়াছিল। সে সময়ের খেলোয়াড়দের নাম কিছু কিছু মনে পড়ে। সারদারঞ্জন রায়, তাঁহার ভাই মুক্তিদা ও কুলদা, বসন্তকুমার গুহ, জমিদার যতীন রায়, বিপিন, সুধন্য বসু, বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়। খেলাতে ঢাকার ছেলেদের নাম ছিল। পরে তাহারা একবার রংপুরে গিয়াও ফুটবল ম্যাচ জিতিয়া আসিয়াছিল। পোপ সাহেব ছিলেন সদাশয় ও দয়ালু। তিনি আমাদের নিচের ক্লাসের ইংরাজি পরীক্ষা নিতেন এবং পরীক্ষার সময়ে সাহস দিতে কখনো কখনো কোলে তুলিয়া আদর করিতেন। তারপর আসিলেন বুথ সাহেব—সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির লোক। অঙ্কে সুপণ্ডিত, কিন্তু কারো সঙ্গে বড় সম্পর্ক ছিল না। তখন এমন গল্প প্রচলিত ছিল যে গণিতে তাহার মস্তিষ্ক এত ভাল ছিল যে তাঁহার মৃত্যুর পর মস্তিষ্কের গঠন দেখিবার জন্য দশ হাজার টাকায় উহা বিক্রীত হইয়া রহিয়াছে। এ গল্প সত্য কি জানি না। ডাক্তার পি. কে. রায় সম্বন্ধেও এরূপ গল্প শোনা যাইত। সেই সময়ে কলেজে ছিলেন পি. কে. রায়, সারদারঞ্জন রায়, সূর্যকুমার আগস্থি (পরে

তিনি দেশি সিভিলিয়ান হন) প্রসন্ন বিদ্যারত্ন, আর কেমিষ্ট্রি পড়াইতেন ডাঃ প্রিয়নাথ বসু। তাঁহার লেবরেটরি অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ছিলেন ডাঃ সূর্যনারায়ণ ঘোষ। শেষোক্ত দুইজন প্রকৃতপক্ষে ঢাকা মেডিকাল স্কুলে পড়াইতেন কিন্তু ঢাকা কলেজের কেমিষ্ট্রি শিক্ষা দিতেন। সূর্যবাবু 'রামধনু' নামক বিজ্ঞান-বিষয়ক একখানি সুন্দর মাসিক পত্রিকা বাহির করিতেন।

এই সময় ঢাকা কলেজে একজন দেব চরিত্রের প্রফেসর আসিলেন তিনি অতুলের মেসো-মশাই শশীভূষণ দত্ত। তিনি যেমন বিদ্বান তেমন সুপুরুষ, ততোধিক পূতচরিত্র।··· যেমন তিনি তেমনি তাঁর সহধর্মিণী চপলা দেবী।···ঢাকা কলেজের পর ঢাকাতে আর-একটি কলেজের আরম্ভ হয়—জগন্নাথ কলেজ। ইহার প্রথম প্রিন্সিপাল সংস্কৃত ও ইংরাজিতে সুপণ্ডিত কুঞ্জলাল নাগ।······আমাদের সম্পর্কে ভগ্নিপতি শিবেন্দ্র দাশগুপ্ত ছাত্রাবস্থা হইতে অনেক সময়ে আমাদের বাড়িতে থাকিতেন। তাই আমার ঢাকা হইতে বাড়ি যাওয়া আসা প্রায়ই তাঁহার সঙ্গে হইত। আমরা ছোটকালে তাঁহার সঙ্গে নানা ঠাট্টা তামাসা করিতাম, নানান কারণে তাঁহার সহিত আমাদের আত্মীয়তা খুব ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল।

দুই বৎসর পূর্বে অতুল কলিকাতায় আসিয়াছিল। আমিও ছিলাম আমার স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য কলকাতায়। অতুলের ইচ্ছা হইল আত্মীয়দের কারো কারো সঙ্গে দেখা হয়। একটি দিন ঠিক করা হইল। সেদিন আসিয়াছিল শিবেন্দ্রবাবুর ছেলে দুইজন—বড় ছেলে জ্যোতিষ, মধ্যম ক্ষিতীশ, আর অতুলের বিশেষ ইচ্ছায় আসিয়াছিল স্নেহভাজন অচিন্ত্যকুমার। সে এখন একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক। সেই আনন্দের দিনের কথা মনে করিয়া বুক ফাটিয়া যায়। সেই আমার শেষ দেখা। অতুল গাহিয়াছিল, 'ওগো সাথী মম সাথী'। সংসারের নানা পরীক্ষায় ক্ষতবিক্ষত হৃদয় নিয়া ভাই আমার চিরসাথীর সহিত মিলিত হইতে আকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

ঢাকা শহরের আমোদ-প্রমোদ

"ঢাকা শহর গান বাজনার জন্যে বিখ্যাত। এমন মহল্লা নাই যেখানে ২।৩টা গানের বৈঠকখানা নাই। প্রত্যেক মহল্লাতেই গান ও কুস্তির চর্চা হইত। প্রতি বৎসর হোলির গানের পাল্লা চলিত। বাবুরবাজারের পুলের পূর্বদিক হইতে একভাগ ও পশ্চিমদিক হইতে একভাগ করিয়া ঢাকা শহর ভাগ হইত। দুইভাগের লোকেরা একবৎসর লক্ষ্মী বাজার রাজাবাবুর ময়দানে একবৎসর উর্দু লালাবাবুদের বাড়িতে পাল্লা করিয়া হোলির গান করিত। সুর, তাল, মান, লয় নিয়া গানের বিচার হইত। গানের মধ্যে এমন ভাষা থাকিত যাহাতে গুণগান করিতেছে কি গালি দিতেছে বোঝা কঠিন

হইত। ভানু নামে একজন ওস্তাদ ছিল উর্দুর দিকে। সে একবার গাহিয়াছিল, ভানুকা জ্যোতিসে তেরা ভর দেঙ্গা চাঁদ বদন। অর্থাৎ সূর্যের আলোতে তোমার সুন্দর মুখ ঢাকিয়া ফেলিব। আবার, ভানু নামক ওস্তাদের জুতা দিয়ে তোমার মুখ ঢাকিয়া দেব।

আমরা, বিশেষ করিয়া (আমি) অতুল ও বিনয়মামা এসব গান উপভোগ করিতাম। তখন হিন্দু মুসলমান একত্রিত হইয়াই এ সকল আমোদে যোগ দিত। কি মহরমের তাজিয়া, কি জন্মাষ্টমীর মিছিল, কি হোলির গান হিন্দুমুসলমানেরা পরস্পরের উৎসবে আনন্দে গলাগলি হইয়া উপভোগ করিত। এখন নাকি তাহা হয় না।

ঢাকার একটি উৎসব জন্মাষ্টমীর মিছিল।···এক সময়ে ঢাকা শহরকে দুই ভাগে ভাগ করা হইত। চারিদিক হইতে সহস্র সহস্র নরনারী এই তামাসা দেখিতে আসিতেন। সমস্ত ঢাকা শহরময় একটা আনন্দের সাড়া পড়িয়া যাইত। চারিদিকে লোক সমাগম, নানারকম পণ্যের দোকান, আখ, চিনেবাদামের ছড়াছড়ি। চতুর গাড়োয়ানরা নবাগত সরল পল্লীবাসীদিগকে সমস্ত ঢাকা শহর দেখাইবে চুক্তি করিয়া শহরের খানিক দূর নিয়াই বলিত—হইয়াছে এখন নামেন মহারাজ। আপত্তি করিলে মুস্কিল, তখন নিজ মূর্তি ধরিয়া জোর করিয়া নামাইয়া দিয়া পয়সা আদায় করিত। জন্মাষ্টমী মিছিলের মত আর একটিও মিছিল নাকি সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে হয় না। তবে এখন নাকি আর তেমন হয় না। প্রথমে যাইত ৫০।৬০টি হাতি, তারপর ছোট চৌকি। ঘোড়া ও হাতিদিগকে বহুমূল্যবান ঢাকনি দিয়া সাজাইত। উহাদের শতাধিক ঘোড়া, তারপর কপালে সোনা কি রুপার মালা বাঁধা থাকিত। তারপর বড় চৌকি। চৌকিতে অপর দিকের কুৎসাই বেশি থাকিত। বড় চৌকিতে শিল্প ও রুচির পরিচয় পাওয়া যাইত ও ইহা দিয়াই কোন্ দিক জিতিল বিচার হইত। বড় চৌকিতে পৌরাণিক কিম্বা ঐতিহাসিক ঘটনার চিত্র থাকিত। যেমন—সীতহরণ, পদ্মিনীর চিতারোহণ, ইন্দ্রসভা ইত্যাদি। বড়লোকেরা জাঁকজমক করিয়া নিজ নিজ হাতিতে চড়িয়া বাহির হইতেন। প্রায় প্রত্যেক বড় লোকেরই নিজ নিজ হাতি ছিল। আমরা দু তিনবার বালীয়াটির জমিদার দিগুবাবুর (ব্রজেন্দ্রকুমার রায়) হাতিতে চড়িয়া দেখিতে গিয়াছি।··একবার খুড়োমহাশয় পিলখানা হইতে হাতি ভাড়া করিয়া আনিয়াছিলেন।

এই মিছিলে উভয় পক্ষেরই বহু সহস্র টাকা খরচ হয়। তাঁতির বাজারের পোদ্দারবাবুরা ব্যাঙ্কে এইজন্যে টাকা জমা রাখিয়াছেন, তাহার সুদ হইতে এই ব্যয় হয়। আর নবাবপুরের খরচ চাঁদা করিয়া হয়।

শীতকালে এক উৎসব হইত বনবিহার। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠবিহার সংক্রান্ত নানা

দৃশ্য মাটি দিয়া দেখানো হইত। সাধারণত ইহা বাঙলাবাজারে প্রতাপবাবুর বাড়িতে ও বাড্ডানগরের এক বাড়িতেই ভালো হইত। আমরা অতুলের মাতামহর সঙ্গে অনেকবার ইহা দেখিয়াছি। তিনি একজন ভাল শিল্পী ছিলেন। তাই বোধহয় তাঁহার ইহা দেখিতে ভাল লাগিত। তিনি ইহার দোষগুণ ভাল বিচার করিতে পারিতেন। তিনিও বালকের মত সরলভাবে আমাদের হাস্যরসে যোগ দিতেন ও নানা ব্যাখ্যা করিয়া আমাদিগকে সমুদয় বুঝাইয়া দিতেন। সেই রাজর্ষিকে স্মরণ করিয়া বারবার নমস্কার করিতেছি।

আমাদের শিশুকালে প্রথম নাটক দেখি নবাবপুরের 'শকুন্তলা'; তারপর 'সীতার বনবাস', 'নীলদর্পণ', 'বিল্বমঙ্গল'। এই নাটকের প্রাণ ছিলেন অতুলের মাতুল আমার পরম উপকারী বান্ধব গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্ত। চিত্রপট আঁকিতে, অভিনয়কারীদিগের অভিনয়ে শিক্ষা দিতে, কথা ও নৃত্য শিখাইতে, সাজাইতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। নাটকের প্রভাতকালীন এক দৃশ্যে নানাবিধ পাখির সুরে তিনি ডাকিতেন। শিশু ভরত যখন সিংহের সঙ্গে লড়াই করিত তখন তিনি সিংহের গর্জন শোনাইতেন। শকুন্তলা নাটকের কোন কোন গানের সুর অতুলের কোন কোন গানে আছে। এই নাটকের গান রচয়িতা ছিলেন রামবাবু। নবাবপুরের প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁতিরবাজারও 'মালতীমাধব' নাটক করিয়াছিল। ইহার একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন চন্দ্রনাথ রায় মহাশয়। চন্দ্রনাথবাবুর গম্ভীর ও মধুর গলা যাঁহারা শুনিতেন তাঁহারাই মুগ্ধ হইতেন। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বেতন-ভোগী গায়ক ছিলেন। চন্দ্রনাথবাবুরা একটি বাউলের দল করিয়াছিলেন। গেরুয়া পরিয়া, নকল চুলদাড়ি লাগাইয়া বাউল সাজিয়া রাত্রিযোগে কিছুকাল বাড়াবাড়ি সঙ্গীত করিতেন। তাঁহার একটি গান ছিল "রাম রহিমকো জুদা কর ভাই।' পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে তাঁহারা যে মিলন সঙ্গীতটি গাইয়াছিলেন আজ আমরা তাহার আবশ্যকতা অনুভব করি। এই বাউল সঙ্গীতের রেশ অতুলের প্রাণে শেষ দিন পর্যন্ত বাজিয়াছিল।

মহরমের তাজিয়ার উৎসবেও হিন্দু মুসলমান একত্র হইয়া মিছিল বাহির করিত। হোসেনী লালন ঢাকার একটি পরম রমণীয় সৌধ। আমরা শিশুকালে খুড়োমহাশয়ের সঙ্গে মহরমের সময়ে সেখানে যাইতাম। আমাদের শৈশবে দুই একঘর মোগল মুসলমান দেখিয়াছি ঢাকাতে। মোগলটুলীতে তাহাদের একটা কাঁচ ও চিনেবাদামের দোকান ছিল। মহরমের মিছিলের পূর্বভাগে তাহারাই বুক চাপ্‌ড়াইয়া হাসান হোসেন করিত। ইহা ছাড়া ঢাকাতে আমাদের ছোট সময়ে যাত্রা গান করিত গোবিন্দ কীর্তনীয়া, ব্রজবাসী। তখন হইত 'ভীষ্মের শরসজ্জা', 'বিজয়বসন্ত', 'অভিমন্যুবধ'। প্রথম প্রথম হইত 'মানভঞ্জন'।

ঢাকায় প্রতি মহল্লায় কুস্তির আখড়া ছিল ও জমিদারদের বাড়িতে কুস্তিগির বেতন

করিয়া রাখা হইত। কখনো কখনো ইহাদের মধ্যে কুস্তি খেলা হইত। প্রসিদ্ধ শ্যামাকান্ত বাড়ুজ্জে ও পরেশ নাথ ঘোষ ঢাকার অঘোর ঘোষের শিষ্য ছিলেন। অঘোর ঘোষ নিরীহ ছোট মানুষটি ছিলেন, কিন্তু কুস্তি করার চমৎকার কৌশল জানিতেন। আমরা তাঁহাকে ও তাঁহার আখড়া দেখিয়াছি। শ্যামাকান্তবাবু পরে সোহংস্বামী নাম লইয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। তিনি বাঙালিদের মধ্যে আদি সার্কাস কর্তা ও তাঁহার বাঘের সঙ্গে লড়াই দেখিয়া আমরা শিশুকালে বিস্মিত ও গুণমুগ্ধ হইয়া পড়িতাম। পরেশবাবু ছিলেন অতিশয় নিরীহ স্কুলমাস্টার, কিন্তু ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াইয়া শক্তির পরীক্ষা দিতে ভীত হইতেন না। অনেক ভদ্রসন্তান তাঁহার নিকট কুস্তি শিক্ষা করিত। একবার ঢাকাতে গিরিশ ঘোষের স্টার থিয়েটার আসিল। ছাত্ররা প্রতিজ্ঞা করিল মেয়েদের অভিনয় দেখিবে না। নিজেরা যাইবে না, অপরকেও যাইতে দিবে না। নিষেধ করিতে দলে দলে ছাত্ররা ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। পাছে কোন গোল হয় সেইজন্যে তখনকার পুলিশ সাহেব মিঃ ক্লার্ক পরেশবাবু ও প্রসন্নবাবুকে (পাগলা) স্পেসিয়াল কনস্টেবল করিল। ফল বিপরীত হইল। ছাত্রদের দৃঢ়তা আরো বাড়িয়া গেল। অভিভাবকরা ছাত্রদের সঙ্গে যোগ দিলেন। ফলে স্টার থিয়েটারকে ঢাকা ত্যাগ করিতে হইল। কিছুদিন পরেই রাজকৃষ্ণ রায় তাঁহার দল লইয়া আসিলেন। তিনি 'প্রহ্লাদ চরিত' ও 'চন্দ্রহাস' দেখাইলেন। তাঁহার দলের সকলেই পুরুষ। তিনি দু-পয়সা লইয়া গেলেন।

* * * *

'বাংলা ১২৯১ সালের কার্তিক মাসে খুড়োমহাশয় পরলোক গমন করিলে আমি চতুর্দিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। বাবা ও ছোট পিসিমা খুড়োমহাশয়ের পীড়ার কথা শুনিয়া বাড়ি হইতে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া দেখিতে পান নাই। আমি আপাততঃ তাঁহাদের সহিত বাড়ি গেলাম। কিছুদিন পরে স্নেহময়ী খুড়িমা জানাইলেন অতুলের সঙ্গে আমারও স্থান অতুলের মামার বাড়িতে হইবে। এখানে রাজর্ষি কালীনারায়ণ অতুলের মাতামহ ও তাঁহার মহীয়সী ধার্মিকা সহধর্মিণী অন্নদাদেবী অতুলের মাতামহী, কালীনারায়ণের জ্যেষ্ঠপুত্র স্যার কে. জি. গুপ্ত, মধ্যমপুত্র ডাক্তার প্যারীমোহন, তৃতীয় গঙ্গাগোবিন্দ (পানীবাবু), চতুর্থ বিনয়চন্দ্র। কন্যাগণ খুড়িমা হেমন্তশশী, সৌদামিনী, চপলা, সরলা, বিমলা ও সুবালা। এখানে আমি যে স্নেহ যত্ন পাইয়াছি তাহা স্মরণ করিতেই আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠি। কোনমতে তাঁহারা বুঝিতে দিতেন না যে এ বাড়ি আমার আপন মাতুলালয় নহে। বিনয় ছিলেন আমাদের কিছু বড়। প্রতি মাঘোৎসবের সময়ে আমরা পাবনার ধুতি পাইতাম। বিনয় অতুল কি আমার কাপড়ে কোন প্রভেদ থাকিত না। পানীবাবু ও বিনয় গানে বাদ্যে চিত্রাঙ্কনে পটু ছিলেন।

পানীবাবু হাস্যরসিক পুরুষ ছিলেন। যেখানেই যাইতেন সেখানেই তাঁহার ব্যঙ্গ কৌতুক শুনিবার জন্য লোকেরা পাগল হইত। তিনি কাহারও অনুরোধ এড়াইতে পারিতেন না। তাঁহার হৃদয় ছিল প্রেম ও ভালোবাসায় পরিপূর্ণ। নীচতা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। শুনিয়াছি রাজকার্যে যখন যেখানে গিয়াছেন সকল দলেই তাঁহার স্থান ছিল। সকলের সঙ্গে সমান ভাবে মিশিতেন। কি ছোট কি বড়। তাঁহার দক্ষিণ হস্তের দান বাম হস্ত জানিতে পারিত না। দুঃস্থ বন্ধু ও আত্মীয়স্বজনকে সর্বদা যথাসাধ্য যথাযোগ্য সাহায্য করিতেন। যখন আমার মেডিকেল কলেজের পড়া খরচার অভাবে বাদ হইবার উপক্রম হইল তখন এই মহানুভব দয়ার্দ্রচিত্ত আত্মীয়টির সাহায্যেই উহা সম্ভব হইয়াছিল।”

ডায়েরির পৃষ্ঠার আরো কিছু পরে সত্যপ্রসাদ বিনয়চন্দ্রর বিষয়ে লিখেছেন, “বিনয় আমাদের অপেক্ষা অল্পই বড় ছিলেন। তাঁহার হৃদয়টিও পানীবাবুর অনুরূপ ছিল। তাহার অকপট বন্ধুত্ব আমার জীবনের মূল্যবান সম্পদ। তাহার প্রথম বিবাহের পাত্রী নির্বাচনে আমি তাহার সঙ্গী ছিলাম। এই সময় অতুলের এক মাতৃহীন মাসতুতো ভাইও মাতুলালয়ে ছিল।”

ডায়েরির পৃষ্ঠায় এলোমেলো পুরোনো স্মৃতিকথার মধ্যে ডুব দিয়েছিলেন সত্যপ্রসাদ। অকস্মাৎ লিখলেন, “আজ ১৩৪১ সন ১৫ই পৌষ সোমবার আমি ও প্রভা (ছুটকি) প্রাণাধিক অতুলের চিতাভস্ম পূজনীয় খুড়িমার সমাধির পার্শ্বে স্থাপন করিলাম। ভগবানের ইহা দেয়। আত্মার শান্তি করুন।

১৩৪১ সন ১৪ই পৌষ রবিবার আমি কাওরাইদ গিয়াছিলাম (30. 12. 34 ইংরাজি) সেখানে সোনামামা পানীবাবুর (গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্ত) ছোট পুত্র ছোটকু (ধীরেন্দ্র নাথ গুপ্ত) ছিল। সেদিন বড়কুর স্ত্রী শোভনা বড়কুর (৺ হিমাংশু মোহনের) চিতাভস্ম লইয়া আসিয়াছিল। সঙ্গে আসিয়াছিল দুই কন্যা তাহার বৃদ্ধ পিতা ভ্রাতা ও ময়মনসিংহের ৺ অমর দত্তের পুত্র। ছুটকি ও তাহার কন্যা কুন্তলা ও টেড (শশীবাবুর কন্যা) আসিয়াছিল, বহুদিন পরে উহাদের দেখিলাম। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে মাঘোৎসবের উপলক্ষে কাওরাইদ যাইতাম আর আজ গিয়াছিলাম এক শোকাবহ কর্তব্য সম্পাদন করিতে।

১৯৩৫ ১লা জানুয়ারি ছুটকি কুন্ত ও টেড আসিল। অনেক পুরাতন কথা স্মরণ হইল।”

অতুলপ্রসাদের পিতার ঢাকা শহরে অল্পদিনের মধ্যেই মৃত্যু হয়। অতুলপ্রসাদের পিতা রামপ্রসাদের সহিত ব্রাহ্মধর্মী সমাজকর্মী উকিল দুর্গামোহন দাসের বন্ধুত্ব ছিল। ব্যবসায়িক নানান প্রয়োজনে ডাঃ রামপ্রসাদ সেন দুর্গামোহন দাসের কাছে প্রায়ই

পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তাঁরা পরস্পর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরূপে পরিচিত ছিলেন। পরে বেশি বয়সে দুর্গামোহন দাশ অতুল-মাতা হেমন্তশশীকে বিবাহ করেন। ঢাকা শহরে থাকতে সে ঘটনার কথা স্মরণ করে সত্যপ্রসাদ সেন লিখেছেন:

"ইংরেজি ১৮৯০ জুন মাসের এক রবিবার আমি অতুল বিনয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে বাসায় ফিরিয়া দেখি সেখানে সকলেই শোকে মুহ্যমান। অধিকতর শোকাতুরা অতুলের মাতামহী ঠাকুরাণী। অনুসন্ধানে জানিলাম যে খুড়িমাতা ঠাকুরাণী দ্বিতীয়বার দুর্গামোহন দাশ মহাশয়ের সঙ্গে পরিণীতা হইয়াছেন। এ সংবাদ কে. জি. গুপ্ত লিখিয়াছেন কলিকাতা হইতে। এ সংবাদে সকলেই বিচলিত। হিরণ প্রভৃতি কাঁদিতেছে। আমরা খুব কাঁদিতে লাগিলাম। আমি তো নিজেকে সম্পূর্ণ আশ্রয়হীন মনে করিতে লাগিলাম। অতুলের মাতুলালয়ের সঙ্গে আমার সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল। এখন আমি দাঁড়াই কোথা? সেদিনকার আঘাত আমার খুউব প্রাণে লাগিয়াছিল। সে শোকাবহ দৃশ্য আজও আমার স্মরণ হয়। অতুল ভগ্নিদের লইয়া কিছুদিনের মধ্যে কলিকাতায় চলিয়া গেল। ভগ্নিরা গেল মায়ের কাছে। অতুল রহিল মাতুল পানীবাবুর কাছে। তখন কে. জি গুপ্ত রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বার আর পানীবাবু চীফ ইনকাম ট্যাক্স এসেসার কলিকাতার।

আমরা একে একে লক্ষ্মীবাজার হইতে বিদায় লইলাম। আমি সম্পূর্ণ আশ্রয়হীন হইলাম। দাঁড়াই কোথায়? কোথায় যাই? কলিকাতা যাইবার পূর্বে অতুল বলিয়া গেল যে সে আমাকে কিছু কিছু দিবে। অতুলের মাসীরা কেহ কেহ আমাকে কিছু কিছু দিবেন আশা দিলেন। এ সময় আমার অকৃত্রিম বান্ধব পানীবাবু সাহস ও ভরসা দিয়া জানাইলেন যে তিনি আমাকে মাসিক ৫ টাকা করিয়া সাহায্য করিবেন। এই ৫ টাকার উপর নির্ভর করিয়াই আমার মেডিকেল স্কুলের পড়া শেষ করিতে কিছুদিন পরে অতুল বিলাত গেল তখন আমাকে ব্যথিতচিত্তে জানাইল আমাকে টাকা পাঠানো আর তাহার সম্ভব হইবে না। সুতরাং পানীবাবুর ৫ টাকাই আমার মেডিকেল স্কুলে পড়ার শেষ সম্বল হইয়াছিল।"

"১৮৯০ সন আমি মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হইলাম। অতুল সে বৎসর বিলাত গেল। অতুলের সঙ্গে আমাদের সহপাঠী জ্ঞান রায়ও বিলাত গিয়াছিলেন। জ্ঞান স্কুলে থাকার সময়েই ছোট একখানি কবিতা-পুস্তক ছাপাইয়াছিলেন। জ্ঞান সুন্দররূপে কবিতা আবৃত্তি করিতে পারিতেন। রবিবাবুর কবিতা আবৃত্তি করিয়া আমাদিগকে বুঝাইতেন যে রবিবাবু কখন কোন কোন কবিতাটি লিখিয়াছেন। কেন কাহাকে কোন বইখানি উপহার দিয়াছেন ইত্যাদি 'ভগ্নহৃদয়' ছিল আমাদের অধিক আলোচনার বিষয়। তিনি 'দুই দিন' কবিতার ব্যাখ্যা করিতেন যখন, তখন নিজেও ভাবে গদগদ হইয়া

পড়িতেন, মুখ হইতে অনির্বচনীয় জ্যোতি নির্গত হইত। শ্রোতারা মুগ্ধ হইয়া স্থির হইয়া শ্রবণ করিত। জ্ঞান খুব সুপুরুষ ছিলেন। বিলাতে গিয়াও আমাকে মাঝে মাঝে চিঠিপত্র দিতেন। দেশে ফিরিয়া জ্ঞান ব্যবসায়ে বেশ নাম করিয়াছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় নাম অনেকেই জানেন। পরিতাপের বিষয় অল্পকালের মধ্যেই তিনি চলিয়া গিয়াছেন। অরবিন্দ ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতি অতুলের প্রবাসকালীন বিলেতে ছিলেন।"

সত্যপ্রসাদ সেন ডায়েরিতে এর পরের কিছু পাতায় অতুলপ্রসাদের বাল্য জীবন সম্বন্ধে আরো কিছু আলোকপাত করেছেন। সত্যপ্রসাদ লিখেছেন, "ব্রাহ্মসমাজ ভাগ হইয়া যখন নববিধান সমাজ আরম্ভ হইল তখন নববিধান সমাজের কোন উপসনাগৃহ পৃথক না থাকাতে রবিবারের উপাসনা আমাদের মিরাতারের বাড়িতে ঘটিত। অতুল কখনো কখনো খোল বাজাইত। শিশু অতুলের খোল বাজাইবার ক্ষমতা দেখিয়া সকলে অবাক হইতেন। আমার বেশ মনে আছে প্রমাণ খোল বাজাইতে অতুলের অসুবিধা হইত দেখিয়া খুড়োমহাশয় অতুলকে একটি ছোট খোল কিনিয়া দিয়াছিলেন। বাঁশি, বেহালা, হারমোনিয়াম সকল যন্ত্রই অতুল শিশুকাল হইতে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। অতুলের মধুর গলার স্বর শিশুকাল হইতেই সকলকে মুগ্ধ করিত। পরিণত বয়সে অতুল যখন স্বরচিত গান করিতেন তখন মনে হইত যেন বাস্তবিকই গানের মধ্যে প্রাণ আছে। নিজে ভাবে গদগদ হইয়া পড়িতেন, মুখ হইতে অনির্বচনীয় জ্যোতি নির্গত হইত। শ্রোতারা মুগ্ধ হইয়া স্থির হইয়া থাকিতেন। শিশুকাল হইতে বক্তৃতা করিবার আকাঙ্ক্ষা অতুলের মনে জাগিয়াছিল। আমাদের শৈশবে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সুমধুর বক্তৃতা শুনিতাম। তারপর কলিকাতা হইতে বড় বড় কৌসুলি—মনোমোহন ঘোষ, টি. পালিত, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতিরা মকর্দমা উপলক্ষে যখন ঢাকাতে আসিতেন তখন আমরা তাঁহাদিগকে দেখিতাম ও তাঁহাদিগের বক্তৃতা শুনিতে কাছারিতে যাইতাম। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী, নগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামকুমার বিদ্যারত্ন ব্রাহ্ম সমাজে, ও শশধর তর্কচূড়ামণি, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন প্রভৃতি হিন্দু সমাজে যে সকল বক্তৃতা করিতেন তাহা শুনিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছিল। আমরা যখন যুবক তখন সুরেন্দ্রবাবু, লালমোহন ঘোষ প্রভৃতির বক্তৃতা শুনিয়া অতুল তাহা নকল করিবার চেষ্টা করিতেন। আমরা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের বিলাত ও ভারতবর্ষের বক্তৃতা খুউব আগ্রহের সঙ্গে পড়িতাম। অতুল বক্তৃতার ভঙ্গিতে তাহা পাঠ করিয়া আমাদিগের শুনাইতেন। উক্ত দুইখানি পুস্তক পুনঃ-পুনঃ পাঠ করিয়াছিলাম।… শ্রীহট্টের ভূতপূর্ব হেডমাস্টার দুর্গাকুমার বসু মহাশয়ের পুত্র সত্যেন্দ্র, জ্ঞান রায়, অতুল ও আমি মাঝে মাঝে রূপবাবুদের কিম্বা আনন্দ মাস্টারমহাশয়ের বাগান-বাড়িতে

গিয়া নিভৃতে আলোচনা করিতাম। আলোচনার বিষয় থাকিত কেশববাবুর বক্তৃতা, রবিবাবুর কবিতা আর কংগ্রেসের কার্যাবলী। সত্যেন্দ্র সুন্দর ইংরাজি বলিতে পারিতেন। তিনি প্রতাপ মজুমদারের মত করিয়া বক্তৃতা করিতে চেষ্টা করিতেন। জ্ঞান কবিতা আবৃত্তি করিতেন। কখনো কখনো নিজের কবিতাও শুনাইতেন। আর অতুল সুরেন্দ্রবাবুর বক্তৃতার অনুরূপ বক্তৃতা করিতে প্রয়াস পাইতেন। একবার সুরেন্দ্রবাবু ঢাকায় আসিয়াছিলেন। আমরা তখনও তাঁহাকে দেখি নাই, অতুল তাঁহাকে দেখিবার আশায় নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত গিয়াছিলেন ও তাঁহার সহিত আলাপ করিতে করিতে ঢাকায় আসেন। দেশ সেবার আকাঙ্ক্ষা সুরেন্দ্রবাবু অতুলের প্রাণে জাগরিত করেন। সুরেন্দ্রবাবুর ঢাকার বক্তৃতার বিষয় ছিল বোধহয় 'ভারতে ও বিলাতে একসঙ্গে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা নেওয়া', 'পরীক্ষার্থীর বয়োবৃদ্ধি ও উচ্চপদে ভারতীয়দের নিয়োগ'। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে এমন সকল পুলিশ সাহেব নিয়োগ করা হয় যে তাহাদের মধ্যে কেহ পরীক্ষায় নিজ মাতৃভাষা ইংরাজিতে তিন নম্বর ও অঙ্কে শূন্য পাইয়াছিলেন।

রবিবাবুর 'কড়ি ও কোমল' বাহির হইবার কিছুদিন পরই ইহার সমালোচনা করিয়া একখানি ব্যঙ্গ পুস্তক বাহির হইল নাম 'বাহুরি রচিত মিঠে কড়া।'…পুস্তকখানা প্রথম দেখিলাম চিত্তরঞ্জনের (C. R. Das) নিকট। তিনি ঢাকা আসার সময়ে নিয়া আসিয়াছিলেন। আমরা প্রায় কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম। এখনও কিছু-কিছু মনে আছে। অতুল সুন্দর করিয়া এইসকল আবৃত্তি করিয়া শোনাইতেন।"

কবিবর রবীন্দ্রনাথ এবং অতুলপ্রসাদ দু-জনের পরস্পর পরিচয়ের কথায় সত্যপ্রসাদ তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন :

"বিলাত হইতে আসার পর অতুলের সাথে রবিবাবুর আলাপ হয় এবং ক্রমে তাহা স্নেহের বন্ধনে পরিণত হইয়াছিল। রবিবাবু অতুলের সঙ্গ লাভ করিতে সর্বদাই উৎসুক থাকিতেন। কবি একবার গ্রীষ্মের সময় অতুলকে লিখিয়াছিলেন তাহার ভাবার্থ আমার স্মরণ আছে যে গ্রীষ্মের আতিশয্যে সকলেই মেঘের জন্য লালায়িত, আমি ভাবিতেছি অতুল কবে আসিয়া আমাকে স্নিগ্ধ করিবেন।

রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলি অতুল আমাকে গৌরবের সহিত দেখাইতেন। কবি কখনো কখনো লখনউয়ে আসিতেন, অতুলও অবসর সময়ে শান্তিনিকেতন গিয়া তাঁহার ক্ষত হৃদয়ে শান্তির প্রলেপ দিতে প্রয়াস পাইতেন।

বিলাত গিয়া ব্যারিস্টার হওয়ার প্রবল বাসনা অতুলের প্রাণে কিশোর বয়স হইতেই ছিল। খুড়োমহাশয় অকালে চলিয়া যাওয়াতে যে সংস্থান রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহাতে ইহা সম্ভব হওয়া সুকঠিন ছিল। নিয়তি, তাই শৈশবে একবার পদ্মানদীর

প্রবল বন্যায় ও আর একবার ঘোড়ার গাড়িসহ জলের মধ্যে পড়িয়াও রক্ষা পাইলেন। যৌবনেও সাংসারিক নানা ঘটনায় অতুলের প্রাণে নিদারুণ আঘাত লাগিয়াছিল, ফলে মাতুলদের কাহারো কাহারো প্রাণে এত সমবেদনা জাগিয়া উঠিয়াছিল যে অতুলকে দূর দেশে পাঠাইয়া তাহার প্রাণের জ্বালা প্রশমিত করিতে চেষ্টা করা সমীচীন মনে করিলেন। এও নিয়তিরই খেলা। যাহা প্রায় অসম্ভব ছিল তাহা সম্ভব হইতে চলিল। অতুল আমাকে বলিয়াছিলেন যে এ বিষয়ে তাঁহার মধ্যম মাতুল Dr. P. M. Gupta তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। এজন্য অতুল আজীবন কৃতজ্ঞ ছিলেন। কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ মাতুল-কন্যা সাহানাকে অত্যধিক স্নেহ করিতেন। শুনিয়াছি সাহানাকে বলিতেন সে যেন তার আবশ্যকীয় টাকাকড়ি অতুলের বাক্স হইতে নেয় এবং কত নিল তাহা যেন কখনো না বলে।

আমি ঢাকা মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হইবার কয়েক মাসের মধ্যেই অতুল বিলাত চলিয়া গেলেন। আমি পাশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে অতুল বিলাত হইতে ব্যারিস্টার হইয়া আসিলেন। বিলাত হইতে আসার পর অতুল একবার মাত্র দেশের বাড়িতে গিয়াছিলেন, কিন্তু আমার কর্মস্থানে কখনো কখনো আসিতেন এবং আমিও কখনো কখনো তাঁহার সহিত লখনউ কি দার্জিলিং কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে একত্রিত হইয়াছি।

মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে জীর্ণ স্বাস্থ্য সংস্কার-নিমিত্ত পুরী গিয়াছিলেন। সেখানে আমাকে যাইবার জন্য পুনঃ-পুনঃ আহ্বান করিয়াছিলেন। আমি তখন রুগ্ন, শয্যায় শায়িত; তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই। এই জীবনে আর আমাদের দেখা হইল না। অতুলের জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল হইতেছিল কেন তখন বুঝি নাই। ভগ্নী কিরণকে লিখিয়াছিলাম জীবনের সন্ধ্যাকালে আমার বড় সাধ হইতেছে তোমরা আমার অতুলকে নিয়া কিছুকাল আমার কাছে থাক। কিন্তু পূর্বেই অতুল চিকিৎসকের আদেশে পুরী যাওয়া স্থির করিয়াছিলেন। আমার প্রাণের সাধ পুরিল না। শেষ মুহূর্তে যখন তাঁহার অন্তিম শয্যার পার্শ্বে যাইবার তার পাইলাম তখনও দুর্বল শরীরে যাইতে সাহস করি নাই। গেলেও তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম না। ১৩ ঘণ্টা অজ্ঞান অবস্থায় থাকিয়া তাঁহার আত্মা অমরধাম চলিয়া গেল। লখনউ নিবাসী লোকেরা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে অশ্রুবিসর্জন করিতে করিতে তাঁহাকে শেষ দর্শন করিতে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। এই আকস্মিক নিদারুণ শোক-সংবাদে সমস্ত বাঙলা তথা ভারতের শিক্ষিত সমাজ স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রায় দুই মাস পর্যন্ত প্রতিদিন সংবাদ-পত্রে কোন না কোন স্থান হইতে অতুলপ্রসাদের আত্মার কল্যাণ কামনায় শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানের সংবাদ বাহির হইতেছিল। তাঁহার নিকটতম আত্মীয়দের প্রাণে যে গভীর

আঘাত লাগিয়াছিল দেশবাসীর অশ্রুজল তাহা অনেক পরিমাণে প্রশমিত করিয়াছিল। আমরা দেশবাসীর নিকট সেইজন্য চিরকৃতজ্ঞ।"

* * * *

"মানুষ চিরদিনই মানুষ। ভুলভ্রান্তির হাত হইতে কেহই মুক্ত নয়। অতুলপ্রসাদের জীবনেও এক ভীষণ ভুল হইয়াছিল—জানি না ইহা ভুল, না ইহাই বিধাতার বিধান। অমৃত জ্ঞানে যে হলাহল তিনি পান করিয়া চিত্তের পিপাসা নিবারণ করিতে চাহিয়াছিল, তাহাই অমৃতের পরিবর্তে গরলে পরিবর্তিত হইয়া অতুলের প্রাণে ভস্মাচ্ছাদিত আগুনের ন্যায় জ্বলিতেছিল। অতুল কিন্তু নীলকণ্ঠের ন্যায় হলাহল পান করিয়াও তাঁহার স্বাভাবিক মাধুর্য হারান নাই। অতুল স্যর কে. জি. গুপ্তর দ্বিতীয়া কন্যা হেমকুসুমকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সকল আত্মীয়দের অসম্মতি সত্ত্বেও এই বিবাহ সম্পন্ন করিবার জন্য তাঁহাকে বিলাত পর্যন্ত যাইতে হইয়াছিল; কারণ এদেশের আইনে এইরূপ বিবাহ সিদ্ধ হয় না। বিলাত থাকাকালীনই তাহার পত্নী দুইটি যমজ সন্তান প্রসব করিলেন। একটি অকালে কালগ্রাসে পতিত হইল। বিলাতে থাকাকালীনই তাহাদিগকে বিষম অর্থকষ্টে নিপতিত হইতে হইয়াছিল। সেখানে একজন মুসলমান তালুকদার বন্ধুর সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি অতুলকে লখনউ উপস্থিত হইয়া প্র্যাকটিস করিতে উপদেশ দেন। তার আগে অতুল কলিকাতায় ও রংপুরে গিয়া পসারের চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু সুবিধা করিতে পারেন নাই। বিবাহের পর আত্মীয়রা তাঁহার উপর বিমুখ হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের নিকট হইতে দূরে থাকিবার জন্য এবং অভাবের তাড়নায় অতুল লখনউ গিয়া ভাগ্যপরীক্ষা করাই স্থির করিলেন। এখন তাঁহার পত্নী ও পুত্রের ভার বহন করিতে হইবে। অর্থের অনটনে আত্মীয়দের নিকট হইতে কোন সাহায্যের প্রত্যাশা নাই, অথচ কাছে থাকিলে তাঁহাদের কাছে উপহাসের পাত্র হইতে হইবে, এইসকল চিন্তা করিয়াই অতুল কর্মভূমি লখনউ নির্ধারিত করিলেন। প্রথম-প্রথম এখানেও অর্থসঙ্কট কম ছিল না। এখন অতুলের মাও অতুলের সঙ্গে আসিয়া থাকিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময়ে অতুলের জীবনে মস্ত পরীক্ষা আরম্ভ হইল। আত্মীয়দের সঙ্গে অতুলের কোন যোগ থাকে ইহা তাঁহার পত্নীর ইচ্ছা নহে। অথচ অতুলের স্বাভাবিক স্নেহপ্রবণতা ইহার বিপরীত। ফলতঃ প্রতি পদেই পতি পত্নীর মধ্যে মনোমালিন্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে উঁহাদের একত্রে থাকা অসম্ভব হইল। ১৯১৩ সালে স্থির হইল অতুল কলিকাতায় থাকিবে, হেমকুসুম লখনউয়ে থাকিবে। তখন শান্তি পাইবার জন্য অতুল আমাদের কাছে কয়েকদিন আসিয়া থাকিলেন। তখন আমি লাকসামে। হেমকুসুমের ব্যবহার অতুলের মনে খুবই আঘাত দিতে লাগিল। অতুল ইচ্ছা

করেন আত্মীয় স্বজনদের লইয়া থাকেন, হেমকুসুম বাধা দিতে লাগিলেন। ক্রমে বাধা অত্যাচারে পরিণত হইল। বিবাহের পর অতুল রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের মত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমাদের সহিত সকল রকম সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। এমনকি কিছুদিন চিঠিপত্র পর্যন্ত লেখালেখি ছিল না। অতুল আমাকে পরে ইহার কারণ বলিয়াছিলেন যে তিনি একেবারে উপায়হীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। একদিকে হেমকুসুমের জেদ যেমন বাড়িতে লাগিল অন্যদিকে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের জন্য অতুলের স্নেহ মমতা কূল ছাপাইয়া উঠিতে লাগিল।

অতুলের প্রেমে ভরা মন পত্নীর অন্যায় জেদ সহ্য করিতে অপারক হইয়া উঠিল। একদিন এমন হইয়াছিল যে কোন বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যান ইহা হেমকুসুমের ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু অতুল এই অন্যায় জিদে প্রশ্রয় না দিয়া বন্ধুর ভবনে চলিয়া গেলেন। কিছুকাল পরে ভৃত্যের নিকট সংবাদ পাইয়া বাড়িতে আসিয়া দেখেন তাঁহার সমুদয় মূল্যবান পোশাক একত্রীভূত করিয়া তাহাতে হেমকুসুম অগ্নি সংযোগ করিয়াছেন। পোশাকগুলি দাউ-দাউ করিয়া উঠানের মাঝখানে জ্বলিতেছে। এমন একটিও পোশাক রহিল না যে তাহা পরিধান করিয়া পরের দিন আদালতে যাইতে পারেন। সেইজন্য অতুলকে পরের দিন অন্যের দ্বারস্থ হইতে হইয়াছিল।

অতুলের মুখে যখন এই ঘটনা শুনিয়াছিলাম তখন সক্রেটিসের মস্তকে পত্নী কর্তৃক কর্দমাক্ত জল ঢালিয়া দেওয়ার কথা শৈশবে পাঠ করিয়াছিলাম তাহাই আমার মনে পড়িল। আশ্চর্য ধৈর্যশক্তি অতুলের ছিল। সকল নির্যাতনই অম্লান বদনে সহ্য করিয়াছেন। কিছুতেই তাঁহার স্বাভাবিক মাধুর্য ম্লান করিতে পারে নাই। আগুনে পুড়িলে সোনা খাঁটি হয়। আমাদের অতুলপ্রসাদকেও অতুলপ্রসাদ রূপে পাইতাম না যদি তাঁহাকে আগুনে পুড়িয়া পরের জন্য বাহির করিয়া না দিত। তাই একদিন গাহিয়াছিলেন, 'যাব না যাব না যাব না ঘরে'। একদা আমরা দুই ভাই দুই বন্ধু দার্জিলিংএ একত্রে ছিলাম। আমাদের শয়নকক্ষ ছিল পাশাপাশি, কিন্তু অতুল শয্যায় শয়ন করিবার অল্পক্ষণ পরেই আমার শয্যায় আসিয়া আমার বুকে মাথা রাখিয়া থাকিতেন। নীরবতার মধ্যেই তাঁহার প্রাণের বেদনা জানিতে ও বুঝিতে পারিতাম। তিনিও আমার সমবেদনার স্পর্শ বুঝিতে পারিতেন। এরূপে আমরা কত বিনিদ্র রজনী নীরবে কাটাইয়াছি। সেবার অতুল, 'যাব না যাব না যাব না ঘরে' গানটি রচনা করিয়াছিলেন। প্রভাত হইবার পূর্বেই আমরা দুই ভাই বেড়াইতে বাহির হইতাম। পথে বসিয়া বসিয়া বিহঙ্গের কাকলির ন্যায় তাঁহার নূতন নূতন গান শুনাইয়া আমাকে মুগ্ধ করিতেন। তখনও বাঙ্গলা দেশে তাঁহার গানের আদর আরম্ভ হয় নাই।

অকস্মাৎ একদিন সংবাদ আসিল হেমকুসুম লখনউ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায়

আসিতেছেন। অতুল দুই কারণে বিচলিত হইয়া উঠিলেন : প্রথম—সাংসারিক অশান্তি, দ্বিতীয়—কলিকাতায় তাঁহার সাহিত্যসেবী বন্ধুদের সঙ্গে বিচ্ছেদ-ভীতি। কারণ অতুল জানিতেন যে হেমকুসুম কলিকাতায় আসিলে অতুলের পক্ষে কলিকাতায় থাকা অসম্ভব। তাঁহাকে অনত্র যাইতেই হইবে। সুতরাং তখন সাহিত্যের যে একটা মধুচক্র গড়িয়া উঠিয়াছিল বাধ্য হইয়াই অতুলকে তাহা ত্যাগ করিতে হইবে ; ফলতঃ হইলও তাহাই। অতুল পুনর্বার লখনউ চলিয়া গেলেন। লখনউবাসীরাও তাঁহাকে চাহিয়াছিলেন। এ সময়ে অতুল আমাকে ইহা লিখিয়াছিলেন।"

সত্যপ্রসাদ আরো লিখেছেন :

"একাধিকবার হেমকুসুম গৃহত্যাগ করিয়া অতুলকে জব্দ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সর্বদাই অতুল তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া গৃহে স্থান দিতে প্রস্তুত ছিলেন। অতুল আমাকে বলিয়াছিলেন যে একবার রবীন্দ্রনাথ অতুলের অতিথি, তার পূর্বে হেমকুসুম গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। কবির আতিথ্যে ত্রুটি না হয় সেইজন্য হেমকুসুম বাড়িতে আসিতে চাইলে অতুল অম্লান চিত্তে তাহা অনুমোদন করিলেন। কিন্তু এই মিলন অচিরাৎ বিচ্ছেদে পরিণত হইল। খুড়িমার পরলোক গমনের পর আরো একবার শ্রদ্ধেয় বিহারীলাল সেন মহাশয়ের পুত্র মেজর জ্যোতিলালের অনুরোধে অতুল হেমকুসুমকে পুনর্বার তাঁহার চিকিৎসার যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে সকল চেষ্টাই বৃথা হইল। অল্পকালের মধ্যেই গৃহত্যাগের রোগ প্রবল হইয়া উঠিয়া শেষবারের মত হেমকুসুম বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। ক্রমে স্বামী-স্ত্রীতে যেরূপ সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছিল তাহাতে একে অন্যের প্রতি মমতাশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। তবু কর্তব্যজ্ঞান অতুলকে কোনদিনই ত্যাগ করে নাই। অকাতরে হেমকুসুমের সুখ-সুবিধার জন্য অর্থ জোগাইতেন। নিয়মিত মাসিক মাসোহারা দেওয়ার পরেও রোগের সময় কিম্বা গ্রীষ্মকালে শৈলাবাসে থাকার জন্য প্রয়োজনাধিক অর্থ দিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। এত করিয়াও পুনর্মিলন হয় নাই। তাই বড় দুঃখে গাহিয়াছিলেন :

নিদ নাহি আঁখিপাতে, বঁধুয়া।

নিয়তি অতুলকে দিয়া তাঁর খেলা খেলাইবেন, তাই শৈশবে দুইবার তাঁর জীবন বিপন্ন হইয়াও রক্ষা পাইল। যৌবনের এক ঘটনায় প্রাণে এমন আঘাত পাইলেন যে তাহার উপশমের জন্য মধ্যম মাতুলের সহানুভূতি পাইয়া বিলাত যাইতে সমর্থ হইলেন ; নতুবা ইহা হওয়া হয়ত কঠিন হইত। তারপর তাঁহার অভিশপ্ত বিবাহ। সকল আত্মীয় স্বজনরা একদিকে, অতুল একদিকে। কিন্তু যে বিবাহের জন্য অতুল সকলের বিরাগ-ভাজন হইল তাহার ফলও বিষময় হইল। নীলকণ্ঠের ন্যায় তিনি নিজে সেই বিষ আকণ্ঠ

পূর্ণ করিয়া ধারণ করিলেন আর তাহাই দেশবাসীকে সুধারূপে দিয়াছিলেন। তখনই অতুল গাহিয়া উঠিল, 'কী আর চাহিব বল হে মোর প্রিয়!' ফলতঃ দেশবাসী অতুলপ্রসাদকে পাইল সাধক রূপে, উদাসী বাউল রূপে আর সর্বত্যাগী বৈরাগী রূপে।"

"বাল্য, কৈশোর ও যৌবনে আমরা পরস্পরের নিকট প্রাণ খুলিয়া যেমন আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা ও সুখ দুঃখের আলোচনা করিতাম, বার্ধক্যের কোঠায় পা দিয়াও আমরা তেমনই প্রাণের কপাট খুলিয়া আলাপ করিতাম। তাই তাঁর প্রাণের খবর মিলিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। প্রত্যেক মানুষেরই জীবনে আলো ছায়া দুই পৃষ্ঠাই আছে। প্রথমটি স্বর্গীয়, তাহার ধ্বংস নাই। দ্বিতীয়টি পার্থিব। অতুলের জীবনের যাহা অবিনশ্বর সেই কথা আমি কমই বলিব। কারণ তাহা হয়ত পক্ষপাত-দোষে দুষ্ট হইতে পারে এই আমার ভয়। তাঁহার শেষ জীবনের সঙ্গী মুখোপাধ্যায় ভ্রাতা-যুগল। অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ, উত্তরার উত্তরাধিকারী ও সাহিত্যে সহকারী সুরেশবাবু ও কথাশিল্পী মরমী কেদার বন্দ্যোপাধায় শেষ জীবনের কথা ব্যক্ত করিবেন আশা করি। আর অতুলের শ্রেষ্ঠ দান সুর ও কথার প্রকৃত বোদ্ধা দিলীপকুমার রায় এ বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করিবেন।

কয়েক বৎসর পূর্বেই অতুল আমাকে তাঁহার উইল কিরূপ হইবে জানাইয়াছিলেন। আমরা সমবয়সী হইলেও তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে তিনি আমার পূর্বেই যাইবেন। গেলেনও তাই। সেইজন্য তাঁহার উইলে আমাদের ও বীরেনকে (Mr B. C. Sen. I. C. S.) তাঁহার উইলের ট্রাষ্টি করিবেন ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। যে কারণেই হোক তাঁহার ইচ্ছার অবশেষে পরিবর্তন করিয়াছিলেন। করিয়া ভালই করিয়া-ছিলেন। হয়ত বুঝিতে পারিয়াছিলেন আমাদেরও সময় আগতপ্রায়। আমরা কেহই এই কঠিন কর্তব্য এত দূরে থাকিয়া সম্পন্ন করিতে পারিতাম না।

লখনউয়ে অতুল প্রথম ভাড়াটিয়া বাড়িতে থাকিতেন; পরে নিজ বাড়ি করার সঙ্কল্প করিয়া যে জায়গা নিয়াছিলেন সে জায়গাটা লখনউয়ের বড় স্টেশনের সন্নিকট। অতুলের নামানুসারে একটি নতুন রাস্তা হইয়াছিল A. P. Sen Road, তাহারই উপর প্রায় পাঁচ বিঘা জমি। এই জমি দু-ভাগ করিয়া দু-খানি বাড়ি করার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। কিন্তু হইয়া ওঠে নাই। এ. পি. সেন রোড সম্বন্ধে অতুল আমাকে বলিয়াছিলেন যে অতুলের লখনউয়ে অনুপস্থিত কালে লখনউয়ের পুরজনেরা অতুলের অজ্ঞাতসারেই একটি নূতন রাস্তা বাহির করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিল A P. Sen Road. লখনউবাসীদের হৃদয়ের ভালবাসার ইহা এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন। যে জায়গাটিতে বাড়ি করার জন্য জমি লওয়া হইয়াছিল তাহার বার্ষিক খাজনা বোধহয় ৬০০ টাকা। এই জায়গা ছিল লখনউ

মিউনিসিপ্যালিটির। অতুলই আমাকে বলিয়াছিলেন যদি ২০ কি ২২ বৎসরের খাজনা একত্রে দেওয়া যায় তবে আর কোন খাজনা দেওয়ার দরকার নাই।

অতুল যাহা উপার্জন করিতেন সবই খরচ করিতেন, তাই এই টাকা দেওয়া সুকঠিন ছিল। আমি আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলাম যে যেমন করিয়াই হোক এ জায়গাটা নিষ্কর করিতে হইবে। কয়েক বৎসর পর আমি যখন অতুলের নূতন বাড়িতে গিয়াছিলাম তখন বলিয়াছিলেন যে এই জায়গাটা নিষ্কর করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

লখনউয়ের বাড়ির পরিকল্পনা তাঁহার নিজের। কত রাত্রি জাগিয়া কী রকম করিলে সুন্দর হয়, কী রকমে সকলের সুবিধা-মত জায়গা হইবে ইহাই চিন্তা করিতেন ও এক-এক সময়ে এক-এক রকম প্ল্যান অঙ্কিত করিতেন। জ্ঞানবাবু নামক একজন ইঞ্জিনীয়ারের কাছে আমাকে নিয়া চলিলেন বাড়ির নির্মাণ বিষয়ে সবিশেষ পরামর্শ করিবার জন্য। অতুলের ইচ্ছা ছিল আমি থাকিয়া আমারই তত্ত্বাবধানে বাড়িটা করায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি সক্ষম হই নাই, থাকিতে পারিলে হয়ত আরো কম খরচে বাড়িটা হইতে পারিত। অতুলের বাড়ির নাম খুড়িমা হেমন্তশশীর (অতুলের মা) নামানুসারে 'হেমন্তনিবাস' রাখা হইল। কিন্তু বড়ই পরিতাপের কথা খুড়িমা এই বাড়ি দেখিয়া যাইতে পারেন নাই।

অতুলের গৃহবিচ্ছেদের মূলে একজন অকৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ-সন্তান ছিল। অতুল নিঃসহায় অবস্থায় সাহায্য করিয়া লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। পরে সে সেই উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইয়াছিল নিতান্ত নির্লজ্জের মত ব্যবহার করিয়া। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনেও এরূপ অভিজ্ঞতা বিরল নহে, এমন গল্প শুনিয়াছি।

অর্ধ-উন্মাদ পত্নী গৃহত্যাগী, ভগ্নীরা তিনজনেই পতিহারা তদুপরি শোকাতুরা, অপর জন কন্যাপাগলিনীপ্রায়। স্নেহময়ী জননী এত সাধের ভবন প্রস্তুত হইবার পূর্বেই চলিয়া গেলেন—এ সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও তাঁহার স্বাভাবিক মাধুর্য হারায় নাই। সদাই হাসিমুখে ধীর-স্থিরভাবে সবই সহ্য করিয়াছেন আর গাহিয়াছেন:

'তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিও।'

বুকে সর্বদা আগ্নেয়গিরির বহ্নি জ্বলিতে থাকিলেও মুখে কিছুই প্রকাশ পাইত না। তাঁহার বাড়ি ছিল একটা আনন্দ-ভবন। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, কুটুম্ব কেহ না কেহ সর্বদাই তাঁর বাড়িতে থাকিতেন। তাঁহাদিগকে আনন্দে রাখিবার জন্য আন্তরিক চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। কাহারো যাহাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয় সেদিকে প্রখর দৃষ্টি। আমি যতবারই গিয়াছি প্রত্যেকবারই আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের নিয়া কাপড়ের কি খেলনার দোকানে গিয়া উহাদের ইচ্ছামত জিনিস কিনিয়া আনিতেন। উহাদিগকে এই সকল দিয়া বড়ই তৃপ্ত হইতেন।

অমিতব্যয়ী বলিয়া আমি সর্বদাই অভিযোগ করিতাম। খুড়িমাও অনেক সময়ে বলিতেন, 'দেখ আমি তো পারি না, তুই বড় তোর কথায় যদি খরচাপত্র কমায়।' আমি যখনই লখনউ যাইতাম তখনই তাঁহার মুন্সিদের প্রতি আদেশ থাকিত যেন হিসেবের খাতা আমাকে দেখানো হয়। আমাকে বলিতেন, 'দাদা তুমি দেখ দেখি কোন্‌টা আমার অন্যায় খরচ?' ভবিষ্যতের জন্য সংস্থান করার কথা বলিলে বলিতেন, 'আমি শেষ জীবনে রামকৃষ্ণ মিশনে থাকব। ৫০ টাকায় আমার বেশ চলে যাবে।' "

ডায়েরির পাতা এলোমেলো। সত্যপ্রসাদ নিয়মিত ডায়েরি লেখেননি। 'রোজনামচা'র অলিখিত নিয়মই বোধহয় তাই। বছর ঘুরে গেছে, হয়ত এক কলমও লেখেন নি, আবার কয়েকটি দিনে পর-পর কিছু ছত্র লিখেছেন। তাঁর বাল্য, কৈশোরও প্রথম যৌবনের সঙ্গী তাঁর কবি-ভ্রাতা অতুল সমস্ত মনপ্রাণ জুড়ে ছেয়ে ছিলেন। ডায়েরির পাতায় তাঁর কথাই—তার জীবনের টুকরো টুকরো ঘটনার মালা আপনার অজানিতে আমাদের উপহার দিয়েছেন। সত্যপ্রসাদের হয়ত এক সময়ে ইচ্ছেও ছিল অতুলপ্রসাদের জীবনী রচনার কাজে হাত দেবেন। কিন্তু হয়ে ওঠে নি; হয়ত বার্ধক্যের জন্যে কিংবা অসুস্থ শরীরের জন্যে—যেকোন কারণেই হোক। তিনি ডায়েরির পাতায় অতুলপ্রসাদের জীবনের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ঘটনাপঞ্জীর একটা ছকও এঁকেছিলেন। শেষের দিকে তাঁর লেখার কোন তারিখ নেই, যদিও কিন্তু অনেক জীবনের জন্মমৃত্যুর তারিখ লিখে গেছেন। সেদিন লিখলেন

"খুড়িমা হেমন্তশশীর জন্ম ১২৫৪
মৃত্যু ২৮শে বৈশাখ ১৩৩২
খুড়িমা ৭৮ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন"

আরো দু-এক পাতা পরে লিখেছেন: "অতুল ও হেমকুসুমের মধ্যে বিচ্ছেদের প্রথম কারণ আমার মনে হয় যে উহাদের বিবাহে যাঁহারা বাধা দিয়াছিলেন ও উহাদের পরে প্রায় ত্যাগ করিয়াছিলেন তাহাদের সম্পর্ক সম্পূর্ণ বর্জন করাই ছিল হেমকুসুমের ইচ্ছা, কিন্তু অতুল তাহা সমর্থন করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, খুব সম্ভবত ঈর্ষা। অতুল ছিলেন স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই প্রিয়। অনেক মেয়েরা অতুলের কাছে গান শিখিতে আসিত ইহা বোধহয় হেমকুসুম পছন্দ করিতেন না। বিচ্ছেদের পর অতুল আমাকে বলিয়াছিলেন যে অতুলের কি হেমকুসুমের দিকের আত্মীয়ের কাহারো সঙ্গে কোন সংস্রব থাকে ইহা হেমকুসুমের ইচ্ছা ছিল না।"

অতুলপ্রসাদের পরলোক গমনের পর একটি বছর অতিক্রান্ত হল, ফিরে এল সেই দুঃস্বপ্নের কাল রাত্রি। মনে হয় না অতুল আর এ জগতে নেই। তাঁর গান আজ আকাশে বাতাসে সকলের কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরছে। তাঁর কথা যে একদিনও ভুলতে পারা

যায় না। ভোলা যায় না তাঁর দুঃখ তাঁর বেদনা, তাঁর উচ্চ হাসি, সরস উক্তি আর হাস্যমুখর লাজুক মুখখানা। তিনি যে উদাসী বাউল, সাধক, সর্বত্যাগী বৈরাগী।

সত্যপ্রসাদ লিখলেন :

"আজ প্রায় এক বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল প্রাণাধিক অতুলকে আমি হারাইয়াছি। তাঁহার শোক আমাকে বড় বিচলিত করিয়াছে। এমন এক দিনও যায় নাই যেদিন তাঁহার কথা স্মরণ করি নাই অথবা তাঁহার বিষয়ে আলোচনা করি নাই। শোক ব্যথায় ইহাই আমাকে সান্ত্বনা দিতেছে। ঈশ্বর মঙ্গলময়।"

(অতুলপ্রসাদের মৃত্যুবার্ষিকীতে সত্যপ্রসাদের ভাষণ)

রাজর্ষি কালীনারায়ণ তাঁহার রচিত গানের পুস্তক 'ভাব সঙ্গীত' তাঁহার তিন শিশু দৌহিত্র অতুলপ্রসাদ, চারুচন্দ্র ও নলিনীভূষণকে অর্পণ করিয়াছিলেন। তিনজনই সুকণ্ঠ ছিলেন। অতুলপ্রসাদ কেবল সুকণ্ঠ ছিলেন না, তিনি দাদামহাশয়ঠাকুরের সঙ্গীত রচনার যোগ্য উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।

অতুলপ্রসাদের কর্মক্ষেত্র যুক্তপ্রদেশের লখনউ শহরে ছিল। কিন্তু তাঁহার সঙ্গীতের রস বাঙলাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। অতুলপ্রসাদের সঙ্গীত এতই উচ্চদরের ছিল যে কেহ কেহ অতুলপ্রসাদের কোন কোন গানকে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের রচনা মনে করিতেন। সেই কারণে কবিগুরু অতুলপ্রসাদকে তাঁহার রচিত গানগুলো পুস্তকাকারে বাহির করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। অতুলপ্রসাদের রচিত গান বাঙলা ভাষায় অপূর্ব সম্পদ। তাঁহার গীতাবলী তাঁহাকে বাঙালীর নিকট অমর করিয়া রাখিবে। সুখের বিষয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অতুলপ্রসাদের গান বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যভুক্ত করিয়াছেন।

অতুলপ্রসাদ উত্তর ভারতের খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী, সমাজ হিতৈষী, আর্তের বন্ধু এবং শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক। বাঙলায় তিনি উদাসী বাউল বলিয়াই পরিচিত। আজীবন অতুলপ্রসাদ সঙ্গীতে মশগুল ছিলেন, তাই গাহিয়াছেন, 'মিছে তুই ভাবিস মন, তুই গান গেয়ে যা গান গেয়ে যা আজীবন।' গাহিলেন :

'সংসারে যদি নাহি পাই সাড়া
তুমি তো আমার রহিবে
বহিবারে যদি নাহি পারি এ ভার
তুমি তো বন্ধু বহিবে।
দুঃখেরে আমি ডরিব না আর
কণ্টক হোক কণ্ঠের হার
জানি তুমি মোরে করিবে অমল
যতই অনলে দহিবে।'

দুঃখী অতুলপ্রসাদ তাঁর চিরসঙ্গী সঙ্গীতের মধ্যে আত্মস্থ হইতে চাহিয়াছিলেন। গাহিলেন, 'ওগো দুঃখসুখের সাথী সঙ্গী দিনরাতি সঙ্গীত মোর !'

সংসারের অশান্তির মধ্যেও অতুলপ্রসাদ বাহিরের পাগলকে অন্তরে দেখিতে পাইলেন। পাগলের ডাক শুনিয়া অতুলপ্রসাদ গাহিয়া উঠিলেন, 'যাব না যাব না, যাব না ঘরে, বাহির করেছে পাগল মোরে।'

জাতীয় কবি অতুলপ্রসাদ

দীনশা ওয়াচার সভাপতিত্বে কলিকাতায় বিডন পার্কে যে বৎসর জাতীয় মহাসভা হইয়াছিল সেই মহাসভায় অতুলপ্রসাদ গাহিলেন, 'উঠো গো ভারতলক্ষ্মী, উঠ আদি জগতজন-পূজ্যা।' সভাস্থ সকলে মন্ত্রমুগ্ধ ও চমৎকৃত। এ লোকটি কে ? এমন আশ্চর্য রচনা কাহার ? সেইদিন হইতে অতুলপ্রসাদ বাঙালীর নিকট পরিচিত হইলেন। তারপর তাঁহার 'হও ধরমেতে ধীর হও করমেতে বীর হও উন্নতশির নাহি ভয়', 'বল বল বল সবে শত বীণা বেণু রবে' ইত্যাদি গান তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বাঙলার ও বাঙালীর আপনজন করিয়া দিল। তদবধি বাঙলায় কবি অতুলপ্রসাদ সর্বজন-পরিচিত।

বিদুষী স্বর্ণকুমারী দেবী অতুলপ্রসাদকে জলধর সেন মহাশয়ের সঙ্গে পরিচিত করার সময়ে বলিয়াছিলেন, 'দেখুন ইনি "উঠগো ভারতলক্ষ্মীর কবি।" ' ইহাই অতুলপ্রসাদের প্রকৃত পরিচয়।

সংস্কারক অতুলপ্রসাদ

মহাত্মার অচ্ছুত আন্দোলনের বহু পূর্বেই অতুলপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন, 'পরের শেকল ভাঙিস পরে নিজের শিকল ভাঙ রে ভাই, আপন কারায় বদ্ধ তোরা পরের কারায় বন্দী তাই।'

অতুলপ্রসাদ হিন্দু মুসলমানকে পৃথক বলিয়া জানিতে শিখেন নাই, ভাবিতেও পারেন নাই। তাই ব্রাহ্ম অতুলপ্রসাদের শবাধার বহন করিয়াছিলেন একদিকে হিন্দু ডাঃ জগৎনারায়ণ, অপরদিকে মুসলমান বন্ধু মিঃ মহম্মদ নাসিম। অতুলপ্রসাদের নিকট ধর্ম পৃথক হইলেও সকল ভারতবাসীই জাতিগতভাবে এক, সকলেই 'ভারতীয়'।

দরদী অতুলপ্রসাদ

অতুলপ্রসাদ কথায় ও কার্যে এক ছিলেন। জীবিত কালে তাঁহার আয়ের অধিকাংশই দানে ব্যয় করিতেন, মৃত্যুর পরও উইল দ্বারা আয়ের প্রায় সমস্তটাই পরার্থে দান করিয়া গিয়াছেন। তাই অতুলপ্রসাদ গাহিয়াছেন :

"কতকাল রবে নিজ বিভব অন্বেষণে"

ভক্ত অতুলপ্রসাদ

অতুলপ্রসাদের সঙ্গীতের বহু স্থানে শেষের দিনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মনে হয় সেই দিনের জন্য যেন তিনি সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন।

ভক্ত মাতামহ কালীনারায়ণ গুপ্ত গাহিলেন :

'ওগো দরদী—আমার মন কেন উদাসী হতে চায়।

যোগ্য দৌহিত্র অতুলপ্রসাদ গাহিলেন :

আমার পরান কোথা যায়—কোথা যায় উড়ে।

* * *

এক প্রবন্ধে ধূর্জটিপ্রসাদ লিখেছেন :

"অতুলপ্রসাদ ছিলেন সুসমন্বিত পুরুষ।......তাঁর জীবনের বহুমুখীনতা কোন দ্বন্দ্ব কিংবা বিভাগ সৃষ্টি করেনি। দ্বন্দ্ব ছিল না বলি না, কিন্তু সেই দ্বন্দ্বের শক্তিকে তিনি সুসম্বদ্ধ সংহতিতে পরিণত করেছিলেন। বিভাগ যে কত ছিল সকলেই জানেন। অত বড় ব্যারিস্টার, নেতা, সমাজ সেবক, কর্মী, দাতা, কবি, সঙ্গীত রচয়িতা একাধারে দুর্লভ। কিন্তু প্রত্যেক কর্ম তাঁর স্বভাবে এত উত্তম-ধৃত ছিল যে মনে হত সবই যেন অন্তরের জ্যোতির বিকিরণ, গোলাপগাছের গোলাপ ফোটার মত স্বাভাবিক, প্রতিবেশের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। প্রতিকূলকে অনুকূলে রূপান্তরিত করার জাদুবিদ্যা তাঁর ছিল করায়ত্ত। এমন প্রয়াসবিহীন সামঞ্জস্যের কৃপাতেই তিনি ছিলেন জনপ্রিয়।

কিন্তু বিশেষ কর্মেই তাঁর সমগ্রতা ধরা পড়ত। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন সর্বোচ্চ সমিতির সভ্য হিসেবে। কিন্তু আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অন্য ধরনের। আরো অনেকের মত আমি তাঁর কর্মান্তের বিরামের সঙ্গী ছিলাম। আমাদের পরিচয় হয় সঙ্গীতের দৌত্যে, সঙ্গীতের আসরে।......কৈসরবাগে তখন তিনি থাকতেন। অনেক রাত পর্যন্ত গানবাজনা হয়। তারপর কত আসরে তাঁর পাশে ব'সে গানবাজনা শুনেছি তার সংখ্যা নেই।

তাঁর গান গাওয়ার মধ্যে একটা কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে। সেটা হল অবসর। আরম্ভ করার পূর্বেই গানকে অবসর দিতেন ; চোখে বুজে, নীরবে জমি তৈরি করতেন। কালো ভেলভেটের ওপর কামদানীর কাজ, আগ্রহে উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করতাম। গান গাইবার সময়ে প্রত্যেক কথাকে অবসর দিতেন। বাক্যের সঙ্গে তার সম্বন্ধটি উপলব্ধি হত। নীরবতার আশ্রয়ে গানটি মিলিয়ে যেত, যেন মায়ের কোলে ছেলে ঘুমিয়ে পড়েছে। তাঁর গান গাওয়া ছিল নিভৃতের কম্পিত রূপচ্ছটা, রাগ হত সম্ভ্রমের সংযত কুশলতা। এই বিরাম কি তাঁর বিশ্রামবিহীন জীবনের ক্ষতিপূরণ ? কে

তাঁর জীবনের কর্মকথা বুঝে তাঁর গান গাইবে? করুণায় মৃদুল, অন্তরেরই ভাবসম্পদে অন্তর্মুখী যে নয় সে যেন তার গান না গায়।

তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের মহা ভক্ত। কবির কবিতা শুনতে পেলে আর কিছু চাইতেন না। বলতেন, 'লিখতে লজ্জা হয়, ইচ্ছে হয়, কেবল পড়ি। কিন্তু হঠাৎ যেন হাত কিরকম করে ওঠে।' রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও অন্য কবির কবিতা পড়তে তিনি খুব ভালবাসতেন। তাঁর রুচি ছিল নিতান্ত উদার। সাহিত্যের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি না থাকলে এইপ্রকার সার্বভৌমিকতা লাভ করা যায় না। তুলসীদাস ও কবিরের দোঁহা, মীরাবাঈয়ের ভজন তাঁর নিতান্ত প্রিয় ছিল। কিন্তু সাত রাজার ধন মানিক তাঁর নিজের ভাষা বাংলা ভাষা। সঙ্গীত ও কবিতা রচনা ছাড়া অন্য উপায়ে প্রবাসী তিনি বাংলা ভাষাকে সাহায্য করেছেন। 'উত্তরা'র জন্যে, উত্তর প্রদেশের বাঙালীর সাহিত্য অনুষ্ঠানের জন্যে, এ অঞ্চলের প্রত্যেক বাংলা বিদ্যালয়ের জন্যে তিনি যে হাজার হাজার টাকা দান করেছিলেন সে কেবল সাহিত্যের প্রতি গভীর ভালবাসার প্রেরণায়। 'উত্তরা' তাঁরই মানস সন্তান। তিনিই প্রথম বলেন কাগজ বের করতে হবে। রাধাকমলবাবু এবং প্রবাসী বাঙালী প্রত্যেকেই তাঁর প্রস্তাব সোৎসাহে গ্রহণ করেন। প্রথম সংখ্যা বেরুল, তারপর সব উৎসাহে ভাঁটা পড়ল। অন্য শহর থেকে টাকা এল কিন্তু তাঁর দুরাশা পূরণের উপযুক্ত নয়। লাগে টাকা দেবে অতুল সেন। তিনি টাকা দিলেন কত, আমি জানি। দেবার সময় রাগের ভান করে বললেন, 'টাকা আমি আর দিতে পারব না।' শুনে প্রত্যেকে হেসেছিলাম।...কতবার যে হয়েছে ইয়ত্তা নেই—'অমুক লোকটা আমায় ঠকিয়েছে হে ওকে আর এক পয়সা দেব না', তখনই বলাবলি করতাম, 'ইতিপূর্বে মন নরম হয়েছে তাই নিজের দুর্বলতা লুকুতে ব্যস্ত।'...

"প্রবাসী বাঙালীদের সাহিত্য-সভায় যোগ দেওয়া ছিল তাঁর নেশা।...তাঁর উপস্থিতিতে রসের ফোয়ারা খুলে যেত। গান, গান আর গান। কানপুরে রাত দুটো পর্যন্ত গাইলেন, দিল্লীতে জয়ন্তী উৎসবে রাত বারোটা পর্যন্ত।...গোরখপুর, নাগপুর, কাশী সর্বত্রই তিনি গেয়েছেন—সকলকে মুগ্ধ করে এসেছেন—কেবল সৌজন্যে নয়, সাহিত্য-প্রীতির সংক্রমণে।"

শ্রীযুক্ত ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের পত্র নিচে 'সুরেলা' নামে 'উত্তরা'র অতুল স্মৃতি সংখ্যায় প্রকাশিত রচনাটি থেকে কিছু অংশ তুলে দেওয়া হল:

"অতুলপ্রসাদ আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। সন্ন্যাস রোগে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সব শেষ হয়ে গেছে। না, সব শেষ নয়। অনেক কিছু রয়ে গেল। দিয়ে গেছেন তিনি। উত্তরাধিকারী আমরা সে সম্পদের। তাঁর গানের। কম নয় সে সৌভাগ্য।

সে গান সে যে কী বস্তু ছিল তা তুমি জান। তাঁর 'কয়েকটি গান'—তাঁর প্রথম গানের বই,—যা প্রকাশ করতে তাঁর কতই কুণ্ঠা ছিল, তুমিই একরকম জোর করে প্রেসে দাও। আমার বিশ্বাস খুব কম লোকই তাঁর গানকে তেমন করে জানে। তুমি যে ছিলে তাঁর বোদ্ধা, সতীর্থ, বন্ধু। শুধু সুরের যে নৈর্ব্যক্তিক আবেদন তার মধ্যে দিয়েই নয়, দরদের, সামীপ্যের, তাঁর ব্যক্তিগত মাধুর্যের মধ্যে দিয়েও চিনেছিলে তাঁর সুরকে তাঁর সুরময় প্রাণকে। তাই তুমি জানো যে এমন সুরেলা কান ও ফুলেলা প্রাণ জীবনে বড় বেশি মেলে না। তোমার কাছে কত প্রিয় এই গানটি আমি জানি :

'আমার বাগানে এত ফুল, তবু কেন চলে যায়
(তারা) চেয়ে আছে তারি পানে, সে তো নাহি ফিরে চায়।'

এক নতুন ঢঙের খাম্বাজ ; ছোট মীড়ে, ছোট গমকে, ছোট তালে এ গানটি শুনলে কার না মনে জাগত উদাস-করা ফুলের সুগন্ধ ? আলোক-লোকের পিপাসা ? কার না অতুলপ্রসাদকে লক্ষ্য করে বলতে ইচ্ছে হত

'ফুলে ও সুরে ভরেছ কবি প্রাণ!
কণ্ঠ তব গায় তো তারি গান।'

মনে পড়ে যেদিন এ গানটি তিনি প্রথম শুনিয়েছিলেন তাঁর পেলব অভিমানী কণ্ঠে। কত দরদই না ছিল তাঁর মধুর সুরেলা কণ্ঠস্বরে। কজন বড় গায়কের মধ্যে সে মনোজ্ঞ সুর, সে দরদ মেলে ?"

* * *

এক প্রবন্ধে লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অর্থনীতির অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "অতুলপ্রসাদ সেনের মনের এমন একটা প্রসারতা ছিল যাহাতে তিনি কি বাঙালী কি অবাঙালীর সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করিতে পারিতেন। প্রবাসী বাঙালীর পক্ষে এইটাই তাঁহার বিপুল কর্মময় ও রসপ্রবণ জীবন হইতে প্রধান গ্রহণ করিবার জিনিস। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে অপরিচিত দেশে ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি অবসর সময়ে এ প্রদেশের সাহিত্য ও গান, আমোদ-উৎসব ও চারু শিল্পকলার রসপ্রাচুর্য উপভোগ করিবার জন্য সর্বদাই উন্মুখ থাকিতেন। এই কারণেই তাঁহার বন্ধুত্বের আদানপ্রদান বাঙালী সমাজে আবদ্ধ ছিল না। গোখলে, চিন্তামণি ও শ্রীবাস্তবের সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্বের প্রগাঢ়তা অনেক বাঙালী কল্পনাই করিতে পারে নাই। একটি সহজ সহৃদয়তা ও উদ্বেল প্রীতি তাঁহার পরিশীলনের প্রসারতার সহায় ছিল।

'আমায় রাখতে যদি আপন ঘরে
বিশ্বঘরে পেতাম না ঠাঁই।

দুজন যদি হত আপন

হত না মোর আপন সবাই।'

এইটাই তাঁহার জীবনের মূলসূত্র ছিল। তাই তিনি আপনা ভুলিয়া মনে প্রাণে এত ভালবাসিতে পারিয়াছিলেন।

কিন্তু যে বাঙালীর অন্তর এমন করিয়া প্রবাসকে ভালোবাসিতে পারিয়াছিল তাহা দিয়া প্রবাস জীবন বাঙালী জাতিকে কম দান দেয় নাই। কত গান কত কবিতায় এই বাঙালী কবি উত্তর ভারতের সাহিত্যের সহজ লৌকিক অনুভূতি তাঁহার সরল ভাবপ্রকাশ ও তাঁহার চঞ্চল বিচিত্র ছন্দে আনিয়াছেন। লৌকিক গানের ভিতর জাতির মনের স্ফূর্তির প্রধান সুরটি ধরা পড়ে। তাই কবি যখন নতুন ছন্দে নতুন প্রকার শব্দ যোজনায় নতুন তীব্র আবেদনে বাংলা গানে নতুন মাধুর্য আনিলেন তখন আমরা তাঁহার শুধু প্রতিভার মৌলিকতার পরিচয় পাই না, বেশি পরখ ও প্রশংসা করি তাঁহার মনোময়তার, যাহার জন্য উত্তর ভারতের পরিশীলনের সহিত বাংলার প্রাণের একটা সহজ ও সুন্দর সংযোগ স্থাপিত হইল। সঙ্গীতের নূতন ছন্দ, অভিনব সুরের লীলা-তরঙ্গ বাংলার ভাবুক প্রাণকে মুগ্ধ করিয়াছে ইহা সত্য।

'এ বনেতে বনমালী, কোথা তব বনফুল ?

কার লাগি ধায় এত দলে দলে অলিকুল ?'

এই গানে হিন্দুস্থানী গজলের সুর বাঙলাদেশের কীর্তনের সুরের মতই প্রচলিত হইতে পারে।...আরো কত গানের সুর ও ছন্দ বাংলাদেশের পক্ষে নূতন, আদরণীয়। কিন্তু এই সুর মিশ্রণ বা নূতনত্বের মৌলিকতার চেয়ে যাহা সর্বাপেক্ষা গৌরবের জিনিস অতুলপ্রসাদ সেনের গীতি কবিতায় তাহা হইতেছে বাংলার সহিত উত্তর ভারতের ভাব-সাধনার আদানপ্রদান।

প্রবাসী বাঙালীর সর্বাপেক্ষা গুরু দায়িত্ব বাংলার কূপমণ্ডূকত্বের বাহিরে আসিয়া বিপুল ভারতের ভাবসাধনের উত্তরাধিকারী হওয়া। প্রবাসী বাঙালী ভারতবাসী হউক, তবেই বাংলার পরিশীলনের সার্থকতা। ভারতের গৌরব। অতুলপ্রসাদ সেন এই মহান আদর্শের অগ্রদূত। ...অতুলপ্রসাদের জীবন ও সাধনার মধ্য দিয়া আমরা পাই বাঙলা দেশ ও বহির্ভারতের পরিশীলনের আদান প্রদান।

...অতুলপ্রসাদ এক হিসাবে প্রবাসী বাঙালীর বিচিত্র ভাবসাধনার সংযোজনার অগ্রদূত। প্রবাসী বাঙালীকে নিঃশঙ্কচিত্তে আপনার জাতীয় ভাবসাধনার ভিত্তিতে একটা সার্বজনীন শীলতা ও পরিশীলন অর্জন করিতেই হইবে। ...অতুলপ্রসাদ সেনের সমস্ত জীবন ও সাধনা আমাদের নিকট আজ এই প্রবাস জীবনের ঘোর বৈষম্য ও বিরোধের মধ্যে এই নির্দেশই দিতেছে।

কিন্তু শুধু জাতির নয়, ব্যক্তিগত জীবনের উপর তাঁহার অধিকার বড় কম নহে। কারণ অতুলপ্রসাদ সেন যে বড় গায়ক ও কবি। ঋতু পর্যায়ে যুগে যুগে কত নিবিড় বরষা আমাদিগের মনকে বিরহ-ব্যথায় ভরিবে। গঙ্গা-যমুনার বিপুল বক্ষে কত চাঁদিনী রাত্তি আসিয়া ফিরিয়া যাইবে। আকাশের দুই তীরে কত আলো কত কালো মিলিয়া হোলিখেলা খেলিবে। মধুমাসে কত সখী মধু হাসিয়া প্রেম সম্ভাষণ জানাইবে। প্রকৃতি ও জীবন আমাদিগকে কত না সম্পদে ধনী করিবে, কত না বেদনায় ক্ষত-বিক্ষত, কত না রিক্ততায় উদ্বেল করিবে। তখনই কবি তাঁহার মনোহারী সুরটি লইয়া আমাদিগের প্রতি সুখ দুঃখ, প্রতি কান্না-হাসির মধ্যে মনের মানুষটি সাজিয়া জীবনের সঙ্গে মিশিয়া থাকিবেন। সম্পদের দিনে আমরা এই কবিকে ফিরিয়া পাইব কত না তাঁহার মধুর হোলি, কাজরী, নটমল্লার, চৈতী ও শাওয়নী গানে, কিন্তু তাঁহাকে আমরা আরো নিবিড়ভাবে পাইব দুঃখের দিনে, চোখের জলের মধ্যে, যখন আমাদিগের সাজানো বাগান নিদারুণ উত্তপ্ত ঝটিকায় শুকাইয়া যাইবে—শুধু কাহার চরণের অলক্ত-রাগ আলবালে অঙ্কিত থাকিবে। এই ঘর-ছাড়া কবি, যাহার জীবনের প্রধান সুর হইতেছে অন্তরের বিরাগী বাউলের সে বাণী—

'যাব না, যাব না, যাব না ঘরে
বাহির করেছে পাগল মোরে!'

তিনি দেখা দিবেন কত না দুঃখের তিমির রাতে। যখন দুঃখের বাদল রাত মনোবিহঙ্গকে অন্ধ ও হতাশ করিবে, যখন গগনে বাদল, নয়নে বাদল, জীবনে বাদল ছাইবে, অলক্ষিতে তখন আঁখিপাতে জাগিয়া হাসিতে থাকিবেন :

'মিছে তোর সুখের ডালি, মিছে তোর দুখের কালি :
দুদিনের কান্না-হাসি—ছল ছল ছল রে ভোলা!'

দুঃখের কবি এ জীবনের পরম সাথী। কারণ মানুষ অমৃতের পরশ পায় চোখের জলে। নিস্পন্দ হতাশ অন্ধকারে। সম্পদের রোশনাইয়ের হাজার হাসিতে নয়।

* * *

অতুলপ্রসাদ সেনের আত্মীয়া ৺সুবালা দেবী 'অতুল' নামক প্রবন্ধে বলেন :

"ঢাকা নগরীতে একটি শিশুর জন্মের কথা মনে পড়িল। এই শিশুটি আমার পূজ্যপাদ পিতা স্বর্গগত ভক্ত কালীনারায়ণ গুপ্তের প্রথম দৌহিত্র। তাই এই শিশুর মুখখানি দর্শনে সকল আত্মীয়স্বজন ও দাদামহাশয়ের মনে আনন্দ আর ধরে না। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই শিশু দাদামহাশয়ের অঞ্চলের নিধি হইয়া উঠিল। তাহার সরলতা-মাখা পবিত্র সুন্দর মুখখানি কেহ আদর না করিয়া থাকিতে পারিত না। দাদামহাশয় তাহাকে ভগবানের প্রসাদ স্বরূপ পাইয়া তাহার নাম দিয়াছিলেন

অতুলপ্রসাদ। তাঁহার যত্ন ও সোহাগে এই শিশু বাড়িতে লাগিল। অত্যধিক আদরে শিশুর চরিত্র কোনপ্রকার বিকৃত হয় নাই। তাহার আহার, খেলা, শোয়া, বসা সবই তাহার ঠাকুরদাদার সঙ্গে। (অতুল তাঁহাকে ঠাকুরদাদা বলিয়াই ডাকিত) তাই বাল্যেই দাদামহাশয়ের সকল সদ্‌গুণ তাহার চরিত্রে অঙ্কুরিত হইয়াছিল।"…"আমাদের পিতৃদেবের পূত জীবন কাব্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা, চিত্র ও হাস্যামোদে আনন্দময় ছিল। তিনি ছিলেন আনন্দের উপাসক…আমাদের অতুলের জীবন এমন আদর্শ জীবনের সহবাসে দিন-দিন বিকশিত হইতেছিল। বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতে, চিত্রে, কাব্যে তাহার আশ্চর্য অনুরাগ ছিল। শুনিয়াছি বাবা যখন উৎসবে নগর সংকীর্তন লইয়া বাহির হইতেন এবং ভাবোন্মত্ত হইয়া কীর্তন করিতেন তখন পাঁচ বৎসরের শিশু অতুল-প্রসাদও করতাল সহযোগে তাঁহার সহিত সংকীর্তনে উন্মত্ত হইত ও দু-চোখে জলধারা বহিয়া যাইত।…দাদামহাশয় তাহাকে কোলে লইয়া কত আদর ও আশীর্বাদ করিতেন। দাদামহাশয়ের আদর্শ জীবন আলোকস্তম্ভ স্বরূপ চিরদিন তাহাকে জীবন পথে চালিত করিয়াছে।

দানে বাল্যকাল হইতে অতুল মুক্তহস্ত ছিল। কাহারও দুঃখ দারিদ্র্য দেখিলে সে অস্থির হইয়া পড়িত। কোন ভিখারী তাহার নিকট হইতে রিক্ত হস্তে ফিরিতে পারিত না। মুষ্টিভিক্ষার স্থলে তাহার থলিটি পূর্ণ করিয়া বিদায় দিত। ইহা দেখিয়া আমার দিদি হাসিমুখে বলিতেন, 'অতুলের জন্য আমার ভিক্ষার চাউল সর্বদা ভাণ্ড ভরিয়া রাখিতে হয়। অন্ন দিয়া তাহার প্রাণ কিছুতেই তৃপ্ত হয় না।"

আমি সম্পর্কে তাহার মাসি হইলেও তাহার বয়োকনিষ্ঠ ছিলাম। সেইজন্য বাল্যকালে অতুল আমার খেলার সাথী ছিল। এবং আমরা একত্রে খেলাধূলা ও আনন্দে বর্ধিত হইয়াছি। তাহার সরল মিষ্ট স্বভাব সকলকে আকৃষ্ট করিত। ছেলেবেলা হইতে তাহার কবিতা লিখিবার অভ্যাস ছিল ও সঙ্গীতে প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাল মান লয় সহযোগে সুমিষ্ট কণ্ঠে গান গাহিয়া সকলকে মুগ্ধ করিত। অনুকরণ করিবার শক্তিও তাহার আশ্চর্য ছিল। তাহার সমবয়সী ছোটমামার সঙ্গে একত্রে মিলিয়া সঙ্গীত, অনুকরণ ও হাস্যামোদে আমাদের গৃহ সকল সময়ে মুখরিত রাখিত।"…"এগারো বৎসরে তাহার পিতৃবিয়োগ ঘটে। এই সময়ে দাদামহাশয় তাহাকে আরো বুকে আঁকড়াইয়া ধরিলেন। তাহার মাতুলেরা একদিনের তরে পিতার অভাব বুঝিতে দেন নাই। পাঠ্যাবস্থাতেই তাহার খুউব বক্তা হইবার সাধ ছিল। তখন কলেজে পড়িত, অনেক সময়ে দেখিয়াছি ছাদে পায়চারি করিতে করিতে বিড়-বিড় করিয়া কি বলিত। আমি হঠাৎ পিছন হইতে বলিতাম, 'কী করছ?' চমকিয়া বলিত, 'কিছু না। এক জায়গায়

কিছু বলবার জন্য ছাত্রবন্ধুরা ধরেছে, তাই যা বলব তাই অভ্যাস করছি।' পরবর্তী জীবনে তিনি সুবক্তা হইয়াছিলেন।"

সুবালা দেবী আরো বলেছেন :

"সেই সময়ে তাহার ইংলণ্ড যাইবার জন্ম বড় আগ্রহ দেখা যাইত।...একদিন বলিল, 'আমার বিলেত যেতে এত ইচ্ছে হয় যে কী বলব! যদি কেউ চাকর করেও আমাকে সঙ্গে নিয়ে যায় আমি যেতে রাজি আছি।'...বিলেত হইতে ব্যারিস্টার হইয়া আসিলেন। ...কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গে তাহার খুব বন্ধুত্ব ছিল।...তাহার পর রংপুরে কিছুদিন প্র্যাকটিস করে। সেখান হইতে আবার বিলেত যাত্রা করে। সেখানে তাঁহার একটি মুসলমান বন্ধু লখনউ যাইয়া প্র্যাকটিস করিবার জন্য তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করেন এবং বলেন, 'আমি তোমার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব। নিশ্চয়ই তোমার সেখানে ব্যবসায়ের উন্নতি হবে।' তাঁহার কথামত ফিরিয়া আসিয়া লখনউয়ে প্র্যাকটিস শুরু করিল।...সেখানে তাহার জীবনের সকল দ্বার মুক্ত হইয়া গেল।

লখনউ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চার জন্য বিখ্যাত। সেখানে গিয়া তাহার সঙ্গীত-চর্চার বিশেষ সুযোগ ঘটিল এবং তাহার অন্তরের সঙ্গীত নানা ভাবে ও নানা ছন্দে নব নব সুরে উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। তাহার কণ্ঠে এক উন্মাদনা শক্তি ছিল। তাহার সুকণ্ঠে তাহার রচিত সঙ্গীত যখন গীত হইত তখন মুখে এক স্বর্গীয় ভাব প্রকাশ পাইত। তাহার সঙ্গীতের ভাষা সরল ও হৃদয়স্পর্শী। কি ধর্ম-সঙ্গীত, কি স্বদেশ-সঙ্গীত, কি অন্যান্য সঙ্গীত—সকলের ভিতরেই তাহার প্রাণের একাগ্রতা এবং ভগবানে বিশ্বাস এবং ভক্তি প্রকাশ হইয়াছে। তাই তাহার দেশপ্রীতি শুধু কথায় পর্যবসিত হয় নাই। ধর্মকে ভিত্তি না করিলে যে খাঁটি স্বদেশপ্রীতি হয় না, সেই ভাব তাহার সকল স্বদেশ সঙ্গীতের ভিতরেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর', 'কতকাল রবে নিজ যশ-বিভব অন্বেষণে' ইত্যাদি অনেক সঙ্গীতই তাহার প্রাণের এই গভীর ধর্মভাবের পরিচায়ক।...অন্তর্নিহিত ভগবৎ প্রেমই বিশ্বপ্রেমে পরিণতি লাভ করে। এই প্রেমই তাহাকে দেশসেবা ও জনসেবার কার্যে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল।...তাহার মধ্য ও শেষ জীবন লখনউ শহরেই কাটিয়াছে। সেখানকার সকল মঙ্গল প্রতিষ্ঠানেই সে আগ্রহী ছিল এবং জাতিধর্ম-নির্বিশেষে ধনী দরিদ্র সকলের যথাশক্তি কল্যাণ সাধনে আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছিল। কাহারও দুঃখ অভাবের কথা শুনিলে চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিত এবং সেই দুঃখ মোচনে তনু মন ধন সর্বস্ব দিতে কখনো দ্বিধাবোধ করিত না।"

তাহার একটি ভাগিনেয়ীর বিবাহের সময় আমরা ইচ্ছা করিয়াছিলাম যে বিবাহের উপাসনায় অতুলপ্রসাদের রচিত সঙ্গীতই গীত হইবে। সে ইহা পছন্দ করিল না।

আমাকে বলিল, 'এ হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের এত সুন্দর সুন্দর সঙ্গীত থাকতে শুধু আমার রচিত গানগুলিই হবে, এ আমার ভাল লাগছে না। চারটি গানের মধ্যে অন্তত দুটি রবীন্দ্রনাথের হোক।' রবীন্দ্রনাথকে সে এতই শ্রদ্ধা করিত এবং নিজেকে নগণ্য মনে করিত।

বাড়িতে কেহ অতিথি আসিলে আত্ম পর ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলকেই সমান যত্ন ও আদর করিত। তাঁহাদের আরামে ও সুবিধায় রাখিবার জন্য নিজের সব ছাড়িয়া দিত। এবং তাঁহাদের মনোরঞ্জনের জন্য কতরূপে ব্যয় করিত। তাহার গৃহ কখনো অতিথিশূন্য থাকিত না।

তাহার বড় ভয় ছিল মৃত্যুর সময়ে রোগে ভুগিয়া পাছে কাহাকেও কষ্ট দিতে হয়। ঈশ্বর তাহার সে প্রার্থনা শুনিয়াছিলেন। সকলের কাছে হাসিমুখে বিদায় লইয়া শয্যা গ্রহণ করিয়া চক্ষু মুদিত করিল, সেই চক্ষু আর মেলিল না।

মানুষ-মাত্রেরই দোষ ত্রুটি দুর্বলতা আছে। তাহারও তাহা থাকা স্বাভাবিক। রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করে সত্য, কিন্তু রাহুমুক্ত চন্দ্র যেমন স্নিগ্ধ ও নির্মল জ্যোতিতে প্রকাশ হয়, আমাদের প্রিয় অতুলপ্রসাদের জীবনও আরো উজ্জ্বলতর রূপে আমাদের সকলের অন্তরে প্রকাশ পাইতেছে।...বিশ্বজননী তাহার সকল সন্তাপ হরণ করিয়া তাহাকে কোলে স্থান দিয়াছেন।

* * *

লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন: "অতুলপ্রসাদের অপ্রত্যাশিত পরলোক গমন বিনা মেঘে বজ্রপাতের ন্যায় লখনউবাসী সকলকেই আঘাত করিয়াছে।....আবালবৃদ্ধ বনিতা জাতি-সম্প্রদায়-শ্রেণী নির্বিশেষে গভীর শোকে অভিভূত। তাঁহার নশ্বর দেহ স্কন্ধে বহন করিবার জন্য অশ্রু-সিক্ত নয়নে প্রথমে অগ্রসর হইয়াছিলেন লখনউয়ের হিন্দুর অধিনায়ক পণ্ডিত জগৎনারায়ণ আর মুসলমানের প্রতিমিধি মহম্মদ নসীম। ইঁহারা দুইজনেই লখনউর আইন ব্যবসায়ী-দিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ও প্রবীণ। ইঁহারা উভয়ে শোকবিহ্বল চিত্তে অতুলপ্রসাদের জীবনের অন্তিম কার্যের ভার গ্রহণ করিবার অধিকার উপস্থাপিত করিলেন।...ঘটনাটুকু সামান্য ও ক্ষণিক হইতে পারে, কিন্তু ইহার অর্থ নিগূঢ় এবং সঙ্কেত নিতান্ত মর্মস্পর্শী। ইহা অতুলপ্রসাদের ঐহিক কর্মজীবনের সার্থকতা ও বিশেষত্বের একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন।

বিগত চৈত্র মাসে তাঁহার শরীরের অবস্থা বিশেষ শঙ্কার কারণ হইয়া ওঠে। চিকিৎসকের আদেশে তিনি তখন লখনউ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং চিকিৎসা এবং বিশ্রামের জন্য কলিকাতায় যান। কলিকাতায় যাওয়ার সময়ে আমি কিছুদূর ডাকগাড়িতে তাঁহার

সহযাত্রী হইয়াছিলাম। প্রতাপগড় স্টেশনে যখন আমাকে তাঁহার নিকট বিদায় নিতে হয় তখন তাঁহার শরীরের অবস্থা দেখিয়া আমি তাঁহার চিরবিদায়ের কিঞ্চিৎ আভাস পাই। একটি ভারি দুর্ঘটনার ছায়া যেন তখন আমাকে স্পর্শ করিল। এমনকি এই বিদায়ের পর তাঁহার কলিকাতায় নিরাপদে পৌছানোর সংবাদ পাইবার জন্যও আমি একটু উদ্বিগ্ন হইয়াছিলাম।

ইহার কিছুদিন পরেই আমার আবার তাঁহার সঙ্গে দেখা হয় পুরীতে। তখন তাঁহাকে দেখিয়া আমার পূর্বের উদ্বেগ একেবারেই অপসারিত হইল। আমি আশা করি নাই যে এত অল্প সময়ের মধ্যে পুরীর সমুদ্রের হাওয়ার গুণে তাঁহার স্বাস্থ্য এতটা উন্নতি লাভ করিবে। তিনি তখন সবল হইয়া হাঁটিয়া বেড়াইতেছেন। দুইবেলা সমুদ্রে অনেকক্ষণ ধরিয়া স্নান করিতেছেন এবং পুরীর লোকরাও তাঁহার প্রকৃত পরিচয় পাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। লখনউয়ের বাহিরে অতুলপ্রসাদ কবি ও গায়ক বলিয়া বেশি পরিচিত ছিলেন। ইহার মধ্যেই আমি শুনিতে পাইলাম যে তাঁহাকে লইয়া পুরীর স্থানে স্থানে সান্ধ্য সম্মেলন ও মজলিস বসিতে আরম্ভ করিয়াছে।"

কবিবর অতুলপ্রসাদের গান রচনা এবং সংযোজনা সম্বন্ধে এবং সঙ্গীত সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ বলেছেন, "......খুব আনন্দের সহিত স্বচক্ষে দেখিলাম যে তিনি গুনগুন করিয়া মাঝে মাঝে গাহিতেছেন ও পরে সেই নতুন রচিত গানটিকে লিপিবদ্ধ করিতেছেন। প্রথমে সুর তাঁহার মনকে আচ্ছন্ন করে, তাহার পর সেই সুর তাহার নিজের ভাষা খুঁজিয়া লইয়া নিজেকে কবিতা ও গানে প্রকাশ করে। কালিদাস বলিয়া গিয়াছেন যে বাক্য ও মিল হরগৌরীর সম্বন্ধ ও মিলনের ন্যায় অচ্ছেদ্য। সেইরূপ অতুলপ্রসাদের সুর ও গান একসঙ্গেই উদ্ভূত ও পরস্পর-বিজড়িত। ইহাদের মধ্যে ব্যবধান বোধগম্য হইত না। অতুলপ্রসাদের রচনা-প্রণালী সাধারণ প্রণালীর মতন ছিল না। আগে কবিতা রচিত হইবে তাহার পর সেই কবিতার উপযুক্ত সুর অনুসন্ধান করিয়া সেই সুরের প্রয়োগ দ্বারা কবিতাটিকে গানে পরিণত করিতে হইবে—এই প্রণালী অতুলপ্রসাদের প্রণালী নয়। সুর কিম্বা ছন্দের যে একটা স্বাধীন সত্তা আছে তাহা অতুলপ্রসাদ বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতেন। ছন্দের দ্বারা আগে তিনি আবিষ্ট হইতেন, তারপর ছন্দাবেশে সেই ছন্দকে ভাষার দ্বারা রূপ দিতেন ও গানে মূর্ত করিতেন। ইহা যেন সুরলোক হইতে সুরের মর্ত্যলোকে অবতরণ। সুতরাং তাঁহার কবিতায় কৃত্রিমতার চিহ্ন নাই। তাঁহার কবিতা সহজ, সরল, সুললিত, প্রকৃতির বাণী, হৃদয়ের অদম্য উচ্ছ্বাস, অন্তরের উদ্বেলিত ভাবধারা।

হিন্দুস্থানী কতিপয় সুরের প্রতি তাঁহার একটি স্বাভাবিক অনুরাগ ও আকর্ষণ ছিল।

সেই সুরের দ্বারা তিনি প্রথমে আক্রান্ত হইতেন। প্রায় সময়েই দেখা যাইত যেন তিনি সুরগ্রস্ত। সুর যেন প্রণবের ন্যায় তাঁহার অন্তরে আপনা আপনি স্বতঃই ধ্বনিত হইতেছে। তখন সেই অন্তরের অদম্য সুর আত্মপ্রকাশের জন্য নিজের বাহনকে আকুলিত করিত। সুর ভাষায় ব্যক্ত হইল। তখন উহা কবিতা ও গানে নিবদ্ধ হইয়া পড়িল। হিন্দুস্থানী সুর বাংলা ভাষা মণ্ডিত হইয়া বাংলা ভাষাকে একটি অপূর্ব সঙ্গীত সম্পত্তি দান করিল।

অতুলপ্রসাদের এই অপূর্ব সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে একটি অভিনব পর্যায় প্রবর্তন করিয়াছে।...তাঁহার রচনা কেবল সঙ্গীত হিসাবেই বিবেচিত হইলে উহার প্রতি সুবিচার করা হইবে না। বঙ্গীয় সঙ্গীত শাস্ত্র ও কলাবিদ্যায় অতুলপ্রসাদের সঙ্গীতগুলি একটি অতুলনীয় সম্ভার আনিয়া দিয়াছে। কিন্তু তাঁহার সঙ্গীতগুলি কবিতা হিসাবেও যে উচ্চশ্রেণীর তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

অতুলপ্রসাদের ভাবধারা অমৃতধারা। ইহার অবাধ, চিরন্তন গতি। উহা কালে আরো প্রশস্ত ও গভীর হইতে থাকিবে। কারণ সেই গতির সঙ্গে কালচক্রের গতির আভ্যন্তরীণ মিল আছে। অতুলপ্রসাদের কবিতা নবযুগের কবিতা, বিপ্লবের বাণী, তরুণের প্রেরণা, ভবিষ্যতের আভাস। তাই তাহার উৎস চিরজাগরূক থাকিবে।

...ইহা কম সৌভাগ্যের কথা নয় যে অতুলপ্রসাদ জীবনে নিজেই উপলব্ধি করিয়া গিয়াছেন কেমন করিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার ভাবধারা গানের মধ্য দিয়া সমস্ত বাঙলা দেশে একটা বন্যা আনিয়া দিয়াছে। সেই বন্যা পল্লীতে পল্লীতে প্রবেশ করিয়া বাংলার মানস ক্ষেত্রকে সরস ও সজীব করিয়া তুলিয়াছে। এই অন্তরের প্রসাদই তাঁহাকে সংসারের নানা অশান্তির মধ্যেও আত্মস্থ করিতে পারিয়াছিল। বাস্তবিক অতুলপ্রসাদের মহত্ত্ব এই অচল অটল আধ্যাত্মিকতাকে অবলম্বন করিয়াই বর্ধিত হইয়াছিল। তাঁহার জীবনের প্রতিষ্ঠা ছিল সুরলোকে, কল্পনার রাজ্যে, রস-সরোবরে, কবিতা-কুঞ্জে। তিনি পার্থিব মানুষ ছিলেন না।" মানুষ অতুলপ্রসাদ প্রসঙ্গে লিখেছেন:

"লখনউতে তিনি যাহাদের রাখিয়া গেলেন তাঁহার তিরোভাবে তাহাদের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার পরিমাণ ও পরিপূরণ সহজে হইতে পারে না। তাঁহার স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের ক্ষতি কখনই পূরিত হইতে পারে না। তাঁহার সুমধুর হাস্য, প্রেমময় আলিঙ্গন, করুণাসিক্ত হৃদয়, সম্ভাষণ-প্রসারিত হস্ত, নিরপেক্ষ বিচার, পরিপক্ব বুদ্ধি, সর্বত্যাগী আতিথ্য, হৃদয়গ্রাহী ব্যবহার, এইসকল হইতে তাঁহার বন্ধুগণ চিরকালের জন্য বঞ্চিত হইলেন। সেইসঙ্গে তাঁহার বৈঠকখানার অপূর্ব মজলিস চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইল। বাঙালীর সভ্যতা বিশেষ বিশেষ বাঙালী ভাবুকের বৈঠকখানা আশ্রয় করিয়া কালে কালে সঞ্জীবিত ও পুষ্ট হইয়া আসিয়াছে। লখনউয়ের

প্রবাসী বাঙালী সমাজও নিজের বিশিষ্ট সভ্যতা বিদেশে অক্ষুণ্ণ রক্ষা করিবার জন্ত অতুলপ্রসাদের অসম্ভব সুযোগ ও দৃঢ় অবলম্বন পাইয়াছিলেন।"

আরো বলেছেন, "লখনউয়ের যাবতীয় অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানে তিনি একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি কর্মকর্তা ছিলেন আউধ সেবা সমিতি, রামকৃষ্ণাশ্রম, হরিমতী বালিকা বিস্তালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের। এই প্রতিষ্ঠানগুলি তাঁহার অর্থ-সাহায্য অপেক্ষা তাঁহার সুবিবেচিত পরিচালনাকে বেশি মূল্যবান মনে করিত। তিনি স্থানীয় উচ্চ আদালতে সুপ্রসিদ্ধ নেতা হইয়াছিলেন। Oudh Bar Association ও Oudh Bar Council এই উভয় প্রতিষ্ঠান তাঁহাকে সভাপতি পদে বরণ করিয়াছিল। লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা সভায়, Court, Executive Council, Board of Appointments প্রভৃতির মনোনীত সভ্য হইয়া তিনি স্বভাবসিদ্ধ নিরপেক্ষ বিচারশক্তি ও মাধুর্যের দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শ্রেণীর সমগ্র শিক্ষক ও ছাত্রমণ্ডলীর আন্তরিক অনুরাগ ও শ্রদ্ধা অর্জন করিয়া গিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার অভাব বিশেষভাবে আজ অনুভব হয়।

অতুলপ্রসাদের কীর্তি লখনউয়ের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। রাজনীতি-ক্ষেত্রে যুক্তপ্রদেশের তিনি একজন প্রধান নেতা ছিলেন। মধ্যপন্থী রাজনৈতিক দলের বাৎসরিক অধিবেশনে তিনি দুইবার সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি যে সভাপতির অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন তাহা আধুনিক রাজনৈতিক আন্দোলনের সাহিত্যে যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে তাহা সর্ববাদীসম্মত। তিনি যাবতীয় রাজনৈতিক সমস্যার সমালোচনা যেরূপ ওজস্বিনী ভাষায় ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিবৃত করিয়াছেন তাহার তুলনা সমগ্র কংগ্রেসের সাহিত্যেও দুর্লভ। একাধারে এতগুলি সদ্‌গুণের ও কর্মবৃত্তির সমাবেশ অতি বিরল।"

* * *

সুসাহিত্যিক সাহিত্য-রসিক শ্রীঅমল হোম 'অতুলপ্রসাদ' প্রসঙ্গে বলেছেন তার 'স্মৃতি-কথা' প্রবন্ধে: "অতুলপ্রসাদকে আমি ঠিক কবে প্রথমে দেখেছিলাম মনে নেই, কিন্তু তাঁকে আমি আমার বাল্যকালেই দেখে থাকব। যখন স্কুলে পড়ি তখন আমি······ কোন আত্মীয়ের বাড়িতে একটি পারিবারিক উৎসবে তাঁর গান প্রথমে শুনেছিলাম।······তারপর যখন কলেজে পড়ি কলকাতার এখানে ওখানে তাঁকে কয়েক-বার দেখেছি। লখনউয়ের তিনি বড় ব্যারিস্টার একথা জেনেছি। তাঁর গান আরো শুনেছি ও গেয়েছিও বন্ধুমণ্ডলীর সঙ্গে—'কাঙাল বলিয়া করিও না হেলা আমি পথের ভিখারী নহি গো', কিম্বা 'তুমি মধুর অঙ্গে নাচ গো·রঙ্গে নূপুর-ভঙ্গে হৃদয়ে'—তখন আমাদের যুবক-মহলে তাঁর এইসব গানেরই চলতি ছিল।

১৯১৪ সালে তখনকার ক্যানিং কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বল মহাশয়ের বিবাহে আমি লখনউ যাই। সেখানেই আমার অতুলপ্রসাদের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। একদিন বিকেলবেলা উপেনবাবু বললেন, 'চল তোমায় মিস্টার এ. পি. সেনের কাছে নিয়ে যাই।' আমার সহর্ষ সম্মতিজ্ঞাপনের অল্পক্ষণের মধ্যে আমরা তাঁর ব্যক্স্ রোড-এর বাড়িতে পৌছুলাম।

পাঁচ রাস্তার মোড়ের ওপর প্রকাণ্ড হাতাওয়ালা বাড়ি। সৌখীন ফুলবাগান পার হয়ে বারান্দায় উঠতেই সেনসাহেব নিজে বেরিয়ে এলেন......সবেমাত্র তখন কোর্ট থেকে ফিরেছেন, পোশাক ছাড়েন নি। আমাদের সোজা খানা-কামরায় নিয়ে গেলেন। তখন সেখানে বৈকালিক চা পান চলছিল। টেবিলে আরো কয়েকজন বসে ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। তাঁদের মধ্যে দুজন মুসলমান ভদ্রলোকদের এখনও আমার বেশ মনে আছে। তাঁদের একজন মির্জা সামিউল্লা বেগ, পরে তিনি হায়দ্রাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন। অন্য ভদ্রলোকটি অধ্যাপক আবদার রহিম। ইনি কলকাতার পলিটিকাল মহলে বিশেষ পরিচিত। তখন মহম্মদ আলি সাহেবের অত্যুগ্র 'প্যান-ইস্লামিজম বরদাস্ত না করতে পেরে রহিম সাহেব'কমরেড' কাগজের সাব-এডিটরি কাছে ইস্তফা দিয়ে দিল্লী ছেড়ে লখনউ এসেছেন শিয়া স্কুলের হেডমাস্টারি নিয়ে। অল্পক্ষণ পরে সামিউল্লা সাহেব ও আরো দু-এক জন যাঁরা ছিলেন তাঁরা বিদায় নিলেন। রইলাম শুধু বল মহাশয়, রহিম সাহেব আর আমি। রহিম সাহেব বাঙালী, মৌলবী আবদুল করিমের ছেলে। কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই ভাগ্যদোষে আলিগড়ের আবহাওয়ায় মানুষ হয়ে বাংলা জবান 'টুটিফুটি' বলতেন পারেন মাত্র। তিনি আমার সঙ্গে বাঙলায় কথাবার্তা বলবার চেষ্টা করে অবশেষে ইংরেজি ধরলেন।"

১৯১৬ খ্রীঃ কংগ্রেসের লখনউ অধিবেশন সম্বন্ধে শ্রীঅমল হোম বলেন, ..."১৯১৬র ডিসেম্বরে লখনউয়ে কংগ্রেসের অধিবেশন হল। কংগ্রেস বসবার তিন সপ্তাহ আগে লখনউ থেকে কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে একজন এসে অতুলবাবুকে পাকড়াও করে নিয়ে গেলেন। যাবার সময়ে আমাকে বললেন, 'তুমিও তো আসছ। লখনউয়ে পৌছেই আমার সঙ্গে দেখা কোরো।' কংগ্রেস বসবার দিনতিনেক আগে লখনউ পৌছুলাম। পৌছিয়ে অতুলপ্রসাদের বাড়িতে গেলাম। বাড়িতে তিনি নেই। অবগত হওয়া গেল যে অতুলপ্রসাদ কংগ্রেসের কম্পাউণ্ডে তাঁবুতে বাস করছেন, বাড়িতে আসেন না। ডেলিগেটদের মধ্যে হোমরা-চোমরা কয়েকজন তাঁর বাড়িতে এসে থাকবেন। কংগ্রেস ক্যাম্পে গেলাম। সেখানে দেখি অতুলপ্রসাদ ভলেন্টিয়ার বাহিনীর অধিনায়ক; যোধপুরী পাজামার ওপর খাকি রঙের ইউনিফর্ম কোট, মাথায় রাজপুত পাগড়ি, বুকে কর্ড দিয়ে বাধা হুইসল, হাতে ছড়ি। ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন। আমাকে

দেখে এগিয়ে এসে বললেন, 'তুমি আমার বাড়িতে থাকবে, সেখানেই সব ব্যবস্থা আছে কোন কষ্ট হবে না।' আমি হেসে বললাম, 'তা আমি শুনেছি কিন্তু ওসব হোমরা-চোমরাদের মাঝে আমি থাকতে পারব না।' 'তুমিও তো একজন "হোম" হে! আচ্ছা তাহলে আমার ক্যাম্পে এসে থাক।' আমি ধন্যবাদ জানালাম যে, আমি উপেন বল মহাশয়ের বাড়িতে উঠেছি; সেখানেই বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় আছেন, আমরা একসঙ্গে কলকাতা থেকে এসেছি।······সেবার লখনউ কংগ্রেসে গিয়ে বুঝলাম অতুলপ্রসাদ লখনউ শহরবাসীর কত প্রিয়। সত্যিই তিনি লখনউয়ের মুকুটহীন রাজা ছিলেন। ধনী দরিদ্র, মডারেট একস্‌ট্রীমিস্ট, রাজা নবাব, রৈসরায়ং, অধ্যাপক স্কুলমাস্টার, উকিল ব্যারিস্টার, হিন্দু মুসলমান, সকল শ্রেণীর সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর অদ্ভুত প্রভাব। দেখলাম সামান্য টাঙাওয়ালা পর্যন্ত সেনসাহেবকে জানে, শ্রদ্ধা করে। যুবক মহলে তাঁর কী অসাধারণ প্রতিপত্তি! তাঁর তাঁবুতে বসে দেখতাম কংগ্রেস ভলেন্টিয়াররা তাঁর আঙুল হেলনে নিঃশব্দে আদেশ পালন করছে। কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি পরলোকগত পণ্ডিত গোকরণনাথ মিশ্র, পরে যিনি আউধ চীফ কোর্টের জজ হয়েছিলেন—অন্যতম সেক্রেটারি পণ্ডিত বিশ্বেশ্বর নাথ শ্রীবাস্তব যিনি চীফ কোর্টের চীফ জজ, মোসলেম লীগের সৈয়দ ওয়াজির হোসেন সাহেব, প্রত্যেকে এবং সকলেই 'ভাই সাহেবে'র সঙ্গে পরামর্শ না করে কোন কাজ করেন না। তিনি তাঁদের বন্ধু, মন্ত্রণাদাতা, নেতা—অথচ তিনি কেবল মাত্র ভলেন্টিয়ার বাহিনীর অধিনায়ক। বড় পদের লালসা তাঁর কখনও ছিল না। তাই লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারের পদ তিনি উপরোধ-অনুরোধ সত্ত্বেও গ্রহণ করেন নি।

সাম্প্রদায়িকতা হতে মুক্ত মানুষ আজকের দিনের পোলিটিক্যাল ক্ষেত্রে দেখা পাওয়া দুষ্কর। ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় আজ সকলেই, কি হিন্দু কি মুসলমান কম্যুনালিজম-এর আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অতুলপ্রসাদকে এই ভাব থেকে মুক্ত দেখেছি। মনে পড়ে যেদিন লখনউয়ে প্রথম হিন্দু মুসলমান প্যাক্ট নিষ্পত্তি হল সেদিন তাঁর কী আনন্দ! যখন শুনলেন তিলক বলেছেন যে 'I don't care how many seats in the legislature the Mahomedans get' তখন তিনি বারবার বলতে লাগলেন—'That's exactly my view too'। লখনউ কংগ্রেস থেকে অতুলপ্রসাদের চরিত্রের আর একটা দিক—তাঁর কর্মশক্তি, স্বদেশপ্রেম, লোকহিতৈষণা, বন্ধুবাৎসল্য দেখে মুগ্ধ হয়ে ফিরলাম। তিনি কিন্তু আর কলকাতায় ফিরে এলেন না। আবার লখনউয়ে প্র্যাকটিস শুরু করলেন। তাঁকে কি আর লখনউ ছাড়তে দেয় বন্ধুরা? ১৯১৭ সালের কলকাতায় বেসাণ্ট কংগ্রেসে তিনি এসেছিলেন কি না মনে নেই। তবে যতদূর মনে পড়ছে বঙ্গীয় হিতসাধন-মণ্ডলীর পক্ষ থেকে সে সময় আমরা

যে First All India Social Service Conference কলকাতায় করি তাতে গান্ধীজীকে সভাপতি করবার প্রস্তাব তিনিই আমাদের কাছে করেন। রাজনৈতিক মতান্তর সত্ত্বেও মহাত্মাজীর প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল ; তাঁর সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা তিনি সহ্য করতে পারতেন না।

......১৯১৮ সালের ডিসেম্বরে দিল্লীতে কংগ্রেস, মালবীয়াজী সভাপতি। লাহোর থেকে কাগজের Special Representative হয়ে এসেছি, মডারেট আর হোমরুলীয় বা মণ্টেগু চেম্‌স্‌ফোর্ড স্কীম নিয়ে লড়াই করবার জন্য কোমর বেঁধেছেন মিসেস বেসাণ্ট, বেঁকে বসেছেন। তাঁর দল দ্বিধাবিভক্ত,বাংলার পোলিটিসিয়ানারা বিপিনচন্দ্র ও ব্যোমকেশের পরিচালনায় ইমিডিয়েট প্রভিন্সিয়াল অটোনমির দাবি জানিয়েছেন, মোসলেম লীগের দোমনা ভাব, জিন্নাসাহেব সংশয়-তরীতে দোল খাচ্ছেন, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী 'মডারেশন' ও 'প্রুডেন্স'-এর দোহাই দিচ্ছেন—খবরেকাগজীদের খোরাকের অভাব নেই তাই আমারও দিনে রাতে বিশ্রাম নেই, হঠাৎ খবর পেলাম অতুলপ্রসাদ এসেছেন। বহুদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি। খবর পেয়ে ছুটলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তিনি উঠেছেন মেটকাফ হাউসে, কংগ্রেস-ক্যাম্প থেকে তিন চার মাইল দূরে। যখন পৌছুলাম রাত্রি হয়ে গিয়েছে। ভলেণ্টিয়ার একজন খবর দিল যে সেদিন বিকেলে তিনি এসে পৌছেছেন। বড় ক্লান্ত, শুয়ে পড়েছেন। তবু তাকে বললাম কার্ড নিয়ে যাও। কার্ড পাঠাবামাত্র অতুলবাবু বেরিয়ে এসে জড়িয়ে ধরে নিয়ে গেলেন তাঁর ঘরে। দেখি দুখানি ক্যাম্পখাট। একখানিতে লেপের ওপর কম্বলমুড়ি দিয়ে শ্রীনিবাস শাস্ত্রী শুয়ে, আর একখানিতে অতুলবাবু। একটি মাত্র চেয়ার। আমাকে তাতে বসিয়ে নিজে খাটে বসলেন। কত প্রশ্ন, কত গল্প। খাওয়া হয়েছে কি না জিজ্ঞাসা করলেন। হয়নি শুনে তক্ষুনি খাবার আনালেন, বসে খাওয়ালেন এবং বারবার সতর্ক করে দিলেন যেন অতিরিক্ত পরিশ্রম আর দিল্লীর হাড়ভাঙা শীতে অসুখ না করে বসি। ঘরে ভিতর fire-place-এ আগুন জ্বলছিল, তাই আমার ওভারকোট খুলে রেখেছিলাম। ঘর থেকে বের হবার আগে নিজে ওভারকোট পরিয়ে দিলেন এবং কোটের ওপর হাত বুলিয়ে দেখলেন সেটা যথেষ্ট মোটা আর গরম কি না।

১৯১৯-এ পাঞ্জাবের হাঙ্গামার সময় কালীনাথ রায় মহাশয়ের কারাদণ্ড হওয়াতে আমি যখন 'ট্রিবিউন' কাগজের অস্থায়ী সম্পাদক পদ লাভ করলাম, অতুলপ্রসাদ টেলিগ্রাম করে আনন্দ অভিনন্দন জানালেন। কিছুদিন বাদে এল প্রকাণ্ড একঝুড়ি লখনউ-বিখ্যাত সফেদা আম। পাঞ্জাবে জঙ্গী আইনের অত্যাচারে তিনি বিষম মর্মাহত হয়েছিলেন। হাণ্টার কমিটির তদন্তের ফলে যখন সত্য ঘটনা যা চাপা ছিল বের হতে আরম্ভ করল। তখন তিনি আমাকে যে একখানি চিঠি লিখেছিলেন তাতে মডারেট মনোবৃত্তির এতটুকু

পরিচয়ও ছিল না। সত্যই তিনি মতামতে মডারেট হলেও স্বভাবতঃ মডারেট ছিলেন না। আমার মনে হয় গোখেলের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা খুব বেশিরকম থাকাতে তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁর অনুগামী ছিলেন।…

তাঁর বাড়িতে সর্বদলের সর্বজাতির সম্মিলন দেখে বিস্মিত হয়েছি, ভারতবর্ষের বহু মনীষীর সাক্ষাৎকার লাভ করে কৃতার্থ বোধ করেছি।…

এলাহাবাদ ছেড়ে ১৯২১ এ কলিকাতায় এসে 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ'-এ যোগ দিলাম। ইতিমধ্যে অতুলপ্রসাদ যখনই কলকাতায় আসেন দেখা হয়। সুপরামর্শ দেন, তাঁর স্নেহ ভালোবাসার নিত্য নূতন পরিচয়ে মন ভরে ওঠে। ইতিমধ্যে বন্ধুবর ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লখনউএ অধ্যাপক হয়ে গেলেন, তার আগে গিয়েছেন অগ্রজতুল্য রাধাকুমুদ ও রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ভ্রাতৃযুগল। তারপর গেলেন সুহৃদয় নির্মলকুমার, তারপর বন্ধু অসিতকুমার। এঁদের সকলকে পেয়ে অতুলপ্রসাদ যে কী আনন্দ লাভ করেছিলেন তা আমি জানি। বিশেষত ধূর্জটিপ্রসাদের গানের সমঝদারিতায় ও তাঁর মননশীল অনুসন্ধিৎসায় তিনি মুগ্ধ ছিলেন।…এঁরাও সকল কর্মে অতুলপ্রসাদের চারিপাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে ঘিরে বাঙ্গালার সংস্কৃতির বিশুদ্ধ পরিচয় উত্তর ভারতে দিচ্ছিলেন।

১৯২৬ সালের ডিসেম্বরে দিল্লীতে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশনে যোগদান করে লাহোর ঘুরে ফিরবার পথে লখনউ এলেন অতুলপ্রসাদ ও অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে। অতুলপ্রসাদ সম্মিলনীতে আসেন নি। শুনেছিলাম তিনি শান্তিনিকেতনে পৌষ উৎসবে যোগদান করতে গিয়েছেন। আমি লখনউ পৌঁছুবার পরদিন ৩রা জানুয়ারি ১৯২৭ তিনি বোলপুর থেকে ফিরলেন। বিকেলবেলা বন্ধুবর নির্মলকুমার, ধূর্জটিপ্রসাদ, অধ্যাপক বিনয় দাশগুপ্ত আর আমি তাঁর চারবাগের নতুন বাড়িতে এলাম। এ বাড়ি আমি এর আগে দেখি নি। অতুলপ্রসাদের নিজের নামের রাস্তার উপর লখনউয়ের নতুন স্টেশনের সামনে চমৎকার বাড়িটি দেখে এত ভাল লাগল! বাড়ির নাম দিয়েছেন নিজে স্বর্গগতা মায়ের নামে। নিজে সমস্ত বাড়িটি ঘুরে দেখালেন।"

১৯২৭-এর ডিসেম্বরে বড়দিনের ছুটিতে শান্তিনিকেতনে সাম্বৎসরিক উৎসবে অমল হোম অতুলপ্রসাদের দেখা পেলেন। অমল হোম লিখেছেন,—"যেদিন সন্ধ্যায় আমরা পৌঁছুলাম, তার পরদিন অতি প্রত্যূষে কবির কণ্ঠস্বরে ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ করে এসে দেখলাম, কবি আমাদের পাশের ঘরখানি ঠিকঠাক করে রাখবার জন্যে ভৃত্যকে নির্দেশ দিচ্ছেন। আমাকে দেখেই বললেন,'কাল রাতে অতুলের টেলিগ্রাম এসেছে, সে আজ একটু পরেই এসে পৌঁছবে।' অতুলপ্রসাদের জন্যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঘর ঠিক করাচ্ছেন। দেখে এত আনন্দ হল! অল্পক্ষণ পরেই অতুলপ্রসাদ এলেন।

তারপর চার-পাঁচটি দিন কবি-ভবনে আমাদের কী আনন্দেই কাটল! প্রতিদিন চার বার খাবার টেবিলে কবির অতিথি আমরা সকলে যখন সমবেত হতাম তখন কী রসের বন্যা ছুটত! কবির রসিকতা সর্বজনবিদিত, তাঁর পরিহাস-প্রিয়তা সুপ্রসিদ্ধ, তাঁর সঙ্গে যেন মনিকাঞ্চন যোগ হল অতুলপ্রসাদের পরিচ্ছন্ন ও প্রচ্ছন্ন রহস্য-শক্তি। কবির সুতীক্ষ্ণ ও সুগভীর রহস্যালাপ ক্ষণে ক্ষণে হাসির লহরা তুলত। আর সে কী অম্বুদমন্দ্র হাসি অতুলপ্রসাদের। সমস্ত ঘরটি যেন গমগম করত।

কবির প্রতি অতুলপ্রসাদের যে কী অসীম অনুরাগ ছিল তার বহু পরিচয় বহুবার বহুভাবেই পেয়েছি। ১৯৩১-এর ১৬ই মে রবীন্দ্রজয়ন্তীর উদ্বোধন-সভায় সকালে আমি জানতে পারলাম অতুলপ্রসাদ কলকাতায় এসেছেন। বালীগঞ্জে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। বলামাত্রই তিনি সভায় উপস্থিত থাকতে ও কিছু বলতে সানন্দে সম্মত হলেন। অথচ রক্তের চাপ হঠাৎ বেশি হওয়াতে তিনি স্যর নীলরতনকে দেখাবার জন্যে সেবার কলকাতায় আছেন। আত্মীয়-স্বজনের নানা আপত্তি সত্ত্বেও তিনি যথাকালে সভায় যোগদান করলেন ও সুন্দর একটি বক্তৃতা দিলেন। তারপর রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবের আয়োজনে তাঁর কী আনন্দ!…প্রবাসী বাঙালীরা যাতে উৎসবে যোগদান করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে আমি স্যর লালগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সে বৎসর প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন স্থগিত রাখবার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। এ খবর পেয়ে অতুলপ্রসাদ নিজে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে লালগোপালবাবুকে আমার অনুরোধে তাঁর একান্ত সম্মতি জানালেন। 'উত্তরা' সম্পাদককে টেলিগ্রাম করলেন প্রবাসী বাঙালীদের নাম ঠিকানার তালিকা প্রস্তুত করে আমাকে পাঠাবার জন্য।……রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব সন্নিকট। টাউন হলে অফিস খোলা হয়েছে। প্রদর্শনীর স্টল বাঁধা হচ্ছে, চিত্রশালা সাজানো হয়েছে—আমার ও সহকর্মীদের এক মুহূর্ত বিশ্রাম নেই। একদিন সন্ধ্যায় টেবিলে বসে কাজ করছি, হঠাৎ মাথা তুলে দেখি সামনে বসে অতুলপ্রসাদ। কখন যে এসেছেন, নীরবে আসন গ্রহণ করেছেন কিছুই টের পাইনি।

আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'অতুলদা, এ কী অন্যায়! আপনি এসে এরকম বসে আছেন? বলুন কী করতে হবে?' বোম্বাই থেকে দুটি মারাঠী বন্ধু এসেছেন তাঁদের জন্যে 'নটির পূজা' অভিনয়ের টিকিট সংগ্রহ করতে পারেননি জানালেন,—তাঁদের একজনকে নিজের টিকিটখানি দিয়েছেন, আর একখানি টিকিট প্রয়োজন। এর ব্যবস্থা করা আমার সাধ্যাতীত ছিল।…মুহূর্তের মধ্যে আমার অবস্থা বুঝে নিয়ে আমাকে আশ্বস্ত করলেন এবং আমাকে জানালেন তিনি কিছু মনে করবেন না।

২৭ শে ডিসেম্বর ১৯৩১, রবীন্দ্রজয়ন্তীর কবি সংবর্ধনা সভা। জন-সমাগম শুরু হয়েছে,

স্বেচ্ছাসেবকরা নির্দিষ্ট আসনে সদস্যদের বসাচ্ছেন, সহসা অতুলপ্রসাদ এসে বললেন, 'অমল আমি কি আমার সীট আর একজনের সঙ্গে বদলিয়ে নিতে পারি?' আমি বললাম, 'আপনার এত সামনের সীট, তা ছেড়ে এত দূরে চলে যেতে চাচ্ছেন কেন?' উত্তর হল, 'আমার একটি বন্ধুর পাশে বসতে চাই।'

"ইদানীং অতুলপ্রসাদ প্রায়ই চিকিৎসা ও বিশ্রামের জন্য কলকাতায় আসতেন। তাঁর সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ ঘটত না। তিনি কলকাতা এলেই তাঁর আবাসস্থলে জলসা বসত। কখনো কখনো তাতে উপস্থিত থেকে দেখেছি সঙ্গীতে তিনি তাঁর সমস্ত সত্তা কেমন করে ডুবিয়ে দিতে পারতেন।"

* * *

শ্রীযুক্ত পাহাড়ি সান্যাল মহাশয় লেখকের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন:

"তখন দ্বিজেনদার (১) বিয়ে। সময়টা ঠিক মনে নেই, ১৯২৩।২৪ হবে। আমি তখন খুউব ব্যস্ত নতুন বৌদিকে পেয়ে, আরও নতুন নতুন আত্মীয় স্বজন, তখন নতুন নতুন সম্পর্ক, নতুন স্বপ্ন, এদিকে ওদিকে মন ছুটে বেড়াচ্ছে, তখন কি আর অতুলদার কথা মনে থাকে! হাজার হোক তিনি তখন প্রবীণ মানুষ, আমি নবীন···অতুলদা আমাকে ডাক পাঠিয়েছিলেন, যাওয়া হয়ে উঠল না। যাচ্ছি যাব করতে করতে তারপর ভুলে গেলুম।

তার আগে মণ্টুদা (২) এসে লখনউতে গাইলেন, 'যদি দিন তো দেবে'। বড় অপূর্ব গাইলেন দরদী কণ্ঠে;—ভুলতে পারলাম না। যাঁরা সেদিন উপস্থিত ছিলেন তাঁরা তন্ময় হয়ে শুনেছিলেন তাঁর গান। অতুলদা মণ্টুদার গান শুনে এত মুড্‌ড্‌ হয়েছিলেন যে তাঁর দু-চোখ ভরে জল এসেছিল। সেদিন মণ্টুদার সঙ্গে আমিও গলা মিলিয়েছিলাম। একদিন অতুলদাকে তাঁর কতগুলি গান গেয়ে শোনালাম। আমার গলাটা, বলব না, ভালোই ছিল। অতুলদা বললেন, 'তোমার হবে, তোমার হবে, বুঝেছ!' সেদিন চারুবাবু (৩) সেখানে ছিলেন। বললেন, 'বেশ গায়।' চারুবাবু অতুলদাকে বললেন. 'চলুন আমরা নির্মলের (৪) বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। ঝুনুর (৫) গান শোনা যাক।' অতুলদা, আমি, চারুবাবু এবং আরো কেউ কেউ ছিলেন, সকলে সেদিন নির্মলবাবুর

---

১ শ্রীদ্বিজেন স্যান্যাল॥ সঙ্গীতজ্ঞ। শ্রীযুক্ত পাহার্ষি স্যান্যালের বড় ভাই। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সঙ্গীত শাখার সভাপতি ছিলেন কয়েকবার।

২ মণ্টুদা॥ শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়

৩ চারুবাবু॥ সিনেমা-অভিনেত্রী রুমা দেবীর পিতা

৪ নির্মলবাবু॥ ৺নির্মল সিদ্ধান্ত

৫ ঝুনুদি॥ শ্রীচিত্রলেখা সিদ্ধান্ত। ৺নির্মল সিদ্ধান্তের সহধর্মিণী

বাড়ি উপস্থিত হয়ে খুউব খানাপিনা করলাম আর মনের আনন্দে ঝুনুদির গান শুনলাম। ঝুনুদি অপূর্ব গান গাইতেন। ঝুনুদিকে বলা হত সেই সময়ে নাইটিঙ্গেল অব্ বেঙ্গল। বাঙলাদেশ থেকেই এই সম্মান দিয়ে উত্তরপ্রদেশের রাজধানী লখনউ শহরে পাঠিয়েছিল। সুকণ্ঠী ছিলেন। তাঁর গান যাঁরা শুনেছেন তাঁরা ভুলতে পারেন না।

যাই হোক যে কথা বলছিলাম। অতুলদা আমাকে খুউব স্নেহ করতেন—খুব স্নেহ-পরায়ণ ছিলেন। তাঁর বাড়ির দ্বার সব সময়েই সকলের জন্যে অবারিত ছিল। যখন তখন তাঁর বাড়ি হাজিরা দিতাম, তিনি কখনো তার জন্যে বিরক্ত বোধ করেন নি। অতুলদা সকলকে খুউব খাওয়াতে ভালবাসতেন। যখনই আমরা ওঁর বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হয়েছি খুব খাইয়েছেন। খাইয়ে মানুষদের খাইয়ে উনি আনন্দ পেতেন। নিজেও খাদ্যরসিক ছিলেন। কাবাব কোপ্তা মোগলাই খানা খেতে খুউব ভাল-বাসতেন। ১৯২০ সন থেকে তাঁর ব্লাড প্রেশার দেখা দেয়, তাই ডাক্তারেরা তাঁকে খাদ্যের ব্যাপারে লোভ সংবরণ করতে বলেছিলেন। কিন্তু তিনি বালকের মত ব্যবহার করতেন। কোন এক ভোজসভায় খাওয়ার টেবিলে আমি ঠিক তাঁর পাশের চেয়ারেই বসেছিলাম। তখন যতদূর মনে পড়ে মণ্টুদা, ধূর্জটিপ্রসাদ এবং আরো অনেকেই ছিলেন। বয় নানান খাদ্যসম্ভার নিয়ে আসে আমরা সকলে তুলে নিই, কিন্তু তাঁর তো উপায় নেই। আমার তখন বয়স অল্প, ডাক্তারের নিষেধের কথা আমি ততটা বুঝি না। আমি অতুলদার প্লেটে সব মুখোরোচক খাবার চুপিসারে সাপ্লাই দিই। অতুলদাও সকলের অলক্ষ্যে তা যথাস্থানে প্রেরণ করেন। একবার ধরা পড়ে গেলেন। সকলে হাঁ-হাঁ করে উঠলেন—একি অতুলদা এ কী করছেন! আপনার না এসব খাওয়া বারণ! অন্যায়ই; ভীষণ অন্যায়ই হচ্ছে ইত্যাদি। সকলে একসঙ্গে বললেন। তখন অতুলদা শিশুর মত হেসে বললেন, খাইনি···কোথায় কো-কোথায় খেলাম আর! একটু টেস্ট করছিলাম, কেমন রান্নাটা দেখলাম।

অতুলদা উচ্চরবে হাস্য করতেন···অল্প তোতলামি ছিল। দেখে মনে হত রাসভারি মানুষ, কিন্তু তিনি ছিলেন রসিক মানুষ। তাঁর কত যে গুণ ছিল! তাঁর সেই ব্যক্তিত্ব কেমন ছিল ঠিক বোঝাতে পারব না। আমরা তখন ছিলাম ছোট, তিনি আমাদের কাছে বিরাট পুরুষ, আমাদের আদর্শ; আমাদের মনপ্রাণ জুড়ে থাকতেন।··· অনেকদিন হয়ে গেছে মাঝে মাঝে ভুলে যাই, তবু তাঁর কথা যখন ভাবতে বসি, তাঁর স্মৃতিগুলো যখন ভিড় করে এসে দাঁড়ায় স্মৃতিপটে তখন কী যে তৃপ্তি পাই বোঝাতে পারব না। মনে পড়ে তিনি খুউব জোরে কথা বলতেন এবং উচ্চহাস্য করতেন। তাঁর চিকিৎসকরা অত উচ্চহাস্য থেকে বিরত থাকতে বলেছিলেন বারবার। উচ্চহাসির দমক তার শরীরে যে-কোন মুহূর্তে বিপদ ডেকে আনতে পারত।

যাই হোক, যেকথা বলছিলাম। অতুলদা আমাকে একদিন ডেকে পাঠালেন। বলে পাঠালেন, আমার কাছে এসো অমুক দিন। একটা গান শেখাব, নতুন একটা গান লিখেছি।'

'কী গান ?'

'কত গান তো হল গাওয়া'……

কিন্তু আমার যাওয়া হল না। তখন আমার কত কাজ!

অতুলদা আমাদের বেঙ্গলী ক্লাব অ্যাণ্ড বেঙ্গলী ইয়ংম্যান অ্যাসোসিয়েশনের সারা জীবনের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। তিনি ছাড়া আর কারো যোগ্যত্য ছিল নাকি? সে কথা এতই স্বতঃসিদ্ধ যে সকলেই তা মেনে নিয়েছিলেন। তিনি দু-হাতে পয়সা উপায় করতেন, ব্যয় করতেন চার হাতে। তাঁর কাছে যে কেউ যেতেন আতিথ্য গ্রহণ করতেন; তাঁর কথা কেউ ভুলতে পারতেন নাকি! লখনউয়ের ভদ্রতার তিনি সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত।

আমার সঙ্গে প্রথম আলাপের কথা বলি। সাল তারিখ ঠিক মনে নেই, সম্ভবত আমার বয়স বোধহয় বার কি তেরো হবে। 'আওয়ার ডে ফাণ্ড' উপলক্ষে আলাপ হয়ে গেল। 'আওয়ার ডে ফাণ্ড' অর্থাৎ আজকাল যেমন ডিফেন্স বণ্ড, নানান ত্রাণ তহবিল ইত্যাদি হচ্ছে তখন প্রথম মহাযুদ্ধের পর ছিল 'আওয়ার ডে ফাণ্ড'; সেই তহবিলে টাকা সাহায্যের জন্য অতুলপ্রসাদের গানের একটা অনুষ্ঠান হয়েছিল। বৈশিষ্ট্য ছিল, অতুলপ্রসাদ নিজেই সেই অনুষ্ঠানের শিল্পীর তালিম দিচ্ছিলেন। আমি তখন অতুলপ্রসাদের দু-খানি গান বাড়িতে গেয়ে খুউব মক্স করে অতুলপ্রসাদের গানের একজন মস্ত বড় শিল্পী বা সমঝদার বলে নিজেকে মনে করেছিলাম। তাই যখন অতুলপ্রসাদ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণে ইচ্ছুক শিল্পীদের তালিম দিচ্ছিলেন তখন আত্মপ্রত্যয়ে ভরপুর আমি তাঁদের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। ভয়ঙ্কর গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, ততোধিক কণ্ঠস্বর ……আমাকে হাতের ঈশারায় ডেকে বললেন, 'তুমি ·····তুমি কেন? এখানে কী করছ? তোমার নাম কী?'

পাশ থেকে কে একজন ছেলে বললে, 'ও পাহাড়ী।'

তিনি ইংরেজিতে বললেন, 'তুমি পাহাড়ী হয়ে আমার বাংলা গান জান? গাইতে পারবে? বাংলা জান বুঝি?'

আমি বললাম, 'আমি বাঙালী। আমার নাম পাহাড়ী সান্যাল।'

সেদিনকার তালিমের পর অতুলদা আমাকে ডেকে বললেন, 'তুমি আমার কী কী গান জান?'

বললাম, 'উঠো গো ভারত-লক্ষ্মী।'

'শোনাও শুনি।'
আমি গাইলাম 'উঠো গো ভারত-লক্ষ্মী', 'মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাংলা ভাষা।' গান শুনে বললেন, 'তোমার গলাটা ভাল। চেষ্টা কর, গান হবে। তোমাকে আমার গান কিছু শেখাব।' আমি তো আনন্দে আত্মহারা তাঁর কাছে গান শিখব একথা ভেবে। সত্যিই তাঁর কাছে থেকে অনেক গানই আমি শিখেছি। অপূর্ব ভরাট গলা ছিল তাঁর। গানও গাইতেন চমৎকার। সে সময়ে তিনি আমাদের কত গান শিখিয়েছিলেন। তাঁর শেখানো সুরগুলি আর এখন স্বরলিপিতে যে সুর আছে অনেক ফারাক। সেই মেজাজ কোথায়! তাঁর অনেক গানের সুর আজ হারিয়ে গেছে, অনেক গানেরও আজ চিহ্ন পাওয়া যায় না। কবি রবীন্দ্রনাথ তখন লখনউতে আসবেন, সঙ্গীত সম্মেলন, তার জন্য সারা লখনউ শহরে প্রস্তুতি চলেছে। রবীন্দ্রনাথকে কিভাবে অভ্যর্থনা করা হবে, তাই নিয়ে বাঙালীদের মধ্যে জোর জল্পনা কল্পনা চলছে। অতুলপ্রসাদ অভ্যর্থনা কমিটির প্রেসিডেণ্ট। রবীন্দ্রনাথ লখনউয়ে আসবেন তাই অতুলপ্রসাদ তাঁর সম্মানে একখানা গান বাঁধবেন। আমার উপর হুকুম হল সে গান গাইবার। কথা রইল, রবীন্দ্রনাথের লখনউ আসার আগেই অতুলদা গান বেঁধে গানখানা আমাকে তুলে দেবেন। বললেন, কয়েকদিন পরে এসো পাহাড়ি, তোমাকে গানখানা তুলে দেব। আমি প্রত্যেক দিনই অতুলদার বাড়ি যাই গানখানি রচনা করেছেন কি না জানতে এবং গান রচনা হলে অতুলদার পায়ের কাছে বসে গানখানির সুর তুলে নিতে, কিন্তু অতুলদার বাড়ি উপস্থিত হয়ে প্রত্যেকদিনই দেখতুম অতুলদা নিরাসক্তভাবে তাকিয়ে আছেন; গানখানি রচনা করার কোন আগ্রহই নেই।
আমি বলতাম, 'অতুলদা গান রচনা হল না এখনও?'
তিনি বলতেন, 'হবে, ব্যস্ত কী?'
আরো কয়েকদিন পরে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছি, অতুলদাকে তখনও দেখেছি খুব ব্যস্ত। গানের কথা বলতে বলেছেন, 'একটু সবুর কর। গান লেখা হলেই সুর দিয়ে তোমাকে শিখিয়ে দেব। এক কাজ কর তুমি। বরং কাল এসো পাহাড়ি, কালকের মধ্যেই গানখানা লিখে ফেলব।'
কাল কাল করতে করতে অনেকগুলো দিন এগিয়ে গেল, অতুলদার আর গান লেখা হল না। আমারও গান শেখা হল না। আমি ভাবলাম অতুলদা গান লেখার কথা ভুলেই গেছেন, কারণ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের লখনউ পৌঁছবার মাত্র আর কদিন আছে। যখন আর দুদিন বাকি তখন অতুলদাকে না বলে আর পারলাম না বললাম, 'অতুলদা, আপনার গান লেখার কি ইচ্ছে নেই? আপনি গান লিখবেন সুর দেবেন তারপর আমাকে শেখাবেন তারপর আমি সকলের সামনে গাইব;

এ তিন কাজ কী করে সম্ভব হবে এত অল্প সময়ের মধ্যে? অতুলদা এ আমি পারব না!'

অতুলদা অকস্মাৎ ভীষণ গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তুমি কি মনে কর আমি গান রচনার জন্যে চেষ্টা করিনি? এক মাস ধরে প্রতিদিন গান রচনার চেষ্টা করেছি। রবীন্দ্রনাথের উপযুক্ত গান লিখতে পারি নি; মনোমত হয় নি তাই ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি।' দেখলাম বাজে কাগজের ঝুড়িতে অসংখ্য ছিন্ন কবিতার পাণ্ডুলিপি।

অবশেষে লখনউয়ে রবীন্দ্রনাথের আগমন ঘটল, আর এক-দেড়দিন আগে অতুলপ্রসাদ লিখলেন, 'চাহ রে আজি ভারত মাতার প্রতি।' অতুলদা নির্দেশ দিলেন, গান শেষ করে আমি যেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পদধূলি গ্রহণ করি। রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত সম্মেলনীতে লখনউ এসেছিলেন ১৯২৬ সালে।

কিন্তু তারও আগে দ্বিজুদার বিয়ের পর সেই সেদিন যখন অতুলদার সঙ্গে দেখা হয়েছিল অতুলদা বলেছিলেন, 'পাহাড়ি তুমি কবে আসছ, তুমি একদিন এসো আমার কাছে। এত কী কাজ তোমার!'

সেই সময়ে আমি তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচর হয়ে পড়েছিলাম। যেখানে যে অনুষ্ঠানে তিনি যেতেন তাঁর ছোট্ট ভক্তটির আসন তাঁর পাশেই থাকত। আমার অন্তরে তিনি যেরকম বিরাটরূপে বিরাজ করেছিলেন, সম্ভবত তাঁর অন্তকরণেও ক্ষুদ্রতম জায়গা আমার জন্যে সংরক্ষিত ছিল। আমার কেমন অধিকার-বোধ জন্মেছিল তাঁর অনুপস্থিতিতে ক্লাব-ঘরে তাঁর সংরক্ষিত আসনে বসে থিয়েটার দেখার। তিনি সস্নেহে আমাকে এই অধিকারটুকু দান করেছিলেন। বেঙ্গলী ক্লাব এবং ইয়ং ম্যান অ্যাসোসিয়েশনের কোন থিয়েটার-হলে তাঁর আসনে ততক্ষণ বসে থাকতাম যতক্ষণ না তিনি এসে উপস্থিত হতেন। তিনি এলে তাঁর পাশের চেয়ারে বসতাম। এই ছিল নিয়ম।

সেদিন একটা ঘটনা ঘটে গেল। ক্লাব-ঘরে যথারীতি থিয়েটার হচ্ছে। আমি বসে আছি অতুলদার অনুপস্থিতিতে তাঁরই সংরক্ষিত আসনটিতে। থিয়েটার শুরু হল তখনও অতুলদা এলেন না, এমন তো সাধারণত হয় না! থিয়েটার যখন জমে এসেছে, খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছি, তখন অতুলদা এলেন। স্টেজের দিকেই চোখ রেখে তাঁর আসন ছেড়ে দিয়ে অতুলদাকে বললাম, 'বসুন অতুলদা।'

অতুলদা বললেন, 'উঠতে হবে না তোমাকে, আমি পাশের চেয়ারে বসছি।'

অবাক হলাম একটু, অতুলদা তো এমন বলেন না কখনো! অতুলদা কেমন যেন নিঃশব্দে বসে থিয়েটার দেখছেন; এমন তো হয় না কখনো! থিয়েটার দেখতে দেখতে অতুলদা মতামত ব্যক্ত করতে এবং শুনতে ভালবাসেন, তাই আমরা থিয়েটার চলাকালীন নিচু স্বরে কথা বলে থাকি।

অতুলদা কি আমার ওপর রাগ করেছেন! মনে মনে ভাবলাম, উনি আমাকে যেতে বলেছিলেন আমি যাই নি, তাই কি এ রাগ! আমরা দু-জনে থিয়েটার দেখে চলেছি অথচ কথা বলছি না এবং সেইজন্য মনে মনে বড় পীড়িত হচ্ছি। ভাবি ক্ষমা চাইব অতুলদার কাছে অন্যায় করেছি বলে, না কী অন্য কোন কারণ, সেই কারণটা জিজ্ঞেস করে জেনে নেব।

অতুলদা মনোযোগ দিয়ে থিয়েটার দেখছেন। তারপর দেখলাম, অতুলদা মনোযোগ দিয়ে থিয়েটার দেখছেন না। কারণ মনোযোগ থাকলে চোখ থাকে স্টেজে অভিনেতাদের প্রতি এবং হাতের উল্লাস প্রকাশ পায় আমার পৃষ্ঠদেশে; সেদিক থেকে তিনি নীরব। তিনি যখন নীরব আমিই বা কেন সরব হব। স্থির করলাম অতুলদা কোন কথা না বললে আমিও কোন সাড়াশব্দ করব না। আসলে আমিও তো কম অভিমানী নই!

অতিক্রম করেছে কিছু সময়। অন্ধকারে এক সময়ে অনুভব করলাম একখানা ভারি হাতের স্পর্শ আমার পিঠে এবং শুনলাম তাঁর কণ্ঠস্বর, 'তুমি কেন আমার সঙ্গে কথা বললে না, আমি যদি তোমার সঙ্গে কোন কথা না-ও বলে থাকি!'

আমি অতুলদার কথা শুনে অন্ধকারেই তাঁর দিকে ফিরে তাকালাম। আমার চোখ-দুটো জলভরা হয়ে উঠেছিল। অতুলদা বললেন, 'বল, তোমাকে আমি ডাক পাঠালাম বারবার আমার নতুন গান শেখাবো বলে আর তুমি এলে না, কেন?'

অতুলদার দু-চোখ দিয়ে দরদর করে অকস্মাৎ জলধারা নামল। আমি স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইলাম। সেই বিরাট ব্যক্তিত্বের কোমল স্নেহপূর্ণ কোন্ গভীর তল থেকে এ কোন্ অভিমানের ফল্গুধারা!*……

*　　　*　　　*

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ ঘোষ 'অতুলপ্রসাদ প্রসঙ্গে' নামক প্রবন্ধে বলেছেন:

সন তারিখ মনে নেই ঠিক। অনুমান ১৩২৯-৩০ সাল হবে। ঋতুটা বর্ষা। জোড়াসাঁকো, শিবুঠাকুরের গলি, ৩১ নম্বর বাড়ি। গুণী, শিল্পী, কদরদান মহলে বাড়িটি সুপরিচিত। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ তান্ত্রিক সাধক পূর্বপুরুষ-প্রতিষ্ঠিত ঐ নিবাসের অধিকারী মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য। তস্য অনুজ শিশিরশোভন। মধ্যম ভ্রাতা তিমিরবরণ তখনও অজ্ঞাত অখ্যাত।

বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে নয়, চিঠি বিলি করে নয়। কিন্তু আসর বসে ওখানে মাঝে মাঝেই। সঙ্গীত, শিল্প, সাহিত্য সর্বক্ষেত্রের গুণীদের সমাগম হয়। সঙ্গীতের তান ওঠে। কখনো কণ্ঠে, কখনো যন্ত্রে। কেউ চোখ বুজে শোনেন বুঁদ হয়ে। কারো কণ্ঠ উচ্ছ্বসিত।

---

* উপরোক্ত বিবরণ শ্রীপাহাড়ি সান্যাল মহাশয়ের সাক্ষাৎকার-সময়ে বর্ণনা অনুসারে লেখক কর্তৃক লিখিত।

খোশ গল্প, হাস্য পরিহাস, পান জর্দা চা— অর্থাৎ বৈঠকের উপচার ও উপাদান কিছুরই কমতি নেই।

এক বর্ষা-সন্ধ্যায় গিয়েছি সেখানে। দেখি—বীরবল, আর তাঁর পাশে বসেছেন অতুলপ্রসাদ। গৃহস্বামীর সস্নেহ আপ্যায়ন—'এই যে এসেছ। বাঃ বেশ হয়েছে। বস, গান শোনাও দেখি।' বীরবল ও অতুলপ্রসাদকে লক্ষ্য করে বললেন,—'এর নাম বিনয়। বিনয় ঘোষ। গান গায়। ভারি মিষ্টি গলা।' বীরবল চুরুটটা ঠোঁট থেকে সরিয়ে বললেন, 'বলতে হবে না। ওকে জানি।' অতুলপ্রসাদ কিছুই বললেন না; চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইলেন। মুখে স্মিত হাস্য। গাইলাম, 'মেঘেরা দল বেঁধে যায় কোন্ দেশে।" একটু আশঙ্কা ছিল মনে। অতুলপ্রসাদের গান গাইছি তাঁর একেবারে তিন হাত নাগালের মধ্যে বসে, যদি গাওয়া তাঁর পছন্দ না হয়! যদি কোথাও ভুল-ভাল হয়!

গাওয়া শেষ হল। মিহিরদা হাসিমুখে বললেন, 'বাঃ বেশ গেয়েছ।' অতুলপ্রসাদ তেমনি বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে রইলেন হাসি-হাসি মুখে। আস্তে করে বললেন, 'বাঃ! বেশ সুন্দর!'

দোল পূর্ণিমা। ১৯৩০ সালেরই হবে। সমবায় ম্যানশনে Society of Oriental Arts যেখানে ছিল, অর্থাৎ পুরোনো হিন্দুস্থান বিল্ডিংএ 'আনন্দমেলা' (আনন্দবাজারের আনন্দমেলা নয়) প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক উৎসব। প্রতিষ্ঠানে যুক্ত ছিলাম। এই সুবাদে গিয়েছি সেখানে। মেঝেতে আলপনা দিয়ে কিছু প্রশংসা পেলাম শিল্পী মনীষী দে মশাইয়ের কাছ থেকে। অতুলপ্রসাদ তখন ছিলেন ওই 'আনন্দমেলা'র প্রেসিডেণ্ট। লখনউ-প্রবাসী হওয়া সত্ত্বেও। ঐ সময়ে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন, এবং উপস্থিত ছিলেন ঐ সভায়। 'আনন্দমেলার' প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিহর চন্দ্র মহাশয়ের অনুরোধে অতুলপ্রসাদ সেদিনের আসরে তাঁর ইচ্ছেমত কয়েকখানি গান গাইলেন। গানের পর গান। খাদের দিকে কণ্ঠস্বরে গুরুগাম্ভীর্যের সঙ্গে মাধুর্যের মিলন লক্ষ্য করবার মত। বেশি তান খেলিয়ে কোন গান গাইলেন না। তার সপ্তকেও দাঁড়ালেন না। অথচ যে-সব ছোট ছোট টপ্পার তান আর মীড় লাগিয়ে ঠুংরির লাবণ্য ফুটিয়ে তুললেন গানগুলিতে তা লক্ষ্য করে আমার পিপাসা আরও বেড়ে গেল। বালক বয়স থেকেই অতুলপ্রসাদের কয়েকটি গান কণ্ঠস্থ করেছিলাম দাদাদের কাছ থেকে। বিচার করবার মত তখন না ছিল বয়স, না ছিল ক্ষমতা। কিন্তু না বুঝে-সুঝেও মুগ্ধ হয়ে যেতাম। সেই অতুলপ্রসাদের আপন কণ্ঠে, তাঁরই লেখা গান শুনলাম এত কাছে বসে! ভাগ্যবান বলে মনে করলাম নিজেকে। আরও গণ্যমান্য অনেকে 'আনন্দমেলা'র ঐ আসরে সেদিন ছিলেন। ছিলেন ইন্দিরা দেবী

চৌধুরানী, ছিলেন প্রিয়ম্বদা দেবী। অতুলপ্রসাদের পরে গান গাইবার পালা ছিল আমার। কিন্তু এবারে সুযোগটি ছেড়ে দিলাম না। বললাম অতুলপ্রসাদকে মনের কথাটি। বললেন, 'গান শিখতে চাও, বেশ তো। এসো আমাদের বাড়ি। আমি আছি আমার ভাইয়ের বাড়িতে স্টোর রোডে। হ্যাঁ কয়েকটা দিন আরও থেকে ফিরে যাব—লখনউ। বেশ তো, সকালের দিকে এসো। বিকেলেও আসতে পার।'

গিয়ে হাজির হলাম ৬ নম্বর স্টোর রোডে—এখন যার নাম হয়েছে গুরুসদয় রোড। প্রথমেই মিষ্টিমুখ। অতুলপ্রসাদ বললেন আমার সঙ্কোচ দেখে, 'খাও না, সবই ঘরের তৈরি। খেয়ে নাও আগে।' খেয়ে নিলাম। তারপর গিয়ে বসলাম গান শিখতে। একটা খাতা খুলে পাতা উলটে দেখতে লাগলেন আর গুন-গুন করে সুর ভাঁজতে লাগলেন অতুলপ্রসাদ। প্রথমে শেখালেন,

"জল কহে চল্ মোর সাথে চল্
তোর আঁখিজল হবে না বিফল"

গাইলেন নিচু পর্দায় আস্তে করে। দিনেন্দ্রনাথের মত গলা ছেড়ে, মানে উচ্চকণ্ঠে নয়। কিন্তু গলার কাজগুলো ঠিক দেখিয়ে দিচ্ছিলেন। গানটির দ্বিতীয় লাইন

"চেয়ে দেখ মোর নীল জলে
শতচাঁদ করে টলমল"

গাইবার সময়ে 'চাঁদ' কথাটা টপ্পার দ্রুত কম্পন দিয়ে অনায়াসে গেয়ে দেখালেন। আবার সহজ সাদামাটা করেও গাইলেন।

রেডিও আর্টিস্টদের গলায় ঐ টপ্পার কাজটুকু এ পর্যন্ত শুনতে পেলাম না তো! বলতে লজ্জা নেই, ঐ একখানা গান ভাল করে শিখে নেবার জন্যে একাধিক দিন গিয়েছিলাম তাঁর কাছে। আরও গান অবশ্য শিখিয়েছিলেন। খুব যত্ন করে, ধৈর্য ধরে নিজে বার বার গেয়ে শেখাতেন গান। তার সঙ্গে চা এবং সন্দেশাদি তো থাকতই।

আমার পরম সৌভাগ্য, অতুলপ্রসাদ আমার গান শুনে খুব খুশি হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, 'চল না আমার সঙ্গে লখনউ। অনেক গান শিখিয়ে দেব। এখানে মাত্র কয়েকদিনের জন্যে আসি।' আমার স্বল্প বুদ্ধি! তাঁর সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিনি সেদিন। কে ভাবতে পেরেছিল এমন অকস্মাৎ চিরজীবনের মত চলে যাবেন অতুলপ্রসাদ!

১৯৩৪ সালে তিনি পরলোক গমন করেন, আর ১৯৩৫ সালে আমার লখনউ যাবার সুযোগ ঘটে। তাঁর নামে নামাঙ্কিত এ. পি. সেন রোডে তাঁর প্রাসাদোপম শূন্য বাস-ভবনটি দেখে তখন দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের বুদ্ধিকে ধিক্কার দেওয়া ছাড়া আর কিছু করবার ছিল না।

অল্প-সল্প পরিচয় আমার সঙ্গে। তবু লখনউ থেকে কলকাতায় এলে একখানা ছোট্ট

চিঠিতে দু-ছত্র লিখে পাঠাতেন অতুলপ্রসাদ—'ভাই বিনয়, আমি এসেছি। দিনকতক থাকব। তুমি সুবিধামত অবশ্যই এসে দেখা কোরো। অতুলদা।'

গিয়ে হাজির হলেই সেই মধুর স্মিত হাস্যমাখা মুখের অভ্যর্থনা—'এসেছ? বেশ। বস, চা খাও আগে।' "কে তুমি বসি নদীকূলে একেলা" গানটি শেখাতে শেখাতে মাঝখানে বলেন ঐ গান লেখবার ইতিহাসটা। 'একবার এক কমিশনে যাচ্ছি গোমতী নদী দিয়ে, নৌকো করে। মাঠের ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে গিয়েছে নদীটা, বেশ মিঠে মিঠে হাওয়া বইছে। বসে বসে একটা বইয়ের পাতা উল্টে যাচ্ছি। এমন সময়ে চোখে পড়ল, অল্প বয়সের একটা মেয়ে নদীর একেবারে ধারে একলা বসে রয়েছে। কেমন যেন আনমনা হয়ে তাকিয়ে আছে—কিছুই যেন দেখছে না। হাওয়ায় চুলগুলি উড়ছে এলোমেলো। আধময়লা ঘাঘরাটাও উড়ছে এদিকে সেদিকে। কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই মেয়েটির। দেখে মনটা যেন কেমন উদাস উদাস হয়ে গেল। উদাস-করা একটা সুর মনে এসে গেল। তখন এই গানটা লিখে ফেললাম।' বললেন অতুলপ্রসাদ তাঁর সেই ঈষৎ হাসি আর একটুখানি লাজুক ভঙ্গি-মেশানো ঢঙে। তারপর সব গানটা শেখালেন।

এই গানটি দ্রুত লয়ে, খেমটার তালে গাইতে গেলে এর অন্তর্নিহিত শান্ত উদাস-করা ভাবটুকু যে চটপট পটল তুলবে এতে সন্দেহ নেই। অধিকাংশ রেডিও এবং রেকর্ড আর্টিস্ট নিঃসন্দেহে এই সূক্ষ্ম বিচার এবং অনুভূতি থেকে যে মুক্ত একথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে।

আর একবার এসেছেন অতুলপ্রসাদ লক্ষ্ণৌ থেকে, চিঠি পাঠিয়েছেন, গিয়েছি তাঁর কাছে। উঠেছেন এবারে তাঁর জ্ঞাতি ভ্রাতা, স্মল-কজেজ কোর্টের জজসাহেব গুপ্ত সাহেবের বাড়িতেই। "তব চরণ তলে সদা রাখিয়ো মোরে" গানটি শেখাতে শেখাতে একবার একটু হেসে বললেন, "আচ্ছা, তুমি কি হরেন চট্টোপাধ্যায়কে চেনো? আলাপ আছে?" একদিন আনতে পার আমার কাছে? শোননি রেকর্ডে গেয়েছে আমার গানটা—'ওগো নিঠুর দরদী'? শুনেছ? ও, হরেন দিলীপের বন্ধু বুঝি? তা, নিয়ে এসো একদিন ওকে, কেমন? নিয়ে গিয়েছিলাম হরেনদাকে অতঃপর।

তখন বাংলা দেশ ভেসে যাচ্ছে সুরের প্লাবনে—অপরূপ সুকণ্ঠ দিলীপকুমার রায়ের গানের বন্যায়। গান তো শুনে আসছিলাম, গেয়েও আসছিলাম বেশ ক-বছর ধরে। কিন্তু গানের জান, প্রাণ, কলিজা যে কোথায় থাকে তার খবর প্রথম দিলেন দিলীপকুমার। ভক্ত হয়ে পড়ব এ আর বেশি কী! সাকরেদ বনে গেলাম হরিদাস গোস্বামী, কুমুদেশ (বদন) সেন, রণজিত (টুলু) সেন, সুনীল সরকার, পূর্ণেন্দু চক্রবর্তী, হরিপদ রায়—আমাদের বন্ধুগোষ্ঠীভুক্ত কয়েকজন। অতুলপ্রসাদের কতকগুলি গান

দিলীপবাবু (আমাদের মণ্টুদা) মধুনিঃস্যন্দী কণ্ঠের জাদুতে তখন বাংলা দেশকে মুগ্ধ মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছেন। ঐসব গানের কিছু কিছু আমরাও শিখেছিলাম মণ্টুদার কাছ থেকে। সুতরাং একদিন আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে অতুলপ্রসাদ যখন তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ স্নিগ্ধ হাসি আর লাজ-নম্র বচনে জানালেন "মণ্টু বেশ ভালো গায়, কিন্তু বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলে", মনটা একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিল বৈকি! হোক না একটু বাড়াবাড়ি। তান বিস্তার না-হয় ঈষৎ অতিরিক্ত হলই। অমন অমৃতনিঃস্যন্দী "কণ্ঠে ফিরিতেছে সাতটি স্বর সাতটি যেন পোষা পাখি" এ যাঁরা চাক্ষুষ করেছেন তাঁদের চক্ষু ও কর্ণের বিবাদ নিশ্চয়ই ভঞ্জন হয়েছিল। সুরের খেলা না-হয় একটু বেশিই হল। 'ও আমার নবীন পাখী ছিলে তুমি কোন্ বিমানে", 'ওগো নিঠুর দরদী, এ কী খেলছ অনুক্ষণ', 'যদি তোর হৃদ-যমুনা হল রে উছল', 'আর কতকাল থাকব বসে', 'বঁধুয়া নিঁদ নাহি আঁখিপাতে', 'কে আবার বাজায় বাঁশি এ ভাঙা কুঞ্জবনে'—এ সব গান বহু আসরে দিলীপবাবু তখন গেয়েছেন। দিলীপকুমার, ধূর্জটিপ্রসাদ এঁরা খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। অতুলপ্রসাদের গানগুলি দিলীপকুমার নিশ্চয়ই নির্ভুল সুরে এবং ঢঙে গাইতেন, তানালাপের কথা আলাদা। আমাদের উল্লিখিত বন্ধুগোষ্ঠী এইসব গান শিখেছিলাম দিলীপকুমারের কাছে এবং বহু আসরে তাঁর সঙ্গে বসে গেয়েছি।

কিন্তু আজকাল এই গানগুলি যাঁরা গেয়ে থাকেন তাঁদের গলায় অতুলপ্রসাদের গানের বিশিষ্ট ঢঙ যে খুব কমই দেখতে পাওয়া যায় এটা তাঁরা নিজেরা অর্থাৎ গায়ক-গায়িকারা বোঝেন কি? সম্ভবত বোঝেন না। এবং আমার বিশ্বাস, গ্রামোফোন কোম্পানি এবং বেতার প্রতিষ্ঠানে এমন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোক সম্ভবত নেই যাঁদের ঐসব গানের বিশুদ্ধ ঢঙের সঙ্গে পরিচয় আছে। যদি তা থাকত, তাহলে অশুদ্ধ এবং নিকৃষ্ট গায়ন-ভঙ্গিতে শিল্পীরা গাইবার অনুমতি পেতেন না।

গায়ন-পদ্ধতি বা ঢঙের কথা দূরে, যেখানে গানের কথা পর্যন্ত ঠিক আছে কি না এটাও ঠিক জানেন না অথবা জানা থাকলেও ঐ ভুল-ভাল সমেতই গাইতে দেওয়া হয় সেখানে মাঝারির রাজত্ব চলছে এতে কোন সন্দেহ নেই। আর মাঝারির রাজত্ব ভয়াবহ একথা বলে গেছেন ক্রান্তদর্শী রবীন্দ্রনাথ।

'মনোপথে এল বনহরিণী' গানটি অতুলপ্রসাদের জীবিত অবস্থাতেই গ্রামোফোন রেকর্ডে গেয়েছেন স্বর্গত হরিপদ রায়—যাঁর উল্লেখ করেছি আগে। কথা, সুর, ঢঙ সবই যথাযথ রয়েছে ঐ রেকর্ডে। যাঁরা ঐ গানটির বিশুদ্ধতা যাচাই করতে ইচ্ছুক তাঁরা ঐ রেকর্ড শুনে দেখতে পারেন। তাছাড়া বাংলা ভাষায় কিছুটা জ্ঞান গায়ক গায়িকাদেরও থাকা বাঞ্ছনীয়। অতুলপ্রসাদের সর্ব গানেই ছন্দ বা মিলের খুব যে পারিপাট্য আছে, এমন কথা বলা যায় না। তা হলেও বাংলা ভাষাটা তাঁর ভালভাবে জানা ছিল। তিনি

লিখেছেন, "থমক-থির একি বঙ্কিম ভঙ্গী।" বেতারে গাওয়া হয়, "থমকি থির" অর্থাৎ পদটির অর্থ হৃদয়ঙ্গম না হওয়ায় কথাগুলি সম্ভবত improve করা হয়েছে। গাওয়া হয়, "কারে চাহ তুমি মনোবিষাদিনী", অথচ রচয়িতা অতুলপ্রসাদ নিজে গেয়েছেন, "কারে চাহ তুমি বনবিহারিণী"। আরও আছে। রচয়িতা লিখেছেন, "কোথা যূথ তব কোথা সে বনস্থলী, আইলে হেথায় জেনে কি পথ ভুলি।" আগে যে কথা বলেছি তার একটুখানি নমুনা এখানে পাওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ মিল সম্বন্ধে অতুলপ্রসাদের ঈষৎ ঔদাসীন্য। 'বনস্থলী' আর পথ ভুলি' যে উৎকৃষ্ট মিল নয় এটা নিতান্তই প্রাকৃতজন ভিন্ন সকলেই বুঝবেন। কিন্তু এটা বোঝা খুবই শক্ত, ঐ 'বনস্থলী' কী করে 'বনস্থলিনী' হতে পারে। শক্ত হলেও এটা হয়েছে। বেতারে বহুবার গাওয়া হয়েছে, রেকর্ডেও তাই হয়েছে। সঙ্গীত-শিক্ষার আসরে পঙ্কজকুমার মল্লিকও ঐ 'বনস্থলিনী'ই শিখিয়েছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করাতে উত্তর দিয়েছেন,—"কী করব ভাই, স্বরলিপিতে ঐ কথাটাই রয়েছে। আমার কী দোষ?" হায় স্বরলিপি! তুমি এক তুড়িতে কী না করতে পার!"

নিতান্ত প্রসঙ্গতই আলোচনা করলাম শিল্পীদের কণ্ঠে অতুলপ্রসাদের গানের বর্তমান দুরবস্থা নিয়ে। আমার আলোচ্য বস্তু মূলত এ নয়।

স্মল কজেজ কোর্টের জজসাহেব মিঃ গুপ্ত, কলকাতায় এসে সাধারণত যাঁর বাড়িতে অতুলপ্রসাদ এসে উঠতেন, সে সময়ে ছিলেন রাসবিহারী এভিনিউএ স্বর্গত অনাথগোপাল সেন মহাশয়ের বাড়িতে। সেখানে একদিনের আসরে এলেন শচীনদেব বর্মন মশাই, হিমাংশু দত্ত, আর সেই সময়ে একেবারে অজ্ঞাত অখ্যাতনামা কুন্দনলাল সাইগল। জাতে পাঞ্জাবী, লক্ষ্ণৌ থেকে রেলের চাকরি ছেড়ে ছুড়ে কলকাতায় এসেছেন ভাগ্যপরীক্ষা করতে। আছেন ওয়েলিংটন স্ট্রীটে। চমৎকার গান করেন। এই বলে তাঁর পরিচয় দেওয়া হল। সাইগল সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়ে গাইলেন, 'কবে তুমি আসবে বলে, রইব না বসে।' রবীন্দ্রনাথের গান। কণ্ঠমাধুর্যে মুগ্ধ সকলেই। অতুলপ্রসাদ খুউব তারিফ করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন পাহাড়ীর (সান্যালের) সঙ্গে চেনা আছে কি না। হাঁ, খুব দোস্তী আছে, বললেন সাইগল। কয়েকটি গজল গেয়ে শোনালেন। আমার অনুরোধে গাইলেন একটি পাঞ্জাবী পল্লীগীত।

ঐ বাড়িতেই একদিন গিয়েছি। অতুলপ্রসাদ বললেন: 'একটা গান শোন, রেকর্ডে গেয়েছে আমার এক ভাইঝি। খুব ভাল গেয়েছে।' শোনালেন নিজেই রেকর্ডটা বাজিয়ে। "বাদল ঝুমঝুম বোলে"—গানটা রেকর্ড করেছেন শ্রীমতী বিজয়া দাস (এখন রায়, সত্যজিৎ রায়ের গৃহিণী)। একটুখানি প্রসন্ন হাসি হেসে বললেন অতুলপ্রসাদ: 'মন্টুর গলাটা খুব মিষ্টি। ছেলেমানুষ, মাত্র ১৪ বছর বয়স।" শেখালেন আমাকে।

এর পর অতুলপ্রসাদ কলকাতায় এসে উঠেছেন হিন্দুস্থান রোডে তাঁর সেই জ্ঞাতি ভ্রাতা হাকিম গুপ্তসাহেব তাঁর নিজস্ব বাড়িতে উঠে এসেছেন যেখানে।
গিয়েছি গান শিখতে। শেখালেন, "তুমি গাও, তুমি গাও গো।" বললেন, এই গানটা লিখেছেন রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করে। এটা পরে রেকর্ড করেন বন্ধু হরিপদ রায়। অপূর্ব মিষ্টি অথচ বলিষ্ঠ ছিল তাঁর কণ্ঠ। অতুলপ্রসাদের কত সব গান আমরা সভা সমিতিতে গেয়েছি বিনা মাইকেই। সেনেট হলে, দুর্ধর্ষ ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের মত হলেও সেইসব গান শুনিয়েছি।
হিন্দুস্থান রোডের ঐ বাড়িতে একদিন সকালে গানের আসর বসেছে। হিমাংশু দত্ত, হরিপদ রায় প্রভৃতি অনেকেই এসেছেন। গৃহস্বামীর দুই পুত্র, মনু এবং ভানু দুই থালা ভর্তি উৎকৃষ্ট সন্দেশ আমাদের সামনে ধরে দিয়েছেন। সেগুলির সদ্ব্যবহার করছি আমরা সানন্দে সদলে। অতুলপ্রসাদের কাছে এক ভদ্রলোক এলেন গাড়ি করে। ডাক্তার। অতুলপ্রসাদ একটুখানি সলজ্জ হাসি হেসে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তোমরা গান টান গাইতে থাকো। আমি এই এঁর সঙ্গে একটু যাচ্ছি। মাথার এইটে কাটিয়ে ফিরে আসব এক্ষুনি।' বলে হাতটা ঠিক তালুর উপরে ঠেকিয়ে দেখালেন। একটা ছোটগোছের মেচেতা হয়েছে সেখানে। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এলেন।
"উঠ গো ভারতলক্ষ্মী" গানটির কথা উঠল। জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা কখন লিখেছিলেন?' বললেন, 'ভেনিসে এক সন্ধ্যায় গণ্ডোলায় করে বেড়াচ্ছি। চারদিকের বাড়ির আলো, আকাশের তারা, জলের ঝিকিমিকি আর এধারে ওধারে গণ্ডোলার ছপ-ছপ শব্দ। চুপ করে দেখছি, শুনছি। হঠাৎ একটা গণ্ডোলা থেকে সুর ভেসে এল। বেহালা বাজাচ্ছে। চমৎকার লাগল সুরটা। গণ্ডোলা থেকে দূরে চলে গেলেও সেই সুরটা কানে বাজতে লাগল। ফিরে এসেই গানটা লিখে ফেললাম। দেশে ফিরে গানটা দু-চার জায়গায় গেয়েছি। অনেকে প্রশংসাও করেছেন। প্রথম কোথায় ছাপা হয়েছিল গানটা, ঠিক মনে নেই। অনেকদিন আগের কথা তো। সেটা ছিল স্বদেশীর যুগ। প্রায়ই সভা-সমিতি হত, তাতে এই গানটা গেয়েছি। একদিন ভবানীপুরের গঙ্গার ধারের একটা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ দূর থেকে কানে এল একদল ছেলের গানের সুর। একটু কাছে এলে বুঝতে পারলাম, ওরা আমার ঐ গানটাই গাইতে গাইতে যাচ্ছে। ভারি আনন্দ হল।'
লখনউতে 'প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের' অধিবেশন বসবে। সভাপতি করা হয়েছে অতুলপ্রসাদকে। বলা বাহুল্য, খুব জোরজার করেই। অতুলপ্রসাদ বললেন: 'আমাকে তো ওরা জোর করে সভাপতি করবেই। কোন আপত্তি শুনল না। আমার এদিকে এত কাজের চাপ। সভাপতির ভাষণ আর লিখে উঠতে পারছি না কিছুতেই।

ওদিকে সম্মেলন তো শুরু। কী আর করি। একটা গান লিখে ফেললাম—"ওগো দুঃখ-সুখের সাথী সঙ্গী দিন রাতি সঙ্গীত মোর।" ভাষণের বদলে এই গানটা গেয়ে দিলাম। কী আর করি, বল।' এই বলে একটুখানি হাসলেন। হো-হো, হা-হা করে অতুলপ্রসাদকে হাসতে দেখিনি। মাঝে মাঝে বেশ হাসির গল্প বলে আমাদের হাসিয়েছেন, নিজে কিন্তু ঐ "বিলিতি ধরনের হাসি" একটুখানি হেসেছেন শুধু।

বোধহয় ১৯৩০ সাল হবে। উদয়শঙ্করকে আবিষ্কার করেছেন ইম্প্রেসারিও স্বর্গত হরেন ঘোষ মশাই। তাঁরই সৌজন্যে কলকাতার কতিপয় বিশিষ্ট নাগরিক এই আশ্চর্য প্রতিভাশালী শিল্পীর অপূর্ব নৃত্যভঙ্গিমার স্পর্শ লাভের পরম সৌভাগ্য আর প্রথমে মুগ্ধ হবার দুর্লভ আনন্দ আস্বাদনের সুযোগ লাভ করেছিলেন।

প্রায় সেই সময়েই, অর্থাৎ উদয়শঙ্করের আবির্ভাবের হয়ত কয়েক মাস আগে শিবুঠাকুর লেনের ঐ ৩১ নং বাড়িটিতে পরিচয় হল মিহিরদার মেজ ভাই তিমিরবরণের সঙ্গে। সদ্য প্রত্যাবর্তন করেছেন মাইহার থেকে গুরু আলাউদ্দিনের কাছে শিক্ষা গ্রহণ সমাপনান্তে। মিহিরদার পরামর্শ নিয়ে এবং তিমিরদাকে পুরোধা করে একটা গানের ইস্কুল খোলা হল বিবেকানন্দ রোডে, একটা মেয়েদের ইস্কুলে। আয়োজন উদ্যোগ সম্পূর্ণ। সেই সময়ে অতুলপ্রসাদ ছিলেন কলকাতায়। গানের স্কুলটির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করার জন্য অনুরোধ করা হল অতুলপ্রসাদকে। তাঁর সম্মতি পাওয়া গেল।

ঐ অনুষ্ঠানে আমাকে গান গাইতে হয়েছিল। তার মধ্যে একটা গানের একটুখানি ইতিহাস আছে। সংক্ষেপে বলছি। প্রেসিডেন্সি কলেজের শারীর বিজ্ঞান অর্থাৎ ফিজিওলজির অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় সুবোধচন্দ্র মহলানবিশের ছোট ছেলে কাবুল (সুজিত) ছিল আমার সহপাঠী ঐ কলেজে। এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানের মাত্র কয়েকদিন আগে এক দুপুরে গিয়েছি পার্ক সার্কাসে, কাবুলদের বাড়িতে ওর ঘরে বসে আড্ডা জমাতে। দেখি বন্ধু হিমাংশু দত্ত (সুরসাগর) সেখানে আমার আগে, মানে বেশ কয়েকদিন আগেই এসে অধিষ্ঠিত।

আমি যাওয়ামাত্রই কাবুল বলে উঠল, "দ্যাখ্ বিনয়, তোকে আজ হিমুর সুর দেওয়া একটা নতুন গান শোনাবো। এই আমার এখানে বসেই সুরটা তৈরি করেছে। কিন্তু তোকে আজ শেখানো হবে না কিছুতেই গানটা। একটিবার শুনবি শুধু, হিমু গাইবে।" বললাম, 'বেশ আমি রাজি। গেয়ে শোনাও।' হিমাংশু গানটা গাইল হারমোনিয়াম বাজিয়ে। গানটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই কথাগুলো লিখে নিলাম। গানটার প্রথম লাইন হচ্ছে: 'তুমি তো বঁধু জানো, কাঁদিছে কেন আঁখি।' গল্পগুজব সেরে বাড়ি ফিরে গেলাম। এই গানটি গেয়েছিলাম ঐ গানের স্কুলের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে।

দিনকয়েক বাদে অতুলপ্রসাদের একখানা পোস্টকার্ড পেলাম। লিখেছেন তাঁর বাড়িতে একটা গানের আসর বসছে, অবশ্বি করে যেন যাই। গেলাম। গিয়ে দেখি ঘর-ভরা লোক। তার মধ্যে নামকরা গায়ক গায়িকারা অনেকেই রয়েছেন। বন্ধু হিমাংশু দত্তও ছিলেন। দুই তিন জনের গান গাওয়া হয়ে গেলে আমার কাছে এসে অতুল-প্রসাদ বললেন, "ভাই ঐ গানটা তুমি গেয়ে শোনাও না! ঐ যে সেদিন সেইখানে গেয়েছিলে।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি তো বঁধু জানো"—এই গানটা? তিনি খুশি-খুশি মুখে বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ ঐটে—ঐটে গাও। সুন্দর গানটা।" গাইবার আগে একবার চেয়ে দেখলাম হিমাংশুর দিকে। তারপর গেয়ে দিলাম। অতুলপ্রসাদ প্রসন্ন হাসিতে উজ্জ্বল মুখে আমার দিকে চেয়ে বললেন: 'বাঃ! বেশ গেয়েছ! সুন্দর গেয়েছ!"
হিমাংশুকে বললাম, "কী হে, শুনলে তো? ভুল-টুল হয়নি তো কোথাও?" বলল, "না, ঠিক হয়েছে। ভালোই গেয়েছ।" "তাহলে বাজিটা জিতে গেলাম কাবুলের কাছে?" কাবুল অবশ্য ঐ গানের আসরে উপস্থিত ছিল না।… …
শ্রদ্ধেয় খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় তখন থাকেন ১০ নং ডোভার লেনে বালিগঞ্জ প্লেসে। তাঁর নিজস্ব বাড়ি তখনও তৈরি হয় নি। তাঁর একখানা চিঠি পেলাম। লিখেছেন, "আমার বাড়িতে আজ সন্ধ্যায় অতুলপ্রসাদ আসবেন। গান টান একটু হওয়া চাই, তুমি নিশ্চয়ই এসো।"
সেটা সম্ভবত জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাস ছিল। ডোভার লেনে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে যাবার মুখে নামল বৃষ্টি। একটু ভিজেই গেলাম। জামাকাপড় বদলাবার জন্যে খুব পীড়াপীড়ি করলেন সবাই। গায়ের খদ্দরের চাদরটা শুধু খুলে নিয়ে মেলে দিলাম শুকোবার জন্যে। ভেজা চুল আর পাঞ্জাবী শুকিয়ে গেল ফ্যানের হাওয়ায়। অতুলপ্রসাদ গাইলেন, "ভাঙা দেউলে মোর কে আইলে আলো হাতে।" বর্ষার বৃষ্টি, বাদলা হাওয়া আর তার সঙ্গে ঐ গান, রাতের স্তব্ধতা (প্রায় ৪০ বছর আগেকার ডোভার লেন, মনে রাখতে হবে)—সব কিছু মিলে এমন একটা মধুর বিষাদময় পরিমণ্ডল রচনা করল, যার মধ্যে অতুলপ্রসাদের গম্ভীর মধুর কণ্ঠে গাওয়া ঐ গানটি যেন প্রাণময় হয়ে উঠল। গাওয়া শেষ হলে আবেগে উদ্বেলিত হয়ে খগেনবাবু অতুলপ্রসাদের হাত মুঠো করে ধরে বললেন, "আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে আমার। আরেকদিন আসতে হবে আপনাকে।"
বলা বাহুল্য, গানটা লিখে নিলাম পরের দিনই অতুলপ্রসাদের কাছে গিয়ে। এই গানটা কোথাও কারো মুখে গাইতে শুনিনি।
অতুলপ্রসাদ প্রসঙ্গে যা বললাম, সে শুধু তাঁর সঙ্গে আমার স্বল্প দিনের অল্প পরিচয়

আর অভিজ্ঞতার কথাই, এবং এ প্রসঙ্গটি প্রধানত তাঁর কাছে গান শেখা আর অন্য দুচারটে ঘটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাঁর গানের বৈশিষ্ট্য, রূপ গুণ ইত্যাদি নিয়ে তেমন আলোচনা করা হয়নি। আমার অভিজ্ঞতার টুকরোগুলির মধ্যে থেকে কবি, গায়ক ও সুরকার অতুলপ্রসাদের যে-রূপের আভাসটুকু লক্ষ্য করলেই ধরা পড়ে, সেটা হল তাঁর নিরহঙ্কার, উদার, অমায়িক এবং স্নেহসিক্ত স্নিগ্ধ মধুর চরিত্র। কোনও দিন আমার কোনও অনুরোধ তাঁর কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়নি। কখনও বলেননি, 'সময় নেই', 'পারব না', 'এখন নয় পরে এসো', কিম্বা 'ব্যস্ত আছি' ইত্যাদি।

সময় অসময়ের বাছ বিচার না করেই তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হয়েছি। টেলিফোনে দিনক্ষণ নির্ধারণ করে যাইনি কোনদিনই। এমনও হয়েছে, গিয়ে হাজির হয়েছি, যখন তিনি স্নানে যাবেন। যথারীতি প্রসন্ন স্মিত হাস্যমুখে অভ্যর্থনা করে বসিয়ে বলেছেন : 'বস, চা খাও। আমি স্নানটা একটু সেরে আসি।'

কাছাকাছি ছিল স্নানের ঘর। শুনতে পেয়েছি স্নানের সঙ্গে গান চলছে। একদিন হরিপদ রায়ও গিয়েছিল ঐ সময়েই। স্নানের ঘরে অতুলপ্রসাদের সুর ভাঁজা শুনে বলল : 'দেখছিস, খাদের দিকে অতুলদার গলায় দানাগুলি কি রকম স্পষ্ট হচ্ছে?'

১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের ৭০ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে খুব জাঁকজমকের সঙ্গে 'রবীন্দ্রজয়ন্তী' উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। যুগ্ম-সম্পাদকের অন্যতম ছিলেন শ্রদ্ধেয় অমল হোম মহাশয়। অতুলপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। কলকাতার টাউন হলে উৎসবের অঙ্গীভূত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছিল। সেবারের জন্যে টিকিটও বিক্রি করা হয়। একদিন দেখলাম, অতুলপ্রসাদ তাঁর লক্ষ্ণৌয়ের কয়েকজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে টাউন হলে এলেন টিকিট কেনার জন্যে। কাউণ্টারে গিয়ে স্বয়ং অতুলপ্রসাদ চাইলেন টিকিট। সে সময় অমল হোমও সেখানে এসে উপস্থিত। দু-জনের মধ্যে কুশল প্রশ্নাদি বিনিময়ের পর অমল হোম মহাশয় জিজ্ঞাসা করলেন, "অতুলদা টিকিট চাই নাকি?" একটু হেসে অতুলপ্রসাদ বললেন, "আমার এই বন্ধুদের জন্যে ক-খানা।" একটু হেসে বললেন, "পাওয়া যাবে তো?" বলেই পকেটে হাত দিলেন টাকার জন্যে। অমল হোম বললেন, "দাঁড়ান দেখছি।" নিজেই কাউণ্টারের দিকে গেলেন। ফিরে এসে বললেন, "না অতুলদা, টিকিট সব ফুরিয়ে গিয়েছে। একেবারে নিঃশেষ। কী করব বলুন, নিরুপায়।"

"না না, তার জন্যে কী হয়েছে!" প্রসন্ন হাসি হেসে বললেন অতুলপ্রসাদ, যাতে অমল হোম মহাশয় কিছুমাত্র অপ্রস্তুত বোধ না করেন এইরূপ মনোভাব। সঙ্গী লখনউয়ের বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে হাস্যমুখে বললেন, "কী আর করা যাবে!" ওঁরাও সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "না না, ঠিক আছে, ঠিক আছে; চলুন যাই।"

আমি লক্ষ্য করছিলাম। অতুলপ্রসাদ যে অত্যন্ত ভদ্র, তার পরিচয় আমার অজানা ছিল না। তাহলেও ঐ দিন তখন মনে হচ্ছিল, অমল হোম মশাইকে একটু বিশেষ অনুরোধ হয়ত তিনি করবেন কোনরকম করে খানকয়েক টিকিটের ব্যবস্থা করে দেবার জন্যে। বিশেষ করে তাঁর লখনউয়ের বন্ধু কয়েকটিকে যখন সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। আমরা সাধারণ পাঁচজনে যা করে থাকি। কিন্তু অতুলপ্রসাদ সে সব কিছুই করলেন না। যেন কিছুই হয় নি এমনিভাবে চলে গেলেন সেখান থেকে—বন্ধুদের নিয়ে। বন্ধুস্থানীয় অমল হোম অপ্রস্তুত বোধ করছেন, এটা যেন তিনি দেখতে চাইছিলেন না।

ছোট ছোট ঘটনা। নাটকীয়তা নেই, আড়ম্বর নেই। কিন্তু তার মধ্যেই ধরা পড়ে মানুষের আসল রূপটি। যাকে বলে অন্তরঙ্গ রূপ। কৃত্রিমতার বার্নিশ-রহিত রূপ। অতুলপ্রসাদ সম্পর্কে আমার নিজের সামান্য অভিজ্ঞতার কথাই শুধু বললাম। এখানে ধূর্জটিপ্রসাদের মুখে শোনা একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। স্বর্গত ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন লখনউ প্রবাসী অধ্যাপক। সাহিত্য, সমাজ বিজ্ঞান এবং সঙ্গীত সর্ববিষয়েই তাঁর দখল ছিল অসাধারণ। অতুলপ্রসাদের অন্তরঙ্গ ও বিশিষ্ট বন্ধুদের অন্যতম ছিলেন তিনি।

ধূর্জটিপ্রসাদ থাকতেন লখনউ কলেজ-সংলগ্ন অধ্যাপক নিবাসে। অতুলপ্রসাদ সময় পেলেই গাড়ি করে গিয়ে হাজির হতেন বন্ধুদের কাছে। কখনও বসে যেতেন আড্ডা জমিয়ে, কখনও বা দু-তিন জন বন্ধুকে তাঁর গাড়িতে তুলে নিয়ে বেরিয়ে যেতেন বেড়াতে। একদিন এমনি চলেছেন বেড়াতে। সঙ্গে রয়েছেন ধূর্জটিপ্রসাদ। একটা গলির মুখে এসে গাড়ি থামাতে বললেন অতুলপ্রসাদ। "এক্ষুনি আসছি, তোমরা ভাই একটু বস"—বলে গাড়ি থেকে নেমে গলিতে ঢুকে গেলেন অতুলপ্রসাদ। ধূর্জটিপ্রসাদের মনে জাগল কৌতূহল। নিঃশব্দে অনুসরণ করলেন। ছোট্ট একটা প্রায় কুঁড়ে ঘরে ঢুকে গেলেন অতুলপ্রসাদ। পকেটে হাত ঢুকিয়ে মুঠো ভর্তি করে নিয়ে এলেন রূপোর টাকা আর নোট—যতটা পারলেন। ঐ কুটিরে শয্যাশায়ী এক বৃদ্ধের কাছে গিয়ে তার বালিশের তলায় গুঁজে দিলেন ঐ সমস্ত নোট, টাকা কড়ি সব। চেয়ে দেখলেন না কত টাকা, গোনা তো দূরে।

মুখ ফেরাতেই ধরা পড়ে গেলেন ধূর্জটিপ্রসাদের কাছে। "এটা কী হল অতুলদা?" সকৌতুক প্রশ্ন ধূর্জটিপ্রসাদের। লজ্জায় জড়িত কণ্ঠে যা বললেন অতুলপ্রসাদ গাড়িতে আসতে আসতে তার মর্ম এই :

তরুণ-বয়সী ব্যারিস্টার এ. পি. সেন লখনউ শহরে এসেছেন ভাগ্যপরীক্ষা করতে। যেমন সাধারণত হয়ে থাকে—দিনের পর দিন যাচ্ছে। উপার্জন হচ্ছে না কিছুই।

মনে চিন্তা ভাবনা। সেই সময়ে এক মুসলমান ফকির তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, তোর অনেক টাকা রোজগার হবে বেটা। ঘাবড়াচ্ছিস কেন মিছিমিছি। এই সেই ফকির। এখন বৃদ্ধ, জরাজীর্ণ। তাঁর সেই ভবিষ্যৎবাণী মিথ্যা হয়নি। অতুলপ্রসাদ (ব্যারিস্টার এ. পি. সেন) অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছেন, কিন্তু ফকিরকে ভোলেন নি। মাঝে মাঝে তার ডেরায় গিয়ে এমনি পকেট-ভর্তি (অতুলপ্রসাদের ভাষায় 'সামান্য কিছু') টাকাকড়ি বালিশের তলায় গুঁজে দিয়ে আসেন।

তাঁর দানের কথা সুবিদিত। একটি মাত্র এবং অসাধারণ ঘটনা মাত্র উল্লেখ করা গেল।

* * *

বিশিষ্ট প্রবন্ধকার এবং সঙ্গীত-রসিক শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায় 'অতুলপ্রসাদের বাংলা গান' প্রসঙ্গে বলেন :

"বাঙলার অমর কবি দরদী সুরকার অতুলপ্রসাদ চিরদিন বঙ্গবাসীর হৃদয়ে অমর হইয়া বিরাজ করিবেন। বাঙলা সঙ্গীতের এই যুগে তিনজন কবি, সুরকার বা composer ও সঙ্গীত রচয়িতা বলিয়া সম্মানিত হইয়া থাকেন—রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও অতুল-প্রসাদ। এই তিনজনের মধ্যে অতুলপ্রসাদ যে সুরসৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন তাহা সত্যই বাঙলা গানকে বহুল পরিমাণে শ্রীমণ্ডিত করিয়াছে।

অতুলপ্রসাদের সঙ্গীতের প্রধান গুণ

সঙ্গীতের যেটি প্রধান গুণ, সুর ও কথা—মুহূর্তের মধ্যে হৃদয়দ্বারে আঘাত করিয়া তাহা আমাদের লইয়া যায় সুরকারের সৃজিত সেই কল্পলোকে—তন্ময় হইয়া আমরা সেই স্বপ্নরাজ্যে অপূর্ব রসসৃষ্টির আস্বাদ গ্রহণ করি—এই প্রধান গুণ অতুলপ্রসাদের ভাষা ও সুরসৃষ্টির মধ্যে প্রবলভাবে দেখিতে পাওয়া যায়।

অতুলপ্রসাদ আমাদের নিকট দুঃখ করিতেন যে, তাঁহার গানে রবীন্দ্রনাথ বা দ্বিজেন্দ্র-লালের ন্যায় ভাষার ঝঙ্কার বা পদলালিত্য নাই। কিন্তু তাঁহার দুঃখ করিবার কী কারণ আছে, বরং তাহাতে ইহাই প্রমাণ হয় যে সুরের ঐশ্বর্য কথার ও ভাষার দৈন্যকে ম্লান করিয়া এমন একটা সহজ আবেদন শ্রোতার মনে আনিতে সমর্থ, যাহার মূল্য ভাষার ঝঙ্কার বা পদলালিত্য অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে।

অতুলপ্রসাদের সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য হইতেছে, তিনি বাঙলা গানে ঠুংরির সৌন্দর্য ও মাধুর্যের মধ্যে ছোট-ছোট তান ও মীড়ের প্রয়োগ করিয়া এক অপূর্ব রস সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা তাঁহার পূর্বে বাঙলা গানে কখনও দৃষ্ট হয় নাই।

যে সব বাঙালী গায়ক হিন্দুস্থানী ঠুংরি ভাল গাহেন তাঁহাদের দ্বারা অতি সুন্দরভাবে অতুলপ্রসাদের সঙ্গীত গীত হইতে পারে। তবে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে অতুলপ্রসাদের সঙ্গীতের উপর অনেক গায়ক অত্যাচার করিয়া থাকেন। তাঁহারা

গায়ক হইলেও একথা বিস্মৃত হন যে সুরকার বা composer-এর স্থান অনেক ঊর্ধ্বে। সুরকার সুরের মাধুর্য সৃষ্টি করিয়াছেন—গায়কের কর্তব্য সেই মাধুর্যকে লোকসমক্ষে জাগ্রত করা, নিজেকে জাহির করা নহে।

প্রকৃত গায়ক

যিনি সত্যকারের গায়ক, তিনি এই কর্তব্য-বুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়া থাকেন; কিন্তু সত্যকারের গায়কের সংখ্যা মুষ্টিমেয়, যদিও বহু সঙ্গীতজ্ঞ আমরা প্রত্যহই দেখি। সব গায়কই সত্যকারের আর্টিস্ট নহেন। যাঁহারা আর্টিস্ট নহেন, শুধু গায়ক, তাঁহারা musician নহেন, musicএর technician, এই পর্যন্ত। একজন গায়ক হয়ত ঠিক সুরেই গাহেন ও তাঁহার তালেরও দক্ষতা বর্তমান, কিন্তু তাহা হইলেই যে তিনি প্রকৃত গায়ক হইবেন, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। প্রকৃত গায়ক তিনিই হইতে সক্ষম, ভগবান যাঁহাকে সে প্রতিভা দান করিয়াছেন। নিজের চেষ্টায় সুর ও তাল ঠিক করিলেই গায়ক হওয়া সম্ভবপর নহে। ·· যিনি প্রকৃত গায়ক তিনি কোথায় সুরের বিস্তার করিলে মাধুর্য বর্ধিত হইবে, কোথায় সুরের বিস্তারের প্রয়োজন কোথায় একেবারেই প্রয়োজন নাই সামান্য মীড় দিলেই অতি শোভন হইবে, ইত্যাদি সব ব্যাপার সাধারণ গায়ক অপেক্ষা অনেক বেশি উপলব্ধি করেন। সাধারণ গায়কের হয়ত টেকনিকের জ্ঞান উক্ত শিল্পী হইতে অনেক অধিক হইতে পারে; যেমন ৺ আবদুল করিম বা ৺ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার অপেক্ষা টেকনিকের প্রচুর বেশি জ্ঞান অনেক গায়কের মধ্যে বর্তমান, কিন্তু কেহই তাঁহাদের নাম সুরেন্দ্রনাথ বা খাঁ সাহেবের সহিত সমপর্যায়ে আনিতে চাহেন না।

বাঙলা ও হিন্দুস্থানী ওস্তাদি সঙ্গীত

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে টেকনিশিয়ান-এর একটা বিশেষ স্থান আছে—তিনি সত্যকারের গায়ক না হইলেও হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তাঁহার গলার আরোহণ অবরোহণ তালের উপর অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইতে পারেন অর্থাৎ intellectual appeal একটা আছে—এবং গায়ক সত্যকারের রস-সৃষ্টি না করিলেও আংশিকভাবে শ্রোতাকে আনন্দ দান করিতে পারে। কিন্তু বাংলা গানের ক্ষেত্রে ধরুন, অতুলপ্রসাদের গানের মধ্যে যদি কেহ গলার অবাধ গতি ও তালের দক্ষতা দেখাইতে কোমর বাঁধিয়া বসেন তাহা হইলে শ্রোতা অস্থির হইয়া পড়িবেন ও সুরকার স্বর্গ হইতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিবেন।

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সুর বিস্তারের একটা ঐন্দ্রজালিক মোহ আছে। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে বিশেষ অভিজ্ঞ না হইয়া ও সুর বিস্তারের পদ্ধতি না জানিয়া এই ঐন্দ্রজালিক মোহ বাঙলা সঙ্গীতের গায়কদের ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করিয়াছে। এই কারণে বাঙলা

গানের ও হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মধ্যে প্রকৃতিগত বৈষম্য উপেক্ষা করিয়া মডার্ন বাঙলা গানে গায়ক প্রচুর vocal gymnastic-এর আমদানি করিয়াছেন, ফলে আধুনিক বাংলা গান না ঠুংরি না টপ্পা না গজল না খেয়াল না কীর্তন না ভাটিয়ালী হইয়া vocal gymnastic-এর চূড়ান্ত আকারে পরিণত হইয়াছে।

বাঙলা গানে গায়কের ওস্তাদি ও সুরকারের প্রতি অবিচার

আজ এ বিষয়ের আলোচনার প্রয়োজন হইয়াছে। বাঙলা গানের জগতে বহু গায়ক গায়িকা আছেন যাঁহারা রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল অতুলপ্রসাদের গীতাবলীর মধ্যে নিজেদের ওস্তাদির পরিচয় দিতে বিশেষ ব্যগ্র। তাহাতে সুরকারের রচিত গান ও সুরের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য থাকে তাহা নষ্ট হইয়া যায় ও ক্রমশ যে সুরের অসাধারণ মাধুর্য পরিবেশনের ফলে সুরকারের অমরত্ব লাভ করিয়াছেন সেই স্টাইল নষ্ট হইয়া যায় ও মূল সুরও বিকৃত হইয়া পড়ে।

বাঙলা গানে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে—প্রথম, এই গানেতে তাল খুব বড় জিনিস নহে—বাঙলা গানের মধ্যে এমন একটা সুন্দর ছন্দ আছে যাহা গানকে বড় বেতালা করে না, যদি গায়ক সুরকার বা composer-এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন। দ্বিতীয়, বাঙলা গান গাহিতে যাঁহাদের কথা ও ভাব অপেক্ষা সুরের ও তালের দিকে ঢের বেশি লক্ষ্য, তাঁহাদের বাঙলা গান গাওয়া অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত। প্রত্যেক আর্টেরই সৌন্দর্য উপলব্ধি করিবার দুই দিক আছে—intellectual appeal ও emotional appeal—দার্শনিক হার্বার্ট স্পেনসার হইতে কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ সকলেই emotional appeal-কে আর্টের রাজ্যে শ্রেষ্ঠ মানিয়া লইয়াছেন। বাঙলা গানে emotional appeal-এর প্রাধান্য থাকা প্রয়োজন। সেজন্য যদি কেহ অতুলপ্রসাদের গান গাহিয়া নিজেকে বা শ্রোতাকে ভাবে অভিভূত করিতে না পারেন তাহা হইলে তাঁহার গান সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছে বলিতে হইবে—তা সে সঙ্গীতের মধ্যে যতই কেন না তিনি তানের বিস্তার করুন বা তালের বিভিন্ন লয় লইয়া বিশেষ দক্ষতা দেখান।

রবীন্দ্রনাথ বা দ্বিজেন্দ্রলালের গানের মধ্যে গায়কের স্বাধীনতা অল্পই আছে: কিন্তু অতুলপ্রসাদের গানের মধ্যে ভাষার ঝঙ্কার কম থাকার জন্য সুরের স্বাধীনতা বেশি আছে। কিন্তু ঠিক এই কারণেই অতুলপ্রসাদের সুরের উপর গায়কদের অত্যাচার বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। অতুলপ্রসাদের বাঙলা গানে একটা বিশেষ স্টাইল বর্তমান; সে স্টাইল কি ভৈরবী, কি পিলু বাঁরোয়া, কি আশোয়ারীতে বর্তমান। কেহ যদি অতুলপ্রসাদের গান সাধারণ বাঙলা ভৈরবীতে বা আশোয়ারীতে টপ্পায় গাহেন তাহা গান হইতে পারে, তাহা অতুলপ্রসাদের সঙ্গীত হইল না।"

* * *

প্রসিদ্ধ সঙ্গীতশিল্পী শ্রীমতী সাহানা দেবী কবি অতুলপ্রসাদের গান ও অতুলপ্রসাদ মানুষটি প্রসঙ্গে বলেছেন :

"অতুলপ্রসাদ সেনের কথা মনে হলেই মনে পড়ে তাঁর গানের কথা, মনে পড়ে সেইসব সুরে ভরা সংস্পর্শের আনন্দমুখর দিনগুলির কথা। অতুলদা আমার আত্মীয়, আমার আপন পিসতুতো ভাই হলেও তাঁর সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধের মূল্য আমার কাছে ছিল তা আত্মীয়তার চাইতেও বেশি, তা হচ্ছে সঙ্গীত নিয়ে সম্বন্ধ। অতুলদা ছিলেন গান-পাগল।...রবীন্দ্রনাথের কাছে গান গেয়ে যেমন মন ভরে উঠত, অতুলদার কাছেও হত সেইরকম। গান শুনে অত খুশি হয়ে উঠতে আমি খুউব কমই দেখেছি। কী যে করবেন যেন ভেবে পেতেন না। কত দীর্ঘ সময় ধরে এঁদের কাছে বসে আমি গান শিখেছি, গেয়েছি।...গান শোনার আনন্দে এঁরা ভুলে যেতেন আর সব। অতুলদা শুধু সঙ্গীত-অনুরাগীই ছিলেন না, সঙ্গীত ছিল তাঁর প্রাণ, সত্তার নিত্য সহচর। গাইতেনও সুন্দর। আওয়াজ খুব জোর না হলেও ভারি অন্তরস্পর্শী, মিষ্টি মধুর আর দরদে ভরা ছিল কণ্ঠস্বরটি। যখনই গাইতেন,...প্রাণে লেগে থাকত তার স্পর্শ, মধুরতার একটা রেশ। অতুলদার রচিত সব গানগুলিতে আমরা পাই একটা বিশেষ মধুরতার আস্বাদ। তাঁর নিজের গান তাঁর মুখে যা শুনেছি, আর এখন যা সচরাচর শুনতে পাই তা এতই তফাত যে, তা যেন আর অতুলদার গান বলে চেনা যায় না। মৃদু মধুর সুরের নানা কাজের আলোছায়ার ভিতর ছোট্ট এক একটি খোঁচ ও এক একটি মোচড়ের ভিতর তাঁর সঙ্গীতে ধরা পড়ে সূক্ষ্মতার স্পর্শ; রস, কমনীয়তা ও লালিত্য সব জড়িয়ে তাঁর গান হয়ে ওঠে অদ্ভুত একটা 'ডেলিকেসি'—অতুলদার গানের বিশেষত্ব এইখানেই। নিজস্বতার ছাপ, স্বকীয়তার ধরন। তারই মাঝে আমরা শুনতে পাই অতুল-গীতির মর্মের সুর। এ গানের মাধুর্য এমন যে শুনলেই মন স্বতই বলে ওঠে, 'আহা!' এই এমন জিনিসটিই দেয় অতুলদার গানের আসল পরিচয়। তাঁর সঙ্গীতে সুরচিত্রণে নেই জাঁক-জমকের ঘটা, নেই চমক লাগাবার চেষ্টা। আছে পেলব মাধুর্যের স্নিগ্ধতায় ভরা মনোহরা স্পর্শ। স্বরলিপিতে কিন্তু এ সব পাওয়া যায় না। এসবের স্বরলিপি করা যায় না। সম্ভব নয়। শুধু যে অতুলদার গানের বিষয়ে বলছি তা নয়, এ-জাতীয় বিশিষ্ট শ্রেণীর বাঙলা গানের সম্বন্ধেই বলছি, যে-জাতীয় গানে কথার মূল্য বিশেষভাবে ধরা হয়ে থাকে। বাঙলা গানে কথার ভাব বাদ দেওয়া যায় না কেননা তার কথার সঙ্গে সুরের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। বিশিষ্ট শ্রেণী বলছি এই কারণে যে, গান রচনা হয়ত অনেকেই করে থাকেন, কিন্তু যে সব গীতকারের গান তাদের বৈশিষ্ট্যের গুণে বিশেষ আসন পায়, একটা বিশেষ পর্যায়ে পড়ে, আমি বলতে চাইছি সেই সব গুণীদের গানের কথা। স্বরলিপিতে গানের সুরের কাঠামোটুকুই কেবল দেখা যায়।

বাকি সব দিতে হয় গায়ককেই। সেইজন্যে যাঁরা স্বরলিপি থেকে গান তোলেন, রচয়িতার গান সম্বন্ধে গানের ধরন-ধারন বা ধারা সম্বন্ধে যাঁদের সেরকম কোন জ্ঞান নেই অভিজ্ঞতা নেই ধারণাও নেই, তাদের তোলা গানের সঙ্গে রচয়িতার গানের এত বেশি পার্থক্য থেকে যায় যে, সে গানের মধ্যে রচয়িতার গানকে খুঁজে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় না তার আসল জিনিসের স্পর্শ, ফোটে না তার যথার্থ রূপ, আর বাদও পড়ে অনেক কিছুই। সুরের কাঠামোই তো গান নয়। তাই শুধু স্বরলিপি থেকে গান তোলা সম্পূর্ণ হয় না, সফলও হতে পারে না, যদি না গায়কের রচয়িতার রচনার সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় ও বিশেষ অন্তরঙ্গতা থাকে, যদি না কোন্‌টি রচয়িতার নিজস্ব ছাপ ও বিশেষত্ব সেটাকে তিনি হৃদয়ঙ্গম করে থাকেন, যদি না অন্তরে তাঁর গানের অতলস্পর্শী ভাব উপলব্ধি করে থাকেন। না হলে হাজার বিশুদ্ধভাবে স্বরলিপির সুরকে অনুসরণ বা অবিকল অনুসরণ করে গেলেও রচয়িতার গানের বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে না। যথার্থ শিল্পী-মাত্রেরই থাকে তাঁর প্রতিভার নিজস্ব ছাপ, যা দিয়ে তাঁকে চেনা যায়, যেটা দেয় তাঁর পরিচয়। আমি শুধু আমাদের গীতকারদের কথাই বলছি না···শিল্পকলা জগতের সব শিল্পীদের কথা বলছি—কাব্য সাহিত্য চিত্র সঙ্গীত নৃত্য নাট্য। তাঁদের প্রত্যেককেই আমরা চিনতে পারি তাঁদের নিজস্ব ছাপটি দিয়ে। এই ছাপ দিয়েই আমরা চিনতে পারি অতুলপ্রসাদকে।

* * *

বিশিষ্ট সঙ্গীত-রসিক এবং সঙ্গীত-শিল্পী শ্রীরণজিতকুমার সেন (টুলু সেন) 'অতুলপ্রসাদ ও তাঁর গান' প্রবন্ধে বলেছেন:

"বাংলাদেশে ঠুংরির প্রচলন খুব বেশি দিনের নয়। বাংলার নিজস্ব সম্পত্তি কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালি ইত্যাদি ছাড়া বাংলা দেশে সে সময়ে ওস্তাদী গান বলতে ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা গানই বোঝাত। বলা চলে, বাংলা গানে ঠুংরি চালের প্রবর্তন ব্যাপকভাবে অতুলপ্রসাদই প্রথম করেন। পরে অন্য গীতকাররা ওঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। লখনউতে থাকাকালীন অতুলপ্রসাদ ঠুংরি ও লখনউয়ের আঞ্চলিক গান শোনবার এবং চর্চা করবার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর গানে ঠুংরির প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। তবে তিনি ঠুংরি-জাতীয় গানই যে শুধু রচনা করে গিয়েছেন তা নয়। বহু রাগ সঙ্গীত, খেয়াল সঙ্গীত, খেয়াল টপ্পা, জাতীয় গান, গজল, কাজরী, চৈতী, লউনি, হোলী ইত্যাদি সুরেও গান রচনা করে গেছেন। এছাড়া খাঁটি বাঙলার সুর কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালি, রামপ্রসাদী এবং দক্ষিণী সুরেও গান লিখে গেছেন।
হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে কথার চাইতে সুরের প্রাধান্য বেশি। সঙ্গীতের মাধ্যমে আমরা যখন কোন মনোভাব প্রকাশ করতে চাই, কোন বিশেষ অনুভূতিকে ফুটিয়ে তুলতে চাই,

তখন আমরা সুরেরই আশ্রয় নিই। কথার প্রয়োজন থাকলেও তা সুরকে ছাপিয়ে যাবে না। একথা অবশ্য ঠিক যে কথাকে একেবারে বাদ দেওয়া যায় না, তাহলে সঙ্গীতের পরিসমাপ্তি ঘটত শুধু তেলেনা ও সার্গম দিয়ে বা যন্ত্র-সঙ্গীতে। যেখানে কথা ও সুরে হরগৌরী মিলন হয়েছে, সেইখানেই কণ্ঠ সঙ্গীতের পূর্ণ সার্থকতা। অতুলপ্রসাদের গানে কথা ও সুরের অপূর্ব মিলন লক্ষণীয়।

অতুলপ্রসাদের গানের ভাষা সহজ ও সরল হলেও সুরের দিক দিয়ে তাদের বৈচিত্র্যময় বলা যেতে পারে। সুরকে তিনি বাণীর অনুগামী করেন নি, বাণীর আজ্ঞাবহ ভৃত্য-মাত্র করেননি। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের যে একটি নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য আছে, সঙ্গীত যে মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় সুরের আকাশে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে আবার নিজের নীড়ে ফিরে আসতে সমর্থ, একথা তিনি স্বীকার করতেন। তাই সেই স্বাতন্ত্র্যে তিনি কখনো বাধা দেন নি। শাস্ত্রীয় রাগ-সঙ্গীতের মাধ্যমে তান বিস্তারের লীলা তাঁর গানের বৈশিষ্ট্য। তাঁর গানকে কাব্য-সঙ্গীত পর্যায়ে ফেলা যায় না। অতুলপ্রসাদের গানের প্রাণ হল সুর-ভিত্তিক। যিনি সঠিক দীর্ঘকাল ধরে তাঁর গানের অনুশীলন করেছেন, তিনিই শুধু অতুলপ্রসাদের গানের মূল আবেদনটি সম্পূর্ণভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন।

অতুলপ্রসাদ তাঁর গানে নিজেই সুর যোজনা করতেন। নিজে খুউব বিশিষ্ট গায়ক না হলেও তাঁর সুরসৃষ্টির বাহাদুরি না দিয়ে পারা যায় না। বিভিন্ন রাগের সমন্বয়ে তিনি অতীব মনোরম সুর সৃষ্টি করে গিয়েছেন। তাঁর প্রিয় রাগ ছিল আশাবরী, ভৈরবী, ঝিঁঝিট, খাম্বাজ, দেশ, বেহাগ ও কাফি। তাঁর গানে সুরবিহারের (Improvisation) অবকাশ যথেষ্ট আছে। ইয়োরোপে তিনি দীর্ঘকাল ছিলেন। সেখানে পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত শোনার ও আলোচনা করবার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের ছাপ তাঁর কয়েকটি জাতীয় সঙ্গীতে দেখা যায়—যেমন, 'উঠগো ভারতলক্ষ্মী'। এ গানের সুরটি একটি ইতালীয় সুর অবলম্বনে তৈরি। কিন্তু এই প্রভাব-সম্পাত তাঁর অন্য গানে দেখা যায় না।

সংসারে নানারূপ দুঃখ তিনি পেয়েছিলেন। তাই তাঁর অনেক গানেই বিষাদের সুরটি ও উদাসী ভাবটি মূর্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু সংসারে কঠিন আঘাত পেয়েও তিনি কখনো নিরাশাবাদী হয়ে পড়েন নি। দুঃখ যখন চরমে ওঠে তখন ভগবানের কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণের কথাটাই আমাদের মনে জাগে। তিনি গেয়েছেন, 'কী আর চাহিব বল হে মোর প্রিয়, শুধু তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিও।' সঙ্গীতে তিনি খুঁজেছেন সান্ত্বনা। অতুলপ্রসাদ ছিলেন স্বদেশ প্রেমিক……জাতিকে উদ্দীপিত করতে তার অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনে তাঁর স্বদেশী গানগুলো বাংলাদেশে চিরন্তন হয়ে থাকবে।"

শ্রীরণজিত সেনের সঙ্গে কবিবর অতুলপ্রসাদের সাক্ষাতকার হয় একবার লণ্ডন শহরে।

সে সময়ে অতুলপ্রসাদ এবং রণজিতের মাঝে 'অতুলপ্রসাদী গান' নিয়ে কিছু আলোচনা হয়। সেই প্রসঙ্গে শ্রীরণজিত সেন বলেছেন:

"১৯৩০ সালে লণ্ডন শহরে কয়েকদিনের জন্য অতুলপ্রসাদের সান্নিধ্য আমি লাভ করেছিলাম। সে কটি দিন আমার rosaryতে মুক্তোর মত গাঁথা হয়ে আছে কলকাতায় এবং অন্যত্র বহু অনুষ্ঠানে আমি ওঁর গান গেয়েছি জেনে তিনি আগ্রহ করে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন এবং কয়েকটি গান শিখিয়েছিলেন। সে সময়ে ওঁর গান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম: 'আচ্ছা আপনি যখন গান রচনা করতেন তখন কি বিশেষ কোন পরিবেশের প্রয়োজন হত? কোন বিশেষ ঘটনা বা অভিজ্ঞতা আপনার গান লেখার প্রেরণা হত কি?' তিনি মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'সব সময় নয়। ভাব (expression) অনেক সময়ই আত্মবাদী, (subjective) পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সব সময়ে তার যোগাযোগ থাকে না।' উদাহরণস্বরূপ বলেছিলেন, 'কোর্টে recess। চারদিকে উকিল, আরদালি, পেয়াদা, পুলিশ, সাক্ষীরা ঘোরাফেরা করছে, নিজের চেম্বারে এসে বসেছি। এই হট্টগোলের মধ্যে গান মনে এল। লিখলাম, "ওগো আমার নবীন শাখী ছিলে তুমি কোন্ বিমানে"। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আপনার "জল কহে চল মোর সাথে চল" গানটি পড়ে মনে হয়েছিল আপনি যেন কোন এক জ্যোৎস্না রাতে নৌকো করে নদী দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন ওই গানটি মনে এসেছিল।' এবারেও হেসে বলেছিলেন, 'মোটেই না। কোর্টে যাবার তাড়া, বাথরুমে স্নান করছি, ঘটি দিয়ে বারবার মাথায় জল ঢালছি, তখন ওই গানটি মনে এল। কাজেই বুঝতে পারছ, গান লিখতে সব সময়ে কোন বিশেষ পরিবেশের দরকার হয় না। তবে আমার "বঁধুয়া নিদ নাহি আঁখিপাতে" গানটি লিখেছিলাম মফঃস্বলের এক ডাক-বাঙলোতে। কোন একটি কেসে গিয়েছিলাম। ডাকবাঙলোর বারান্দায় রাতে ডিনারের পর ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে একা বিশ্রাম করছি। বাইরে টিপটিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে, চোখে ঘুম আসছে না। ঝিঁঝিঁ পোকা ও ব্যাঙের ঐকতান শুনছি। মনটা হঠাৎ উদাস হয়ে গেল। ঐ গানটি তখন লিখেছিলাম।'

আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল ওঁর গানের স্বরলিপি সম্বন্ধে। বাংলাদেশে ওঁর গানের প্রচারের প্রথম প্রচেষ্টা করেন ওঁর ছোট মাসি শ্রীমতী সুবালা দেবী, ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্যের স্ত্রী। যদিও ওই প্রচারের সবচাইতে বেশি দাবি করতে পারেন শ্রীদিলীপ-কুমার রায় ও শ্রীসাহানা দেবী। এঁরা নানা অনুষ্ঠানে অতুলপ্রসাদের গান গেয়েছেন। ...যে সব স্বরলিপি সে সময়ে ভারতবর্ষে ও অন্য পত্রিকায় ছাপানো হয়েছিল, তার বেশির ভাগ ছিল সাহানা দেবী ও দিলীপকুমারের কৃত। কিন্তু ওঁরা যখন গাইতেন, তখন হুবহু ঐ স্বরলিপি অনুসরণ করতেন না। অতুলপ্রসাদের গানে তান বিস্তার ও

সুরবিহারের যথেষ্ট অবকাশ আছে, যেটা আমাদের ভারতীয় সঙ্গীতের বিশেষত্ব। এবিষয়ে অতুলপ্রসাদ বলেছিলেন, 'স্বরলিপি হল সুরের ও তালের কাঠামো। সেই নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যেই যে সুরকে আটকা রাখতে হবে তা তো নয়। অবিশ্যি কয়েকটি গান ছাড়া, যেমন আমার জাতীয় সঙ্গীতগুলো। সেগুলি সমবেত কণ্ঠে ভাল শোনায়, তাই সেগুলি নির্দিষ্ট সুরে একভাবে গাইতে হবে যাতে কারো অসুবিধা না হয়। কিন্তু অন্য গানের বেলায়, যেমন খেয়াল, ঠুংরি, গজল ইত্যাদি যেখানে গায়ক গাইছেন, সে বন্ধন থাকতে পারে না। শিল্পী গাইবার সময় গানের ভাবধারাটিকে সম্পূর্ণ বজায় রেখে যদি তান বিস্তার করেন, সুরের কোনরকম অঙ্গহানি না করে যদি সুরবিহার করেন তাহলে সেটা দূষণীয় মনে করি না। শিল্পীর স্বাধীনতা আমি মানি, তবে যথেচ্ছাচার নয়; আমার গানে কালোয়াতি নয়, উচ্ছ্বাস থাকলেও সংযম থাকবে। শিল্পী যদি পারদর্শী হন, তিনি যদি গলায় সূক্ষ্ম কাজ বের করতে পারেন, তাতে ক্ষতি নেই, বরং তাতে গানের সৌষ্ঠব আরো বাড়বে। শুধু স্বরলিপির ওপর চোখ বুলিয়ে গাইলে সে গান মেকানিকাল, প্রাণশূন্য হয়ে যাবার সম্ভাবনা। তাছাড়া ভিন্ন ভিন্ন শিল্পীর অনুভূতি আলাদা রকমের। তাদের প্রকাশভঙ্গী তাই আলাদা হতে বাধ্য। কিন্তু তাতে ক্ষতি কী? After all আর্টের বেলাতেও variety is the spice of life, এটা মান তো'?"

অতুলপ্রসাদের উইল

(আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত)

১৯৩০ সালের ৩০ মে তারিখে কবিবর অতুলপ্রসাদ সেন নিম্নলিখিত উইলখানি করেছিলেন। কবির সম্পত্তির ট্রাস্টীদ্বয় ছিলেন ব্যারিস্টার মিঃ এইচ. কে. ঘোষ ও মিঃ এস. সি. দাশ।

উইলে তিনি তাঁর সম্পত্তির নিম্নলিখিতরূপ বিলি-ব্যবস্থা করেছিলেন:

(১) আমার পত্নী শ্রীযুক্তা হেমকুসুম সেন মৃত্যুকাল পর্যন্ত মাসিক ১০০ টাকা করিয়া পাইবেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ওই ১০০ টাকা এই উইলে যে সকল দাতব্যের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে আনুপাতিক হারে ব্যয় করা হইবে।

(২) আমার পুত্র দিলীপকুমার সেন আজীবন ১০০ টাকা করিয়া পাইবেন এবং তাঁহার অবর্তমানে উহা এই উইলে বর্ণিত দাতব্য কার্যে অথবা অন্যান্য দাতব্য কার্যে ব্যয়িত হইবে।

(৩) ট্রাস্টীরা দিলীপকুমার সেনের জীবনবীমার প্রিমিয়াম দিবেন তৎপর সম্পত্তির যে আয় ও উপস্বত্ব হইবে তাহা ট্রাস্টীরা নিম্নলিখিতভাবে ব্যয় করিবেন:

(ক) রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের অধীন হেমন্ত সেবাসদনে (উইলকর্তার জননীর স্মৃতিরক্ষার্থ নির্মিত) মাসিক ২৫ টাকা করিয়া দেওয়া হইবে।

(খ) কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বা পরিচালিত দাতব্য প্রতিষ্ঠানে মাসিক ২৫ টাকা।

(গ) ঢাকা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ বা নববিধান ব্রাহ্ম সমাজ কর্তৃক দাতব্য কার্যের জন্য মাসিক ২৫ টাকা।

(ঘ) উইলকর্তার পৈত্রিক গ্রাম ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার অধীন মাইগার গ্রামে বা উহার নিকটবর্তী পঞ্চপল্লী গুরুরাম হাই স্কুলে মাসিক ২৫ টাকা।

(ঙ) ব্রাহ্ম প্রচারকদের সাহায্যের জন্য মাসিক ২৫ টাকা।

(চ) লক্ষ্ণৌ বেঙ্গলী ক্লাব ও ইয়ংম্যান অ্যাসোসিয়েশনে মাসিক ১০ টাকা।

(ছ) লক্ষ্ণৌ বেঙ্গলী গার্লস হাই স্কুলে মাসিক ১৫ টাকা।

(জ) মমতাজ পার্কের মুসলমান এতিমখানায় অথবা অন্য কোন উপযুক্ত মুসলমান এতিমখানায় মাসিক ৫ টাকা।

(ঝ) লক্ষ্ণৌতে বা অন্যত্র হিন্দুদের বা আর্য সমাজের কোনও অনাথ আশ্রমে মাসিক ৫ টাকা।

(ঞ) ট্রাস্টীদের বিবেচনাক্রমে এবং সম্পত্তির আয় অনুসারে অন্যান্য দান-কার্যেও ট্রাস্টীরা টাকা দিতে পারিবেন।

সাহায্যপ্রাপ্ত প্রবন্ধ ও পুস্তকের তালিকা

১. অতুলপ্রসাদ, 'ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (উত্তরা)
'মনে এল', 'ঝিলিমিলি' ইত্যাদি গ্রন্থ ও 'অতুল স্মৃতি' সম্পর্কে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ও ভাষণ।

২. 'A. P. Sen' by. C. Y. Chintamani.

৩. 'অতুলপ্রসাদ সেনের জীবন ও গান'—রাধাকমল মুখোপাধ্যায় (উত্তরা)

৪. 'অতুল'—সুবালা দেবী (উত্তরা)

৫. 'তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে'—কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় (উত্তরা)

৬. 'অতুলপ্রসাদ ও অতুলপ্রসাদের গান'—দিলীপকুমার রায় (প্রবাসী)
'সুরেলা'—দিলীপকুমার রায় (উত্তরা), ও 'তীর্থঙ্কর' গ্রন্থ

৭. 'স্বর্গীয় অতুলপ্রসাদ সেন'—রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় (উত্তরা)

৮. 'অতুলপ্রসান সেন', সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (উত্তরা)

৮. 'অতুলদা'—অসিতকুমার হালদার (উত্তরা)

১০. 'অতুল প্রয়াণে—প্রসন্নকুমার সমাদ্দার (উত্তরা)

১১. 'অতুলপ্রসাদের গান'—মেঘেন্দ্রলাল রায় (আনন্দবাজার পত্রিকা)

১২. 'অতুলপ্রসাদের গান'—অরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় (উত্তরা)

১৩. 'অতুলপ্রসাদ'—লালগোপাল মুখোপাধ্যায় (উত্তরা)

১৪. 'অতুলপ্রসাদ'—মহেন্দ্রচন্দ্র রায় (উত্তরা)

১৫. 'আমার কয়েকটি রবীন্দ্রস্মৃতি' ও 'মুসেয়ারা'—অতুলপ্রসাদ সেন (উত্তরা)

১৬. 'আমাদের মনডে ক্লাব'—প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (যুগান্তর)

১৭. 'গীতকার অতুলপ্রসাদ সেন'—রেণুকা দাশগুপ্তা

১৮. 'স্বর্গীয় অতুলপ্রসাদ সেন'—বেলা সেন (পুত্রবধূ) (লখনউর বেঙ্গলী ইয়ংম্যান এসোসিয়েশনের মুখপত্র থেকে)

১৯. 'অতুলপ্রসাদ প্রসঙ্গে'—বিনয়কৃষ্ণ ঘোষ (অপ্রকাশিত প্রবন্ধ)

২০. 'সুরে ভরা দিনগুলি'—সাহানা দেবী (দেশ)

২১. 'অতুলপ্রসাদের তিরোভাবে'—প্রতিভা দেবী (উত্তরা)

২২. 'কবি অতুলপ্রসাদ'—পারুল দেবী (উত্তরা)

২৩. 'অতুল-স্মৃতি'—অমল হোম (উত্তরা)

২৪. 'অতুলপ্রসাদী গান'—জয়দেব রায়

২৫. 'মরমী কবি অতুলপ্রসাদ'—মানিক ভট্টাচার্য (উত্তরা)

২৫. 'অতুলপ্রসাদ'—রাজ্যেশ্বর মিত্র